এনসিয়েন্ট সোসাইটি

প্রথম ভাগ

লুইস হেনরি মর্গান

BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ

লুইস হেনরী মর্গ্যান

লুইস হেনরি মর্গ্যানের জন্ম ১৮১৮ সালে, আমেরিকায়। পেশায় ছিলেন আইনজীবি। বাস করতেন নিউইয়র্কে। পেশার পথে চলতে গিয়ে তিনি ঘটনাক্রমে প্রবেশ করেন নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের আঙিনায়। সেই সময় একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আমেরিকার আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের অন্যতম গোষ্ঠী সেনেকাদের (ইরাকোয়া সঙ্ঘের মধ্যে ছিল এরা) জমি জায়গা অন্যায়ভাবে দখল করবার চেষ্টা করছিল। সেই অন্যায় জবর দখলের বিরুদ্ধে লড়াই-এ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন আইনবিশেষজ্ঞ মর্গ্যান। ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলায় সেনেকাদের পক্ষে দাঁড়ান তিনি। দীর্ঘ লড়াই-এর পর ঐ মামলায় জিতে রক্ষা করেন সেনেকাদের জমি-জায়গা। আর এই সময়ই আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের সমন্ধে, তাদের সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে এক তীব্র কৌতূহল ও মমতা জেগে ওঠে তার মধ্যে। ইণ্ডিয়ানরাও মর্গ্যানকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলে এবং তাদের আপনজন হিসাবে গ্রহন করে। এমনকি তাঁকে সেনেকা গোষ্ঠীর একজন সদস্য হিসাবে গ্রহন করে তারা। আদিবাসীদের জীবনে এমন ঘটনা নিতান্তই বিরল। এ থেকে বোঝা যায়, মর্গ্যানকে তারা কতটা গভীর ভাবে বিশ্বাস করেছিল ও ভালবেসে ছিল। তিনি তাঁর বাকী জীবন ওদের মধ্যেই কাটিয়েছিলেন, ওদের সমাজের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ান আদিবাসী সমাজের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে প্রবেশ করার ফলে তিনি ওদের রীতিনীতি, সামাজিক সংগঠন ও সমাজব্যবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষনের সুযোগ পান। সমাজবিজ্ঞানে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন তিনি। গভীর অধ্যায়ন ও পর্যবেক্ষন শুরু করেন। শুরু করেন মানব সমাজের ক্রমবিবর্ত্তন সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা। আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'লীগ অফ দ্য ইরোকোয়াজ' প্রকাশিত হয় ১৮৫১ সালে। ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয় সিস্টেমস্ অব কনস্যাঙ্গুইনিটি অ্যাণ্ড অ্যাফিনিটি অব দি হিউম্যান ফ্যামিলি'। দীর্ঘকালব্যাপী একাগ্র অধ্যয়ন ও কঠোর গবেষণা চালাতে থাকেন মর্গ্যান। অবশেষে, ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয় 'এনসিয়েণ্ট সোসাইটি', দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর শ্রমের গবেষণালব্ধ গ্রন্থ—মানবজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

বইটির প্রথম প্রকাশের পরে শতাব্দীকালের বেশী সময় ধরে মানবসমাজের বাসস্থান এই পৃথিবী আবর্তিত হয়ে চলেছে। কিন্তু এই বই শতবর্ষের ধুলিমলিনতায় আচ্ছন্ন হয় নি। নিত্য নতুন তথ্য নৃতত্ব ও সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে চলেছে. কিন্তু মর্গ্যানের গবেষণালব্ধ এই মহাগ্রন্থ চিরকাল ঐ দুটি বিষয়ে জ্ঞানের চিরন্তন কোষগ্রন্থ রূপে বিরাজিত হবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

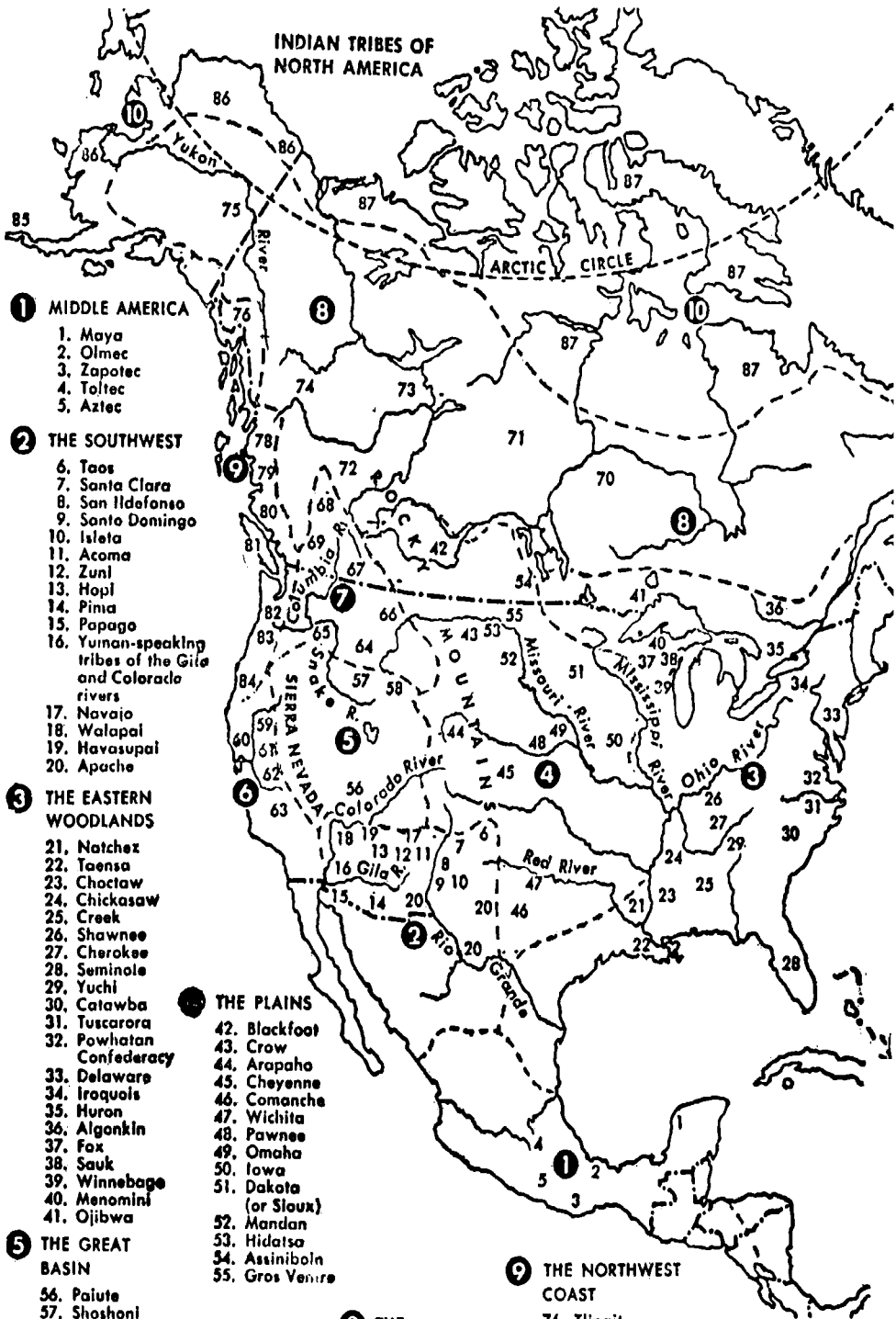
INDIAN TRIBES OF NORTH AMERICA
ARCTIC CIRCLE
Yukon River
Columbia R.
Snake R.
SIERRA NEVADA
Colorado River
Missouri River
Mississippi River
Ohio River
Red River
Rio Grande
1 MIDDLE AMERICA
1. Maya
2. Olmec
3. Zapotec
4. Toltec
5. Aztec
2 THE SOUTHWEST
6. Taos
7. Santa Clara
8. San Ildefonso
9. Santo Domingo
10. Isleta
11. Acoma
12. Zuni
13. Hopi
14. Pima
15. Papago
16. Yuman-speaking tribes of the Gila and Colorado rivers
17. Navajo
18. Walapai
19. Havasupai
20. Apache
3 THE EASTERN WOODLANDS
21. Natchez
22. Taensa
23. Choctaw
24. Chickasaw
25. Creek
26. Shawnee
27. Cherokee
28. Seminole
29. Yuchi
30. Catawba
31. Tuscarora
32. Powhatan Confederacy
33. Delaware
34. Iroquois
35. Huron
36. Algonkin
37. Fox
38. Sauk
39. Winnebago
40. Menomini
41. Ojibwa
4 THE PLAINS
42. Blackfoot
43. Crow
44. Arapaho
45. Cheyenne
46. Comanche
47. Wichita
48. Pawnee
49. Omaha
50. Iowa
51. Dakota (or Sioux)
52. Mandan
53. Hidatsa
54. Assiniboin
55. Gros Ventre
5 THE GREAT BASIN
56. Paiute
57. Shoshoni
58. Bannock
6 CALIFORNIA
59. Wintun
60. Pomo
61. Maidu
62. Miwok
63. Yokuts
7 THE PLATEAU
64. Nez Perce
65. Umatilla
66. Flathead
67. Kutenai
68. Shuswap
69. Thompson
8 THE SUBARCTIC
70. Cree
71. Chipewyan
72. Beaver
73. Slave
74. Kaska
75. Kutchin
9 THE NORTHWEST COAST
76. Tlingit
77. Haida
78. Tsimshian
79. Bella Coola
80. Kwakiutl
81. Nootka
82. Coast Salish
83. Chinook
84. Yurok
10 THE ARCTIC
85. Aleut
86. Alaskan Eskimo
87. Canadian and Greenland Eskimo

DISTRIBUTION OF INDIAN TRIBES BEFORE EUROPEAN TOUCH

এনসিয়েন্ট সোসাইটি

লুইস হেনরী মর্গ্যান

প্রথম পর্ব

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ANCIENT SOCIETY

Lewis Henry Morgan

Part—I

প্রথম বঙ্গানুদিত সংস্করণ ॥ শ্রাবণ ১৩৯৫
দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ॥ আশ্বিন ১৪০১

ভাষান্তর
অসিত চৌধুরি । অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রকাশক ॥ রেণুকা সাহা ॥ দীপায়ন ॥ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭০০০০৯
মুদ্রাকর ॥ দি নিউ মণ্ডল প্রিণ্টার্স ॥ ৪/১ই বিডন রো ॥ কলিকাতা-৭০০০০৬
প্রচ্ছদপট ॥ সন্দীপন ভট্টাচার্য

সত্তর টাকা

এনসিয়েণ্ট সোসাইটি

(প্রাচীন সমাজ)

বন্য অবস্থা থেকে শুরু করে বর্বর অবস্থার মধ্য দিয়ে সভ্যতায় উত্তরণের ধারায়
মানব-প্রগতির উপর গবেষণাকর্ম

লুইস হেনরী মর্গ্যান

সম্পাদনা

অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দীপায়ন ॥ ২০ কেশব সেন স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

ANCIENT SOCIETY

Or

Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization

LEWIS HENRY MORGAN

Member of the National Academy of Sciences, Author of "The League of the Iroquois", "The American Beaver and his Works", "Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family", Etc.

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

First Published in 1877

By

Macmilan & Co. London

And

Printed in the United States of America

বাক্‌শক্তিহীন আদিম একদল জীব বুকে হেঁটে প্রথম ডাঙায় উঠে আসা মাত্রই খাদ্য আর আশ্রয়ের জন্য নিজেদের নখ ও দাঁতের সাহায্যে লড়াই শুরু করে দিল। তারপর লড়াইয়ের জন্য তারা তৈরি করল মুগুর, আরও পরে নানান অস্ত্র-শস্ত্র। স্বরগত ধ্বনি ও ভাবনা প্রকাশ করার জন্য যতদিন না তারা শব্দ এবং নানান নাম ব্যবহার করতে শিখল, ততদিন তারা এইভাবেই লড়াই করে চলল। তারপর থেকে যুদ্ধবিগ্রহে নিরন্ত হতে শুরু করল তারা, শুরু করল প্রাচীরবেষ্টিত শহর তৈরি করতে। আর সেইসঙ্গেই তারা রচনা করল আইনকানুন, যাতে করে কেউ আর চোর, ডাকাত বা ব্যাভিচারী হয়ে উঠতে না পারে।

—হোরেস, স্যাট্‌, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, ৯৯

মানুষ এবং তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে অত্যন্ত সযত্ন ও ব্যাপক অনুসন্ধানের যাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, পৃথিবীতে আমাদের প্রজাতির অস্তিত্ব শুরু হয়েছিল স্থলভাগে নয়, জলভাগে। তারপর ক্রমান্বয়ে তারা উঠে এসেছে ওপরের দিকে। আধুনিক বিজ্ঞান আরও প্রমাণ করেছে যে মানবশক্তির ক্রমবিকাশের একটা ইতিহাস আছে। প্রমাণ করেছে যে মানব-মন ও শরীরের সঙ্গে বহিঃস্থ প্রকৃতির সংঘাতের মধ্য দিয়ে ধীরগতি ও কণ্টকর প্রচেষ্টার পথ বেয়েই গড়ে উঠেছে সংস্কৃতির উপাদান-গুলো—জীবনধারণের উপকরণ, শিল্প, বিজ্ঞান, ভাষা, ধর্ম ও দর্শন।

—হুইট্‌নি, ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক স্টাডিজ, পৃঃ ৩৪১

এই জনগোষ্ঠীগুলো আমাদের হাজার হাজার বছর আগেকার পূর্বপুরুষদের আত্মিক আচার-আচরণকেই প্রতিফলিত করে। দৈহিক ও নৈতিক বিকাশের একই স্তরের মধ্য দিয়ে এসেছি আমরা। পূর্বপুরুষদের জীবন, তাঁদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলেই আজ আমরা এই জায়গায় এসে পৌঁছতে পেরেছি। আমাদের এই বিস্ময়কর সভ্যতাটা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ নাম-না-জানা মানুষের নীরব প্রচেষ্টারই দান, ঠিক যেমন ইংল্যাণ্ডের চুনা-পাথরের পাহাড়গুলো গড়ে উঠেছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত কণার সমন্বয়ে।

—ডঃ জে. কেইন্‌স, অ্যান্‌থ্রোপোলজিআ,
খণ্ড ১, সংখ্যা ২, পৃঃ ২৩৩

প্রকাশনা প্রসঙ্গে

এই বই প্রকাশের পরিকল্পনা আমাদের অনেক দিনের। একদিকে এই বিশাল বইয়ের অনুবাদ এবং প্রকাশনাকে সাধ্যমতো উন্নত করার চেষ্টা, অন্যদিকে নানান বাধা-বিপত্তি—দু'য়ে মিলে বইটা প্রকাশ করতে এক বছরেরও বেশি দেরি হয়ে গেল। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠকসমাজের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

ভারতে বাংলা ভাষায় এ বইয়ের এই প্রথম অনুবাদ। ভারতের আর কোন আঞ্চলিক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে কিনা, জানা নেই আমাদের। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা যথাসম্ভব মূলানুগ থাকার চেষ্টা করেছি, সেইসঙ্গেই চেয়েছি অনুবাদ যেন সহজবোধ্য হয়। বইটাকে আমরা দু'পর্বে ভাগ করে প্রকাশ করছি। এই পর্বানুযায়ী ভাগটা কিন্তু নেহাতই প্রকাশনার সুবিধার্থে করা, এর অন্য কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই।

অনুবাদকর্মে আমরা কলকাতার ভারতী লাইব্রেরী, ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি সংস্করণটির সাহায্য গ্রহণ করেছি। ভারতী লাইব্রেরী ঐ সংস্করণটি প্রকাশ করেন ১৯৪৭ সালে। পরবর্তী সংস্করণ ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

এ বই প্রকাশ করতে গিয়ে পেয়েছি অগণিত সাথীবন্ধুদের উৎসাহ ও পরামর্শ। প্রকাশের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন তাঁরা। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তাঁদের। কোন কোন বন্ধু এগিয়ে এসে প্রকাশনার কাজে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। আর আলাদা করে উল্লেখ করা দরকার 'দি নিউ মণ্ডল প্রিণ্টার্স'-এর কথা—এর কর্মীরা নীরবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ছাপার কাজে।

৫ই শ্রাবণ ১৩৯৫

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

লুইস হেনরী মর্গ্যান

লুইস হেনরী মর্গ্যানের জন্ম ১৮১৮ সালে, আমেরিকায়। পেশায় ছিলেন আইনজ্ঞ। বাস করতেন নিউইয়র্কে। পেশার পথে চলতে গিয়ে তিনি ঘটনাক্রমে প্রবেশ করেন নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের আঙিনায়। সেই সময় একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আমেরিকার আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের অন্যতম গোষ্ঠী সেনেকাদের (ইরোকোয়া সংঘের মধ্যে ছিল এরা) জমি-জায়গা অন্যায়ভাবে দখল করার চেষ্টা করছিল। সেই জবরদখলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন আইনবিশেষজ্ঞ মর্গ্যান। ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলায় সেনেকাদের পক্ষে দাঁড়ান তিনি। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ঐ মামলায় জিতে রক্ষা করেন সেনেকাদের জমি-জায়গা। আর এ সময়ই আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে তাদের সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে এক তীব্র কৌতূহল ও মমতা জেগে ওঠে তাঁর মধ্যে। ইণ্ডিয়ানরাও মর্গ্যানকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলে এবং তাদের আপনজন হিসেবে গ্রহণ করে। এমনকি তাঁকে সেনেকা গোষ্ঠীর একজন সদস্য হিসেবেও গ্রহণ করে তারা। আদিবাসীদের জীবনে এমন ঘটনা নিতান্তই বিরল। এ থেকেই বোঝা যায় কতটা গভীরভাবে মর্গ্যানকে তারা বিশ্বাস করেছিল ও ভালবেসেছিল। তিনি তাঁর বাকি জীবন ওদের মধ্যেই কাটিয়েছিলেন, ওদের সমাজের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ান আদিবাসী সমাজের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে প্রবেশ করার ফলে তাদের রীতিনীতি, সামাজিক সংগঠন ও সমাজব্যবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান তিনি। অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন সমাজবিজ্ঞানে। গভীর অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। শুরু করেন মানবসমাজের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা। আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'লীগ অফ দ্য ইরোকোয়াজ' প্রকাশিত হয় ১৮৫১ সালে। ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয় 'সিস্টেমস্ অব কনস্যাঙ্গুইনিটি অ্যাণ্ড অ্যাফিনিটি অফ দ্য হিউম্যান ফ্যামিলি'। দীর্ঘকালব্যাপী একাগ্র অধ্যয়ন ও কঠোর গবেষণা চালাতে থাকেন মর্গ্যান। অবশেষে ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয় 'এনসিয়েণ্ট সোসাইটি', দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর শ্রমের গবেষণালব্ধ গ্রন্থ—মানবজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

বইটির প্রথম প্রকাশের পর শতাব্দীকালের বেশি সময় ধরে আবর্তিত হয়ে চলেছে মানবসমাজের বাসভূমি এই পৃথিবী। কিন্তু শতবর্ষের ধূলিমলিনতায় আচ্ছন্ন হয় নি এ বই। নিত্য নতুন তথ্য যদিও নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে চলেছে, তবুও মর্গ্যানের গবেষণালব্ধ এই মহাগ্রন্থ চিরকাল ঐ দুটি বিষয়ে জ্ঞানের চিরন্তন কোষগ্রন্থ হিসেবেই বিবেচিত হতে থাকবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মর্গ্যান প্রসঙ্গে

আমেরিকার আইনজীবী লুইস হেনরী মর্গ্যান একদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—বর্তমান ধনিক সভ্যতার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে হবে সেনেকা-ইণ্ডিয়ানদের বাসভূমিকে। এগিয়েছিলেন মর্গ্যান। এগিয়েছিল মানবসমাজের ইতিহাসও। সেইদিন, মর্গ্যানের সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিনই, এক নতুন অধ্যায়ের বৃত্তে পা রেখেছিল নৃতত্ত্ব ও মানব-সমাজের ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাস রচনার কাজ।

মানবসমাজের অগ্রগতির ধারা সম্বন্ধে মর্গ্যানের আবিষ্কার, যে-কোন মানবগোষ্ঠীর পুরনো, হারানো অতীতকে জানার এক নির্দিষ্ট পদ্ধতি গড়ে তোলার কাজে তাঁর অবদান—এ-সব প্রসঙ্গ আজকের পৃথিবীতে বহুল আলোচিত। তবে, মর্গ্যানের নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের কাজ সম্পর্কে সবথেকে গভীর ও মূল্যবান আলোচনার কৃতিত্বটা সম্ভবত নির্দিষ্ট ছিল ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস-এর জন্যই। 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' নামক গ্রন্থটিতে এঙ্গেলস বিপুলভাবে কাজে লাগিয়েছেন মর্গ্যানের গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে। একদিক দিয়ে বলতে গেলে এঙ্গেলসের এই গ্রন্থটি মর্গ্যানের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের একটি সুনির্দিষ্ট বর্ধিত প্রকাশ। ১৮৮৪ সালে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ এবং ১৮৯১ সালের চতুর্থ সংস্করণের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লিখেছিলেন এঙ্গেলস। ঐ দুটি ভূমিকায় মর্গ্যানের কাজ আর তার তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি যা লিখেছিলেন, তার অনেকটাই আমরা উদ্ধৃত করব এখানে। কিন্তু তার আগে দেখা যাক মর্গ্যানের কাজ প্রসঙ্গে আমাদের এই বাংলার এক প্রায়-বিস্মৃত চিন্তানায়ক কী বলেছিলেন।

আজ থেকে চৌষট্টি বছর আগে, ১৯২৪ সালে, এঙ্গেলস-এর 'The Origin of the Family, Private Property and the State' গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেন বস্তুবাদী দর্শন প্রচারের অন্যতম পুরোধা অধ্যাপক শ্রীবিনয় কুমার সরকার 'পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র' নামে। বইটির সূচনায় শ্রীসরকার নিজে একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। গভীর, সুচিন্তিত ঐ ভূমিকায় 'মর্গ্যানের সিদ্ধান্ত' শিরোনামে তিনি লিখেছেন —"...মর্গ্যানের প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে মানব-সমাজে এককালে 'দলগত' বিবাহ অর্থাৎ অবাধ যৌনিসংশ্রব প্রচলিত ছিল। এই অবাধ সংশ্রবে বিধি-নিষেধ কায়েম হইতে থাকে। ক্রমশঃ গেন্‌স্‌ বা গোষ্ঠী প্রথা দেখা দেয়, গোষ্ঠী-নীতি আবিষ্কার করা মর্গ্যানের দ্বিতীয় কীর্ত্তি। গোষ্ঠী সমরক্তজ জীবন-কেন্দ্র। এক গোষ্ঠীর ভিতর পরস্পর-বিবাহ নিষিদ্ধ। গোষ্ঠী পরিচালিত হইত প্রথম প্রথম নারীর তরফ হইতে— 'জননী-বিধি'র নিয়মে। সেই 'জননী-বিধি'র গোষ্ঠী আজও চলিতেছে ইরোকোআ সমাজে। এই গেল মর্গ্যানের তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

'নারীর আমল' গোষ্ঠীধর্ম হইতে পরে উঠিয়া যায়। তাহার পরিবর্তে দেখা দেয় 'পুরুষ-বিধি' এবং পুরুষাধিত্য। গ্রীক, রোমান এবং জার্মান সমাজগুলার প্রাচীনতম স্মৃতিশাস্ত্রে পুরুষ প্রাধান্যশীল গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানই দেখিতে পাওয়া যায়। মর্গ্যানের এই আবিষ্কার প্রাচীন ইয়োরোপের ইতিহাস রচনায় যুগান্তর আনিয়াছে। 'এই চার সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াই মর্গ্যান আলোচনা খতম করেন নাই। 'উৎকর্ষে'র (Civilisation) যুগ সম্বন্ধে অর্থাৎ যে-যুগের ভরা জোআরে বর্তমান জগতের 'সভ্য' নরনারী বসবাস করিতেছে—সেই স্তরের জীবন যাত্রাকে ইনি চরম ভাষায় তিরস্কার করিয়াছেন। লাভের লোভই এই যুগের ধনোৎপাদনের গোড়ার কথা,—ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া ধনজীবীরা আর কিছু চিন্তা করে না—ইহাই মর্গ্যানের মতে উৎকর্ষশীল মানবের মূল মন্ত্র। ফরাসী সোশালিষ্ট ফুরিয়ে যে ভাবে বর্তমান জগতের আর্থিক ব্যবস্থার নিন্দা করিয়াছেন, মর্গ্যানও সেইরূপই করিয়াছেন।

'উৎকর্ষের যুগকে গালাগালি দেওয়াই মর্গ্যানের শেষ কথা নয়। একটা ভবিষ্য সমাজের স্বপ্নও তাঁহার মাথায় ছিল। কোথায় একটা অনুন্নত আদিম অসভ্য জাতির আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বৃত্তান্ত-প্রকাশ এবং প্রাচীন ইয়োরোপের মান্ধাতার আমলের গ্রীক্-রোমান জার্ম্মানদের জীবন কথার আলোচনা, আর কোথায় বর্তমান মানবের জন্য সমাজসংস্কার, পরিবার-সংস্কার, আর রাষ্ট্র সংস্কারের মোসাবিদ্যা। সমাজ সংস্কারক হিসাবে মর্গ্যান্ প্রায় মার্কসের বিপ্লব-পথেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কারণ, মর্গ্যানের মতে ভবিষ্য মানব সেই মান্ধাতার আমলেরই যৌথ সম্পত্তি নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী ধর্ম্মের এক নবরূপ প্রকটিত করিবার দিকে অগ্রসর হইতেছে।"

মর্গ্যান যে প্রায় মার্কসের সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছেছিলেন স্বাধীনভাবে, তার স্পষ্ট স্বীকৃতি খুঁজে পাওয়া যায় এঙ্গেলসের লেখায়। 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থের ১৮৮৪ সালের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস লিখেছেন—"...মর্গ্যানের গবেষণার ফলাফলগুলিকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন স্বয়ং কার্ল মার্কস। আসলে তাঁর নিজের—বা আমাদের দুজনের—ইতিহাস সংক্রান্ত বস্তুবাদী অনুসন্ধানলব্ধ সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে মিলিয়েই ঐ ফলাফলগুলিকে উপস্থাপিত করতে আর তার পূর্ণ তাৎপর্য স্পষ্ট করে তুলতেই চেয়েছিলেন তিনি। কেননা আমেরিকায় বসে মর্গ্যান তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে ইতিহাস সংক্রান্ত বস্তুবাদী ধারণাকে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। তার চল্লিশ বছর আগে এই ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন মার্কস। বর্বরযুগ ও সভ্যযুগের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে এই বস্তুবাদী ধারণার সাহায্যে মর্গ্যান যে সিদ্ধান্ত পৌঁছেছিলেন, সেই সিদ্ধান্তগুলি মূলগতভাবে মার্কসের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের থেকে অভিন্ন। মার্কসের 'ক্যাপিটাল'-কে বহু বছর ধরে জার্মানির সরকারি অর্থনীতিবিদরা চুরি করে কাজে লাগানোর ও ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, আর মর্গ্যানের 'এনসিয়েণ্ট সোসাইটি' নিয়ে ঠিক তেমন কাজই করেছিল ইংল্যাণ্ডের 'প্রাগৈতিহাসিক' বিজ্ঞানের মুখপাত্ররা।...মর্গ্যানের মূল কৃতিত্ব হচ্ছে আমাদের লিখিত ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক ভিত্তির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আবিষ্কার ও পুনর্গঠন

করা এবং উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের লিঙ্গভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে গ্রীস, রোম ও জার্মানির প্রাচীনতম ইতিহাসের সবথেকে জটিল সমস্যাগুলো (এতদিন পর্যন্ত যেগুলোর কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় নি) সমাধানের চাবিকাঠি আবিষ্কার করা।...তাঁর গ্রন্থটি এই যুগের এক যুগান্তর সৃষ্টিকারী রচনা।"

এঙ্গেলস-এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায় মর্গ্যানের গবেষণা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। "মর্গ্যানের 'এনসিয়েন্ট সোসাইটি'-র সংক্ষিপ্তসার" শীর্ষক নোটে মর্গ্যানের গ্রন্থ থেকে প্রচুর পরিমাণ সারকথা সংকলন করেছিলেন কার্ল মার্কস।*

১৮৯১ সালে 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' বইটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় মর্গ্যানের কাজ ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে আরও গভীর ও বিস্তৃত বক্তব্য পেশ করেন এঙ্গেলস। ঐ ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"১৮৭১ সালে মর্গ্যান হাজির করলেন এক নতুন এবং বহুলাংশে নিশ্চিত সিদ্ধান্তমূলক তথ্যসমষ্টি। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে ইরোকোয়াদের মধ্যে বিদ্যমান জ্ঞাতিত্বের বিচিত্র প্রণালীটি যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেই উপস্থিত, অর্থাৎ সমগ্র মহাদেশ জুড়েই এই জ্ঞাতিত্ব-প্রণালীটি বিদ্যমান ছিল—যদিও ঐ অঞ্চলে চালু-থাকা বিবাহভিত্তিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন ধরণের জ্ঞাতিত্ব-সম্পর্কের থেকে এই প্রণালীটি ছিল একেবারেই বিপরীত। তাই অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার জ্ঞাতিত্ব-প্রণালী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাহায্য নেন। এই তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা ও সারণী তিনি নিজেই রচনা করেছিলেন। প্রাপ্ত উত্তরগুলো থেকে তিনি আবিষ্কার করেন যে: ১) আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে চালু-থাকা জাতিত্বসম্পর্কের ব্যবস্থাটি এশিয়ার অসংখ্য গোষ্ঠীর মধ্যে কিছুটা পরিবর্তিত রূপে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও বিদ্যমান; ২) হাওয়াই এবং অন্যান্য অস্ট্রেলিয় দ্বীপপুঞ্জে বিদ্যমান এক ধরণের দলগত বিবাহের (যা এখন প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে) ঘটনা থেকে এই তথ্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়; এবং ৩) এই ধরণের বিবাহপদ্ধতির পাশাপাশি ঐ-সব দ্বীপপুঞ্জে জ্ঞাতিত্বসম্পর্কের এমন এক ব্যবস্থা চালু ছিল, যার ব্যাখ্যা করা যায় শুধুমাত্র দলগত বিবাহের এক প্রাচীনতর কিন্তু বর্তমানে বিলুপ্ত ব্যবস্থার সাহায্যেই।...এইভাবে তিনি মানবজাতির প্রাক্-ইতিহাস সংক্রান্ত অনুসন্ধানের এক নতুন দিগন্ত ও ধারা উন্মোচিত করেন এবং সুদূরপ্রসারী জ্ঞানের দুয়ার খুলে দেন।"

এরপর এঙ্গেলস বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহ বিষয়ে মর্গ্যানের আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা করেছেন। মর্গ্যান দেখিয়েছেন—বহির্বিবাহ আর অন্তর্বিবাহ কোন পরস্পরবিরোধী ব্যাপার নয়। দলগত বিবাহ সব জায়গাতেই কোন-না-কোন সময়ে চালু ছিল। তবে গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে গোত্রগুলো থাকত, সেগুলোর সদস্যদের মধ্যেকার সম্পর্কটা

---

* কার্ল মার্কস: অ্যাবস্ট্রাক্ট অফ মর্গ্যানস এনসিয়েন্ট সোসাইটি, ১৯৪৫, মার্কস-এঙ্গেলস আর্কাইভস্, খণ্ড ৯।

নির্ধারিত হত মায়ের দিক থেকে আর এই গোত্রগুলোর মধ্যে অন্তর্বিবাহ প্রায় পুরোপুরিই নিষিদ্ধ ছিল। গোত্রের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যেই বিবাহ করত, কিন্তু গোত্রের মধ্যে বিবাহ করতে পারত না। অর্থাৎ গোত্র ছিল পুরোপুরিই বহির্বিবাহ-ভিত্তিক আর গোষ্ঠী ছিল পুরোপুরিই অন্তর্বিবাহভিত্তিক।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আরও সামনে এগিয়েছেন মর্গ্যান। এঙ্গেলস লিখেছেন: "তিনি (মর্গ্যান) আবিষ্কার করেছিলেন যে মাতৃ-অধিকারের ভিত্তিতে সংগঠিত গোত্রই হচ্ছে গোত্রের আদি রূপ। গোত্রের এই রূপের মধ্যে থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে পিতৃ-অধিকার ভিত্তিক গোত্র—পুরনো দিনের সভ্য জাতিগুলোর মধ্যে গোত্রের এই রূপেরই সন্ধান পাই আমরা। আগেকার আমলের সমস্ত ঐতিহাসিকের কাছেই গ্রীক আর রোমান গোত্রগুলো ছিল এক আশ্চর্য প্রহেলিকা, কিন্তু এখন ইণ্ডিয়ান গোত্রগুলো সংক্রান্ত জ্ঞানের আলোকে গ্রীক ও রোমান গোত্রগুলোকেও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল। এইভাবে আদিম সমাজের সমগ্র ইতিহাসের একটা নতুন বনিয়াদ খুঁজে পেলাম আমরা। ···সভ্য মানুষের পিতৃ-অধিকার ভিত্তিক গোত্রের পূর্ববর্তী স্তরে সমাজে মাতৃ-অধিকার ভিত্তিক গোত্রেরই অস্তিত্ব ছিল—এই সত্য পুনরাবিষ্কার করেন মর্গ্যান। জীববিদ্যার ক্ষেত্রে ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্ব এবং আর্থ-রাজনীতির ক্ষেত্রে মার্কসের উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব যে তাৎপর্য বহন করে, আদিম সমাজের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মর্গ্যানের এই পুনরাবিষ্কারও সেই একই তাৎপর্য বহন করে থাকে।··· মাতৃ-অধিকার ভিত্তিক গোত্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় এই সমগ্র বিজ্ঞানটি (আদিম সমাজের ইতিহাস)। এই আবিষ্কারের পর থেকে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পেরেছি কোন্ পথে পরিচালিত করতে হবে আমাদের গবেষণাকে, কিসের অনুসন্ধান করতে হবে এবং কিভাবেই বা বিন্যস্ত করতে হবে আমাদের অনুসন্ধানলব্ধ ফলাফলকে।"

মর্গ্যানের 'এনসিয়েণ্ট সোসাইটি'-কে একেবারে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি ইংরেজিভাষী দেশের ধর্মীয় নেতারা ও প্রাগিতিহাসবিদরা। এঙ্গেলস লিখেছেন, "এই মুহূর্তে গ্রন্থটির মূল সংস্করণ আর পাওয়া যায় না। আমেরিকায় এই ধরণের গ্রন্থের কোন লাভজনক বাজার নেই। ইংল্যাণ্ডে গ্রন্থটিকে সুপরিকল্পিতভাবে চেপে রাখা হয়েছে। এই যুগান্তকারী গ্রন্থের জার্মান অনুবাদটিই শুধু এখন বাজারে পাওয়া যায়।"

এর পরে এঙ্গেলস জানিয়েছেন কিভাবে মর্গ্যান সমালোচনা করেছিলেন আজকের এই পণ্য-উৎপাদন ভিত্তিক সমাজের। কিন্তু শুধু সমালোচনা করেই দায়িত্ব শেষ করেননি মর্গ্যান। এঙ্গেলস লিখেছেন, "সমাজের এক ভবিষ্যৎ রূপান্তরের কথা এমন ভাষায় বলেছেন মর্গ্যান, যা প্রায় কার্ল মার্কসের ঐ বিষয়ে বক্তব্যেরই সমতুল।"

এঙ্গেলস-এর চমৎকার ভূমিকাটি শেষ হয়েছে এই কথাগুলো দিয়ে—"মর্গ্যানের প্রকল্পের কিছু কিছু বিষয় এখন হয়ত নড়বড়ে হয়ে পড়েছে, এমনকি কোন-কোনটিকে আর সমর্থনও করা যাচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে সদ্য-আবিষ্কৃত তথ্যগুলো কোনভাবেই তাঁর গবেষণার মূলনীতি ও ধারণাকে স্থানচ্যুত করতে পারে নি। আদিম সমাজের

ইতিহাস বিষয়ক চর্চায় যে পদ্ধতির সূত্রপাত করেছিলেন তিনি, তা মূলগতভাবে আজও সঠিক ও সমানভাবে কার্যকরী ।"

এঙ্গেলস কর্তৃক এই ভূমিকা লিখিত হওয়ার পর আমাদের এই নীল গ্রহটি সাতানব্বইবার ঋতু পরিবর্তন করেছে। গঙ্গা-রাইন-ইউফ্রেটিস-ভলগা-হোয়াংহোর শরীর বেয়ে তরঙ্গায়িত হয়েছে অমেয় জলরাশি। হাজার পরিবর্তনের পথ বেয়ে আজও বয়ে চলেছে মিসিসিপি-মিসৌরি-নীল-আমাজন। ঘটে চলেছে নিত্য নতুন পরিবর্তন। নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে সমাজব্যবস্থাকে উন্নত করার চেষ্টা চলেছে অক্লান্ত। কিন্তু আজও একইভাবে আমাদের গভীর মনোযোগ দাবি করে এই 'এনসিয়েন্ট সোসাইটি' এবং তার স্রষ্টা লুইস হেনরী মর্গ্যান।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

মুখবন্ধ

পৃথিবীর বুকে মানবজাতির সুপ্রাচীনতার প্রমাণাদি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে এইসব প্রমাণাদি আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র বিগত ত্রিশ বছরের মধ্যে এবং বর্তমান প্রজন্মই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছে।

এখন জানা গেছে যে সেই তুষার-যুগে এবং ঐ যুগ শুরু হওয়ার আগেও ইওরোপে মানুষের অস্তিত্ব ছিল, আর এটা একান্তই সম্ভব যে এর পূর্ববর্তী কোন ভূতাত্ত্বিক যুগে সেখানে তাদের উদ্ভব ঘটেছিল। সমসাময়িক বহু প্রজাতির পশুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদেরকে তখন টিকে থাকতে হয়েছিল এবং মানবজাতির বিভিন্ন শাখায় বিকাশের একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল—তাদের গতিপথে ও প্রগতিতে যা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মানবজাতির সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল যেহেতু ভূতাত্ত্বিক যুগের সংশ্লিষ্ট, সেই কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমাকে হিসেব থেকে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। উত্তর গোলার্ধের বুক থেকে হিম-বাহ সরে যাওয়ার সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মোটামুটি এক লক্ষ বা দু লক্ষ বছর অতিবাহিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এক-একটা যুগের প্রকৃত স্থায়িত্বকাল আমরা জানি না, আর তা নিয়ে নানান সংশয় দেখা দিতেই পারে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমরা নিঃসংশয় যে বহু প্রাচীনকালেও, এমনকি একেবারে সুদূরতম প্রাচীন-কালেও মানবজাতির অস্তিত্ব ছিল।

বর্বর মানুষদের সঙ্গে বন্য মানুষদের এবং সভ্য মানুষদের সঙ্গে বর্বর মানুষদের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে ধারণা চালু ছিল, তাকে দারুণভাবে পাল্টে দিয়েছে উপরোক্ত সত্যটি। আজ যথেষ্ট দৃঢ় প্রমাণ সহযোগে একথা ঘোষণা করা যায় যে—সমস্ত মানবগোষ্ঠীর মধ্যেই বর্বর যুগের আগে এসেছে বন্য যুগ এবং সভ্য যুগের আগে এসেছে বর্বর যুগ। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসের উৎস এক, অভিজ্ঞতা এক, প্রগতির পথও এক।

অতীতের ঐ-সব যুগগুলো মানুষ কিভাবে কাটিয়ে এসেছে, তারপর অতি ধীর, প্রায় অনির্ণেয় পদক্ষেপের সাহায্যে বন্য মানুষরা কিভাবে পৌঁছেছিল উচ্চতর স্তরে অর্থাৎ বর্বরযুগে; অগ্রগতির ঐ একই পথ বেয়ে বর্বর মানুষ কেমনভাবে এসে পৌঁছেছিল সভ্যতার দুয়ারে, এবং কেনই বা অন্যান্য গোষ্ঠী ও জাতিগুলো পিছিয়ে পড়েছে প্রগতির প্রতিযোগিতায়; কেউ এসে গেছে সভ্য যুগে, কেউ রয়েছে বর্বর দশায়, আবার কেনই বা কোন কোন গোষ্ঠী পড়ে রয়েছে বন্য অবস্থায়—সম্ভব হলে এ-সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজাটা এক নিতান্ত স্বাভাবিক ও যথার্থ আকাঙ্ক্ষা। আশা করা যায় যে একদিন-না-একদিন এ-সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে।

মানবপ্রগতির পথে ক্রমপর্যায়ে ঘটে গেছে একের পর এক উদ্ভাবন ও আবিষ্কার এবং এইসব উদ্ভাবন ও আবিষ্কারই সূচিত করেছে প্রগতির ধারাবাহিক স্তরগুলোকে। অন্যদিকে, মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার দরুণ সামাজিক ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমবৃদ্ধি ঘটেছে কয়েকটি প্রাথমিক চিন্তার ভ্রূণ থেকে। এগুলোর সাহায্যেও প্রগতির স্তরসমূহকে চিনে নেওয়া যায়। এই অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্তবাহী প্রধান সামাজিক প্রধান বিষয়গুলিকে এইসব প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারগুলোই সুস্পষ্ট-ভাবে রূপায়িত করেছে, টিকিয়ে রেখেছে। এগুলোকে একত্রিত করে তুলনা করা হলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সমগ্র মানবজাতির উদ্ভব হয়েছিল একই প্রক্রিয়ায়, অগ্রগতির একই স্তরে মানুষের চাহিদা সর্বত্রই এক, এবং সমাজের একই অবস্থায় মানবমনের কার্যকলাপও সর্বত্রই এক।

বন্য যুগের শেষ পর্যায়ে এবং সমগ্র বর্বর যুগে মানবজাতি সাধারণত সংগঠিত ছিল গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীতে। প্রাচীন পৃথিবীতে সমস্ত মহাদেশেই এইসব সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল এবং এগুলোই প্রাচীন সমাজকে সংগঠিত ও একত্রিত করে রেখেছিল। এই-সব সংগঠনের কাঠামো, একটা সাংগঠনিক ক্রমের অঙ্গ হিসেবে এদের মধ্যেকার সম্পর্ক, গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর সদস্যদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধে আর দায়-দায়িত্ব—এ-সব থেকেই মানুষের চিন্তায় শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারণার উন্মেষকে বেশ বোঝা যায়। মানবজাতির প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল বন্য যুগে, সেগুলো বিকশিত হয়েছিল বর্বর যুগে, আর সভ্য যুগে এসে সেগুলো পূর্ণতাপ্রাপ্ত হচ্ছে। একইভাবে পরিবারও এগিয়েছে বিভিন্ন ধারাবাহিক রূপের মধ্যে দিয়ে এবং রক্তসম্পর্ক ও জ্ঞাতিত্বের এমন এক বিরাট ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যা আজও পর্যন্ত টিকে আছে। এক-একটা যুগে ক্রমে ক্রমে পরিবারের এক-একটা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই ব্যবস্থা-গুলোর মধ্যেই সেই নির্দিষ্ট যুগে পরিবারের মধ্যেকার বিদ্যমান সম্পর্ককে খুঁজে পাওয়া যায়। আর রক্তসম্বন্ধযুক্ত পরিবারের স্তর থেকে শুরু করে, নানান অন্তর্বর্তী রূপের পথ বেয়ে, এক-পতিপত্নীভিত্তিক পরিবারে এসে পৌঁছনোর ব্যাপারে মানব-জাতির অভিজ্ঞতার এক সুস্পষ্ট ইতিবৃত্তও খুঁজে পাওয়া যায় এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণার উদ্ভব ও বিকাশও এই একই পথ অনুসরণ করছে। বন্যতার যুগে সম্পত্তি বলতে কিছুই ছিল না। আর আজ সভ্য জাতিগুলোর মানুষদের মনে সম্পত্তিই হয়ে উঠেছে জীবনধারণের পুঞ্জীভূত প্রতিনিধিস্বরূপ এবং সম্পত্তি সঞ্চয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে গভীর হয়ে চেপে বসেছে।

উপরে উল্লিখিত চারটি বিষয়, যেগুলো বন্য যুগ থেকে সভ্য যুগ পর্যন্ত মানুষের প্রগতির সমস্ত পথটা জুড়ে পরস্পরের পাশাপাশি সারাক্ষণ ছড়িয়ে থেকেছে, সেগুলোই হচ্ছে এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

গবেষণার একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আমেরিকা মহাদেশবাসী হিসেবে আমাদের এক বিশেষ ঔৎসুক্য ও বিশেষ কর্তব্য আছে। বস্তুগত সম্পদে আমেরিকা মহাদেশ খুবই সমৃদ্ধি-শালী। সেই সঙ্গেই এই মহাদেশ জাতিতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের

ব্যাপারেও অন্য সমস্ত মহাদেশের থেকে সমৃদ্ধিশালী। এই উপাদানগুলো হচ্ছে বর্বর যুগের নমুনা বিশেষ। যেহেতু সমগ্র মানবজাতির উৎস মূলত এক, তাই সমস্ত মহাদেশে মানবজাতির অগ্রগতি ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন অথচ সমরূপ গতিপথ ধরে, এবং অগ্রগতির একই পর্যায়ে থাকা সমস্ত গোষ্ঠী ও জাতিগুলোর মধ্যেও একই প্রক্রিয়া একই নিয়মে কাজ করে চলেছে। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আমেরিকার ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা এবং তাদের মত অবস্থায় থাকার সময় আমাদের প্রাচীন পূর্ব-পুরুষদের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা প্রায় একই। মানব-ইতিহাসের একটা অঙ্গ হিসেবে তাদের সামাজিক সংগঠনগুলি শিল্পকলা, উদ্ভাবন এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ উচ্চমানকে বিধৃত করে এবং ইণ্ডিয়ান জাতির সীমানা ছাড়িয়ে সেটা বহু দূরে প্রসারিত।

আমেরিকার ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীসমূহের অস্তিত্ব যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন তাদের মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক যুগের স্বাক্ষর বিদ্যমান ছিল। সেই সময় পৃথিবীর অন্য কোন জায়গায় এই তিনটি যুগের স্বাক্ষর অত পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান ছিল না। জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের সুপ্রচুর উপাদান ছড়িয়ে ছিল এদের মধ্যে। কিন্তু যেহেতু বর্তমান শতাব্দীর আগে পর্যন্ত এইসব বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রায় ছিল না এবং বর্তমানেও যেহেতু এইসব বিজ্ঞানের কার্যকলাপ আমাদের মধ্যে একান্তই দুর্বল, তাই ঐ-সব বিষয়ের গবেষকরা যথাযথভাবে কাজ করে উঠতে পারেন নি। তাছাড়া ভবিষ্যতের ছাত্রদের জন্য মাটির গভীরে রক্ষিত থাকবে প্রচুর জীবাশ্ম, কিন্তু ইণ্ডিয়ানদের শিল্প, ভাষা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন চিহ্ন তখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রতিদিনই এগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, বিগত তিনশ বছরেরও বেশি সময় ধরেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আসছে। নব্য আমেরিকাবাসীদের সভ্যতার প্রভাবে ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর জাতিগত জীবনযাত্রা ক্ষয়ে যাচ্ছে, তাদের শিল্প ও ভাষা শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে যাচ্ছে। এখন যে-সব তথ্য অনায়াসেই সংগ্রহ করা যায়, আর কয়েক বছর পরে সেগুলোকে খুঁজে বার করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। এই পরিস্থিতি এখন এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটিতে প্রবেশ করতে এবং এর সুপ্রচুর ফসল সংগ্রহ করতে দৃঢ়ভাবে আহ্বান জানাচ্ছে আমেরিকাবাসীদের কাছে।

রচেস্টার, নিউইয়র্ক
মার্চ, ১৮৭৭

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে বোধবুদ্ধির ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ
মানবজাতির আদিম যুগপর্যায়

সর্বনিম্ন অবস্থা থেকে মানবজাতির অগ্রগতি—উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বোঝা যায় এই অগ্রগতিকে—দুধরণের সরকার—একটা গোত্রীয় ও সামাজিক, যা সৃষ্টি করে সমাজ (Societas) ; অন্যটা রাজনৈতিক, যা গড়ে তোলে রাষ্ট্র (Civitas)—প্রথমটা গড়ে ওঠে ব্যক্তি ও গোত্রের ভিত্তিতে আর দ্বিতীয়টা গড়ে ওঠে ভূখণ্ড ও সম্পত্তির ভিত্তিতে—প্রথমটা হচ্ছে প্রাচীন সমাজের সরকারের রূপ—দ্বিতীয়টা হচ্ছে আধুনিক বা সভ্য সমাজের শাসনব্যবস্থার রূপ—মানব অভিজ্ঞতার সমতা—আদিম যুগপর্যায়ের বিভাগ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব—১। বন্য যুগের নিম্ন অবস্থা ; ২। বন্য যুগের মধ্যকালীন অবস্থা ; ৩। বন্য যুগের উচ্চ অবস্থা ; ৪। বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থা ; ৫। বর্বর যুগের মধ্যকালীন অবস্থা ; ৬। বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থা ; ৭। সভ্য অবস্থা। ৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের কলাকৌশলসমূহ

পৃথিবীর ওপর মানবজাতির আধিপত্য—জীবনধারণের উপকরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ—কেবলমাত্র মানবজাতিই এই নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পেরেছিল—জীবনধারণের ধারাবাহিক উপকরণ—১। প্রকৃতিজাত ফল-মূলের ওপর নির্ভরশীল জীবনধারণ ; ২। মৎস্যনির্ভর জীবনধারণ ; ৩। তণ্ডুলজাতীয় শস্যনির্ভর জীবনধারণ ; ৪। মাংস ও দুগ্ধনির্ভর জীবনধারণ ; ৫। কৃষিকাজের সাহায্যে অপর্যাপ্ত নির্ভরতার উপায়—এগুলোর মধ্যে সময়ের বিরাট ব্যবধান। ১৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মানব প্রগতির অনুপাত

মানব প্রগতির ধারা—আধুনিক সভ্যতার প্রধান প্রধান অবদান—প্রাচীন সভ্যতার প্রধান প্রধান অবদান—বর্বর যুগের শেষ পর্যায়ের প্রধান প্রধান অবদান—বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ের প্রধান প্রধান অবদান—বর্বর যুগের প্রথম পর্যায়ের প্রধান প্রধান অবদান—বন্য যুগের প্রধান প্রধান অবদান—আদিম মানুষের হীন অবস্থা—জ্যামিতিক অনুপাতে মানব প্রগতি—ঐতিহাসিক যুগগুলোর আপেক্ষিক স্থায়িত্বকাল—সেমিটিক ও আর্য গোষ্ঠীগুলোর উদ্ভব। ২৫

দ্বিতীয় খণ্ড

শাসনতন্ত্রের ধারণার উন্মেষ

প্রথম পরিচ্ছেদ
লিঙ্গভিত্তিক সমাজ গঠন

অস্ট্রেলিয় শ্রেণীসমূহ—এগুলো লিঙ্গের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়—সংগঠনের প্রাচীন চরিত্র—অস্ট্রেলিয় গোত্র—আটটি শ্রেণী—বিবাহের নিয়ম—স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশ-ধারা নির্ণয়—বিস্ময়কর দাম্পত্য-ব্যবস্থা—প্রতিটা গোত্রে দুটো পুরুষ ও দুটো নারী শ্রেণী থাকত—শ্রেণীগুলোতে পরিবর্তন—গোত্রগুলো এখনও প্রাথমিক স্তরেই রয়েছে। ৩৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইরোকোয়াদের গোত্র বিভাগ

গোত্রীয় সংগঠন—বহু জায়গায় এর অস্তিত্ব—গোত্রের সংজ্ঞা—স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ই ছিল প্রাচীন নিয়ম—গোত্রের সদস্যদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব—গোত্রের সাকেম্ ও প্রধানদের নির্বাচিত ও বরখাস্ত করার অধিকার—গোত্রের মধ্যে বিবাহ না করার বিধিনিষেধ—মৃত সদস্যদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে পারস্পরিক অধিকার—সাহায্য, প্রতিরক্ষা ও আঘাতের পরিচর্যা করার পারস্পরিক দায়িত্ব—সদস্যদের নাম-প্রদানের অধিকার—বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার—সাধারণ ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাস পালন—সার্বজনীন কবরস্থান—গোত্র-পরিষদ—পশুদের নাম অনুযায়ী গোত্রের নামকরণ—গোত্রের সদস্যসংখ্যা। ৪৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইরোকোয়া ভ্রাতৃত্ব

ভ্রাতৃত্বের সংজ্ঞা—রক্তসম্বন্ধযুক্ত কিছু গোষ্ঠী পুনর্মিলিত হত একটা উচ্চতর সংগঠনে—ইরোকোয়া গোষ্ঠীগুলোর ভ্রাতৃত্ব—এর গঠন—এর ব্যবহার ও কার্যকলাপ—সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপ—দৃষ্টান্ত—গ্রীক ভ্রাতৃত্বগুলোর প্রাচীন রূপের সমতুল—চোক্‌টাদের ভ্রাতৃত্ব—চিকামা ভ্রাতৃত্ব—মোহেগান্ ভ্রাতৃত্ব—থ্‌লিংকিট্ ভ্রাতৃত্ব—আমেরিকান আদিবাসীদের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই সম্ভবত ভ্রাতৃত্বের অস্তিত্ব ছিল। ৭১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ইরোকোয়া গোষ্ঠী

গোষ্ঠী একটা সংগঠন—এটা গঠিত হত একই উপ-ভাষাভাষী কিছু গোত্রকে নিয়ে—বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার ফলে দেখা দেয় ভাষার পার্থক্য ও বিভাজন—গোষ্ঠী একটা স্বাভাবিক বিকাশের ফল—দৃষ্টান্ত—গোষ্ঠীর কার্যাবলী ও লক্ষণ—নিজস্ব

ভূখণ্ড ও নাম—একটা উপ-ভাষার ওপর একচেটিয়া অধিকার—সাকেম্ ও প্রধানদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার অধিকার—ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপাসনার অধিকার প্রধানদের পরিষদ—কোন কোন ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর একজন সর্দার-প্রধান থাকা—গোত্রীয় সরকারের তিনটি ধারাবাহিক রূপ ঃ প্রথম, এক-শক্তির সরকার ; দ্বিতীয়, দুই-শক্তির সরকার ; তৃতীয়, তিন-শক্তির সরকার। ৮৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ইরোকোয়া মিত্রসঙ্ঘ

স্বাভাবিক বিকাশের ফলেই মিত্রসংঘ গড়ে ওঠে—এর ভিত্তি হচ্ছে সাধারণ গোত্র ও সাধারণ ভাষা—ইরোকোয়া গোষ্ঠীসমূহ—নিউ ইয়র্কে তাদের বসতি স্থাপন—মিত্রসঙ্ঘের গঠন—এর কাঠামো ও নীতিসমূহ—পঞ্চাশটা সাকেম্ পদ সৃষ্টি করা হয়—কয়েকটা গোত্রে পদটা ছিল উত্তরাধিকারমূলক—প্রতিটা গোষ্ঠীর সাকেম্ সংখ্যা—এইসব সাকেম্দের নিয়েই গড়ে উঠত মিত্রসঙ্ঘের পরিষদ—আভ্যন্তরীণ বিষয়ক পরিষদ—এর কার্যকলাপের পদ্ধতি—যে-কোন কাজের জন্য দরকার হত সকলের সম্মতি—শোকপ্রকাশ সংক্রান্ত পরিষদ—সাকেম্দের তুলে-ধরার পদ্ধতি—সার্বজনীন সেনাপতি—এই পদটাই ছিল প্রধান কার্যনির্বাহী বিচারক পদের ভ্রূণরূপ—ইরোকোয়াদের মননগত ক্ষমতা। ১০৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
গ্যানোয়ানিয়ান বর্গের অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে গোত্র

আমেরিকান আদিবাসীদের বিভিন্ন ভাগ—ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেকার গোত্র-সমূহ, তাদের বংশধারা ও উত্তরাধিকার নির্ণয়ের নিয়ম—১। হোডেনোসনিয়ান গোষ্ঠী—২। ডাকোটিয়ান গোষ্ঠী—৩। উপসাগরীয় গোষ্ঠীসমূহ—৪। পাওনী গোষ্ঠী—৫। অ্যাল্‌গন্‌কিন্ গোষ্ঠী—৬। অ্যাথাপ্যাস্‌কো-অ্যাপাশে গোষ্ঠীসমূহ—৭। উত্তর-পশ্চিম উপকূলের গোষ্ঠীসমূহ—এস্কিমোরা একটা আলাদা বর্গ—৮। স্যালিস, সোহাপ্‌টিন এবং কুট্‌নে গোষ্ঠীসমূহ—৯। শোশোনী গোষ্ঠী—১০। নিউ মেক্সিকো, মেক্সিকো আর মধ্য আমেরিকার ভিলেজ ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীসমূহ—১১। দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীসমূহ—গ্যানোয়ানিয়ান বর্গের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই সম্ভবত গোত্রের অস্তিত্ব ছিল। ১৩০

সপ্তম পরিচ্ছেদ
আজটেক মিত্রসঙ্ঘ

আজটেক সমাজ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা—অগ্রগতির অবস্থা—নহট্‌ল্যাক্ গোষ্ঠীসমূহ—মেক্সিকোয় তাদের বসতি স্থাপন—মেক্সিকোর পুয়েব্লো প্রতিষ্ঠা, ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ—আজটেক মিত্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা, ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ—অঞ্চলগত কর্তৃত্বের পরিধি—সম্ভাব্য জনসংখ্যা—আজটেকদের মধ্যে গোত্র ও ভ্রাতৃত্ব ছিল কিনা—প্রধানদের পরিষদ—এর সম্ভাব্য কার্যাবলী—মন্তেজুমার পদ—নির্বাচনমূলক স্থায়িত্বকাল—মন্তেজুমার বরখাস্ত-

করণ—এই পদের সম্ভাব্য কার্যাবলী—আজটেকদের প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল মূলগতভাবে গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন—সামরিক গণতন্ত্রের সরকার। ১৬৫

অষ্টম পরিচ্ছেদ
গ্রীক গোত্র

গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর প্রথম দিককার অবস্থা—গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত—গোত্রের চরিত্রের পরিবর্তন—রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা—যে যে সমস্যার সমাধান করা দরকার ছিল—রাষ্ট্র গঠন—গ্রীক গোত্রগুলো সম্বন্ধে গ্রোটের বিবরণ—গ্রীক ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীগুলো সম্বন্ধে গ্রোটের বিবরণ—গোত্রের সদস্যদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব—এগুলো ইরোকোয়া গোত্রের সদস্যদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির সমতুল—গোত্রের প্রধানের পদ—এই পদ নির্বাচনমূলক ছিল, নাকি উত্তরাধিকারমূলক—গোত্রই ছিল সমাজ ব্যবস্থার বনিয়াদ—গোত্রীয় বংশধারার প্রাচীনতা—সম্পত্তির উত্তরাধিকার—প্রাচীন এবং সর্বশেষ নিয়ম—গোত্রের সদস্যদের মধ্যেকার সম্পর্ক—সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাবের কেন্দ্রস্বরূপ গোত্র। ১৯৩

নবম পরিচ্ছেদ
গ্রীক ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠী এবং জাতি

এথেনিয় ভ্রাতৃত্ব—কিভাবে গঠিত হয়েছিল—ডিকেআর্খাস-এর সংজ্ঞা—উদ্দেশ্য মূলত ধর্মীয়—ফ্রাট্রিয়ার্ক—গোষ্ঠী—তিনটি ভ্রাতৃত্ব নিয়ে একটা গোষ্ঠী—ফাইলো-ব্যাসিলিয়ুস—জাতি—চারটি গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হয়েছিল জাতি—বোউল বা প্রধানদের পরিষদ—অ্যাগোরা, বা গণ-পরিষদ—ব্যাসিলিয়ুস—পদটার স্থায়িত্বকাল, সামরিক ও পুরোহিত-সুলভ কার্যাবলী—পৌর কার্যকলাপ দেখা যায় নি—মহাকাব্যীয় যুগের সরকার, সামরিক গণতন্ত্র—ব্যাসিলিয়ুস সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা—পরবর্তীকালের এথেনিয় গণতন্ত্র—গোত্রের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে এই গণতন্ত্র পাওয়া গিয়েছিল—এথেনিয়দের অগ্রগতির ওপর এর শক্তিশালী প্রভাব। ২১২

দশম পরিচ্ছেদ
গ্রীক রাজনৈতিক সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ

সরকারের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে গোত্রের ব্যর্থতা—থেসেউসের আইন—শ্রেণী-ভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করার প্রচেষ্টা—এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতা—ব্যাসিলিয়ুস পদ বিলোপ—বিচারক—নউক্র্যারি এবং ট্রিট্যু—সোলোনের আইন—সম্পত্তিভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস। গোত্রের হাত থেকে শ্রেণীগুলোর হাতে পৌর ক্ষমতার হস্তান্তর—গোত্রহীন ব্যক্তিরা—এদের নাগরিক করা—ব্যবস্থাপক-সভা—লোক-সভা—আংশিক রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা—অ্যাটিকার ডেমি বা শহর—এর সংগঠন ও ক্ষমতা—এর স্থানীয় স্বশাসন—গোষ্ঠী বা বিভাগ—অ্যাটিকার কমন্‌ওয়েলথ—এথেনিয় গণতন্ত্র। ২৩০

প্রথম খণ্ড

উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বোধবুদ্ধির ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানবজাতির আদিম যুগপর্যায়

মানবজাতির আদিম অবস্থা সম্পর্কে সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফল আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করে যে সর্বনিম্ন অবস্থায় জীবন আরম্ভ করে খুব ধীর গতিতে পরীক্ষানির্ভর নানান ব্যবহারিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানসঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ ক্রমশ বন্য অবস্থা থেকে সভ্যতার বর্তমান অবস্থাতে এসে পৌঁছেছে।

যেহেতু এটা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীতে কোন-এক সময়ে মানবজাতির কিছু অংশ বন্য অবস্থাতে, অপর কিছু অংশ বর্বর অবস্থাতে এবং বাকি অংশটুকু সভ্য অবস্থাতে বিরাজ করত, সেহেতু এটাও স্বতঃসিদ্ধ যে সভ্যতা বিকাশের এই সম্পূর্ণ পৃথক তিনটি পর্যায়ক্রম স্বাভাবিক নিয়ম এবং প্রয়োজন অনুসারে পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। অধিকন্তু সমগ্র মানবজাতির প্রত্যেকটি শাখা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বিকাশের যে যে অবস্থাতে উন্নীত হয়েছে এবং তাদের ঐ বিকাশের প্রতিটি ধাপ পেরিয়ে আসার জন্য যে-সমস্ত অপরিহার্য পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে, তা ঐতিহাসিকভাবে সর্বক্ষেত্রেই একরকম হতে বাধ্য এবং মানবজাতির বহু শাখাই ঐ-সমস্ত পর্যায়ের দুই বা ততোধিক ক্রমের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে বলে আমরা এখন জ্ঞাত হয়েছি।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আরও অনেক প্রমাণ দাখিল করে মানবজাতির বিবর্তনের প্রাথমিক স্থূল অসভ্য অবস্থার কথা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে তাদের মানসিক ও নৈতিক ক্ষমতার ক্রমবিকাশ এবং নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে কিভাবে তারা সভ্যতার দিকে এগিয়ে চলেছিল—তা দেখানর চেষ্টা করব। এর কিছুটা জানা সম্ভব হবে মানবসভ্যতার অগ্রগতির সমগ্র পথের প্রতিটি ধাপে যে-সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনগুলো হয়েছে তার সাহায্যে, কিন্তু মূলত সম্ভব হবে গার্হস্থ্য বিধিনিয়ম বা সাংসারিক রীতিনীতির সাহায্যে, যা মানুষের বেশ কিছু ধ্যানধারণা এবং ভাবাবেগের ক্রমবিকাশকে প্রকাশ করে।

মানব-প্রগতির সিঁড়ি ধরে নীচের দিকে নামতে নামতে মানবজাতির একেবারে প্রথম বন্য অবস্থার কাল পর্যন্ত যদি যাওয়া যায়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে সে-সময়ে ঐ সিঁড়ির প্রতিটি ধাপের এক প্রান্তে কিভাবে পরপর সমস্ত আবিষ্কার ও উদ্ভাবনগুলি হয়েছে এবং অন্য প্রান্তে যে-সমস্ত সংগঠন আর সামাজিক নিধি-নিয়মগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো রয়েছে। মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথে প্রথমটার অর্থাৎ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের প্রতিটি স্তর তার পরের স্তরটিকে সাহায্য করে এগিয়ে চলেছে আর দ্বিতীয়টা অর্থাৎ গার্হস্থ্য নিয়মকানুনগুলি মানুষে মানুষে সম্পর্ক তৈরিতে সাহায্য করেছে।

BanglaBook.org

সভ্যতার অগ্রগতিতে প্রথমটার সংযোগ মোটামুটিভাবে সরাসরি, কিন্তু দ্বিতীয়টা মুখ্যত কিছু চিন্তা-ভাবনার অঙ্কুরের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে সভ্যতার অগ্রগতিকে সাহায্য করেছে। মানবসভ্যতার বর্বর অবস্থার সময়েই বর্তমান সামাজিক নিয়মগুলো বৃহৎ বৃক্ষের মত তার শিকড় এবং শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছিল, যদিও এর বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল একেবারে বন্য অবস্থার সময়েই। যুগ-যুগান্তর ধরে এই একইভাবে তাদের বিকাশ ঘটেছে—কিছুটা রক্তধারার মধ্য দিয়ে, আবার কিছুটা যুক্তি এবং বুদ্ধির পথ বেয়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ স্বাধীন দুটো পন্থা আমাদের দৃষ্টি-আকর্ষণ করছে। একটা হচ্ছে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পথে অনুসন্ধান, অন্যটা হচ্ছে মানবসমাজের সামাজিক বিধিনিয়ম ও রীতিনীতিগুলো কখন, কিভাবে, কোন্ আকারে এল, সেই পথ ধরে অনুসন্ধান। এই দুটো পথ ধরে অনুসন্ধান করে আমরা মানুষের অগ্রগতির প্রতিটি ধাপকে চিহ্নিত করতে পারব বলে আশা করছি। তবে আমরা প্রধানত গার্হস্থ্য বিধিনিয়মগুলোর ভিত্তির ওপরেই অনুসন্ধান করে প্রমাণ এবং নজির টানবার চেষ্টা করব, কারণ এক্ষেত্রে মেধার দ্বারা কার্য সম্পাদনের দৃষ্টান্ত নিতান্তই গৌণ।

এইসমস্ত তথ্য থেকে দেখা যাবে যে বেশ কিছু চিন্তাধারা, ভাবাবেগ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিভাবে আস্তে আস্তে মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে এবং ধাপে ধাপে বিকাশলাভ করেছে। এদের মধ্যে যেগুলো প্রথম স্থান দখল করেছে সেগুলোকে যদি আমরা একটি বিশেষ চিন্তাধারার বিকাশ অনুসারে যুক্ত করে একটা সম্বন্ধ সৃষ্টির চেষ্টা করি, তাহলে দেখা যাবে আবিষ্কার আর উদ্ভাবন ছাড়া তারা নিম্নলিখিত ধরণের হবে।

১) জীবনধারণের উপায়।
২) শাসনব্যবস্থা।
৩) ভাষা।
৪) পরিবার।
৫) ধর্ম।
৬) গার্হস্থ্য জীবন ও স্থাপত্য।
৭) সম্পত্তি।

প্রথম॥ জীবনধারণের উপায় এবং উপকরণগুলি দীর্ঘ ব্যবধানে অনুক্রমিক কলা-কৌশলের সাহায্যে বৃদ্ধি পেয়েছে ও উন্নত হয়েছে, এগুলো আবিষ্কার আর উদ্ভাবনের সঙ্গে কমবেশি প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

দ্বিতীয়॥ বন্য অবস্থায় মানুষ যখন গণের ভিত্তিতে (একই পূর্বপুরুষের বংশধর) দলবদ্ধ হল, তখনই রোপিত হয়েছিল শাসনব্যবস্থার বীজ। এটাই পরে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে অবশেষে রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছিল।

তৃতীয়॥ মানুষের ভাষা খুব সম্ভবত তার ভাবের সহজ আর স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গি থেকেই উদ্ভাবিত হয়েছে। লুক্রেশিয়াসের মতে—অঙ্গভঙ্গি এবং ইঙ্গিত-ইশারাই রূপান্তরিত হয়েছে ভাষায়, যেমন চিন্তাভাবনা রূপান্তরিত হয়েছে বক্তব্যে। এক-অক্ষর-যুক্ত শব্দ থেকে ক্রমশ পদের সৃষ্টি হয়েছে, পরে তা পরিণত হয়েছে পূর্ণ বাক্যে। বুদ্ধির দ্বারা মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই স্বরযন্ত্রের সাহায্যে সুস্পষ্ট উচ্চারণে কথা

BanglaBook.org

বলতে শিখেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা অবশ্য ঠিক আমাদের এখনকার অনুসন্ধানের আওতায় পড়ছে না।

চতুর্থ ॥ পরিবারের উৎপত্তি এবং তার বিকাশ নিহিত রয়েছে রক্তের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার নিয়মগুলোর মধ্যে এবং বিবাহের ব্যাপারের মধ্যেই। এগুলোর সাহায্যেই অনুক্রম অনুসারে পরিবারের উৎসের খোঁজ-খবর নিশ্চিতভাবে পাওয়া সম্ভব।

পঞ্চম ॥ ধর্ম সংক্রান্ত ধ্যানধারণা ঠিক কিভাবে এল এবং তার বিকাশই বা কেমনভাবে হল, সেটা এত দুঃসাধ্য কার্যকারণের ঘেরাটোপে আবদ্ধ যে তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া মুস্কিল। ধর্মের ব্যাপারটা এত বেশি কল্পনা, আবেগ আর অবিশ্বাস্য উপাদানে ভর্তি যে সমস্ত আদিম ধর্মগুলোই বেশ হাস্যকর ও কিছুটা দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। তাছাড়া এই ব্যাপারটাও ঠিক আমাদের এই অনুসন্ধানের আওতার মধ্যে পড়ছে না। ফলে সামান্য কিছু প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করা ছাড়া এটা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো না।

ষষ্ঠ ॥ গৃহ নির্মাণ বা স্থাপত্য, যেটার সঙ্গে পরিবারের আর গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার গভীর সম্পর্ক আছে, সেটা দিয়েই আমরা বন্য অবস্থা থেকে সভ্য অবস্থায় অগ্রগতির মোটামুটি একটা চিত্র খুঁজে পাবো। বন্য অবস্থায় কুঁড়েঘর, বর্বর অবস্থায় যৌথ-বাড়ি এবং তার পরে সভ্য জাতিদের মধ্যে এক পরিবারের জন্য একটা বাড়ির মধ্যেই এর অগ্রগতির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এগুলো একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই বিষয়টাও তেমন প্রয়োজনীয় নয়, মাঝে মাঝে উল্লেখ করা হবে মাত্র।

শেষত ॥ সম্পত্তির ধারণাটা মানুষের মনের মধ্যে আকার গ্রহণ করেছিল খুব ধীরে ধীরে, বহুযুগ ধরে এটা মানুষের মনের মধ্যে সুপ্ত অথচ বর্ধিষ্ণু অবস্থায় ছিল। বন্য অবস্থার এই ধারণার বীজ মানুষের মনে রোপিত হয়, বন্য এবং বর্বর অবস্থার সমস্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এটা পুষ্ট হয়ে অঙ্কুরিত হয়, সম্পত্তির যে সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণকারি ক্ষমতা আছে এই ধারণাটা গ্রহণ করবার জন্য মানুষের মস্তিষ্ককে তৈরি করে তোলে। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে এই সম্পত্তি লাভ করার ইচ্ছেটাই মানব-সভ্যতার সূত্রপাত হিসেবে গণ্য হয়েছে। এটা যে শুধু সভ্যতাকে নানা বিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে নিয়ে যেতেই সাহায্য করেছে তাই নয়, ভূখণ্ড আর সম্পত্তির ওপরে ভিত্তি করে রাজনৈতিক সমাজ গঠন করতেও সাহায্য করেছে মানুষকে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণার বিবর্তনের একটা চুলচেরা হিসেব-নিকেশ করলে মানুষের মানসিক ইতিহাসের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে।

এখানে আমার উদ্দেশ্য হল মানুষের উন্নতি বা বিকাশের কিছু প্রমাণ পূর্বে উল্লিখিত ঐ-সমস্ত রাস্তা ধরে বিচার-বিবেচনা করে উপস্থিত করা, যা বিভিন্ন যুগে আবিষ্কার আর উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে এবং সরকার গঠন, পরিবার ও সম্পত্তির ধারণা বিকাশের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমরা ধরে নিচ্ছি যে সমস্ত ধরনের শাসনব্যবস্থাকে দুটো সাধারণ ধারায় সংক্ষেপিত করা সম্ভব (এখানে আমরা ধারা কথাটাকে বৈজ্ঞানিক অর্থে ব্যবহার করছি)। মূলগত

BanglaBook.org

উপাদানের দিক থেকে এই দুটি ধারা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। প্রথম ধারাটা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিভিত্তিক এবং সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থাকে আমরা সমাজ (societas) বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই ব্যবস্থার প্রাথমিক একক হচ্ছে গোত্র (Gens)। ক্রমশ গড়ে উঠল পরবর্তী স্তরগুলি, অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব (phratry), গোষ্ঠী (tribe) এবং গোষ্ঠীগুলোর সম্মিলিত মিত্রসঙ্ঘ (confederacy)। পরে এরা আবার রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন করেছিল। পরবর্তী সময়ে এইসমস্ত গোষ্ঠীগুলো একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে মিলেমিশে গিয়ে একটা জাতির সৃষ্টি করে ছিল। গোত্রের আবির্ভাবের পর থেকে বহুযুগ ধরে প্রাচীন সমাজের গঠনপদ্ধতিটা ছিল এ-রকমই। সভ্যতার আগমনের পরও এইটাই ছিল গ্রীক আর রোমানদের সমাজের ভিত্তি। দ্বিতীয় ধারাটা হল ভূখণ্ড এবং সম্পত্তি ভিত্তিক। এটাকে আমরা রাষ্ট্র (civitas) আখ্যা দেব। এর প্রাথমিক একক হচ্ছে একটা ছোট সীমারেখা দিয়ে ঘেরা নগর বা ওয়ার্ড এবং তার সম্পত্তি ও জনগণ। পরে এর থেকেই রাজনৈতিক সমাজের উদ্ভব হয়েছিল। এই রাজনৈতিক সমাজ তৈরি হয়েছিল ভূখণ্ডের ভিত্তিতে এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ থাকার সুবাদে মানুষ ও সম্পত্তির ব্যাপারে লেনদেন করতে পারত সে। এর পরের ধাপে নগর আর ওয়ার্ড। ওটাই হল একটা সামাজিক ব্যবস্থার একক। তারপর কিছু নগর মিলে জেলা বা প্রদেশের সৃষ্টি হল। জেলা আর প্রদেশ মিলিয়ে সৃষ্টি হল রাজ্যের, উদ্ভব হল রাষ্ট্রের। প্রত্যেক অঞ্চলের সমস্ত লোকেরা মিলে একটা রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা তৈরি করল। এইভাবে বড় হতে হতে এটা এমন বৃহৎ আকার ধারণ করেছিল যে সভ্যতার যুগে প্রবেশ করার পর রোমান আর গ্রীকদের সাম্রাজ্যের পক্ষে এই ভারটা খুব গুরুভার হয়ে গিয়েছিল। তারাই এই দ্বিতীয় ধারার শাসনব্যবস্থা বা সরকারের সৃষ্টি করেছিল যেটা এখনো পৃথিবীর তাবৎ সভ্য সমাজের মধ্যে টিকে আছে। প্রাচীন সমাজে এই ধরনের অঞ্চলভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারটা একেবারেই অজানা ছিল। যখন এটার উদ্ভব হল তখন থেকে অবশ্য এটাই হল প্রাচীন সমাজ আর আধুনিক সমাজের সীমারেখা।

মনে রাখতে হবে যে বর্বর আমলের সামাজিক বিধি বা নিয়মকানুনগুলো, এমনকি মানুষের আদিম পূর্বপুরুষ বন্য মানুষদেরও কিছু কিছু নিয়মকানুন এখনো মানব-সমাজে পরিষ্কারভাবে রয়ে গেছে। অতি আদিম অবস্থার সময়টুকু ছাড়া প্রায় সমস্ত যুগের মানবসমাজের সমস্ত ধাপের অগ্রগতির বা বিকাশের ইতিহাস নিহিত রয়েছে এর মধ্যে। এসব নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে মানবসমাজের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে, যেমন যৌনসম্পর্কভিত্তিক সমাজ, তারপরে আসে সগোত্রভিত্তিক সমাজ এবং সবশেষে অঞ্চল ভিত্তিতে গঠিত সমাজের মধ্যে। এ-সব সামাজিক সংগঠন ক্রমশ গঠিত হয়েছে পরিবর্তন-শীল বিবাহ পদ্ধতি এবং পরিবার গঠনের মধ্য দিয়ে। জ্ঞাতিত্বের ব্যবস্থাও এ-থেকেই গড়ে উঠেছিল। এটার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাবে গার্হস্থ্য জীবন এবং গৃহ-স্থাপত্যের মধ্যে। পরে ধীরে ধীরে সম্পত্তির অধিকার আর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ব্যবহারের ক্রমপরিবর্তনের মধ্যে এর পরিচয় পাওয়া যাবে।

BanglaBook.org

মানবসমাজের কিছু অংশের ক্রমাবনতির ফলে বন্য আর বর্বরদের সৃষ্টি হয়েছে, এটা অনেকেই বলেন। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। সৃষ্টির অংশ হিসেবে অনেকে এটাকে তুলে ধরেন, সেটাও ভুল ধারণা। এর সাহায্যে মানবসমাজে বন্য অবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা করা যায় না। তাছাড়া মানবজীবনের অভিজ্ঞতার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে ওটা ভুল মতবাদ।

আর্যজাতিগুলির অতি দূরের পূর্বপুরুষেরা নিঃসন্দেহে এখনকার বন্য জাতি আর বর্বরদের অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। সেইসব আর্যদের অভিজ্ঞতার ইতিহাস খুঁজলে আমরা তাদের অতীত ও বর্তমান সভ্যতার এবং সেইসঙ্গে বর্বর অবস্থার শেষ দিককার একটা ছবি পেতে পারি। তাদের আরও আগেকার ইতিহাস জানার জন্য যদি সেই সময়কার অন্য বন্য জাতিদের বিধিনিয়ম বা রীতিনীতিগুলো এবং তাদের আবিষ্কারের ইতিহাস যেগুলো তারা এখনো ধরে রেখেছে, সেগুলোর সঙ্গে তখনকার আর্যদের ঐ-সব ব্যাপারগুলোর সংগতি সাধন করা যায়, তাহলে অনেক খবরাখবরই পরিষ্কারভাবে পাওয়া সম্ভবপর হবে বলে মনে করি।

পরিশেষে এই কথাই বলা যেতে পারে যে মানবজাতির সভ্যতার পথে এগিয়ে চলার অভিজ্ঞতার ধারাটা সমস্ত মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই একইভাবে একই ধারাতে হয়েছে। আর যদি একই অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাদের চলতে হয়ে থাকে, তাহলে তাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনও একই রকমের ছিল। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্কের গঠন একরকম হওয়ার জন্য তাদের চিন্তাধারার বিকাশও একরকমের হওয়াটাই স্বাভাবিক আর সর্বক্ষেত্রে হয়েছিলও তাই। তবে, সর্বত্র অনুরূপ ফল হবার কারণসমূহের মধ্যে এটা অন্যতম কারণ মাত্র। বন্য অবস্থায় থাকাকালীনই মানুষের মধ্যে আচরণবিধি তৈরি করার প্রবণতা এবং শিল্প সংক্রান্ত জ্ঞানাঙ্কুরের উদ্গম হয়েছিল। বর্বর অবস্থার শেষের দিকে এবং সভ্য অবস্থাতে থাকাকালীন নানান অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এইসব গুণগুলো আরও বিকাশলাভ করে। যদি আমরা ভালোভাবে লক্ষ করি তাহলে দেখব, বর্বর অবস্থায় থাকাকালীন পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশের মানবসমাজের রীতিনীতিগুলোর মধ্যে কি অসম্ভব মিল এবং তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে আসলে তারা একই মানব-পরিবার থেকে এসেছে।

এইসকল বিভিন্ন বিষয়গত তথ্যের ওপর আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এক-একটি যুগকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি, যার প্রতিটি ভাগে মানবসমাজের তখনকার জীবনযাত্রার প্রণালীটা মোটামুটিভাবে কাছাকাছি ছিল। যেমন প্রস্তর যুগ, তাম্রযুগ, লৌহযুগ ইত্যাদি (এই অভিধাগুলো ড্যানিশ প্রত্নতত্ত্ববিদরাই প্রথম প্রবর্তন করেন)। কতকগুলো ব্যাপারে এই বিভাগ বেশ কাজে লাগে, যেমন অতীতের শিল্পকর্মে বিষয়-বস্তুর শ্রেণীবিভাগ করা ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের প্রসারের ফলে দেখা যাচ্ছে যে আরও কতকগুলো উপ-ভাগের খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দেখা গেছে যে লোহা আবিষ্কার হলেও পাথরের তৈরি জিনিসপত্রের বা যন্ত্রাদির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি, ব্রোঞ্জের বা তামার তৈরি জিনিস বা যন্ত্রাদিরও প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি, ওগুলো

BanglaBook.org

লোহার সঙ্গে সমানেই ব্যবহৃত হয়ে চলেছে সভ্য সমাজে। আকর গলিয়ে লোহার আবিষ্কারটাকে নিঃসন্দেহেই একটা যুগের সূচনা হিসেবে ধরে নিতে হবে, কিন্তু ব্রোঞ্জ বা তাম্রযুগের শুরু কবে থেকে হল তা আমাদের সঠিক জানা নেই। যেহেতু পাথরের তৈরি হাতিয়ার ব্যবহারের কাল এবং ব্রোঞ্জের ও লোহার তৈরি হাতিয়ার ব্যবহার করার কাল একটা আর একটার ওপর চেপে গিয়েছে, সেইজন্য ঠিক ঐভাবে কোন যুগকে আলাদা-ভাবে ধরে নিয়ে স্বাধীনভাবে কিছু চিন্তাভাবনা করা বেশ অসুবিধের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বেঁচে থাকার কৃৎকৌশলসমূহ, যেগুলো মানবসমাজ অনেকদিন ধরে এক এক করে আবিষ্কার করেছে, সেগুলোর সাহায্যে খুবই সন্তোষজনকভাবে যুগের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এ নিয়ে তেমন অনুসন্ধান করা হয়নি যাতে করে আমরা বিশেষ খবরাখবর পেতে পারি। বর্তমানে আমাদের লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে আমরা মানবসমাজের অন্য কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ওপরে যদি নজর দিই, তাহলে আমরা সেগুলোর সাহায্যে বিভিন্ন যুগের প্রগতির পরিমাপ করতে পারব এবং সেই অনুযায়ী আলাদা করে যুগের শ্রেণীবিভাগও করতে পারব। যদিও এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা বলে অনেকে মনে করতে পারেন, তাহলেও দেখা যাবে এইভাবে ভাগ করাটা বেশ সুবিধের ব্যাপার। এর প্রত্যেক ভাগগুলোই পৃথকভাবে এক একটা সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার রূপকে নির্দেশ করে।

বন্য যুগ, যার প্রথম দিক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তাকে আলাদা তিনটি ছোট ছোট যুগে ভাগ করতে পারি আমরা। এগুলোকে যথাক্রমে বন্য যুগের আদি, মধ্য এবং শেষ পর্যায় বলে নামকরণ করা যেতে পারে আর সেই সময়কার বন্য সামাজিক অবস্থাকে আমরা নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ অবস্থা বলে চিহ্নিত করতে পারি।

একইভাবে, বর্বর যুগকে স্বাভাবিক ভাবেই তিনটি উপভাগে ভাগ করা যায়, অর্থাৎ আদি, মধ্য এবং শেষ পর্যায় এবং ঠিক আগের মতই এই বর্বর যুগের সামাজিক অবস্থাকে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ অবস্থায় ভাগ করা যায়।

এই পর্যায়গুলির প্রতিটির আরম্ভ ঠিক কোন্ সময় থেকে সেটা কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখে ঠিক করা হবে তা নির্ণয় করা বেশ দুরূহ, এবং সেটা প্রতিটি মহাদেশের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে করা দরকার। ব্যতিক্রম থাকতেই পারে, তবে এই মুহূর্তে সেটা আমাদের বিবেচ্য নয়। পারস্পরিক অগ্রগতির মান অনুযায়ী আমরা এখানে মানব-জাতির প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলির শ্রেণীবিভাগ করব, যে অগ্রগতির অবস্থাটাকে পরিষ্কারভাবে অন্যদের থেকে পৃথক করা যায়।

BanglaBook.org

(১) বন্য যুগের নিম্ন অবস্থা

এই পর্যায়টা মানবজাতির একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় সূচিত হয়েছিল। মানুষ যখন বাঁচার জন্য মাছ ধরতে শিখল বা আগুনের ব্যবহার করতে শিখল, তখনই অবসান ঘটে এই পর্যায়টার। এই সময় মানুষ তার নির্দিষ্ট আদিম বসবাসের স্থানেই থাকত এবং

ফলমূল, বাদাম ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করত। এই সময়টাতেই মানুষ স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে শিখেছিল। এই সময়কার মানবগোষ্ঠীর কোন কিছুর নমুনা বা উদাহরণ পেশ করা সম্ভব নয়, কারণ অতীত ইতিহাসের গর্ভেই হারিয়ে গেছে সেগুলো।

(২) বন্য যুগের মধ্য অবস্থা

যখন থেকে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য মাছ খেতে শিখল ও আগুন ব্যবহারের জ্ঞান অর্জন করতে পারল, তখন থেকেই এই পর্যায়টার শুরু। তীর-ধনুক উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে এই পর্যায়টার। এই সময়টাতেই মানুষ তার নিজের আদি বাসস্থান ছেড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছু গোষ্ঠী এখনও এই অবস্থাতে রয়ে গেছে। যেমন, পলিনেশিয়ান আর অস্ট্রেলিয়ানদের যখন আমরা প্রথম দেখলাম, তখন তারা বন্য যুগের মধ্য অবস্থাতেই ছিল। আমার মনে হয় একটা বা দুটো দৃষ্টান্ত দেওয়াই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

(৩) বন্য যুগের উচ্চ অবস্থা

এই যুগের আরম্ভ তীর-ধনুকের উদ্ভাবনের সময় থেকে এবং মানুষ যখন মাটির বাসন-পত্র তৈরি করার কৌশল আবিষ্কার করল তখনই এই পর্যায়ের সমাপ্তি। এই অবস্থাটা এখনো আমেরিকাতে হাডসন উপসাগর অঞ্চলের আথাপাসকান্ গোষ্ঠী, কলম্বিয়া উপত্যকা অঞ্চলে বাসরত কিছু ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠী এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলভাগ অঞ্চলের বেশ কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমান রয়েছে—অবশ্য যখন তারা আবিষ্কৃত হয়েছিল তখন। বন্য যুগের শেষ এইখানেই।

(৪) বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থা

সবদিক বিচার-বিবেচনা করে বন্য যুগের শেষ আর বর্বর যুগের শুরুর সীমারেখাটা ঠিক কোথায় সেটা বার করতে গেলে মাটির বাসনপত্র তৈরি করার কৌশল আবিষ্কার করার সময়টাকেই চূড়ান্ত সীমারেখা বলে ধরা যেতে পারে এবং সেটাকে সর্বসম্মত-ভাবে মেনে নেওয়াও যেতে পারে। বন্য অবস্থা আর বর্বর অবস্থার তফাৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা আমাদের বহুকাল ধরেই আছে, কিন্তু কোন জ্ঞানদণ্ডের বিচারে আমরা এ-দুটো অবস্থার তফাৎ করব সেটা খুব পরিষ্কারভাবে স্থির করা হয়নি। সেইজন্য যে সমস্ত গোষ্ঠী মাটির বাসনপত্রের ব্যবহার জানে না তাদেরকে বন্য, আর যারা মাটির বাসনপত্রের ব্যবহার জানে কিন্তু উচ্চারণযুক্ত বর্ণমালার ব্যবহার জানে না বা লিখতে জানে না তাদেরকে বর্বর নামে চিহ্নিত করব আমরা।

বর্বর অবস্থার এই প্রথম উপ-যুগটি মাটির বাসনপত্র ব্যবহার করার সময় থেকেই শুরু হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে—সেটা তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে থাকুক বা অন্য কারও কাছ থেকে তৈরি করতে শিখুক। বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থার শেষ এবং মধ্য

BanglaBook.org

অবস্থা ঠিক কোন্ সময়ে শুরু সেটা বার করা বেশ দুরূহ, কারণ দুটো গোলার্ধের বিকাশের অবস্থা অসমান। অবশ্য এই অবস্থার শুরু বন্য যুগ শেষ হওয়ার পর থেকে। তবে এটার মোকাবিলা করার জন্য একটা মানদণ্ড গ্রহণ করা যেতে পারে। পূর্ব-গোলার্ধে পশুপালন করা আর পশ্চিম গোলার্ধে ভুট্টা ও বন্য শাকসব্জি জলসেচ করে চাষ করা এবং পোড়ামাটি ও পাথর দিয়ে বাসস্থান তৈরি করতে শেখাটাই বর্বর অবস্থার নিম্ন অবস্থা থেকে মধ্য অবস্থাতে উত্তরণের প্রকৃত সময় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরী নদীর পূর্ব তীরে বাসরত ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠী আর এশিয়া ও ইউরোপের কিছু গোষ্ঠী যারা মাটির বাসনপত্রের ব্যবহার জানত কিন্তু পশু-পালন করত না—তারা এই পর্যায়ে ছিল।

(৫) বর্বর যুগের মধ্য অবস্থা

পূর্ব গোলার্ধে পশুপালন করা এবং পশ্চিম গোলার্ধে সেচ করে চাষবাস আর পোড়া-মাটি ও পাথর দিয়ে বাসস্থান তৈরি করতে পারার সময় থেকেই এই অবস্থার শুরু বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আকর গলিয়ে লোহা তৈরি করার পদ্ধতি উদ্ভাবনের সময়েই এই যুগের শেষ। মেক্সিকোর ভিলেজ ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠী, পেরু ও মধ্য আমেরিকার কিছু গোষ্ঠী এখনো এই অবস্থায় আছে। পূর্ব গোলার্ধের কিছু গোষ্ঠী যারা গৃহপালিত পশু পালন করছে কিন্তু লোহার ব্যবহার জানে না, তাদেরকেও এর মধ্যে ফেলা যায়। পুরাকালের ব্রিটনদেরও এই মধ্য অবস্থার মধ্যে ফেলা যেতে পারে, যদিও তারা লোহার ব্যবহার জানত। ঐ সময়ে বেশ কিছু গোষ্ঠী তাদের সামাজিক রীতিনীতি উন্নত করার চেয়ে তাদের জীবনযাপনের উপকরণসমূহকে অনেক বেশি উন্নত করে তুলেছিল।

(৬) বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থা

এই যুগের আরম্ভ হয়েছে লোহা তৈরি করার সময় থেকে আর শেষ হয়েছে যখন উচ্চারণযুক্ত বর্ণমালার ব্যবহার ও সাহিত্য সৃষ্টির কাল শুরু হল। সভ্যতার সূচনা এইখান থেকেই হয়েছিল। হোমারের যুগের গ্রীক গোষ্ঠীগুলো, রোম নগরীর পত্তনের সময়কার ইতালিয় গোষ্ঠীগুলো এবং সিজারের সময়কার জার্মান গোষ্ঠীদের এর মধ্যে ধরা যেতে পারে।

BanglaBook.org

(৭) সভ্য অবস্থা

আগেই বলা হয়েছে এই যুগের আরম্ভ হয়েছে যখন থেকে মানুষ উচ্চারণযুক্ত বর্ণমালার ব্যবহার শিখল এবং সাহিত্য সৃষ্টি করতে শুরু করল। এই যুগকে দুভাগে ভাগ করা যায়—প্রাচীন এবং আধুনিক। উদাহরণ হিসেবে পাথরের ওপর খোদাই-করা লিপির (Hieroglyphical) কথা উল্লেখ করা যায়।

॥ সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি ॥

সময়কাল বা যুগ	অবস্থা
১) বন্য যুগের আদি কাল	১) বন্য যুগের নিম্ন অবস্থা।
২) বন্য যুগের মধ্য কাল	২) বন্য যুগের মধ্য অবস্থা।
৩) বন্য যুগের শেষ কাল	৩) বন্য যুগের উচ্চ অবস্থা।
৪) বর্বর যুগের আদি কাল	৪) বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থা।
৫) বর্বর যুগের মধ্য কাল	৫) বর্বর যুগের মধ্য অবস্থা।
৬) বর্বর যুগের শেষ কাল	৬) বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থা।
৭) সভ্য যুগ।	

১) বন্য যুগের নিম্ন অবস্থা।	মানব জাতির শৈশব অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা পর্যন্ত।
২) বন্য যুগের মধ্য অবস্থা।	খাদ্যের জন্য মাছ ধরা এবং আগুনের আবিষ্কার ও ব্যবহার ইত্যাদি থেকে···
৩) বন্য যুগের উচ্চ অবস্থা।	তীর-ধনুকের আবিষ্কার ইত্যাদি থেকে···
৪) বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থা।	মাটির তৈরি বাসনপত্র ব্যবহার ইত্যাদি থেকে···
৫) বর্বর যুগের মধ্য অবস্থা।	পূর্বগোলার্ধে জন্তু-জানোয়ার পোষ মানানো এবং পশ্চিম গোলার্ধে ভুট্টা আর শাকসব্জির জলসেচ দিয়ে চাষ করা এবং ইটের ও পাথরের তৈরি বাসস্থান নির্মাণ ইত্যাদি থেকে···
৬) বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থা।	আকর গলিয়ে লোহা তৈরি করার পদ্ধতি উদ্ভাবন ও লোহার তৈরি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদি থেকে···
৭) সভ্য অবস্থা।	উচ্চারণযুক্ত বর্ণমালার উদ্ভাবন ও তার সাহায্যে লেখা থেকে শুরু করে এখনকার সময় পর্যন্ত।

এই সমস্ত যুগগুলোরই একটা আলাদা সংস্কৃতি এবং বিশেষ জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল যেটা তাদের একেবারেই নিজস্ব। এই যে এক একটা যুগকে বিশেষ ভাগে ভাগ করা হল তাতে করে সেই বিশেষ যুগটিকে আলাদা করে নিয়ে তার অগ্রগতির, তার সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা সম্ভব হবে। এতে করে মূল ব্যাপারটার

কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, অর্থাৎ একই মহাদেশের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী আর জাতিরা, এমনকি একই ভাষাভাষি গোষ্ঠীগুলোও যে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে, তা বাতিল হয়ে যাচ্ছে না। কারণ আমাদের এই অনুসন্ধানের জন্য প্রতিটির 'অবস্থাই' হচ্ছে প্রয়োজনীয় তথ্য, সময়কাল কোন ব্যাপারই নয়।

যেহেতু আমাদের কাছে জন্তু-জানোয়ার পোষ মানানো, লোহার ব্যবহার কিংবা উচ্চারণ-যুক্ত বর্ণমালার ব্যবহার, মাটির বাসনপত্র ব্যবহারের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্য সেগুলোর ব্যবহারের কালকেই আমরা একটা বিশেষ যুগের আরম্ভ বলে চিহ্নিত করেছি এবং কেন এটা করা হচ্ছে তার কারণ সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই বলা হবে। মাটির বাসনপত্র তৈরি করার আগে থেকেই গ্রাম্য জীবনযাত্রার জন্য সাধারণ শিল্পদ্রব্যের[১] ব্যবহার বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। চকমকি পাথর আর পাথরের যন্ত্রাদির ব্যবহার মাটির বাসন ব্যবহারের অনেক আগেকার ঘটনা। এর নানান চিহ্ন আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ির ফলে পেয়েছি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে মাটির বাসনপত্র পাওয়া যায়নি। দেখা যাবে যে মাটির বাসনপত্রের দরকার হওয়ার অনেক আগে থেকেই মানুষ তার নিজের প্রয়োজনের জন্য বহু দরকারি আবিষ্কার করে ফেলেছিল। মাটির জিনিস তৈরি করার বহু আগেই মানুষ সমাজবদ্ধভাবে গ্রাম্য পরিবেশে একসঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাবার জোগাড় করতে পেরেছে। এই অবস্থায় কাঠের তৈরি বাসনপত্র, গাছের ছালের সুতো দিয়ে হাতে কাপড় বোনা, ঝুড়ি বোনা এবং তীর-ধনুক আবিষ্কার করে ফেলেছে। বর্বর যুগের মধ্য অবস্থায় থাকা ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে, যেমন জুনিয়ান, আজটেক আর চোলুলানদের নানা রকমের পোড়া মাটির চমৎকার বাসনপত্র তৈরি করে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। তেমনি উত্তর আমেরিকার ইরোকোয়া, চোক্‌টা আর চেরোকি জাতের আংশিক ভিলেজ ইণ্ডিয়ানরা, যারা বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থাতে ছিল, তারাও প্রচুর পোড়ামাটির বাসনপত্র তৈরি করত কিন্তু তেমন বিভিন্ন রকমের নয়। আবার চাষ-আবাদ করে না বা করতে জানে না এমন একেবারে আদিম বন্য অবস্থার ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মানুষরা, যেমন আথাপাসকানরা, যারা ক্যালিফোর্নিয়া আর

(১) মিঃ এডউইন. বি. টাইলর বলেছেন, "কেমনভাবে প্রথমে মাটির পাত্রের উদ্ভব হল, তা গত শতাব্দীতে গোকে প্রথম জানান। মানুষ প্রথমে আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের সহজদাহ্য বস্তু দিয়ে তৈরি পাত্রগুলির বহির্ভাগে কাদামাটি লেপে দিত, যতদিন পর্যন্ত না তারা বুঝতে শিখেছিল যে শুধু কাদামাটির দ্বারাই ঐ কাজটি সম্পন্ন হতে পারে। এইভাবে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে মাটির পাত্রের গঠনশৈলী উদ্ভাবিত হয়েছিল।" 'আর্লি' হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইণ্ড', পৃঃ ২৭৩।

১৫০৩ সালে ক্যাপটেন গর্গেভিল দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর লিখিত বিবরণের সঙ্গে গোকের বক্তব্যের মিল রয়েছে। তিনি ওদের "কাঠের তৈরি গার্হস্থ্য বাসন-বাসনপত্রাদি ব্যবহার করতে দেখেছিলেন। এমনকি তাদের আগুনে সিদ্ধ করার পাত্রগুলোও ছিল কাঠের তৈরি। কিন্তু ঐ পাত্রগুলোর গায়ে খুব ভালভাবে একরকমের কাদামাটির আস্তরণ লাগানো ছিল, যা প্রায় এক আঙুল পুরু। ঐ আস্তরণ কাঠের পাত্রগুলিকে আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করত।" ঐ, পৃঃ ২৭৩।

কলম্বিয়া উপত্যকায় থাকত, তারা কিন্তু একেবারেই মাটির বাসন তৈরি করতে জানত না।[১] এ সম্বন্ধে লুবকের 'প্রি-হিস্টরিক টাইম', টাইলরের 'আর্লি হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইণ্ড' এবং পেশ্চেলের লেখা 'রেসেস্ অফ ম্যান' বইতে অনেক তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক অনুসন্ধান করে তাঁরা পোড়ামাটির বাসনপত্রের বিভিন্নতা, বিস্তার ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা করেছেন। পোড়ামাটির বাসনের ব্যবহারটা পলিনেশিয়ানদের (টোঙ্গান আর ফিজি দ্বীপের বাসিন্দারা বাদে) একেবারেই অজানা ছিল, যেমন অজানা ছিল অস্ট্রেলিয়ানদের আর হাডসন উপসাগর অঞ্চলের ইণ্ডিয়ানদেরও। মিঃ টাইলরের মতে, "এশিয়া মহাদেশের বাইরের দ্বীপগুলোর বাসিন্দাদের কাছে কাপড় বোনার কৌশল অজানা ছিল এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে মাটির বাসনপত্র তৈরি করার কৌশল ছিল অজানা।"[২] রেভারেণ্ড লরিমার ফিসন, যিনি অস্ট্রেলিয়ায় যাজকের কাজ করতেন, জাতে ইংরেজ, আমার চিঠির উত্তরে জানিয়েছিলেন যে "অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা তীর-ধনুকের, কাপড় বোনার বা মাটির তৈরি বাসনপত্রের ব্যবহার জানে না।" পলিনেশিয়ানদের বেলাতেও এটা সাধারণভাবে সত্য। মানুষের সাংসারিক প্রয়োজন মেটাতে ও জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য সিরামিকের ব্যবহার একটা নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল। যদিও চকমকি ও পাথরের যন্ত্রপাতি অনেক আগে থেকেই মানুষ ব্যবহার করতে শিখেছিল, তবুও নৌকো, কাঠের পাত্র ও বাসন, এবং কিছু পরে গাছ থেকে তক্তা বার করে বাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করতে শেখার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল মানুষকে।[৩] তাহলে দেখা যাচ্ছে পোড়ামাটির বাসনপত্র খাবার সিদ্ধ করার সমস্যা থেকে মানুষকে অব্যাহতি দিল। এর আগে তারা বোনা ঝুড়ির মধ্যে মাটি মাখিয়ে এবং মাটির গর্তের মধ্যে চামড়া বিছিয়ে পাত্র হিসেবে ব্যবহার করত এবং কোন কিছু সিদ্ধ করার প্রয়োজন হলে তা চ্যাপ্টা পাথরকে গরম করে করত।[৪]

---

(১) কয়েক বছর আগেও অরিগণ অঞ্চলে আদিম ছাঁচের মাটির পাত্র দেখা যেত। ফস্টার-এর "প্রি-হিস্টরিক রেসেস অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস", ১, পৃঃ ১৫২। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আদিম অধিবাসীদের প্রথম মাটির তৈরি পাত্রগুলি উইলো অথবা নলখাগড়ায় বোনা ঝুড়ির ছাঁচের মধ্যে তৈরি করতে দেখা যেত, কিছুদিন পরে ভেতরের মাটি শক্ত হয়ে গেলে ঐ ছাঁচগুলো আগুনে পুড়িয়ে পাত্রগুলো বের করে নেওয়া হত।—জোন্স-এর "অ্যাণ্টিকুইটিজ অফ দ্য সাউদার্ন ইণ্ডিয়ানস", পৃঃ ৪৬১। "মৃৎশিল্প" প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাউ-এর প্রবন্ধ। "স্মিথসনিয়ান রিপোর্ট", ১৮৬৬, পৃঃ ৩৫২।

(২) "আর্লি হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইণ্ড", পৃঃ ১৮১; "প্রি-হিস্টরিক টাইমস", পৃঃ ৪৩৭, ৪৪১, ৪৬২, ৪৭৭, ৫৩৩, ৫৪২।

(৩) লুইস এবং ক্লার্ক (১৮০৫) কলম্বিয়া নদীর তীরবর্তী আদিবাসীদের বাড়ি তৈরি করার জন্য কাঠের তক্তা ব্যবহার করতে দেখেছিলেন। "ট্রাভেল্স", লংম্যান সংস্করণ, ১৮১৪, পৃঃ ৫০৩। মিঃ জন কিস্ট লর্ড ভ্যাংকুবার দ্বীপে ইণ্ডিয়ানদের বাড়িতে ব্যবহারের জন্য "পাথরের তৈরি করাত ও বাটালী দিয়ে আস্ত সিডার গাছের গুঁড়ি থেকে তক্তা বের করতে" দেখেছিলেন।—"ন্যাচুরালিস্ট ইন ব্রিটিশ কলম্বিয়া", ১, পৃঃ ১৬৯।

(৪) টাইলর, "আর্লি হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইণ্ড", পৃঃ ২৬৫।

তখনকার আদিম অধিবাসীরা মাটির বাসনপত্র রোদে শুকিয়ে নিয়ে ব্যবহার করত নাকি পুড়িয়ে নিয়ে ব্যবহার করত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইণ্ডিয়ানাপোলিসের অধ্যাপক ই. টি কক্স তুলনামূলক রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন প্রাচীন মাটির পাত্রের এবং অধুনা হাইড্রলিক সিমেণ্টের রাসায়নিক উপাদানগুলি প্রায় একই।[১] তিনি আরও বলেছেন, ছাঁচে ফেলে তৈরি করা মাটির পাত্রের যুগে এই উপাদানগুলি ছিল পাললিক কাদা আর বালি এবং এর সঙ্গে কখনো কখনো মিষ্টিজলের ঝিনুকের পোড়ানো চুন ব্যবহার করা হত। এই মিশ্রণটি আজকের দিনের পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের কাছাকাছি ধরনের ছিল, সেই কারণেই এর তৈরি পাত্রগুলি না পোড়ালেও বেশ শক্ত হত, আধুনিক পটারিতে যেভাবে করা হয়। বর্তমান সিমেণ্টের চুনাপাথরের প্রয়োজন তখন ঐ পোড়া ঝিনুকের গুঁড়োর সাহায্যেই মেটানো হত।

ইণ্ডিয়ানদের তৈরি করা মাটির বাসনপত্রের উপাদানের সঙ্গে এখনকার সিমেণ্টের মিল দেখলে মনে হয় যে তখনকার মানুষ অনেক কষ্ট করে ওটা আবিষ্কার করেছিল আর সেইজন্য মাটির বাসনপত্রের ব্যবহারটা অনেক পরে আরম্ভ হয়েছিল। অধ্যাপক কক্সের মতবাদটাকে উড়িয়ে না দিয়েও এটা বলতে পারা যায় যে সম্ভবত ওগুলোকে তারা অন্যভাবে গরম করে শক্ত করে নিত। গাল্‌ফ অঞ্চলে বসবাসকারী গোষ্ঠীদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এডেয়ার বলেছেন—"তারা খুব বড় বড় মাটির জালা তৈরি করত, যাতে দু থেকে দশ গ্যালন পর্যন্ত জল ধরত। জল আনবার জন্য তৈরি করত বেশ বড় বড় পাত্র। এছাড়া থালা, বাটি, ঘটি, গামলা ইত্যাদি এত নানা ধরনের বাসনপত্র তৈরি করত যে তার বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তারা চুল্লীতে পাইন গাছের আগুনের আগুনের শিখায় বাসনগুলোকে পোড়াত যাতে ওগুলো নিটোল, উজ্জ্বল এবং শক্ত হয়।"[২]

নির্দিষ্ট করে যুগ ঠিক করার আর একটা সুবিধে আছে। কেউ যদি কোন বিশেষ সময়ের জন্য কোন একটা গোষ্ঠীর বা জাতির সম্বন্ধে কিছু জানতে বা গবেষণা করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে এইভাবে কাজ করলে তার কাজের বেশ সুবিধে হবে। কারণ এখানে এক একটা যুগই আলাদা একটা অবস্থার নির্দেশ করছে। বেশ কিছু গোষ্ঠী আর পরিবার

---

(১) "জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ানা", ১৮৭৩, পৃঃ ১১৯। নিম্নলিখিত নিরীক্ষার হিসাবগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন তিনি। এনসিয়েণ্ট পটারি, "বোন ব্যাঙ্ক", পোসি কোং, ইণ্ডিয়ানা।

জল (২১২° ফাঃ)	১·০০	প্যারক্সাইড অফ আয়রন	৫·৫০
সিলিকা	৩৬·০০	সালফিউরিক অ্যাসিড	০·২০
কার্বনেট অফ লাইম	২৫·৫০	অন্যান্য জৈব পদার্থ	২৩·৬০
অ্যালুমিনা	৫·০০	(ক্ষারীয় ও উদ্বায়ী পদার্থ)	
কার্বনেট অফ ম্যাগনেসিয়া	৩·২০		
		মোট	১০০·০০

(২) "হিস্ট্রি অফ দ্য আমেরিকান ইণ্ডিয়ানস", লণ্ডন সংস্করণ, ১৭৭৫, পৃঃ ৪২৪। 'ইরোকোয়ারা বলে যে তাদের পূর্বপুরুষরা অতীতকালে আগুনে মাটির বাসনপত্র পুড়িয়ে নিত।'

ভৌগোলিক কারণে আলাদা হয়ে থাকার ফলে সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টাতেই তারা উন্নতি করতে পেরেছে এবং ফলস্বরূপ তাদের সামাজিক রীতিনীতি আর শিল্পকর্মগুলোকে নির্ভেজাল রাখতে পেরেছে। অন্যদিকে, যে-সমস্ত জাতি বা গোষ্ঠীরা এরকম আলাদা থাকত না, তাদের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, সবকিছুই বাইরের প্রভাবে একাকার হয়ে গেছে। যেমন, আফ্রিকাতে বর্বর এবং আদিম অবস্থায় একটা বিশৃংখলা আগেও চলেছিল এখনো চলছে, অথচ অস্ট্রেলিয়া কিংবা পলিনেশিয়ার ভৌগোলিকভাবে আলাদা হওয়ার কারণে বন্য অবস্থার সবকিছু, যেমন সামাজিক নীতিনীতি, শিল্পকলা, ঠিক যে যুগের জন্য যে অবস্থাতে থাকা উচিত, সেইভাবেই রয়ে গেছে। এভাবেই আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে অন্য জাতির মতন না হয়ে, পরপর তিনটি যুগের অবস্থা পাশাপাশি রয়ে গেছে। যখন বিশাল আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কৃত হল, তখন সেখানে একই বংশ থেকে উদ্ভূত একটা জাতি, একই সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে, প্রায় প্রতিটি অবস্থার (পূর্বউল্লিখিত ৬টি অবস্থার), বিশেষ করে বর্বর যুগের নিম্ন এবং মধ্য অবস্থাতে, সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে বাস করছিল। এইরকম অবস্থাটা পৃথিবীর আর কোথাও মানবসমাজের মধ্যে কখনো দেখতে পাওয়া যায়নি। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল অঞ্চলের কিছু গোষ্ঠী আর উত্তর আমেরিকার উত্তর অঞ্চলের বেশ কিছু ইণ্ডিান গোষ্ঠী বর্বর অবস্থার উচ্চ ধাপে ছিল, মিসিসিপি নদীর পূর্বপারের কিছু গোষ্ঠী বর্বর অবস্থার নিম্ন অবস্থায় ছিল এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের সমস্ত গোষ্ঠী বর্বর অবস্থার মধ্য অবস্থাতে ছিল। এইরকম একটা আশ্চর্য রকমের সুযোগ, যাতে করে সমগ্র মানবসমাজের অভিজ্ঞতা এবং তার অগ্রগতিটা কিভাবে ধাপে ধাপে হয়েছে, তাদের সামাজিক বিধি আর রীতিনীতি, তাদের শিল্পকলার বিকাশ বিভিন্ন যুগের প্রতিটি অবস্থায় কিভাবে হয়েছে, তার সম্পূর্ণ ইতিহাস এভাবে একসঙ্গে কখনো পাওয়া যায়নি। অবশ্য এটা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে তাদের অবস্থার উন্নতি ইচ্ছাকৃতভাবে হয়নি, আপনা থেকেই খুব ধীর গতিতে হয়েছে। কিন্তু বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থাতে থাকার তথ্য আমাদের কাছে খুবই অসম্পূর্ণভাবে আছে।

একই কালের পূর্বগোলার্ধের সঙ্গে পশ্চিম গোলার্ধের সংস্কৃতির তফাৎটা নিঃসন্দেহে দুই গোলার্ধের মহাদেশগুলির অসমান বিকাশের জন্য দায়ী। কিন্তু সামাজিক অবস্থা, তদনুযায়ী অন্যান্য ব্যবস্থার প্রতিটি যুগের প্রতিটি অবস্থা, মোটামুটিভাবে একই রকমের ছিল।

গ্রীক, রোমান আর জার্মান গোষ্ঠীদেরও বিভিন্ন যুগে ঐ একই অবস্থার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। বর্বর অবস্থার শেষের দিক থেকে তাদের ইতিহাসটা জানতে পারলাম আমরা। সম্ভবত বর্বর যুগের মধ্য অবস্থার আগে পর্যন্ত তাদের আর বর্বর অবস্থার অন্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তেমন কোন তফাৎ ছিল না। একসময় তাদের যাবতীয় অভিজ্ঞতা, যা তারা বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন অবস্থায় অর্জন করেছিল, সমস্তই হারিয়ে গেল ইতিহাসের গর্ভে। কেবল তাদের আবিষ্কার, তাদের সামাজিক রীতিনীতিগুলোই

টিকে রইল। উচ্চ বর্বর অবস্থার একটা চূড়ান্ত নিদর্শন হোমারের সময়কার গ্রীকদের আর রোমুলাসের সময়কার লাতিনদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের সামাজিক রীতি-নীতিগুলোকে এবং তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বহু জিনিসকে মানবজাতির সভ্যতার অগ্রগতির উৎস হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

আমরা অস্ট্রেলিয়ান আর পলিনেসিয়ানদের দিয়ে আরম্ভ করে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের কথা বলে গ্রীক-রোমানদের দিয়ে শেষ করলাম। সমগ্র মানবজাতির অগ্রগতির ছ'টা ধাপের অতীব গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ এরা। এদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার মোট ফলটাকে মানবসমাজের বর্বর যুগের মধ্য অবস্থা থেকে প্রাচীন সভ্যতার শেষ পর্যন্ত আসার একটা পরিষ্কার চিত্র বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এইভাবে আমরা আর্যদের ইতিহাস নিয়ে যদি বিচার-বিবেচনা করি, তাহলে তারা বন্য অবস্থায় কিভাবে ছিল সেটা এখনকার অস্ট্রেলিয়ান আর পলিনেশিয়ানদের এবং আমেরিকার ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের দেখলেই বুঝতে পারব। বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থায় এবং বর্বর যুগের মধ্য অবস্থায় তারা কিভাবে ছিল, সেটা আমরা বুঝতে পারব অন্য ইণ্ডিয়ানদের দিকে তাকালেই আর তাদের বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থার ইতিহাস তো আমাদের জানাই আছে।

সমস্ত মহাদেশের মানবগোষ্ঠীর শিল্পকলা, সামাজিক বিধিনিয়ম, তাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী প্রতিটি যুগের প্রতিটি অবস্থাতে একেবারে একরকম। গ্রীক-রোমানদের প্রচলিত সাংসারিক রীতিনীতিগুলোর সঙ্গে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের সাংসারিক রীতিনীতিগুলোর যে কি আশ্চর্য মিল, তা আমরা এই বইয়ের পরের অধ্যায়ে দেখাবো। এইসব ঘটনাগুলো প্রমাণ করবে যে সমগ্র মানবসমাজের প্রধান প্রধান সামাজিক বিধিগুলো একই ধরণের চিন্তাধারার বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয়েছে, আর তাদের স্বাভাবিক বিকাশ যে এ-রকম হবে সেটা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, কারণ মানসিক চিন্তাধারা এবং তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা ও চাহিদা একই রকমের ছিল। ফলে মানবসমাজের অগ্রগতিটা প্রতিটি মহাদেশে বিভিন্ন জাতি আর গোষ্ঠীর মধ্যে, এমনকি বিভিন্ন দ্বীপে বা মহাদেশেও একই ধরণের হতে বাধ্য। এই যুক্তিটাকে আর একটু বিশ্লেষণ করলে সমগ্র মানবসমাজ যে একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত, এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

কিছু মানবগোষ্ঠী ও জাতির প্রতিটি যুগের সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ যদি আমরা ভালোভাবে করি, তাহলে আমার বিশ্বাস যে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রাচীন ইতিহাস আর অবস্থা কেমন ছিল—সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারব।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের কলাকৌশলসমূহ

একেবারে প্রথম স্তর থেকে মানুষের ক্রমবিকাশলাভের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিভিন্ন পর্যায়ে তার জীবনধারণের উপকরণসমূহ। এ বিষয়ে তার দক্ষতার ওপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছে পৃথিবীব্যাপী মানবজাতির পরিপূর্ণ আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নটি। বলা যেতে পারে প্রাণীজগতে মানুষই একমাত্র জীব যে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন এবং খাদ্য সংগ্রহের ওপর নিজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে, অথচ প্রাথমিক অবস্থায় জীবজগতের অন্যান্যদের থেকে এ বিষয়ে তারা কোনদিক দিয়েই আলাদা ছিল না। বেঁচে থাকার উপকরণগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে না পারলে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, বিশেষত যেখানে আগের মতো একই ধরণের খাদ্যবস্তু পাওয়া যায় না সেখানে এবং এইভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারত না। সবশেষে বলা যায়, খাদ্যবস্তুর বিবিধ প্রকার এবং পরিমাণের ওপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব না থাকলে তার পক্ষে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এক-একটি জনবহুল জাতি গঠন করাও সম্ভবপর হত না। মানবজাতির বিস্ময়কর ক্রমোন্নতির মূলে কোনবেশি যে কার্যকারণটি বিদ্যমান তা হল তার বেঁচে থাকার উপকরণগুলির দিগন্তবিস্তৃত উৎসসমূহের আবিষ্কার।

মানবজাতির খাদ্যসমূহের উৎসগুলিকে আমরা পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি, যা মানুষ আবিষ্কার করেছে অনেক পরিবর্তনশীল কৌশলের দ্বারা। একটি অন্যটির তুলনায় অধিকতর উপযোগী বিবেচিত হওয়ায় দীর্ঘ সময়কালের ব্যবধানে একে অন্যকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে। এই পাঁচটি বিভাগের প্রথম দুটি উদ্ভূত হয়েছে আদিম বন্যযুগে এবং পরবর্তী তিনটি বর্বরযুগে। উদ্ভূত হওয়ার কালক্রম অনুসারে এগুলির বিবরণ নীচে উপস্থাপিত করা হল।

(১) একটি স্বাভাবিক বসতি অঞ্চলে প্রকৃতিজাত ফলমূলের উপর নির্ভরশীল জীবনধারণ

এই বিষয়টির আলোচনা করার জন্য আমাদের মানবজাতির বন্য অবস্থার একেবারে প্রাথমিক যুগে পিছিয়ে যেতে হবে। তখন তাদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প, জীবন-যাপনের ধারা ছিল অত্যন্ত সহজ এবং তারা বাস করত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অঞ্চলে। বলা যায় যে মানুষ তখন সবে এক নতুন জীবনধারায় প্রবেশ করতে চলেছে। তখনও জীবনযাপনের উল্লেখ করার মতো কোন কৌশল যেমন তার রপ্ত হয় নি, তেমনি

তৈরি হয়নি কোন সমাজবিধিও। কিন্তু উদ্ভাবিত হয়েছে একটি জিনিস—তা হল ভাষা, যা সেই দূর অতীতকালের সঙ্গে বর্তমানের একটা সংযোগ স্থাপন করতে পারে। তাদের তখনকার খাদ্যবস্তুর প্রকার ও ধরণ এ-কথাই প্রমাণ করে যে উষ্ণমণ্ডলীয় বা ক্রান্তীয় অঞ্চলকে মানুষ স্বেচ্ছায় তার স্বাভাবিক বসবাসের স্থান হিসেবে নির্বাচিত করেছিল। ফল আর বাদামজাতীয় গাছে ভরা পরিচিত ক্রান্তীয় অরণ্যেই যে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রথম বসবাস করতে শুরু করেছিল, এ-কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

কালানুক্রম অনুসারে জীবজগতের অন্যান্য প্রজাতিগুলি মানুষের বহু আগেই উদ্ভূত হয়েছিল। আমরা এ-কথা নিশ্চিত অনুমান করতে পারি যে যখন আদিম মানুষ পৃথিবীতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল, তখন অন্যান্য জীবজন্তুরা প্রবলপ্রতাপে এবং বিপুল সংখ্যায় পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করছে। প্রাচীন কবিরা তাঁদের লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন কেমন করে মানবজাতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আশ্রয়লাভের জন্য জানোয়ারদের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে জঙ্গলের ঝোপঝাড় এবং পাহাড়ের গুহা দখল করে নিত এবং জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির দানস্বরূপ ফলমূল সংগ্রহ করত। যেহেতু মানুষ তখন কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছাড়াই ভয়ংকর হিংস্র জন্তু-জানোয়ার পরিবৃত হয়ে এবং আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার না করে জীবনযাপন করত, তাই ধরেই নেওয়া যায় যে তাদের মধ্যেকার একটা বিরাট অংশ তখন বৃক্ষবাসী ছিল—অন্তত নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার খাতিরে।

জীবন বাঁচানোর জন্য সর্বক্ষণ খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারটা প্রতিটি প্রজাতির জীবজন্তুদের অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে একটা বিশাল বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অগ্রগতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর নীচের দিকে যদি আমরা নামতে থাকি, তাহলে দেখতে পাব বেঁচে থাকার উপকরণগুলি প্রতি ধাপে ক্রমশ সরল থেকে সরলতর হচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি ঐ কাঠামোর ওপরের দিকে উঠতে থাকি তাহলে দেখা যাবে ঐ উপকরণগুলিকে চিহ্নিত করা ক্রমশই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে, কারণ কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে আছে সে এবং সেখানেই সেটা সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত হয়েছে। এই সময় থেকেই বুদ্ধিমত্তা আরও বেশি প্রাধান্য পেল। প্রাণীজ খাদ্য সম্ভবত একেবারে সেই প্রথম অবস্থা থেকেই মানবজাতির একটা প্রধান খাদ্য বলে পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু মানব-সমাজ যে-সময়ে খাদ্য হিসেবে ফলমূলের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল, সেই সময়ে তারা সচেতনভাবে প্রাণীজ খাদ্য সবসময় সংগ্রহ করত কিনা তা অনুমানসাপেক্ষ, যদিও স্বভাবগত দিক দিয়ে একমাত্র মানুষই ছিল সর্বভুক। অবশ্য এই প্রকারের জীবন-ধারণ প্রণালী একেবারে আদিম অবস্থাতেই বিদ্যমান ছিল।

(২) মৎস্যনির্ভর জীবনধারণ

কৃত্রিম খাদ্য হিসেবে মাছকেই প্রথম বলে ধরা হয়, কারণ রান্না না করে মাছ খাওয়া সম্ভব নয়। খুব সম্ভবত এই উদ্দেশ্যেই আগুন প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। মাছই হল

BanglaBook.org

একমাত্র খাদ্যবস্তু যা সবসময়েই প্রচুর সংখ্যায় পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। যদি তাদের অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তাহলেও খাদ্য হিসেবে তণ্ডুল জাতীয় শস্যের ব্যবহার আদিম যুগে অজানা ছিল। এবং জীবনধারণের একমাত্র উপায় হওয়ার পক্ষে পশুশিকার ব্যাপারটাও বরাবরই অতিরিক্ত বিপজ্জনক। মাছকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্থান ও আবহাওয়ার গণ্ডি থেকে মুক্ত হল মানুষ। সমুদ্র ও হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চল ধরে ধরে এবং নদীর যাত্রাপথ অনুসরণ করতে করতে বন্যযুগে মানুষ পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গাতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বন্যযুগে এই দেশান্তরগমনের প্রমাণস্বরূপ অজস্র চকমকি পাথর, পাথরের অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রতিটি মহাদেশেই যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র ফলমূল ও সহজলভ্য খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল সরল জীবনযাত্রা হলে মূল বাসস্থান ছেড়ে এই দেশান্তরগমন কখনোই সম্ভব নয়।

খাদ্য হিসেবে মাছের প্রচলন, তার সূত্র ধরে মানবগোষ্ঠীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া এবং গম ও যব চাষ শুরু হওয়ার মধ্যে রয়েছে বহুকালের ব্যবধান। মানুষের বন্য অবস্থার বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে এই সময়কালের মধ্যে এবং এ-সময়েই কিন্তু মানুষের খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেমন ভূমিতে চুল্লো করে সেঁকে খাওয়া হত এমন কন্দ (bread roots) এবং উন্নত অস্ত্র, বিশেষত তীর ও ধনুকের[১] ব্যবহারের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিকার। বল্লম ব্যবহার করতে শেখার পর পরই উদ্ভাবিত হয়েছিল এই উল্লেখযোগ্য অস্ত্রটি। তীর-ধনুক বন্য অবস্থার শেষদিকে উদ্ভাবিত হয় এবং মানুষের হাতে এই প্রথম শিকারের একটা মারাত্মক অস্ত্র এল। তীর-ধনুকের উদ্ভাবনকালটিকে আমরা বন্য যুগের উচ্চ অবস্থার সূচনা বলে চিহ্নিত করতে পারি। এর ব্যবহার আদিম সমাজে একটা ঊর্ধ্বমুখী প্রভাব হিসেবে কাজ করেছিল। এই প্রভাবকে বর্বর যুগে লোহার তৈরি তলোয়ারের ব্যবহার ও সভ্যযুগে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

বিস্তীর্ণ মৎস্য-সংগ্রহ ক্ষেত্রের বাইরে, মানুষের পক্ষে খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা যেখানে খুবই অনিশ্চিত ছিল, সেখানে বেঁচে থাকার জন্য অবধারিত প্রথা হিসেবে নরমাংস-ভক্ষণের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আমরা ক্রমশ আলোচনা করব।

(৩) কৃষিকাজের সাহায্যে তণ্ডুলজাতীয় শস্যনির্ভর জীবনধারণ

আমরা এখন বন্য যুগের আলোচনা থেকে বর্বর যুগের প্রথম অবস্থায় এসে পৌঁছেছি।

১। তীর-ধনুকের ব্যাপারটা এমনই জটিল যে তা আকস্মিকভাবে উদ্ভাবিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। ধনুক তৈরির জন্য প্রয়োজন দৃঢ় অথচ স্থিতিস্থাপক বিশেষ ধরনের কাঠ, ছিলার জন্য দরকার খুব শক্ত অথচ নমনীয় কোন উদ্ভিজ্জ বা জৈবিক তন্তু। অবশেষে এর সঙ্গে যুক্ত হয় মানব-পেশীশক্তি, যার দ্বারা জ্যা রোপণ করে তীর ছোঁড়া হয়ে থাকে। এই এতগুলি ব্যাপার বন্য মানুষের পক্ষে একবারে ধারণা করা সম্ভব নয়। যেমন দেখা যায় যে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী পলিনেশিয়দের তীর-ধনুকের ব্যবহার অজানা ছিল। শধু এই তথ্য থেকেই বোঝা যায় যে যখন তীর-ধনুক উদ্ভাবিত হয়েছিল, তখন বন্য অবস্থা থেকে সভ্যতার পথে অনেকটাই এগিয়ে এসেছিল মানবসমাজ।

যে-সব মানবগোষ্ঠী বন্য অবস্থা পেরিয়ে এসেছে তাদের মধ্যে ছাড়া পশ্চিম গোলার্ধে তণ্ডুলজাতীয় শস্য এবং শাকসব্জির চাষ অপ্রচলিত ছিল। এশিয়া ও ইউরোপের মানবগোষ্ঠীসমূহ বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থা থেকে মধ্য অবস্থাতে উন্নীত হওয়ার আগে পর্যন্ত সম্ভবত পূর্ব গোলার্ধেও এর প্রচলন হয়নি। এটা অদ্ভুত ঘটনা যে পূর্ব গোলার্ধের অধিবাসীদের থেকে পুরো এক যুগপর্যায় আগেই আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা বর্বর অবস্থার নিম্নপর্যায়ে থাকাকালীনই শাকসব্জির চাষ করতে শিখেছিল। দুই গোলার্ধের অসম ভৌগোলিক সম্পদের জন্যই সম্ভব হয়েছিল এটা। পূর্ব গোলার্ধের তখন একটি ছাড়া আর সবরকম গৃহপালিত পশুই ছিল এবং তণ্ডুলজাতীয় শস্যের অধিকাংশেরই চাষ হত। আর পশ্চিম গোলার্ধের অধিবাসীরা মাত্র একটি শস্যই চাষ করতে জানত, কিন্তু সেটাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। এর ফলে পূর্ব গোলার্ধে বর্বর অবস্থার প্রথম স্তরের ব্যাপ্তি পশ্চিম গোলার্ধের তুলনায় অনেক দীর্ঘ এবং এই যুগে আমেরিকার অধিবাসীরা বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। কিন্তু যখন পূর্ব গোলার্ধের বেশ কিছু উন্নত মানবগোষ্ঠী, যারা বর্বর অবস্থার মধ্য পর্যায়ে ছিল, পশুপালনের দ্বারা প্রচুর মাংস এবং দুধ পেতে শুরু করল, তখন তারা শস্যচাষের জ্ঞান ছাড়াই আমেরিকার আদিবাসীদের থেকে অনেক ভালো অবস্থায় পৌঁছল। ঐ-সময়ে আমেরিকার অধিবাসীরা ভুট্টা ও সব্জি চাষ করতে জানত, কিন্তু পশুপালন জানত না। গৃহপালিত পশুর ধারণা থেকেই আর্য ও সেমিটিক গোষ্ঠীগুলি অন্যসব বর্বর গোষ্ঠীর থেকে পৃথক হতে শুরু করল।

আর্য গোষ্ঠীগুলি যে পশুদের গৃহপালিত করতে শেখার অনেক পরে তণ্ডুলজাতীয় শস্যের আবিষ্কার ও চাষবাস শুরু করেছিল, তার একটা বড় প্রমাণ এই যে বিভিন্ন আর্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় গৃহপালিত পশুদের নাম প্রায় একই, কিন্তু শস্য বা সব্জির নামে কোন মিল দেখতে পাওয়া যায় না। মমসেন দেখিয়েছেন যে গ্রীক, লাতিন এবং সংস্কৃত ভাষায় (পরবর্তীকালে ম্যাক্সমুলার অন্যান্য আর্য উপভাষাতেও যে নামগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন) গৃহপালিত পশুদের একই নাম, যা প্রমাণ করে যে এইসব জাতি পরস্পরের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার আগেই এইসব গৃহপালিত পশু তাদের পরিচিত ছিল। তারপরে তিনি বলছেন ঃ 'অন্যদিকে আমাদের হাতে এমন কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই যা থেকে বোঝা যায় যে তৎকালে তারা কৃষিকাজ করত। ভাষার মধ্যেও এর সপক্ষে কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। শস্যগুলির লাতিন ও গ্রীক নামের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় একই উচ্চারণের কোন শব্দ নেই, একমাত্র 'জিয়া' (zea) ব্যতিরেকে যা সংস্কৃত ভাষায় 'যব' (yavas)। কিন্তু ভারতীয়রা এর দ্বারা বোঝায় বার্লি এবং গ্রীকে এর অনুরূপ শব্দ হল স্পেল্ট্ (spelt), যার অর্থ এক ধরনের জংলি গম। গৃহপালিত জীবজন্তুর এক ধরনের নামের বিপরীতে কর্ষিত শস্যের নামের বৈচিত্র্যের অর্থ এই নয় যে এইসব জাতিগোষ্ঠীর এক সাধারণ আদি কৃষিকার্যের কথা অনুমান করা যাবে না। ভারতীয়দের ধানচাষ, গ্রীকদের গম ও জংলি গম চাষ এবং জার্মান ও কেল্টদের রাই ও ওট চাষের অভ্যাসকে একই আদিম কর্ষণপ্রথার উৎস থেকেই

BanglaBook.org

পাওয়া বলে ধরে নেওয়া যায়।"[১] এই শেষ সিদ্ধান্তটা কিন্তু চেষ্টাকৃতভাবে নেওয়া। ফলমূলের চাষ (horticulture) ভূমিকর্ষণের আগেই শুরু হয়েছিল, যেমন বাগান (hortos) এসেছে চাষের জমির (ager) আগে। পরের শব্দটার মধ্যে চৌহদ্দির অর্থ রয়েছে এবং আগের শব্দটার অর্থ হল "ঘেরা জায়গা"। কর্ষণ অবশ্য ঘেরা বাগানের থেকে প্রাচীন। স্বাভাবিক ক্রমটি হল—প্রথমে পলিমাটির খণ্ড খণ্ড ভূমি; দ্বিতীয়ত, ঘেরা জায়গায় বাগান করা; এবং তৃতীয়ত, প্রান্তরভূমিতে পশুশক্তির দ্বারা লাঙল দিয়ে চাষ করা। বর্তমানে আমাদের জানার কোন উপায় নেই যে মটর, ধান, ওলকপি, গাজর, বীট, স্কোয়াশ, তরমুজ ইত্যাদি সব্জির এক বা একাধিকের চাষ তণ্ডুলজাতীয় শস্যের আগে প্রচলিত ছিল কিনা। গ্রীক ও লাতিন ভাষায় এই শব্দগুলির কোন-কোনটার একই নাম। কিন্তু বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডবলু. ডি. হুইটনে আমাকে নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে গ্রীক / লাতিন ও সংস্কৃতে এদের কোন সাধারণ নাম নেই।

ঘেরা জায়গায় সব্জিচাষ যতটা না মানুষের নিজের প্রয়োজনে তার থেকে বেশি করে বোধহয় গৃহপালিত পশুদের প্রয়োজনেই শুরু হয়েছিল। পশ্চিম গোলার্ধে এর শুরু হয় ভুট্টাচাষ দিয়ে। দুই গোলার্ধে সমভাবে না হলেও এই নতুন যুগ সমগ্র মানবসমাজের ভবিষ্যৎকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। কৃষিবিদ্যার কৃৎকৌশল রপ্ত করতে ও তণ্ডুলজাতীয় শস্যকে জীবনধারণের জন্য প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে যে বহুযুগ কেটে গিয়েছিল, এ-কথা বিশ্বাস করার পিছনে অনেকগুলি কারণ রয়েছে। আমেরিকাতে যেহেতু এর ফলে স্থানে স্থানে বসতি ও গ্রামজীবন শুরু হল, যেহেতু এই চাষের ফসলই ক্রমশ ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের খাদ্যে মাছ ও শিকারের স্থান দখল করল। তাছাড়া এই তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য ও শাকসব্জির চাষ থেকে মানুষ এই ধারণা প্রথম লাভ করল যে বিপুল পরিমাণ খাদ্য এভাবে উৎপাদিত হতে পারে।

আমেরিকায় তণ্ডুলজাতীয় শস্যের এবং এশিয়া ও ইয়োরোপে পশুপালনের রেওয়াজ শুরু হওয়ার ফলে উন্নত জনগোষ্ঠীসমূহ নরমাংস-ভক্ষণের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। এ-কথা বিশ্বাসের পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে যে বন্য অবস্থায় সমস্ত পৃথিবী জুড়েই এই প্রথা প্রচলিত ছিল—সাধারণত বন্দী শত্রুদের মাংস এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে বন্ধু ও আত্মীয়দের মাংস খেতেও অভ্যস্ত ছিল মানুষ। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে শুধু বর্বর অবস্থার প্রথম যুগেই নয়, মধ্যযুগেও যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধরত উভয় পক্ষের মধ্যেই নরমাংস-ভক্ষণের রেওয়াজ ছিল—যেমন ইরোকোয়া ও আজটেকদের মধ্যে। কিন্তু সাধারণভাবে এই প্রথা তখন অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল। মানুষের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে খাদ্যের স্থায়ী প্রাচুর্যের যে বিরাট গুরুত্ব রয়েছে, এই তথ্য সেটা জোরালোভাবে উপস্থাপিত করে।

১। 'হিস্ট্রি অফ রোম', সম্পাঃ স্ক্রিবনার, ১৮৭১, পৃঃ ৩৮।

BanglaBook.org

(৪) মাংস ও দুগ্ধনির্ভর জীবনধারণ

পশ্চিম গোলার্ধে লামা[১] ছাড়া আর কোন গৃহপালিত পশু না থাকার ফলে এবং দুই গোলার্ধের খাদ্যশস্যের মধ্যে বিশেষ তফাৎ থাকায় তাদের অধিবাসীদের আপেক্ষিক অগ্রগতির ওপর তার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছিল। এই অসাম্য বন্য যুগে মানুষের ওপর কোন প্রভাব ফেলেনি। বর্বর যুগের প্রথম অবস্থায় এই প্রভাব ছিল সামান্য। কিন্তু যে-সব গোষ্ঠী বর্বরযুগের মধ্য অবস্থায় ছিল, তাদের ওপর এর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। পশুপালনের ফলে মাংস ও দুধের মতো স্থায়ী খাদ্যের যোগানদার হিসেবে গৃহপালিত পশু যাদের ছিল, তারা অন্যান্য বর্বর গোষ্ঠীর থেকে ভিন্ন হয়ে পড়ল। পশ্চিম গোলার্ধে কিন্তু বিপজ্জনক শিকার থেকেই যা-কিছু মাংস পাওয়া যেত। একটা গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যের এই ঘাটতির ফল ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের পক্ষে নিঃসন্দেহেই শুভ হয়নি। এজন্যেই তাদের মস্তিষ্কের আকার বর্বরতার নিম্ন যুগের ইণ্ডিয়ানদের থেকে ছোট। পূর্ব গোলার্ধে পশুপালনের ফলে পরিশ্রমী ও সঞ্চয়ী লোকেরা নিজেদের জন্য প্রাণিজ খাদ্য, বিশেষত দুধের[১] প্রচুর যোগানের ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। ফলে তাদের গোষ্ঠীর সকলের, বিশেষত শিশুদের স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল। অনুমান করা যেতে পারে, যে অনুপাতে আর্য ও সেমিটিক গোষ্ঠীগুলি গৃহপালিত পশুর সংখ্যার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করেছিল সেই অনুপাতেই প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েছিল তারা। প্রকৃতপক্ষে মাংস, দুধ ও দৈহিক শক্তিকে তারা তাদের জীবন-চর্যার অন্যতম বিষয় করে তুলেছিল। আর কোন মানবগোষ্ঠী এ-কাজ এতদূর পর্যন্ত করতে পারেনি এবং আর্যরা এ ব্যাপারে সেমিটিকদের থেকেও এগিয়ে ছিল।

ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায়, ভারতে এবং এশিয়ার স্তেপ অঞ্চলসমূহে পশুকে পোষ মানানোর ফলে এক নতুন ধরনের জীবনযাত্রা শুরু হয়ঃ পশুচারণের জীবন। এই-সমস্ত অঞ্চলেরই কোন-একটিতে পশুকে প্রথম পোষ মানানো হয়েছিল। এইসব গোষ্ঠীর অতীত ইতিহাসে এই অঞ্চলগুলিরই উল্লেখ আছে। ফলে তাদের এমন সব জায়গায় যেতে হল যে-সব অঞ্চল মানুষের আদি বাসস্থান তো নয়ই, বন্য অথবা নিম্নস্তরের বর্বর অবস্থাতেও তারা এইসব জায়গায় বসবাস করার জন্য যেত না, কারণ বনাঞ্চলই ছিল তাদের স্বাভাবিক বসতি। আর একবার পশুপালনে অভ্যস্ত হওয়ার পর এইসব গোষ্ঠীর পক্ষে পশ্চিম এশিয়া বা ইয়োরোপের বনাঞ্চলে আবার তাদের গরু-ছাগল নিয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না, যদি না তৃণভূমি থেকে দূরে গরু-ছাগলকে খাওয়ানোর জন্য

১। প্রাচীন স্পেনীয় লেখকরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ, মেক্সিকো এবং মধ্য-আমেরিকায় এক ধরনের 'বোবা কুকুর' পোষা হত বলে লিখেছেন (ক্লাভিগেরোর 'মেক্সিকোর ইতিহাস'-এর ১ম খণ্ডে মেক্সিকোর কুকুরের ছবি দ্রষ্টব্য)। আমি অবশ্য এ-রকম কোন জন্তুকে চিহ্নিত করতে পারিনি। তাঁরা এই মহাদেশে মুরগি এবং টার্কি পালন সম্পর্কেও বলেছেন। কিছু আদিম অধিবাসীরা টার্কি এবং নাহুয়াট্‌লাক্‌ গোষ্ঠীর মানুষরা কোন কোন জাতের বন্য মুরগি পালন করত।

১। আমরা ইলিয়াড থেকে জানতে পারি যে গ্রীকরা ভেড়া, গরু ও ছাগলের দুধ খেত। দ্রঃ, 'ইলিয়াড', iv, ৪৩৩।

দানাশস্যের চাষ তাদের শেখা না থাকত। অতএব এই অনুমান স্বতঃসিদ্ধ এবং এ-কথা আগেই বলেছি যে গৃহপালিত পশুর প্রয়োজনেই দানাশস্যের চাষ প্রথম শুরু হয় এবং পশ্চিমাঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর দেশান্তরগমনের সঙ্গে তা জড়িত। এবং এইভাবে প্রাপ্ত জ্ঞানের ফলেই এইসব গোষ্ঠী তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য ব্যবহার করতে শুরু করে।)

পশ্চিম গোলার্ধের অধিবাসীরা কিন্তু গৃহপালিত পশু ছাড়াই (পেরুতে লামার ব্যবহার বাদে) সাধারণভাবে বর্বর অবস্থার নিম্নস্তরে এবং কিছু কিছু গোষ্ঠী মধ্যস্তরে উন্নীত হয়েছিল। তারা একটিমাত্র দানাশস্য ভুট্টা এবং এর সঙ্গে বীন, স্কোয়াশ ও তামাক এবং কিছু কিছু অঞ্চলে কোকো, তুলো ও মরিচ উৎপন্ন করত। কিন্তু ভুট্টা, যা পাহাড়ী অঞ্চলেও সহজভাবে চাষ করা যায়, কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই ব্যবহার করা যায় এবং যা একইসঙ্গে অত্যন্ত পুষ্টিকর ও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তা অন্য সব দানাশস্যের যৌথদান অপেক্ষা মানবপ্রগতিতে অধিক সাহায্য করেছে। এই কারণেই আমেরিকান আদিবাসীরা গৃহপালিত পশুর ব্যবহার ছাড়াই উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল। পেরুর লোকেদের ব্রোঞ্জের আবিষ্কারও একটা কারণ, যা সময়ের ক্রমানুযায়ী আকরিক থেকে লোহা গলানোর পদ্ধতি আবিষ্কারের ঠিক পূর্ববর্তী।

(৫) কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে অপর্যাপ্ত নির্ভরতার উপায়

মানুষের পেশীশক্তির সঙ্গে গৃহপালিত পশুর শক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান যোগ হল। এর কিছুদিন পরে লোহা আবিষ্কারের ফলস্বরূপ ছুঁচলো ফলাযুক্ত লাঙল, আগের থেকে ভালো কোদাল ও কুড়ুল এল। আগেকার ঘেরা বাগানে চাষের অভিজ্ঞতা এবং এইসবের সমন্বয়ে জমিতে চাষ শুরু হল এবং তার ফলে এই প্রথম অপর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান সম্ভব হল। পশু-শক্তির সাহায্যে লাঙল টানাকে এক নতুন ধরনের প্রযুক্তির শুরু বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই প্রথম জঙ্গল হাসিল করে চাষের জমি বৃদ্ধি করার চিন্তা মানুষের মাথায় এল।[১] তাছাড়া এখন সীমাবদ্ধ অঞ্চলে প্রচুর লোকের বসবাসও সম্ভবপর হল। মাঠে চাষবাস শুরু হওয়ার আগে পৃথিবীর কোথাও পাঁচ লক্ষ লোকের একই শাসনের অধীনে একসঙ্গে থাকাটা একেবারেই অসম্ভব ছিল। যদি কোন ব্যতিক্রম থেকে থাকে তবে তা নিশ্চয়ই সমতলভূমিতে মেষপালন কিংবা বিশেষ ও বিচিত্র পরিস্থিতিতে সেচের সাহায্যে শাকসব্জি চাষের উন্নয়নজনিত কারণে হয়ে থাকবে।

এখন বিভিন্ন জাতিতাত্ত্বিক যুগে পরিবারের রূপ কী ছিল সে বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ এক যুগ থেকে অন্য যুগে তার রূপ একেবারেই ভিন্ন। তৃতীয় ভাগে পরিবারের এইসব বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে বিশদ করে বলা হবে। কিন্তু যেহেতু পরের ভাগেই এইসব শব্দ বারবার উল্লেখ করতে হবে, তাই পাঠকের অবগতির জন্য তাদের সংজ্ঞাটুকু অন্তত এখানে দেওয়া উচিত।

১। Lucr, "De Re. Nat," V, ১৩৬৯।

BanglaBook.org

(১) ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার

ভাই ও বোনেদের মধ্যে দলগত অন্তর্বিবাহের ফলে এই পরিবার দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রাচীনতম মালয়ের পরিবারের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে পরিবারের এই প্রথম রূপটি আদিমযুগে বিশ্বজনীন ছিল এবং এ থেকে সৃষ্ট জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটিও ছিল বিশ্বজনীন।

(২) দলগত বিবাহভিত্তিক বা পুনালুয়ান পরিবার

হাওয়াই 'পুনালুয়া' সম্পর্ক থেকে এই নামটি এসেছে। এর ভিত্তি হল একটি দলে বিভিন্ন ভাইদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীদের পরস্পরের অন্তর্বিবাহ এবং কোন দলের বিভিন্ন বোনেদের সঙ্গে তাদের স্বামীদের পরস্পরের অন্তর্বিবাহ। কিন্তু এখানে ভাই কথাটির অর্থ হল খুড়তুতো, মাসতুতো, মামাতো ও বিভিন্ন দূর-সম্পর্কের ভাই, যাদের তখন সহোদর ভাই হিসেবেই গণ্য করা হত। একইভাবে বোন বলতেও খুড়তুতো, মামাতো ইত্যাদি বিভিন্ন দূর-সম্পর্কের বোন, যাদের গণ্য করা হত সহোদর বোন হিসেবেই। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের পরে এই রূপের পরিবার চালু হয়। এর থেকে তুরানিয়ান ও গ্যানোয়ানিয়ান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। পরিবারের এই রূপ ও আগে উল্লিখিত প্রথম রূপ, উভয়ই বন্য যুগে প্রচলিত ছিল।

(৩) জোড়-বাঁধা বা সিনডায়াসমিয়ান পরিবার

কথাটি এসেছে সিনডায়াজো থেকে, যার অর্থ জোড় দেওয়া এবং সিনডায়াসমস, যার অর্থ দুটি বস্তুর যোগ। এখানে বিবাহের রূপে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে যুগ্মবদ্ধ করা হয়, কিন্তু তাদের সহবাসের ক্ষেত্রে কোন নিশ্চিত বন্ধন থাকে না। একবিবাহভিত্তিক পরিবারের ধারণার বীজ রয়েছে এর মধ্যে। বিচ্ছেদ বা আলাদা হয়ে যাওয়াটা স্বামী বা স্ত্রী উভয়েরই ইচ্ছাধীন ছিল। এই ধরনের পরিবার কোন জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার সৃষ্টি করেনি।

(৪) পিতৃপ্রধান পরিবার

একজন পুরুষের সঙ্গে বহু নারীর বিবাহের ফলস্বরূপ এই পরিবার গঠিত হতে দেখা যায়। হিব্রু পশুপালক গোষ্ঠীর নেতা ও প্রধান পুরুষদের বহুবিবাহের ফলে উদ্ভূত এক বিশেষ ধরনের পরিবারকে বোঝানোর জন্য সীমিত অর্থে এই পরিভাষার ব্যবহার। সার্বজনীন না হওয়াতে মানব-ইতিহাসে এর প্রভাব খুবই সামান্য।

(৫) একবিবাহভিত্তিক পরিবার

একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর বিবাহ ও তাদেরই সহবাসের ফলে উদ্ভূত পরিবার। এই একান্ত পারস্পরিক সহবাসই এই প্রথার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সভ্য সমাজের পরিবারও এই প্রথার অনুসারী, তাই এই রূপটি প্রকৃতই আধুনিক। পরিবারের এই রূপটিও এক নিজস্ব ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে।

মানবপ্রগতির বিভিন্ন স্তরে এই বিভিন্ন রূপের পরিবারের অস্তিত্ব এবং তাদের প্রভাব পরের পরিচ্ছেদগুলিতে প্রমাণ সহযোগে দেখানোর চেষ্টা করব।

BanglaBook.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানবপ্রগতির অনুপাত

উল্লিখিত বিভিন্ন জাতিতাত্ত্বিক যুগে মানুষের কৃতিত্বের পরিসংখ্যান নিয়ে প্রতিটি যুগে মানুষের অগ্রগতির পরিমাণ ও তার অনুপাত বিচার করতে পারলে ভালো হয়। এটা করতে হবে প্রতিটি যুগের উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে বিভক্ত করে এবং প্রধান প্রধান তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে। এর ফলে আমরা এই প্রতিটি যুগের আপেক্ষিক ব্যাপ্তি সম্বন্ধেও ধারণা করতে পারব। সফলভাবে তা করতে গেলে অনেকটা স্মৃতিচারণের মতো একটা সাধারণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে আমাদের এবং প্রতিটি যুগের প্রধান কীর্তিসমূহের মধ্যেই তাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

সভ্য অবস্থায় পৌঁছনোর আগে সভ্যতার প্রতিটি উপাদান অর্জন করা মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। এর অর্থ হল প্রথমত আদিম বন্য অবস্থা থেকে নিম্নতম স্তরের বর্বরে উন্নীত হওয়া এবং তা থেকে হোমারিক যুগের গ্রীক বা আব্রাহামের কালের হিব্রুতে উন্নীত হওয়ার মতো অবস্থার এক আশ্চর্য পরিবর্তন। (সভ্যযুগে মানুষের ক্রমিক অগ্রগতির কথা ইতিহাসে যেমন লেখা আছে, পূর্ববর্তী যুগগুলিতেও তা কিছু ভিন্ন রকমের ছিল না।

আমরা যদি মানুষের অগ্রগতির সিঁড়ির নীচের দিকে নামতে থাকি, তার আদিম বন্য-যুগের দিকে, আর সেই সিঁড়ির প্রতিটি নীচের ধাপে নামবার সময় তার তৈরি প্রতিটি বিধি, রীতিনীতি, আবিষ্কার, উদ্ভাবন যে-সময়ে যেভাবে হয়েছিল সেগুলিকে ক্রমানুসারে অপসারিত করতে থাকি, তাহলে প্রতিটি যুগে মানুষের অগ্রগতির একটা সাধারণ ধারণায় পৌঁছানো যাবে।

আধুনিক সভ্যতার প্রধান কীর্তিগুলি হল বৈদ্যুতিক তারবার্তা, কয়লার গ্যাস, স্পিনিং-জেনী, বিদ্যুৎচালিত তাঁত, বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, রেলইঞ্জিন, বাষ্পচালিত জাহাজ, দূরবীন, আবহাওয়া ও সৌরমণ্ডল সংক্রান্ত পূর্বাভাষ-বিদ্যা, ছাপাখানা, সেচখালের লকগেট, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, বারুদ ইত্যাদি। এছাড়া আছে আরো প্রচুর আবিষ্কার যা পূর্বোক্তগুলির সঙ্গেই কোন-না-কোনভাবে জড়িত, যেমন এরিকসনের প্রপেলার ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে, যেমন ফোটোগ্রাফি ও আরো অনেক যন্ত্রপাতি, যেগুলোর কথা এখানে বলার কোন প্রয়োজন নেই। (এর সঙ্গে আধুনিক বিভিন্ন বিজ্ঞান, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাধারণ বিদ্যালয়, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, পার্লামেণ্টের সঙ্গে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য, আধুনিক সুবিধাভোগী শ্রেণী, আন্তর্জাতিক নিয়মবিধি ও সাধারণ আইনকেও ধরতে হবে।

BanglaBook.org

আধুনিক সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতাসমূহের সমস্ত মূল্যবান অবদানকে গ্রহণ করেছে। আধুনিকতার অবদান প্রচুর হলেও তা প্রাচীন সভ্যতাসমূহের দানকে তুচ্ছ করার মতো কখনই নয়।

মধ্যযুগের অবদান হল গথিক স্থাপত্য, সামন্ততান্ত্রিক অভিজাততন্ত্র ও তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তব্য পদসমূহ এবং পোপের অধীনে এক যাজকতন্ত্র। এই যুগকে অতিক্রম করে আমরা গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় প্রবেশ করছি। এক অর্থে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সংখ্যা অল্প হলেও শিল্প, দর্শন ও সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গ্রীক ও রোমানরা ছিল বিশিষ্ট। এই দুই সভ্যতার প্রধান অবদানসমূহ হল সম্রাটতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক শাসন, দেওয়ানী আইন, খ্রীষ্টধর্ম, সিনেট ও কনসালদের সাহায্যে অভিজাততান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক মিশ্র শাসন, পরিষদীয় গণতান্ত্রিক শাসন, সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা এবং অশ্বারোহী ও পদাতিকে বিভাজন, নৌবহর ও নৌযুদ্ধের পত্তন, পৌর আইন ও বড় বড় নগর পত্তন, সামুদ্রিক বাণিজ্য, মুদ্রার প্রচলন এবং ভূখণ্ড ও সম্পত্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন। উদ্ভাবনের মধ্যে রয়েছে পোড়া ইঁট, কপিকল[১], জলচালিত কল, সেতু, নালা ও নর্দমা, জল পরিবহনের জন্য সীসার নল, বাঁকানো খিলান, তুলাযন্ত্র, ধ্রুপদী যুগের শিল্প ও বিজ্ঞানসংক্রান্ত রচনা ও সৃষ্টিসমূহ এবং স্থাপত্য, আরবী সংখ্যা ও বর্ণমালার সাহায্যে লেখা।

এই প্রাচীন সভ্যতাসমূহের ভিত্তি পূর্ববর্তী বর্বর যুগের উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর স্থাপিত ছিল। সভ্যমানুষের কীর্তি যতই বিরাট ও উল্লেখযোগ্য হোক না কেন, বর্বরযুগে মানুষের কীর্তিকে ম্লান করে দেওয়ার পক্ষে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। কারণ একমাত্র বর্ণমালাভিত্তিক লিখনপ্রণালী ছাড়া সে যুগের মানুষের হাতে সভ্যতার আর সকল উপাদানই ছিল। বর্বরযুগে মানুষের অগ্রগতির পরিমাণকে সমগ্র মানবপ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হব যে তা তার পরবর্তী সমস্ত যুগের কৃতিত্বের চেয়ে নিঃসন্দেহে অনেক বেশি।

পাথরে হিয়েরোগ্লিফিক্স লিপির সাহায্যে লেখা থেকেই সভ্যতার শুরু হল বলে ধরতে পারি আমরা।[২] সাহিত্য বা লিখিত নথিপত্র ছাড়া ইতিহাস বা সভ্যতা কোনটিরই

১। মিশরীয়রা কপিকল আবিষ্কার করে থাকতে পারে। (দ্রষ্টব্য: হেরোডোটাস, ২য়, পৃঃ ১২৫)। তাদের তুলাযন্ত্রও ছিল।

২। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের পর অন্যান্য মহৎ উদ্ভাবনের মতই ধ্বনিগত বর্ণমালা উদ্ভাবিত হয়েছিল। মিশরীয়রা হিয়েরোগ্লিফিক বর্ণমালাকে ধীর গতিতে কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে উন্নত করতে লাগল। অবশেষে প্রচুর পরিশ্রমের পর একটি সুসম্বদ্ধ বর্ণমালা তৈরি করতে সমর্থ হল তারা। পাথরের ওপর খোদাই করে লিখতে শুরু করল। তারপর এল আশ্চর্য ফীনিসিয়রা, যারা সমুদ্র অভিযানের প্রথম নাবিক ও ব্যবসায়ী, যারা আগেই হিয়েরোগ্লিফিক লিপির সঙ্গে হয়ত পরিচিত ছিল কিংবা ছিল না, তারা মিশরীয়দের পরিশ্রমের সাথী হল। অবশেষে তারা তৈরি করল ষোলো অক্ষরের সেই আশ্চর্য বর্ণমালা, যা মানবসমাজকে তার সাহিত্য এবং ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার জন্য একটা আশ্চর্য লিখিত ভাষা উপহার দিয়েছিল।

BanglaBook.org

সঠিক অস্তিত্ব আছে বলা যায় না। হোমারিক কবিতা, তা মৌখিকভাবেই প্রচলিত হোক বা লিখিতই হয়ে থাকুক, তার সাহায্যেই গ্রীকদের মধ্যে সভ্যতার সূচনাকে চিহ্নিত করা যায়। চিরনবীন ও আশ্চর্য সুন্দর এইসব কবিতার একটা জাতিতাত্ত্বিক মূল্য রয়েছে যা তার অন্যান্য গুণকে আরো বিপুলভাবে বর্ধিত করে। বিশেষত ইলিয়াড, যা তার রচনার কাল পর্যন্ত মানুষের প্রগতির প্রাচীনতম ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণকে ধরে রেখেছে, তার ক্ষেত্রে এ-কথা খুবই সত্য। স্ট্র্যাবো হোমারকে বলেছেন ভূগোলবিদ্যার পিতা[১], কিন্তু এই মহান কবি নিজের অগোচরেই আরো অফুরন্ত জিনিস দান করে গেছেন যা তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, যেমন শিল্প, রীতিনীতি, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনসমূহ এবং প্রাচীন গ্রীকদের জীবনধারার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। এর থেকে আমরা বর্বর যুগে আর্যদের সমাজের রূপ কী ছিল তার প্রথম সম্পূর্ণ এবং খুঁটিনাটি বিবরণ পাই। এইসব কবিতার সাহায্যে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে কয়েকটি বিষয় গ্রীকরা সভ্য যুগে প্রবেশ করার বহু আগে থেকেই জানত এবং এখান থেকেই বর্বরযুগের বহু আগেকার অবস্থা সম্বন্ধেও জানা যায়।

হোমারের কাব্যকে পথনির্দেশক হিসেবে ধরে অতীতের দিকে পিছিয়ে গেলে বর্বর-যুগের উচ্চ পর্যায়ের মানবজাতির অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে যা যা বাদ দিতে পারি সেগুলি হল—কবিতার উদ্ভাবন; অলিম্পিয়ান দেবতারা ও প্রাচীন পুরাণের বিস্তারিত রূপ; মন্দিরস্থাপত্য; ভুট্টা ও কর্ষিত সব্জি ছাড়া তন্ডুলজাতীয় শস্যের জমিতে চাষের জ্ঞান; পাথরের দেয়াল, মিনার ও ফটক দিয়ে ঘেরা নগরসমূহ; স্থাপত্যে মার্বেল পাথরের ব্যবহার; কাঠের তক্তা ও সম্ভবত পেরেকের সাহায্যে জাহাজ-নির্মাণ; মালগাড়ি ও রথ; ধাতব বর্ম; তামার ফলাযুক্ত বর্শা ও প্রতীকছাপযুক্ত ঢাল; লৌহ-তরবারি; সম্ভবত মদের উৎপাদন; স্ক্রু ছাড়া অন্যান্য যান্ত্রিক কলাকৌশল; কুমোরের চাক এবং জাঁতা; তাঁতে বোনা সূতি ও পশমী কাপড়; লোহার কুড়ুল, কোদাল ও বাটালি; হাতুড়ি ও নেহাই; হাপর ও চুল্লি, লোহা গলানোর উনুন, এবং লৌহবিষয়ক জ্ঞান। এছাড়া আরো রয়েছে একবিবাহভিত্তিক পরিবার; হিরোইক যুগের সামরিক গণতন্ত্র; পরবর্তীকালের সংগঠন গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠী; আগোরা বা গণপরিষদ; বাড়ি ও জমিরূপে ব্যক্তিগত সম্পদ এবং সুরক্ষিত নগরে উন্নত ধরনের পৌরজীবন। এইসব বাদ দিলে উচ্চ পর্যায়ের বর্বরদের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং তার ফলে অর্জিত মানসিক ও নৈতিক প্রগতিকেই বাদ দেওয়া হয়।

এই বিন্দু থেকে বর্বরতার মধ্যপর্যায়ের দিকে যতই পিছিয়ে যাব, ততই আবিষ্কার, উদ্ভাবন, সামাজিক রীতিনীতি কীভাবে এল তা অস্পষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আর্য-গোষ্ঠীর এই প্রাচীন যুগের ইতিহাস জানার জন্য আমাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কিছু তথ্য যে একেবারে নেই তা নয়। আমরা আগেই বলেছি কেন এই যুগের তথ্যের প্রয়োজনে আর্যরা ছাড়া অন্যান্য গোষ্ঠী সম্পর্কেও জানতে হবে।

১। স্ট্র্যাবো, ১, ২।

BanglaBook.org

এবার আমরা মধ্য পর্যায়ের মানব-অভিজ্ঞতা থেকে যে-সব উদ্ভাবন বাদ দেব সেগুলি হল—ব্রোঞ্জ তৈরি ; পশুদের বশ করে পালন ; গোষ্ঠীর জন্য রোদে-পোড়ানো ইঁট, চুণ ও বালির সাহায্যে পাথর গেঁথে গৃহনির্মাণ ; প্রকাণ্ড পাঁচিল ; হ্রদের মধ্যে গৃহনির্মাণ ; দেশীয় ধাতুসমূহের[১] ব্যবহার ও কয়লা ইত্যাদির সাহায্যে ধাতু গলানোর বিদ্যা ; তামার কুড়ুল ও বাটালি ; হাতে-চালানো তাঁত ; সেচযুক্ত কৃষিব্যবস্থা ; জলাধার, নদী পার হওয়ার জন্য পাথরবসানো উঁচু রাস্তা, খাল কাটা, বাঁধানো রাস্তা ; ঝোলানো সেতু ; ব্যক্তি-দেবতা এবং পুরোহিতের বিশেষ পোশাকসহ যাজক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ; নরবলি ; আজটেকদের ধরনে সামরিক গণতন্ত্র ; পশ্চিম গোলার্ধে সুতি ও অন্যান্য ভেষজ তন্তুর বস্ত্রবয়ন এবং পূর্ব গোলার্ধে পশম ও শনের কাপড় ; নক্সাকাটা মাটির বাসনপত্র ; ধারে তীক্ষ্ণ পাথর বসানো কাঠের তলোয়ার ; চকমকি ও পাথরের নানান যন্ত্রপাতি ; কার্পাস ও শনের ব্যবহার ; গৃহপালিত জীবজন্তু।'

এই যুগের কীর্তির মোট যোগফল এর পরবর্তী যুগের তুলনায় কম হলেও সমগ্র মানবপ্রগতির বিচারে তা ছিল বিরাট। এর মধ্যে রয়েছে পূর্ব গোলার্ধে গৃহপালিত পশুর ব্যবহার, যা থেকে ক্রমে মাংস ও দুধের এক চিরস্থায়ী যোগান-ব্যবস্থার শুরু হয়েছিল। এবং শেষপর্যন্ত মাঠে চাষ শুরু হয়। এ সময়েই দেশীয় ধাতু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় যার ফলস্বরূপ আবিষ্কৃত হয় ব্রোঞ্জ[২] এবং ক্রমশ আকরিক গলিয়ে লোহা পাওয়ার পথ খুলে যায়। পশ্চিম গোলার্ধে দেশীয় ধাতুসমূহের আবিষ্কার এবং স্বাধীন-ভাবে ব্রোঞ্জ উৎপাদন এই যুগেই শুরু হয়। এছাড়া ভুট্টা ও সব্জির ব্যবহার, চাষে সেচের ব্যবহার এবং বিরাট দুর্গের মতো যৌথ গৃহনির্মাণে রোদে-পোড়া ইঁট ও পাথরের ব্যবহারও দেখা যায়।

এবার আমরা বর্বর যুগের আদি বা নিম্ন পর্যায়ে পিছিয়ে যাচ্ছি। এই সময়ের অবদান হল গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর ভিত্তিতে সমাজগঠন, যা কয়েকজন প্রধানের এক মণ্ডলীর দ্বারা শাসিত ছিল। এই ধরনের সুসংগঠিত সমাজ এর আগে ছিল না। এছাড়া পশ্চিম গোলার্ধে ভুট্টা, ধান, স্কোয়াশ ও তামাকের চাষ আবিষ্কৃত হয় এবং

১। হোমার দেশীয় ধাতুসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেগুলি তাঁর আমলের বহু আগেই. এমনকি লোহারও আগে থেকে জানা ছিল। তাদের গলানোর জন্য কাঠকয়লা ইত্যাদির ব্যবহার-জনিত কারণেই আকরিক থেকে লোহা প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবিত হয়।

২। বেকম্যানের গবেষণার ফলে গ্রীক ও লাতিনদের মধ্যে লোহার ব্যবহারের আগে প্রকৃত ব্রোঞ্জের ব্যবহার ছিল কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ জেগেছে। তিনি মনে করেন 'ইলিয়াডে' কথিত 'ইলেকট্রাম' হল সোনা ও রূপার মিশ্রণ ("হিস্ট্রি অফ ইনভেনশন", বহ্ন সম্পাদিত, II, ২১২) ; এবং রোমানদের 'স্ট্যানাম' বা হোমারের 'ক্যাসিটেরন' হল রূপা ও সীসার মিশ্রণ। এই শব্দটির অর্থ সাধারণত টিন করা হয়েছে। ব্রোঞ্জ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে "এইসব জিনিসের বেশিরভাগই তৈরি হয়েছে স্ট্যানাম দিয়ে যা খাঁটি তামা অপেক্ষা কঠিন।" (ঐ, ২, ২১৩) ভূমধ্যসাগরীয় জাতি-গুলির ক্ষেত্রেই এই মন্তব্য, যেখানে টিন তৈরি হত না। সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক ও উত্তর ইয়োরোপে পাওয়া কুড়ুল, ছুরি, ক্ষুর, তলোয়ার এবং অলংকারগুলি তামা ও টিনের মিশ্রণে অর্থাৎ খাঁটি ব্রোঞ্জে তৈরি। লোহার ভাগ বেশি এমন মিশ্রণেও এগুলি পাওয়া গেছে।

তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের ব্যবহার শুরু হয়। তাছাড়া, টানা-পোড়েন দিয়ে কাপড় বোনা, কিল্টজাতীয় পোষাক, হরিণের চামড়ার পদাবরণ, পাখি শিকারের জন্য বুমেরাং, আত্মরক্ষার জন্য পাঁচিল দিয়ে গ্রাম ঘেরা, গোষ্ঠীগত ক্রীড়া, মহান আত্মার একটা আবছা ধারণাসহ প্রাকৃতিক উপাদানের পূজা, যুদ্ধকালীন নরমাংস-ভক্ষণ এবং মৃৎশিল্পও এই সময়ে শুরু হয়।

সময় ও বিকাশের বিচারে আমরা যতই পিছিয়ে যাচ্ছি এবং মানবপ্রগতির ক্ষেত্রে যতই নীচের দিকে নামছি, ততই দেখতে পাচ্ছি উদ্ভাবনগুলি সরল ধরনের, মানুষের মৌল চাহিদার সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশ রক্তসম্পর্কিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত প্রাথমিক গোত্র যা নির্বাচিত সর্দার দ্বারা শাসিত, এবং সর্দার-মণ্ডলী দ্বারা শাসিত-পরস্পর জ্ঞাতিসম্পর্কিত কয়েকটি গোত্র দ্বারা গঠিত গোষ্ঠীর রূপের নিকটবর্তী হচ্ছে। এই সময়ে এশিয়াটিক ও ইয়োরোপিয় মানবগোষ্ঠীসমূহের (তখন আর্য ও সেমিটিক জাতির অস্তিত্ব সম্ভবত ছিল না) অবস্থার কথা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। পশুকে গৃহপালিত করা ও মৃৎশিল্প উদ্ভাবনের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে প্রাচীন শিল্পের যা অবশিষ্ট আছে তা-ই ঐ যুগের নিদর্শন। ঐ যুগের বাসিন্দাদের মধ্যে আছে বাল্টিক উপকূলে যারা ঝিনুক স্তূপ গড়েছিল এবং কুকুর ছাড়া যাদের সম্ভবত অন্য কোন গৃহপালিত পশু ছিল না, তারা।

বর্বর যুগের তিনটি পর্যায়ে মানুষের কৃতিত্বের যে-কোন নিরপেক্ষ বিচার থেকে বোঝা যাবে যে তা শুধু সংখ্যা ও অন্তর্গত মূল্যেই নয়, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের বিচারেও অপরিসীম মূল্যবান।

এবারে দীর্ঘকালব্যাপী বন্য যুগ ধরে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। এইখানে পৌঁছে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে একে একে বাদ যাবে গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীতে বিভাজন; জোড়-বাঁধা পরিবার; প্রকৃতির আদি উপাদানসমূহের সর্বনিম্নরূপে পূজা; সিলেবিকাল ভাষা; তীর-ধনুক, পাথর ও হাড়ের যন্ত্রপাতি; বেতের ঝুড়ি; চামড়ার পোশাক; দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার; লিঙ্গভিত্তিক সমাজগঠন; নিকটবর্তী কয়েকটি গৃহের সমন্বয়ে গঠিত গ্রাম; নৌকো তৈরি ও গাছ থেকে ডিঙি তৈরি; ফলায় পাথর-বসানো বর্শা ও যুদ্ধে ব্যবহারের মুগুর; আরো স্থূল ধরনের পাথরের যন্ত্রপাতি; ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার; মোনোসিলেবিকাল ভাষা; জড়বস্তুর পূজা; নরমাংস-ভক্ষণ; আগুনের ব্যবহারবিদ্যা, এবং শেষত ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গির ভাষা।[১] এইসব বিভিন্ন

১। ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার ফলে এর সমাধানের পথে বিরাট সমস্যাগুলিকে বোঝা গেছে। এখন তা ফলহীন বিবেচনায় পরিত্যাগ করা হয়েছে। এটা ভাষার উপাদানের থেকে মানববিকাশের নিয়মাবলী ও মানসক্ষমতার ক্রিয়াপদ্ধতির প্রথা। লুক্রেশিয়াস বলেছেন যে আদিম যুগে মানুষ শব্দ ও ভঙ্গির সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে আধো-আধো ভাবে চিন্তার বিনিময় করত (—৫. ১০২১)। তিনি ধরে নিচ্ছেন যে চিন্তা হচ্ছে ভাষার পূর্ববর্তী এবং মৌখিক ভাষার আগে ছিল ভঙ্গির ভাষা। ভঙ্গি বা সংকেতের ভাষা সম্ভবত আদিম ও মৌখিক ভাষার পূর্ববর্তী। বন্যদের না হলেও এখনও বর্বরদের ক্ষেত্রে, যখন তাদের উপভাষা বিভিন্ন,

উদ্ভাবনের ক্রম অনুযায়ী তাদের বাদ দেওয়া হলে আমরা মানব-অস্তিত্বের একেবারে শৈশবে গিয়ে পৌঁছব, যখন মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখছিল, যার ফলে মৎস্য-নির্ভরতা ও বাসস্থান পরিবর্তন সম্ভব হয়, এবং যখন সে ভাষারূপ গঠনের চেষ্টা করছিল। সম্পূর্ণ আদিম এই অবস্থায় মানুষ মানবতার মাপকাঠিতে শুধু শিশুই ছিল না, তার মস্তিষ্কে তখন এইসব সংগঠন, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের চিন্তাও প্রবেশ করেনি। এককথায় সে তখন সবচেয়ে নীচের ধাপে দাঁড়িয়ে, কিন্তু পরে সে যা হয়েছে তার সম্ভাবনা তখনই তার মধ্যে নিহিত ছিল।

যতই নতুন নতুন আবিষ্কার, উদ্ভাবন আর সামাজিক রীতিনীতির ক্রমবিকাশ শুরু হল, ততই মানুষের বোধবুদ্ধিরও বিকাশ হতে থাকল। এর ফলে মানুষের মস্তিষ্কের, বিশেষ করে সেরিব্রাল অংশের বৃদ্ধি হতে থাকল। বন্য যুগে মানসিক বিকাশের ধীরগতি অবশ্যম্ভাবী ছিল, কারণ মানসিক প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার জন্য প্রায় কিছুই না থাকায় সহজতম উদ্ভাবনও তখন খুব কঠিন ছিল। এবং জীবনধারণের ঐ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রকৃতির কোন দান বা শক্তি আবিষ্কার করাও ছিল শক্ত। তেমনি এ-রকম বন্য ও এলোমেলো উপাদান থেকে সমাজের সরলতম রূপ গঠন করাও শক্ত ছিল। প্রাথমিক উদ্ভাবনাসমূহ এবং সমাজের প্রাথমিক রূপগুলি গঠন করা নিঃসন্দেহেই কঠিন কাজ এবং তা পরস্পরের থেকে সবচেয়ে বেশি সময়ের ব্যবধানে অর্জিত হয়েছে। পরিবারের ক্রমিক রূপগুলিতে এর একটা দারুণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এর প্রগতির নিয়ম, যা জ্যামিতিক অনুপাতে কাজ করে, তার থেকে বন্য যুগের দীর্ঘকালীন স্থিতির যথেষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব।

এটাই পারস্পরিক আদান-প্রদানের সর্বস্বীকৃত ভাষা। আমেরিকান আদিবাসীদের এমন একটি ভাষা রয়েছে এবং সাধারণ আদান-প্রদানের পক্ষে যথেষ্ট এই ধরনের ভাষার দৃষ্টান্তস্বরূপ সেটা। এই ভাষা নিঃসন্দেহে মোহন ও ব্যঞ্জনাময় এবং এর ব্যবহার আনন্দদায়ক। এ হল প্রাকৃতিক প্রতীকের ভাষা আর তাই এতে বিশ্বজনীন ভাষার উপাদান রয়েছে। শব্দের ভাষা অপেক্ষা সাংকেতিক ভাষা উদ্ভাবন করা সহজ। এবং যেহেতু তা সহজে আয়ত্ত করা যায়, তাই এই অনুমান অসঙ্গত নয় যে কথ্য ভাষার আগেই এর আবির্ভাব। এই প্রকল্প অনুযায়ী কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রথমে ভঙ্গিকে সাহায্য করত এবং সেগুলো যখন ক্রমশ সার্বজনীন অর্থরূপে পৌঁছল তখন সংকেত ভাষাকে ছাড়িয়ে গেল বা তা-ও অন্তর্ভুক্ত হল। মানুষের স্বরযন্ত্রকেও তা বিকশিত করল। কথ্য ভাষার জন্ম থেকেই ভঙ্গির ব্যবহার রয়েছে—এই অনুমান খুবই সরল। এখনও এরা অবিচ্ছেদ্য এবং এক প্রাচীন মানসিক অভ্যাস অনুযায়ী ভঙ্গির ভাষা এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। ভাষা যদি নিখুঁত হত তাহলে তার অর্থ থেকে জোর দিয়ে ও দীর্ঘসময় ধরে বোঝাতে ভঙ্গির ব্যবহার দোষের হত। ভাষার বিভিন্ন স্তর বেয়ে তার আদিম পর্যায়গুলিতে আমরা যতই পৌঁছই, ততই ভঙ্গির উপাদানটি গুণগত-ভাবে ও রূপবৈচিত্র্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষে আমরা দেখি যে ভাষা অঙ্গভঙ্গির ওপর এত বেশি নির্ভরশীল যে তাকে বাদ দিয়ে ভাষাকে বোঝা মুস্কিল হয়ে পড়ে। বন্যতার সময় থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ভাষা ও ভঙ্গি পাশাপাশি বিকশিত হয়েছে এবং বর্বর যুগের বহুদূর পর্যন্ত তারা সংশোধিত রূপে অবিচ্ছেদ্যভাবেই ঐক্যবদ্ধ থেকেছে। যাঁরা ভাষার উৎপত্তির সমস্যার সমাধান করতে আগ্রহী, তাঁরা সাংকেতিক ভাষার সম্ভাব্য ইঙ্গিতগুলিকে নিয়ে ভাবলে ভালো হয়।

মানুষের আদিম অবস্থা যে উপরে বর্ণিত রূপেই ছিল তা সাম্প্রতিক বা আধুনিক কোন মত নয়। পুরাকালের কবি ও দার্শনিকেরাও বুঝেছিলেন যে মানুষ অসভ্য অবস্থা থেকেই ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে উন্নত হয়েছে। তাঁরা এ-কথাও বুঝেছিলেন যে এই অগ্রগতির পথে তারা অসংখ্য উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করেছে, কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠান-সমূহ, যা এর থেকে আরো স্পষ্ট এবং তথ্য হিসেবে আরও মূল্যবান, তার থেকে তাঁরা এর বিচার করেননি।

এবারে এই প্রগতির অনুপাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সামনে এসে যাচ্ছে, যা এই বিভিন্ন জাতিতাত্ত্বিক যুগের আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যনির্ধারণকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। মানুষের অগ্রগতির অনুপাত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে জ্যামিতিক। তথ্য থেকেই এ-কথা পরিষ্কার এবং তত্ত্বগতভাবে এর অন্যথা হওয়ার উপায় ছিল না। জ্ঞানের একটি অংশ অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তা আরো জ্ঞান অর্জনের সহায়ক হয়ে উঠেছে, যতক্ষণ না অর্জিত হয়েছে আধুনিক জ্ঞানের জটিল ভাণ্ডার। অতএব প্রথম যুগে অগ্রগতি খুব ধীর এবং শেষ যুগে খুব দ্রুত হলেও প্রাথমিক মানুষের প্রগতির আপেক্ষিক পরিমাণ সর্বাধিক—যদি আগেকার কৃতিত্বকে আমরা সমগ্রের তুলনায় বিচার করি। অতএব বলা যেতে পারে বন্য যুগে মানবপ্রগতির মাত্রা সমগ্র মানবপ্রগতির বিচারে বর্বর যুগের তিনটি উপ-যুগ অপেক্ষা বেশি। এবং একইভাবে সমগ্র বর্বরযুগে মানুষের প্রগতির মাত্রা সভ্য যুগের তুলনায় বেশি।

এই জাতিতাত্ত্বিক যুগগুলির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য বিচার করাও একটা জ্ঞানমানের ব্যাপার। এগুলির সঠিক পরিমাপ সম্ভব নয়। তবে একটা মোটামুটি আন্দাজ করা যেতে পারে। জ্যামিতিক হারে ক্রমবৃদ্ধির নিয়মে বন্য যুগ নিঃসন্দেহে বর্বর যুগের তুলনায় দীর্ঘতর ছিল এবং বর্বর যুগ সভ্য যুগের তুলনায় অনেক বড়। যদি ধরে নিই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব এক লক্ষ বছর, তাহলে এর পাঁচ ভাগের তিন ভাগ সময়, অর্থাৎ কমবেশি ষাট হাজার বছর কেটে গেছে বন্য অবস্থাতেই। বাকি সময়ের মধ্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ কুড়ি হাজার বছর বর্বর যুগের আদি পর্যায়। মধ্য ও শেষ পর্যায়ের ব্যাপ্তি পনের হাজার বছর এবং বর্তমান সভ্য যুগের বয়স কমবেশি পাঁচ হাজার বছর।

বন্য যুগের স্থায়িত্ব যা বলা হয়েছে তার থেকে আরো বেশি হওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু কম কোনমতেই নয়। কিসের ভিত্তিতে এই হিসেব করা হয়েছে তার আলোচনা এখানে করলাম না, কিন্তু এটুকু বলা যেতে পারে যে মানবপ্রগতির জ্যামিতিক হার ছাড়াও প্রাচীন শিল্পের ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতির একটা সর্বজনস্বীকৃত মাপকাঠি স্থির হয়েছে এবং সংগঠনের অগ্রগতির ক্ষেত্রেও তাই। জাতিতত্ত্বের এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যে মানুষের ইতিহাসে বন্য যুগের স্থায়িত্ব অন্যান্য সব যুগ অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং সভ্য যুগ সে তুলনায় জাতিগুলির ইতিহাসের এক অতি সামান্য অংশ।

আর্য ও সেমিটিক, সমগ্র মানবগোষ্ঠীর এই দুটো শাখা তাদের অবস্থানগত সুবিধা,

BanglaBook.org

ভালো খাদ্য ও অন্যান্য কারণে বর্বর অবস্থা থেকে সভ্য যুগে প্রথম উন্নীত হয়। তারাই সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করেছে।[১] কিন্তু পৃথক পৃথক শাখা হিসেবে তাদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে পরের ঘটনা। প্রথমদিকের বর্বর মানুষদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষেরা মিশ্রিত বিন্যাসে ছিল। আর্য শাখার প্রথম আবির্ভাব পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে এবং তখন থেকেই তারা পৃথক ভাষাসম্পন্ন এক জাতি। আর্য আর সেমিটিক মানবগোষ্ঠীর পৃথক অস্তিত্বের সূচনা হল বর্বর যুগের মধ্য অবস্থা থেকে। পশুপালন বৃত্তি গ্রহণের দ্বারাই বর্বরদের থেকে ক্রমশ পৃথক হয়ে উঠল তারা।

প্রগতির বিভিন্ন স্তরে এক-একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন ও আবিষ্কার না-হওয়া পর্যন্ত মানবজাতির সবথেকে উন্নত অংশেরও প্রগতি আটকে থেকেছে। যেমন পশুকে গৃহপালিত করা বা আকরিক গলিয়ে লোহা তৈরি করা, যা তাদের সামনের দিকে অনেকটা ঠেলে দিয়েছে। অন্যদিকে অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষেরাও ক্রমশ এগিয়েছে এবং আর্য ও সেমিটিকদের কমবেশি কাছাকাছি পৌঁছেছে। কারণ যেখানে মহাদেশগুলি পরস্পর সংযুক্ত, সেখানেই মানবগোষ্ঠীর কোন-একটা বিশেষ উদ্ভাবনের সুফল অন্যান্যরাও ভোগ করেছে। সমস্ত বড় বড় উদ্ভাবন ও আবিষ্কারই ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু নীচুস্তরের মানবগোষ্ঠীর পক্ষে কোন উদ্ভাবন গ্রহণ করার আগে তার যথার্থ মূল্যকে বুঝতে হয়েছে। কোন-একটা মহাদেশীয় অঞ্চলে হয়তো একটি জাতি নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু একটি জাতিতাত্ত্বিক যুগে নেতৃত্ব বহুবার এক জাতি থেকে আরেক জাতির হাতে গেছে। মানবপ্রগতির ঊর্ধ্বমুখী গতি বহু ক্ষেত্রেই এবং সকল যুগেই কিছু গোষ্ঠীর জাতিতাত্ত্বিক ঐক্যের ও জীবনের ধ্বংসপ্রাপ্তির ফলে কিছুকালের জন্য থমকে গেছে। বর্বর অবস্থার মধ্য যুগে আর্য আর সেমিটিকরাই এগিয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু সভ্যযুগে একমাত্র আর্যরাই প্রগতির পথনির্দেশক।

এই অবস্থার দৃষ্টান্ত আমেরিকান আদিবাসীদের যখন আবিষ্কার করা হয়, তখনকার অবস্থা থেকে পাওয়া যায়। তারা আমেরিকা মহাদেশে বন্য অবস্থায় এসেছিল এবং মানসিক দিক থেকে অনুন্নত হলেও তারা অধিকাংশই বন্য অবস্থা থেকে বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থায় উন্নীত হয়। তাদের কিছু অংশ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ভিলেজ ইণ্ডিয়ানরা মধ্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। তারা লামা পশু। লামাই ছিল আমেরিকার নিজস্ব একমাত্র চতুষ্পদ প্রাণী যাকে দরকারি কাজে লাগানো যেত। এছাড়া তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জের আবিষ্কারও করেছিল তারা। উচ্চ বর্বর অবস্থাতে পৌঁছতে আর একটিমাত্র জিনিসেরই প্রয়োজন ছিল তাদের, তা হল লোহার আবিষ্কার। পূর্ব গোলার্ধের উন্নত মানবগোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছাড়াই তারা যে সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় বন্য অবস্থা থেকে এতদূর এগোতে পেরেছিল, এটাই আশ্চর্য। এশিয়াটিক এবং ইয়োরোপিয় গোষ্ঠীগুলো যখন লোহার যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মুখে, তখন আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা ব্রোঞ্জ প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছে, যা লোহা

১। সেমিটিক শাখার সঙ্গে মিশরীয়দের দূরভাবে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়।

আবিষ্কারের ঠিক পূর্ববর্তী। পূর্ব গোলার্ধের অগ্রগতির এই সাময়িক স্তব্ধতার সময়ে আমেরিকার আদিবাসীরা ঠিক বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে, যে অবস্থায় তাদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছিল ততদূর না হলেও তার যথেষ্ট কাছাকাছি পৌঁছেছিল। এই সময়ে আর্য ও সেমিটিকরা বর্বর যুগের শেষ পর্যায় ও সভ্যতার প্রথম চার হাজার বছর অতিক্রম করতে চলেছে। অতএব আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা অগ্রগতির হিসেবে আর্যদের থেকে বর্বর যুগের শেষ পর্যায় ও সভ্যতার চার হাজার বছর ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল। আর্য ও গ্যানোনিয়ান পরিবারগুলি মানব-অভিজ্ঞতার পুরো পাঁচটি অতীত যুগেরই সাক্ষ্য বহন করে, শুধু বন্য যুগের শেষের কিছু অংশ ছাড়া।

বন্য অবস্থা প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির গঠনের কাল। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার একেবারে শূন্য স্থান থেকে আমাদের বন্য পূর্বপুরুষেরা প্রথমে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ও পরে প্রগতির পথে এগোবার জন্য শুরু করেছিল বিরাট জীবনযুদ্ধ। আগুন জ্বালানো, কথ্য ভাষার ব্যবহার বা কোনরকম কলাকৌশল ব্যতিরেকেই এই যুদ্ধ চালাতে হয়েছিল তাদের, যতক্ষণ পর্যন্ত না হিংস্র জীবজন্তু থেকে নিরাপত্তা ও স্থায়ী খাদ্যের নির্ভরতা অর্জন করতে পেরেছিল। এইসমস্ত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সৃষ্টি হল এক পরিণত ভাষা এবং পৃথিবীর সমস্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ল তারা। কিন্তু সবাই মিলে সংগঠিত হওয়ার পক্ষে সমাজের রূপ তখনো খুবই স্থূল। তারপর যখন মানবগোষ্ঠীর সবচেয়ে উন্নত অংশ বন্য অবস্থা থেকে বর্বর অবস্থার নিম্ন অবস্থায় উন্নীত হল, তখন সারা পৃথিবীর জনসংখ্যা নিশ্চয়ই খুবই স্বল্প ছিল। বিমূর্তভাবে যুক্তি-বিচারের আপেক্ষিক অক্ষমতার কারণে প্রথমদিকের উদ্ভাবনগুলি ছিল সবচেয়ে কঠিন। জ্ঞানের প্রসার ঘটেছে এ-রকম এক একটি আবিষ্কার থেকেই, উন্নতির পথ আরো প্রশস্ত হয়েছে। কিন্তু যে-সব শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রগতি সম্ভব হয়েছে তা মানুষের শক্তির প্রায় সমতুল হওয়ার জন্য এ-কথা দীর্ঘকাল নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়নি। বন্য যুগের আবিষ্কার-গুলি বিশেষ চমকপ্রদ নয়, কিন্তু যৎসামান্য উপকরণ নিয়ে দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম-জনিত সফলতায় পৌঁছনোর সাক্ষ্য বহন করে তারা। তীর ও ধনুক এর একটা দৃষ্টান্ত মাত্র।

বন্য মানুষের মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষের অভাব তাদের অনগ্রসরতা, অনভিজ্ঞতা, পাশব বৃত্তি ও আবেগ, সে যুগের পাথর ও হাড়ের তৈরি জিনিসপত্রের ওপরে তাদের আদিম শিল্প সাক্ষ্য, তাদের গুহাবাসের সাক্ষ্য এবং তাদের কংকালগুলির নিদর্শন থেকেই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। পৃথিবীর কিছু কিছু জায়গায় অতীতের সাক্ষ্য হিসেবে যে-সব বন্য জাতি রয়ে গেছে তাদের বর্তমান অবস্থা থেকেও এ-কথা স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও মৌখিক ভাষার আবিষ্কার ও সিলেবিক স্তর পর্যন্ত তার বিকাশ, দুই বা তিন ধরনের পরিবার গঠন এবং গোত্র গঠন, যাকে সমাজের প্রাথমিক রূপ বলা যেতে পারে, তা এই দীর্ঘ বন্য যুগেরই কৃতিত্ব। এইসব সিদ্ধান্ত পূর্বকথিত এই অনুমানের ভিত্তিতে করা হয়েছে যে মানুষ সিঁড়ির নিম্নতম ধাপ থেকে তার যাত্রা শুরু করেছে।

BanglaBook.org

"যা মানুষ ও তার কীর্তি সম্বন্ধে সতর্ক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করতে প্রয়াসী।"[১]

একইভাবে বর্বর যুগের চারটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল গৃহপালিত পশুর ব্যবহার, তন্ডুলজাতীয় শস্যচাষের প্রথা আবিষ্কার, স্থাপত্যে পাথরের ব্যবহার এবং আকরিক গলিয়ে লোহা তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার। প্রথমে হয়তো শিকারের সুবিধের জন্যই কুকুরকে তারা সঙ্গী করেছিল এবং পরে হয়তো ঠিক উপযোগিতার জন্য নয় বরং খানিকটা খেয়ালের বশেই অন্যান্য প্রাণীশাবকদের পালন করতে শুরু করেছিল। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের উপযোগিতা আবিষ্কার করতে, তাদের বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি করার পদ্ধতি অর্জন করতে এবং ক্ষুধার মুখেও না-খেয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন আবিষ্কার করতে সময় লেগেছিল বিস্তর।) প্রতিটি পশুকে বশ মানানোর তথ্য যদি জানা যেত, তবে তা তথ্যের এক আশ্চর্য সংগ্রহ বলে মনে হত। এই প্রচেষ্টা, যার সাফল্য সেই মুহূর্তে ছিল সংশয়পূর্ণ, পরবর্তীকালে মানুষের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তন্ডুলজাতীয় শস্যের চাষ মানব-অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একটি বিরাট ঘটনা। তবে পশুপালন শুরু হওয়ার পরে পূর্ব গোলার্ধে এর তাৎপর্য তেমন ছিল না, কিন্তু পশ্চিম গোলার্ধে এই আবিষ্কার আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের একটা বিরাট অংশকে বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থায় এবং তার একটি অংশকে মধ্য অবস্থায় উন্নীত করেছিল। যদি মানুষ এই শেষ অবস্থাকে অতিক্রম করতে না পারত, তবুও তার জীবন হত অপেক্ষাকৃত সহজ ও উপভোগ্য) তৃতীয়ত, গৃহনির্মাণের কাজে রোদে-পোড়া ইঁট ও পাথর ব্যবহারের ফলে এক উন্নত জীবনযাত্রা শুরু হল, যা মানসিক ক্ষমতা ও পরিশ্রমের অভ্যাস—উন্নতির এই উৎসকে বাড়িয়ে দিল। কিন্তু চতুর্থ ঘটনাটিই ছিল মানবজাতির উন্নতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যা মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল সভ্যতার পথে। তা হল—বর্বর মানুষ ক্রমে ক্রমে দেশীয় ধাতুসমূহ আবিষ্কার করল, তাদের গলাতে এবং ছাঁচে ঢালাই করতে শিখল। যখন সে দেশীয় তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ আবিষ্কার করল এবং অবশেষে পুনঃ-পুনঃ প্রচেষ্টার দ্বারা চুল্লি আবিষ্কার করে আকরিক গলিয়ে যখন সে লোহা তৈরি করল তখন সভ্যতার জন্য লড়াই-এর দশভাগের নয় ভাগই তার জেতা হয়ে গেছে।[২] ধারওয়ালা

১। হুইট্‌নের "ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড লিংগুয়িস্টিক স্টাডিজ," পৃঃ ৩৪১।

২। জনৈক সুইস ইঞ্জিনিয়ার মঁসিয় কিকেরেজ বার্নের কাছে একটা পাহাড়ের ধারে আকরিক গলানোর কয়েকটি চুল্লি, কিছু যন্ত্রপাতি, লোহা ও কাঠকয়লার চিহ্ন খুঁজে পান। ঐ পাহাড়ের পাশে আরো খনন করে মাটির তৈরি চুল্লী এবং ধোঁয়া বেরনোর জন্য চিমনীর একটা গোলাকৃতি ভগ্নাবশেষও পাওয়া যায়। হাপরের ব্যবহারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গলানোর চুল্লি-গুলিতে পরপর আকরিক ও কাঠকয়লা সাজানো হত এবং হাওয়া পাঠিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত। এর ফলে স্পঞ্জের মতো আকরিক মেশানো ধাতু পাওয়া যেত, তারপর একে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ধাতুপাত তৈরি করা হত। পীটের স্তরের নীচে কুড়ি ফিট গভীর কাঠকয়লার ভাণ্ডার পাওয়া গেছে। সম্ভবত এই চুল্লিগুলি লোহার আবিষ্কারের সমসাময়িক সময়ে তৈরি নয়, কিন্তু আদিচুল্লির অনুকরণেও সেগুলি গড়া নয়।—দ্রষ্টব্য, ফিগিয়ের "প্রিমিটিভ ম্যান", পুট্‌নাম সংস্করণ, পৃঃ ৩০১।

এবং ছুঁচলো লোহার যন্ত্রপাতি মানুষকে নিশ্চিতভাবেই সভ্যতার পথে অনেকটা এগিয়ে দিল। মানব-ইতিহাসে লোহার আবিষ্কার একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, যার পাশে অন্যান্য যাবতীয় উদ্ভাবন ও আবিষ্কারই তুচ্ছ বা অপ্রধান বলে মনে হয়। এর থেকেই এল হাতুড়ি ও নেহাই, কুড়ুল ও বাটালি, লোহার ফলাযুক্ত লাঙল, লৌহ-তরবারি। এককথায়, তৈরি হল মানব-সভ্যতার ভিত্তি, যে-সভ্যতা এক অর্থে এই লৌহ-ধাতুর ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। বর্বরযুগে লোহার যন্ত্রপাতির অভাবই মানবসভ্যতার অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। এই অভাব পূরণ করতে না পারলে মানুষ আজও বর্বর যুগেই থেকে যেত। খুব সম্ভবত আকরিক গলিয়ে লোহা তৈরির ব্যাপারটা মানুষ একেবারেই আবিষ্কার করেছে। যদি জানা যেত যে কোন্ গোষ্ঠীর কাছে আমরা এই আবিষ্কার তথা সভ্যতার জন্য ঋণী, তবে তা দারুণ তৃপ্তির কারণ হয়ে উঠত। তখন সেমিটিক গোষ্ঠী আর্যদের থেকে এগিয়ে ছিল এবং মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। তারাই মানুষকে ধ্বনিভিত্তিক বর্ণমালা উপহার দিয়েছে এবং খুব সম্ভব লোহার আবিষ্কারও তাদেরই অবদান।

হোমারের কাব্যের যুগে গ্রীসের গোষ্ঠীগুলি দারুণ পার্থিব উন্নতি করেছিল। তারা সমস্ত সাধারণ ধাতুগুলির ব্যবহার জানত। আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের পদ্ধতি তো বটেই, সম্ভবত লোহা থেকে ইস্পাত তৈরি করতেও জানত তারা। প্রধান দানাশস্যগুলি ও অন্যান্য শস্যগুলির চাষের পদ্ধতি ও চাষের জন্য লাঙলের ব্যবহার ততদিনে আবিষ্কৃত হয়েছে। কুকুর, ঘোড়া, গাধা, গরু, শুয়োর, ভেড়া ও ছাগলকে বশ মানানো ও প্রচুর সংখ্যায় পালন শুরু হয়েছে। স্থায়ী বস্তু দিয়ে নির্মিত ভিন্ন ভিন্ন মহলবিশিষ্ট[১] ও বহুতল[২] গৃহ স্থাপত্য, জাহাজ নির্মাণ, অস্ত্রশস্ত্র, তন্তুজ কাপড়, আঙুর থেকে মদ, আপেলের চাষ, ন্যাসপাতি, অলিভ এবং ডুমুর[৩], আরামদায়ক পোশাক, উপযোগী যন্ত্রপাতি ও বাসনপত্র ততদিনে আবিষ্কৃত এবং এদের ব্যবহারও শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষের আরো গোড়ার দিকের ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে গেছে অতিক্রান্ত সময়ের অন্তরালে। বর্বর যুগের একেবারে প্রথম দিক সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ভাষার বিকাশ এতদূর পর্যন্ত হয়েছিল যে অত্যন্ত উন্নত আঙ্গিকের কবিতায় সেই প্রতিভার স্পর্শ রয়েছে। অতীতের মহৎ কীর্তিসমূহ দ্বারা উৎসাহিত, অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ এবং সৃজনশীল অফুরন্ত কল্পনাশক্তিসম্পন্ন এই জাতি বর্বর যুগের শেষভাগে সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল। এই অসাধারণ বর্বরদের সৃষ্টি করেই বর্বরতার যুগ সমাপ্ত হল। পরবর্তীকালের গ্রীক ও রোমান লেখকেরা এই শেষভাগের সমাজের অবস্থা সম্যক বুঝেছিলেন, কিন্তু তার পূর্ববর্তী কালের সমাজ, তার বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতা কী, সে-বিষয়ে প্রায় আমাদেরই মতো অজ্ঞ ছিলেন তাঁরা। কেবলমাত্র সময়ের বিচারে তাঁরা আমাদের থেকে নিকটবর্তী হওয়ায় বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সম্পর্ক

১। প্যালেস অফ প্রিয়াম, II, VI, ২৪২।

২। হাউস অফ ইউলিসিস—ওডিসি, XVI, ৪৪৮।

৩। ওডিসি, VII, ১১৫।

BanglaBook.org

তাঁরা আরো স্পষ্ট দেখতে পেতেন, এইটুকুই যা তফাৎ। এটা তাঁদের কাছে স্পষ্ট ছিল যে উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের একটা দীর্ঘ ধারাবাহিকতা ও সমাজ-সংগঠনের একটা ক্রমিক বিকাশের মধ্যে দিয়েই মানুষ বন্যতার অবস্থা থেকে হোমারিক যুগের অন্দরমহলে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু এই দুই অবস্থার মধ্যে যে দীর্ঘ ব্যবধান, তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনরকম প্রশ্ন ছিল বলে মনে হয় না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্বিতীয় খণ্ড

শাসনতন্ত্রের ধারণার উন্মেষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

লিঙ্গভিত্তিক সমাজগঠন

শাসনতন্ত্রের ধারণার ক্রমবিকাশের আলোচনায় জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে গঠিত গোত্র সংগঠনকেই প্রাচীন সমাজের সবচেয়ে পুরনো রূপ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে তার থেকে আরো প্রাচীন একটা রূপ আছে। তা হল লিঙ্গের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ সমাজ। মানব ইতিহাসে এর নতুনত্বের জন্য এর আলোচনা করছি না। আসল গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এর মধ্যে গোত্রের ধারণার বীজ নিহিত রয়েছে। যদি এই অনুমান তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহলে পুরুষ ও নারীতে বিভক্ত এই সংগঠন, যা এখনো অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে পুরোপুরিভাবে চালু রয়েছে, তা গোত্র-ভিত্তিক সংগঠনের মতই এক বহুল প্রচলিত প্রাচীন প্রথা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমরা কিছু পরেই উপলব্ধি করব যে বন্যযুগের গোড়ার দিকে স্বামীদের ও স্ত্রীদের মিলিত দলই, প্রথাগত সীমারেখার মধ্যে, সমাজব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। দলের মধ্যে বিবাহজনিত অধিকার ও বিশেষ সুবিধার (jura conjugialia)[১] ওপর ভিত্তি করে যে-সব নিয়মকানুন গড়ে উঠেছিল, সেগুলিই পরে বিশাল ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গিয়ে সুসম্বদ্ধ সমাজগঠনের মূল নীতি হয়ে উঠেছিল। বিবাহ ব্যাপারটার প্রকৃতিই এমন যে এইসব অধিকার ও সুবিধাগুলি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়েছিল সমাজে। ফলে অত্যন্ত ধীরগতিতে অচেতন সংস্কারের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত ধীরে তাদের থেকে মুক্তি-লাভ সম্ভব হয়েছিল। এই বিবাহপ্রথার ব্যাপ্তি যত সংকীর্ণ হয়ে এল, পরিবার ততই উন্নত রূপে পৌঁছল। একদল ভাই ও বোনের অন্তর্বিবাহের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার অস্ট্রেলিয় প্রথামতো সমাজব্যবস্থার দ্বিতীয় রূপ দলগত বিবাহে উন্নীত হল, যা এই প্রথম ধরনের বিবাহকে ভেঙে দিল। এই দ্বিতীয় ব্যবস্থায় পরিবারের একদল ভাইদের স্ত্রীরা ছিল তাদের সকলেরই স্ত্রী এবং একদল বোনদের স্বামীরা ছিল তাদের সকলেরই স্বামী। দুক্ষেত্রেই বিবাহ ছিল দলবদ্ধ। লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণীবদ্ধ সংগঠন এবং আত্মীয়তাভিত্তিক গোত্রের উন্নততর রূপের সংগঠন, উভয়কেই অচেতনভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিরাট সামাজিক পরিবর্তনের ফল হিসেবেই গণ্য করা দরকার। এইসব কারণে অস্ট্রেলিয় সমাজব্যবস্থা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবি রাখে, যদিও তা মানবজীবনযাত্রার এক অতি নিম্ন স্তর। আমাদের প্রাচীন সমাজ-ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য স্তর হিসেবে গণ্য হওয়ার দাবিদার এই সমাজব্যবস্থা।

১। রোমানরা সামাজিক প্রথা হিসেবে বিবাহ অর্থে 'কনিউবিয়াম' ও শুধু দৈহিক সংযোগ অর্থে 'কনজুগিয়াম', এই দুই প্রথার তফাৎ করেছিলেন।

লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণীবদ্ধ সংগঠন ও আত্মীয়তাভিত্তিক গোত্রের অপরিণত সংগঠন এখন অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কামিলারয় (kamilaroi) ভাষাভাষী অংশের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। সিডনীর উত্তরে ডার্লিং রিভার প্রদেশে বাস করে তারা। এই দুই ধরনের সমাজ-সংগঠনই অন্যান্য অস্ট্রেলিয়ান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় এবং তা এতই বহুল প্রচলিত যে প্রাচীনকালে তা তাদের মধ্যে সার্বজনীন ছিল বলেই মনে হয়। পুরুষ ও নারী শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজ-সংগঠন যে গোত্রের থেকে প্রাচীন, তা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। প্রথমত, গোত্রভিত্তিক সংগঠন এই শ্রেণীবদ্ধ সংগঠনের থেকে উন্নততর রূপ, এবং দ্বিতীয়ত, কামিলারয়দের মধ্যে প্রথম রূপটি যে দ্বিতীয় সংগঠনের রূপকে ক্রমশ হটিয়ে দিচ্ছে, এ থেকেও তা বোঝা যায়। স্ত্রী ও পুরুষে বিভক্ত শ্রেণী তাদের সমাজব্যবস্থার একক যা পূর্ণবিকশিত হলে গোত্রে রূপান্তরিত হয়—এইভাবে একটা অদ্ভুত ঘটনার সমাহার একই সময়ে দেখা যায়। লিঙ্গভিত্তিক ও গোত্রের ভিত্তিতে সমাজ সংগঠনে পূর্বেরটিই প্রধান স্থানে, পরেরটি তখনো অপরিণত। কিন্তু পরেরটি পূর্বেরটিকে হটিয়ে দিয়ে পূর্ণতার দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে।

লিঙ্গভিত্তিক এই সংগঠন অস্ট্রেলিয়ার বাইরে কোন উপজাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের বিভিন্ন বাসস্থানে এই দ্বীপবাসীদের ধীর বিকাশ এবং গোত্রভিত্তিক সংগঠন অপেক্ষা লিঙ্গভিত্তিক সংগঠনের আরো প্রাচীন চরিত্র থেকে মনে হয় যে-সব মানবগোষ্ঠী পরে গোত্রভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলেছে, তাদের সকলের মধ্যেই আগে এই ধরণের সংগঠন বিদ্যমান ছিল। যদিও এই শ্রেণীপ্রথা সম্পর্কে খুঁটিয়ে দেখলে অনেক বিভ্রান্তিকর জটিলতার সামনে পড়তে হয়, তবুও এ-সম্পর্কে জানা খুবই প্রয়োজনীয়। বন্যদের একটা অদ্ভুত সমাজ-সংগঠন হিসেবে দেখলে এতে আগ্রহের বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু এটা এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত সমাজের আদিমতম রূপ এবং আমাদের নিজেদের পূর্বপুরুষ আর্যশাখার মানুষেরাও যে একসময় এইরকম সমাজ-সংগঠনের মধ্যে ছিল, এই তথ্যটি একে আরও গুরুত্বপূর্ণ ও আরও শিক্ষাপ্রদ করে তোলে।

অস্ট্রেলিয়দের স্থান পলিনেশিয়দের থেকে নীচের স্তরে এবং আমেরিকার আদিবাসীদের থেকে অনেক নীচে। তারা আফ্রিকার নিগ্রোদের থেকেও নীচে এবং মানবপ্রগতির সিঁড়ির প্রায় একেবারে নীচের ধাপে অবস্থিত। অতএব তাদের সমাজের রূপ যে-কোন আদিম জাতির সমাজের রূপের মতোই।[১]

১। অস্ট্রেলিয় সামাজিক প্রথার বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমি অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী ইংরেজ মিশনারী রেভারেণ্ড লোরিমার ফিসন-এর কাছে ঋণী। তিনি আবার এই তথ্যের কিছু অংশ পেয়েছিলেন রেভারেণ্ড ডব্লিউ রিডলে ও টি. ই. লান্স-এর কাছ থেকে। শেষোক্ত দুজনই বহু বছর অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে ছিলেন এবং তাদের লক্ষ করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। মিস্টার ফিসন এই সামাজিক প্রথার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ও আলোচনার সঙ্গে এই তথ্যগুলি পাঠিয়েছিলেন যা এই লেখকের মতামতের সঙ্গে "প্রসিডিংস অফ দ্য আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্সেস, ১৮৭২"-এ প্রকাশিত হয়েছিল। দ্রঃ, খণ্ড ৮, ৪১২। ম্যাকলেনানের "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" পৃঃ ১১৮-তে কামিলারয়ের শ্রেণীসমূহের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। এছাড়া টাইলরের "আর্লি হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইণ্ড", পৃঃ ২৮৮ দ্রষ্টব্য।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যেহেতু গোত্রসমূহের কথা বলা হয়েছে, তাই এখানে তাদের আলোচনা না করে শ্রেণীসমূহের ব্যাখ্যার জন্য শুধু তাদের নামগুলি উল্লেখ করছি। কামিলারয়রা ছয়টি গোত্রে বিভক্ত এবং বিবাহের অধিকার সংক্রান্ত প্রথার ভিত্তিতে নিম্নরূপ দুটি ভাগে বিভক্ত ঃ

(ক) ১। ইগুয়ানা, (ডুলি) ২। ক্যাঙারু, (মুরিরা) ৩। অপোসাম, (মুটে)।
(খ) ৪। এমু, (ডিনোউন) ৫। ব্যাণ্ডিকুট, (বিল্‌বা) ৬। ব্ল্যাকস্নেক, (নুরাই)।

প্রথমদিকে প্রথম তিনটি গোত্রের পরস্পরের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, কারণ তারা ছিল একটি আদি গোত্রেরই বিভাজন। কিন্তু অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে তাদের বিবাহ চলত। কামিলারয়দের মধ্যে এই প্রাচীন নিয়মকে এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশোধিত করা হয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র ব্যক্তির সগোত্র ভিন্ন অন্য যে-কোন গোত্রে বিবাহ—এই পূর্ণতা এখনও আসেনি। পুরুষ বা নারীর নিজ গোত্রে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী, শিশুরা মায়ের গোত্র পায়। এগুলি হল গোত্রের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং যেখানেই তার প্রাচীন রূপের অস্তিত্ব আছে সেখানেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়। বহিরঙ্গের দিক থেকে অন্তত কামিলারয়দের মধ্যে এখনও তা সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধভাবে বর্তমান।

কিন্তু মানুষকে আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার আর একটি প্রাচীন প্রথা আছে যার চারটি শ্রেণী শুধুমাত্র পুরুষদের নিয়ে গঠিত আর চারটি শ্রেণী নারীদের নিয়ে। এর কিছু বিবাহ-সংক্রান্ত নিয়মকানুন আছে যা গোত্রের নিয়মকে বাধা দেয়। এর থেকে বোঝা যায় গোত্রে বিভাজনের ব্যাপারটি তখনও তার পরিণত রূপ পায়নি। পুরুষদের চারটি শ্রেণীর একটিমাত্র শ্রেণীর লোকেরা নারীদের চারটি শ্রেণীর একটিমাত্র শ্রেণীর মেয়েকে বিবাহ করতে পারে। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে একটি শ্রেণীর সমস্ত পুরুষ তত্ত্বগতভাবে অনুমোদিত বিবাহযোগ্য শ্রেণীর সমস্ত নারীর স্বামী। তাছাড়া পুরুষ যদি প্রথম তিনটি গোত্রের যে-কোন একটির সদস্য হয়, তাহলে তার স্ত্রী বিপরীত তিনটি গোত্রের যে-কোন একটির সদস্য হবে। অর্থাৎ এখানে একটি গোত্রের পুরুষদের একাংশ আর-একটি গোত্রের নারীদের একাংশেরই স্বামী হতে পারে, যা গোত্রভিত্তিক সংগঠনের প্রকৃত নিয়মের বিরোধী, কারণ সেই নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি গোত্রের সকলেরই সেই গোত্র ভিন্ন অপর সব গোত্রেরই পুরুষ বা নারীকে বিবাহের অধিকার থাকা উচিত।

শ্রেণীবিভাগগুলি নিম্নরূপ ঃ

	পুরুষ	নারী
১।	ইপ্‌পাই	ইপ্‌পাটা
২।	কুম্‌বো	বুটা
৩।	মুরুরী	মাটা
৪।	কুম্বি	কাপোটা।

BanglaBook.org

ইপ্‌পাই শ্রেণীর সমস্ত পুরুষ, তা সে যে গোত্রেরই হোক না কেন, পরস্পরের ভাই। তত্ত্বগতভাবে তারা সকলেই কোন-এক আদিনারীর বংশধর। সমস্ত কুম্‌বোরাও তাই। একই কারণে সব মুর্‌রী ও সব কুম্বিদের নিজেদের মধ্যে একই সম্পর্ক। একই ভাবে এবং একই কারণে সমস্ত ইপ্‌পাটা নারী, তারা যে গোত্রেরই হোক না কেন, পরস্পরের বোন। সমস্ত বুটা, মাটা এবং কাপোটারাও তাই। আবার সমস্ত ইপ্‌পাই ও ইপ্‌পাটারা, যে-কোন গোত্র থেকেই আসুক না কেন, সহোদর বা দূরসম্পর্কিতই হোক, পরস্পরের ভাইবোন। কুম্‌বো ও বুটারা ভাইবোন, মুররী ও মাটা এবং কুম্বি ও কাপোটারাও তাই। কখনও যদি একজন ইপ্‌পাই ও ইপ্‌পাটা, যারা আগে কেউ কাউকে দেখেনি, মিলিত হয়, তাহলে তারা পরস্পরকে ভাই ও বোন বলে সম্বোধন করে। অতএব কামিলারয়রা চারটি প্রধান প্রাথমিক ভাই ও বোনের দলে বিভক্ত, যার প্রতিটি দলের একটি পুরুষ-শাখা ও একটি নারী-শাখা রয়েছে। কিন্তু তারা মিলেমিশে একসঙ্গে থাকত। আত্মীয়তার বদলে লিঙ্গের ভিত্তিতে এই বিভাজন গোত্র কিংবা সমাজের অন্য যে-কোন রূপের থেকে প্রাচীন।

এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে গোত্রের প্রাথমিক অঙ্কুর রয়েছে, কিন্তু তার সম্পূর্ণতা নেই। প্রকৃতপক্ষে ইপ্‌পাই এবং ইপ্‌পাটারা একটি শ্রেণীরই দুটি শাখা এবং তাদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ বলে তাদের এক গোত্রের ভিত্তি বলা চলে। কিন্তু তারা দুটি নামে বিভক্ত যার এক-একটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ এবং যেহেতু তাদের নাম তাদের শিশুদের ওপর বর্তায়, তাই এদের সম্পূর্ণভাবে গোত্র বলা চলে না। এই শ্রেণীবিভাগ আত্মীয়তার বদলে লিঙ্গের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং বিবাহের নিয়মকানুনের সঙ্গে এদের প্রাথমিক সম্পর্ক যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনই মৌলিক।

ভাই এবং বোনেদের অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ বলে এই শ্রেণীগুলি বিবাহ বা আরো সঠিকভাবে বললে সহবাসের নিয়ম অনুযায়ী একটি ভিন্ন ক্রমে বিন্যস্ত। আদি নিয়মটি ছিল এ-রকম ঃ

ইপ্‌পাই বিয়ে করতে পারে কাপোটাকে, কিন্তু আর কাউকে নয়।
কুম্‌বো বিয়ে করতে পারে মাটাকে, কিন্তু আর কাউকে নয়।
মুর্‌রী বিয়ে করতে পারে বুটাকে, কিন্তু আর কাউকে নয়।
কুম্বি বিয়ে করতে পারে ইপ্‌পাটাকে, কিন্তু আর কাউকে নয়।

আমরা পরে দেখব যে এই কঠোর নিয়মকে এক জায়গায় সংশোধিত করে প্রতিটি শ্রেণীর পুরুষকে নির্দিষ্ট শ্রেণীর স্ত্রী ছাড়াও আরো একটি শ্রেণীর মেয়ের সঙ্গে অন্তর্বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শ্রেণীর নিয়ম অপেক্ষা গোত্রের নিয়ম বলশালী হয়ে ওঠার এটা একটা প্রমাণ, যা পরে শ্রেণীর নিয়মকে হটিয়ে দেবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে একজন পুরুষের স্ত্রী-নির্বাচনের ক্ষেত্র সমস্ত কামিলারয় নারীদের এক-চতুর্থাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবশ্য এটাই এই ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক নয়। তত্ত্বগতভাবে প্রত্যেক কাপোটা নারী প্রত্যেক ইপ্‌পাই পুরুষের স্ত্রী। একইভাবে প্রত্যেক মাটা প্রত্যেক কুম্‌বোর, প্রত্যেক বুটা প্রত্যেক মুর্‌রীর এবং প্রত্যেক ইপ্‌পাটা

BanglaBook.org

প্রত্যেক কুম্বি পুরুষের স্ত্রী। এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তথ্যগুলি খুব সুস্পষ্ট। পূর্বোক্ত ফিসন বলেছেন যে লাম্সসাহেব ডার্লিং নদীর তীরবর্তী গঞ্জসমূহে ও ডার্লিং-এর ওপারের অঞ্চলেও বহুদিন থাকার ফলে আদিবাসীদের সঙ্গে খুব ভালভাবে মিশেছিলেন। তারপর তিনি তাঁর চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন: "যদি একজন কুম্বি একজন অচেনা ইপ্পাটা নারীর সঙ্গে মিলিত হয়, তাহলে তারা পরস্পরকে গোলীর অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী বলে সম্বোধন করে।...অতএব একজন কুম্বি একজন ইপ্পাটার সঙ্গে দেখা হলে, সে অন্য গোষ্ঠীর হওয়া সত্ত্বেও, তাকে নিজের স্ত্রী বলে মনে করে এবং এ-ব্যাপারে সেই মেয়ের গোষ্ঠীর সকলে তাকে সমর্থন করে।" তার পরিচিতির গণ্ডির মধ্যে প্রতিটি ইপ্পাটা নারীই তার স্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হবে।

এখানে আমরা খুব সুনির্দিষ্টভাবে দলগত বিবাহের উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি—অবশ্য তার পরিধিটা এখানে বিশাল। কিন্তু বসবাস ও বেঁচে থাকার সুবিধার জন্য তা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত, যার প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশই সমগ্রের প্রতিনিধি। এই বিবাহ-প্রথায় কামিলারয় গোষ্ঠীর পুরুষদের এক-চতুর্থাংশের সকলেই নারীদের এক-চতুর্থাংশের সকলের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ। বন্য জীবনের এই ছবি থেকে আমাদের মনে বীতরাগ জন্মানোর কিছু নেই, কারণ তাদের কাছে এটা ছিল বৈবাহিক সম্পর্কের একটা রূপ এবং সামাজিকভাবে স্বীকৃত। বহুস্বামী ও বহুস্ত্রী প্রথা, যা ক্ষুদ্রতর পরিধিতে সারা পৃথিবীর বন্য গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল, এটা তারই একটা বিস্তৃত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তা ব্যবস্থার মধ্যেও এর সাক্ষ্য রয়ে গেছে, যদিও যে-সব আচরণবিধি থেকে এদের উৎপত্তি তা এখন অপ্রচলিত হয়ে গেছে। অন্তর্বিবাহের এই প্রথাকে যথেচ্ছ যৌন মিলনই বলা যেত, যদি না এর কিছু নিয়মপদ্ধতি থাকত। যেহেতু এর কিছু নিয়মতন্ত্র রয়েছে তাই এই প্রথা যথেচ্ছ মিলন থেকে বহু দূরে। তাছাড়া এ হল বিবাহ ও পরিবারপ্রথার এমন এক বাস্তব অবস্থা, তথ্যের ভিত্তি ছাড়া যার সম্পর্কে কোন ধারণা করাই সম্ভব ছিল না। জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার ভিত্তিতে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা সমাজের এটাই হচ্ছে প্রথম প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।[১]

সন্তানেরা যদিও তাদের মায়ের গোত্রেই থেকে যেত, তবু তাদের শ্রেণী হত তাদের বাবা-মার থেকে ভিন্ন ঐ গোত্রেরই অন্য একটি শ্রেণী। নিচের সারণী থেকে এটা বোঝা যাবে:

পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
ইপ্পাইয়ের সঙ্গে বিবাহ	কাপোটার।	তাদের সন্তানেরা মুর্‌রী	ও মাটা।
কুম্‌বোর সঙ্গে বিবাহ	মাটার।	তাদের সন্তানেরা কুবিব	ও কাপোটা।
মুর্‌রীর সঙ্গে বিবাহ	বুটার।	তাদের সন্তানেরা ইপ্পাই	ও ইপ্পাটা।
কুম্বির সঙ্গে বিবাহ	ইপ্পাটার।	তাদের সন্তানেরা কুম্‌বো	ও বুটা।

১। "সিস্টেমস অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি অ্যান্ড অ্যাফিনিটি অফ দ্য হিউম্যান ফ্যামিলি, (স্মিথসনিয়ান কন্ট্রিবিউশনস টু নলেজ)", খণ্ড ১৭, পৃঃ ৪২০ ও পরবর্তী।

BanglaBook.org

এই বংশপরম্পরাকে অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে মাতৃকুল অনুযায়ী মাটার মা কাপোটা, আবার মাটা কাপোটার মা। একইভাবে বুটার মা ইপ্‌পাটা, আবার বুটা হচ্ছে ইপ্‌পাটার মা। পুরুষ শ্রেণীগুলির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু মাতৃকুল ধরে বংশ নির্ধারিত হয়, তাই দেখা যায় কামিলারয়রা বলে যে তাদের আদি-মানব হচ্ছে দুজন নারী যাঁরা দুটি আদি গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশপরম্পরাকে আরো অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক শ্রেণীর রক্ত সব শ্রেণীতেই রয়েছে।

যদিও এদের প্রত্যেকে শ্রেণীনামকে বহন করে তবু এদের নিজস্ব নামও আছে। এটা বন্য ও বর্বর গোষ্ঠীর লোকেদের ক্ষেত্রেও একইভাবে সত্য। যতই এই লিঙ্গভিত্তিক সংগঠনকে খুঁটিয়ে দেখা যায়, ততই এই ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে এটা বন্য যুগের মানুষের সৃষ্টি। একবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এবং কয়েক পুরুষ ধরে প্রচলনের পরে সমাজকে তা এমনভাবে বাঁধে যে তার পরিবর্তন খুব শক্ত হয়ে পড়ে। একমাত্র একই ধরনের উন্নততর প্রথা ও কয়েক শতাব্দীর প্রচেষ্টার দ্বারাই তা করা সম্ভব; বিশেষত যদি বিবাহপ্রথার পরিধিকে সংকীর্ণ করতে হয়।

গোত্রভিত্তিক সংগঠন শ্রেণীগুলিকে অপরিবর্তিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে তবেই তার স্থান নিতে পেরেছে। দুটি ব্যবস্থার মধ্যকার সম্পর্ক, গোত্রগুলির অসংগঠিত অবস্থা, গোত্রের প্রসারের ফলে শ্রেণীগুলির বাধাপ্রাপ্ত অবস্থা এবং শ্রেণীই তখনো সমাজসংগঠনের বীজ—এইসব তথ্যাদি থেকে বোঝা যায় যে এই ব্যবস্থা সময়ের বিচারে শ্রেণীব্যবস্থার পরবর্তী। নীচের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্ট হবে।

আগে যা বলা হল তা থেকে গোত্রগুলির গঠন কী তা বোঝা সহজ হবে যখন তাদের দেখানো হবে শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কিত করে। নীচের সারণীতে শ্রেণীগুলি ভাই ও বোনের জোড়ায় দেখানো হয়েছে। আর যে যে শ্রেণীর দ্বারা গঠিত, তার হিসাবে গোত্র-গুলিও জোড়ায় জোড়ায় রয়েছে।

	গোত্র	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
১।	ইগুয়ানা	সকলে মুর্‌রী ও মাটা,		বা কুম্বি	ও কাপোটা।
২।	এমু	সকলে কুম্‌বো ও বুটা,		বা ইপ্‌পাই	ও ইপ্‌পাটা।
৩।	ক্যাঙারু	সকলে মুর্‌রী ও মাটা,		বা কুম্বি	ও কাপোটা।
৪।	ব্যাণ্ডিকুট	সকলে কুম্‌বো ও বুটা,		বা ইপ্‌পাই	ও ইপ্‌পাটা।
৫।	অপোসাম	সকলে মুর্‌রী ও মাটা,		বা কুম্বি	ও কাপোটা।
৬।	ব্ল্যাকস্নেক	সকলে কুম্‌বো ও বুটা,		বা ইপ্‌পাই	ও ইপ্‌পাটা।

একটি বিশেষ গোত্রের সঙ্গে সন্তানের কী সম্পর্ক তা বিবাহের নিয়ম দ্বারা নির্দিষ্ট। যেমন, ইগুয়ানা-মাটা অবশ্যই কুম্‌বোকে বিয়ে করবে। তাদের ছেলেমেয়েরা হবে কুম্বি ও কাপোটা এবং অবশ্যই তাদের গোত্র হবে ইগুয়ানা, যেহেতু মাতৃকুল ধরে পরম্পরা নির্ধারিত হয়। ইগুয়ানা-কাপোটা অবশ্যই ইপ্‌পাইকে বিয়ে করবে। তাদের ছেলেমেয়েরা হবে মুর্‌রী ও মাটা এবং একই কারণে তাদের গোত্রও হবে ইগুয়ানা। একইভাবে এমু-বুটা অবশ্যই মুর্‌রীকে বিয়ে করবে। তাদের ছেলেমেয়েরা ইপ্‌পাই ও

ইপ্‌পাটা এবং এমু গোত্রের। এইভাবে গোত্রগুলি বংশপরম্পরায় মেয়ে-সন্তানদের ধরে রাখে। অবশিষ্ট গোত্রগুলির ক্ষেত্রেও সবকিছু ঠিক একইরকম। মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি গোত্রের মধ্যে আটটি শ্রেণীর চারটি রয়েছে, এবং গোত্রগুলি তত্ত্বগতভাবে দু'জন কল্পিত আদি নারী থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত প্রথমে দুটি নারী ও দুটি পুরুষ শ্রেণী ছিল, যারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত হত। এবং পরে এই চারটিই পুনর্বিভক্ত হয়ে আটটি শ্রেণীতে পরিণত হয়। শ্রেণীগুলি যেহেতু প্রাচীনতর সংগঠন, সেহেতু এগুলো নিশ্চয়ই গোত্রের মধ্যেই বিন্যস্ত ছিল এবং তার পুনর্বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হয়নি।

তাছাড়া ইগুয়ানা, ক্যাঙারু, অপোসাম এই গোত্রগুলো তাদের অন্তঃস্থিত শ্রেণীর বিচারে যেহেতু পরস্পরের পরিপূরক, তাই বলা যায় যে আদি একটি গোত্রের থেকেই ভেঙে বেরিয়েছে এগুলো। এমু, ব্যাণ্ডিকুট এবং ব্ল্যাকস্নেক গোত্রগুলির ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য, ফলে ছয়টি গোত্র আসলে মূল দুটি গোত্রে পরিগণিত হল, যাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহের অধিকার আছে কিন্তু নিজের মধ্যে নয়। এটার আরো প্রমাণ এই যে প্রথম তিনটি গোত্রের সদস্যেরা আগে পরস্পরের মধ্যে বিয়ে করতে পারত না, শেষের তিনটি গোত্রের সদস্যরাও না। গোত্রগুলি যখন এক ছিল তখন তাদের মধ্যে বিবাহ চলত না। তারা ভেঙে বিভিন্ন গোত্রনাম[১] নিলেও, সেই নিয়ম চলতে লাগল। আমরা পরে দেখব যে সেনেকা-ইরোকোয়াদের মধ্যেও ঠিক এই একই জিনিস দেখা যায়।

১। ইপ্‌পাই ও কাপোটাদের যদি একটা কুলপঞ্জী করা যায় এবং চতুর্থ প্রজন্ম অবধি বাড়ান যায় আর প্রতি জোড়া স্বামী-স্ত্রীর একটি পুরুষ ও একটি নারী সন্তান রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে ফলাফল হবে এইরকম। ইপ্‌পাই ও কাপোটাদের ছেলেমেয়েরা মুরুরী ও মাটা। ভাই-বোন হওয়ায় এরা পরস্পরকে বিয়ে করতে পারে না। দ্বিতীয় প্রজন্মে মুরুরীর সঙ্গে বুটার বিয়ে হলে ছেলেমেয়েরা হবে ইপ্‌পাই ও ইপ্‌পাটা। মাটার সঙ্গে কুম্‌বোর বিবাহের ফলে জাত সন্তানেরা কুম্বি ও কাপোটা। এদের মধ্যে ইপ্‌পাই তার জ্ঞাতি-বোন কাপোটাকে বিয়ে করবে এবং কুম্বি করবে জ্ঞাতি-বোন ইপ্‌পাটাকে। দেখা যাবে যে কুম্‌বো ও বুটা ছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মে দুটি থেকে আটটি শ্রেণী সৃষ্টি হচ্ছে। তৃতীয় প্রজন্মে রয়েছে দুজন মুরুরী, দুজন মাটা, দুজন কুম্‌বো এবং দুজন বুটা। এদের মধ্যে মুরুরীরা বুটাদের বিয়ে করবে আর কুম্বিরা করবে মাটাদের। অর্থাৎ এরা এদের দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞাতি-বোনদের বিয়ে করবে। চতুর্থ প্রজন্মে ইপ্‌পাই, কাপোটা, কুম্বি ও ইপ্‌পাটা চারজন করে রয়েছে যারা পরস্পরের তৃতীয় পর্যায়ের ভাই-বোন। এদের মধ্যে ইপ্‌পাইরা বিয়ে করবে কাপোটাদের এবং কুম্বিরা ইপ্‌পাটাদের। এইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকবে। বিবাহযোগ্য অন্যান্য শ্রেণীর কুলপঞ্জী থেকেও একইরকম ফল পাওয়া যাবে। এইসব খুঁটিনাটি নিতান্তই বিরক্তিকর। কিন্তু এগুলো থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয় যে আদিম সমাজে এরা সবসময় অন্তর্বিবাহ তো করতই, লিঙ্গভিত্তিক যে সংগঠন ছিল তার ভিত্তিতেই তা করতে বাধ্য হত। এই প্রথার ফলে সহবাসের নিয়ম আবশ্যিকভাবে চালু হয়নি কারণ সমস্ত পুরুষ সমস্ত নারীদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে বিবাহিত হত, কিন্তু প্রায়শই তার ব্যবহার এই প্রথায় ছিল। এইভাবে পূর্ণবিকশিত গোত্র-প্রথার একটি মূল উদ্দেশ্য এখানে পরাজিত। তা হল এক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত বংশধরদের একটা অংশের মধ্যে অন্তর্বিবাহের নিষেধ এবং অন্য গোত্রে বিবাহের অধিকার।

যেহেতু শুধুমাত্র নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যেই বিবাহের অনুমতি ছিল, তাই যখন দুটি মাত্র গোত্র ছিল, তখন একটির সমস্ত নারীর অর্ধাংশ তত্ত্বগতভাবে আর একটির সমস্ত পুরুষের অর্ধাংশের স্ত্রী ছিল। গোত্রের বাইরে বিয়ে করার যে প্রধান সুবিধা এই প্রথায় ছিল, তা শ্রেণীর উপস্থিতি ও তার বিধিনিষেধের ফলে লোপ না পেলেও, বন্ধ হয়ে গেল। ফলে সহোদর ছাড়া অন্যান্য ভাইবোনদের মধ্যে বিয়ে হতে লাগল। গোত্রগুলি যদি শ্রেণী-গুলিকে মুছে ফেলতে পারত, তাহলে এই দূষণীয় ব্যবস্থা দূর হতে পারত। বোধহয় শ্রেণীর সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যই ছিল ভাইবোনের অন্তর্বিবাহ প্রথাকে ভাঙা। এটাই এই ব্যবস্থার গড়ে ওঠার একটা সম্ভাব্য কারণ। কিন্তু এর বাইরে যেহেতু তা আর ভাবেনি, তাই তা একইরকম আপত্তিকর একটি বিবাহপ্রথাকে চালু রেখেছিল ও সনাতন রূপ দিয়েছিল।

আমরা এবার এমন একটি উদ্ভাবনকে লক্ষ করব যা শ্রেণী-ব্যবস্থায় প্রাথমিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিল এবং গোত্রব্যবস্থার প্রকৃত আদর্শের সহায়ক হয়েছিল। এখানে দুটি তথ্য লক্ষণীয়ঃ প্রথমত, তিনটি গোত্রের সঙ্গে অপর তিনটি গোত্রের বিবাহ সীমাবদ্ধ-ভাবে চালু হওয়া; দ্বিতীয়ত, পূর্বে অনুমতি ছিল না এমন শ্রেণীতে বিবাহ চালু হওয়া। এইভাবে এখন ইগুয়ানা-মুরুরী ক্যাঙারু গোত্রের মাটা নারীকে বিয়ে করতে পারে, যে তার দূরসম্পর্কের বোন। আগে সে খালি বিপরীত তিনটি গোত্রের বুটা নারীকেই বিয়ে করতে পারত। একইভাবে ইগুয়ানা-কুম্বি দূরসম্পর্কের বোন কাপোটাকে বিয়ে করতে পারে। এমু-কুম্বি এখন বুটাকে বিয়ে করতে পারে এবং এমু-ইপ্পাই পারে ব্ল্যাকস্নেক গোত্রের ইপ্পাটাকে। এগুলি আগে নিষিদ্ধ ছিল। তিনটি গোত্রের সমষ্টির প্রতি শ্রেণীর পুরুষ ঐ সমষ্টির অন্য দুটি গোত্রের একটি বাড়তি শ্রেণীর মেয়েদের বিয়ে করতে পারে, আগে তারা যাদের বিয়ে করার অনুমতি পেত না। অবশ্য ফিসনের লেখায় এতদূর পরিবর্তনের উল্লেখ নেই।[১]

এই উদ্ভাবন পশ্চাৎগতিসম্পন্ন হত যদি না এর ফলে শ্রেণীব্যবস্থা ভাঙবার উপক্রম হত। কামিলারয়দের মধ্যে প্রগতি যেভাবে চোখে পড়ে তা হল শ্রেণী থেকে গোত্রে পরিবর্তন এবং শ্রেণীর পরিবর্তে গোত্রই ক্রমে সমাজসংগঠনের একক হয়ে দাঁড়ায়। এই পথে মূল বাধা ছিল সহবাসের প্রথা। এর বিস্তৃতি না কমালে সামাজিক উন্নতি অসম্ভব ছিল। শ্রেণীগুলি যতক্ষণ তাদের সুযোগসুবিধা নিয়ে বজায় ছিল, ততক্ষণ এই প্রথাকে সংকুচিত করাও সম্ভব ছিল না। এইসমস্ত শ্রেণীর মিলনসংক্রান্ত যে-সব আইনকানুন বা jura conjugialia, তা কামিলারয়দের ওপর একটা ভার হয়ে চেপে বসেছিল এবং তার থেকে মুক্তি না পেলে তারা আরো হাজার হাজার বছর একইভাবে থেকে যেত।

এইরকমই আর একটি সংগঠন হাওয়াইয়ানদের পুনালুয়া, যার আলোচনা পরে করব। যেখানেই বন্য অবস্থার মধ্য বা নিম্ন স্তর পাওয়া গেছে, সেখানেই পূর্ণভাবে দলগত বিবাহ কিংবা এমন কিছু চিহ্ন যার থেকে বোঝা যায় মানুষের ইতিহাসের এই পর্বে এই

১। প্রস. অফ আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ আর্ট অ্যান্ড সায়েন্সেস," viii, ৪৩৬।

বিবাহ স্বাভাবিক ছিল, তা খুঁজে পাওয়া গেছে। তত্ত্বগতভাবে দল বড় না ছোট হত তা চিন্তা করা অর্থহীন, কারণ তাদের জীবনের অবস্থা দ্বারাই নির্ধারিত হত এই প্রথার অনুগামী দলের আকার কী হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে স্বামী ও স্ত্রীদের দল ব্যাপারটা বন্য অবস্থার একটা নিয়ম, বা বন্যতার যুগে সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে আমাদের পূর্বপুরুষরাও মানুষের এই সাধারণ অভিজ্ঞতার অংশীদার ছিল।

এইসমস্ত আচরণ ও প্রথার মধ্যে বন্য মানুষের নীচু অবস্থার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যদি পৃথিবীর কিছু কিছু কোণে মানুষের আদিম অবস্থার সাক্ষ্য হিসেবে কিছু বন্য মানুষ থেকে না যেত, তাহলে এই অবস্থা সম্পর্কে কোন ধারণা করা সম্ভব হত না। এর থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করা যায়। তা হল—মানুষের প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রগতির এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় গড়ে উঠেছে। এর প্রতিটি হচ্ছে সমাজের দোষত্রুটিকে দূর করার অসচেতন আন্দোলনের ফল। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ বহু প্রাচীন এবং এদের সঠিকভাবে বুঝতে হলে এই আলোকেই দেখা উচিত। এ-কথা ধারণা করা ভুল হবে যে অস্ট্রেলিয়ার বন্যরা প্রগতির সবচেয়ে নীচের ধাপে রয়েছে। তাদের বিভিন্ন শিল্প ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, তা যত সাধারণ মানেরই হোক না কেন, এর উল্টোটাই প্রমাণ করে। এ-কথা মনে করারও কোন কারণ নেই যে এক উন্নত অবস্থা থেকে তাদের অবনতি হয়েছে। কারণ মানব-অভিজ্ঞতায় এই যুক্তিকে সমর্থন করার মতো কোন তথ্য নেই। কিছু কিছু কারণে কোন কোন জাতি ও গোষ্ঠীর মানসিক অবনতি হয় আমরা জানি; কিন্তু তাতে মানুষের সাধারণ প্রগতিতে কোন ছেদ পড়ে না। মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এই কথাকেই সমর্থন করে যে মানুষ ক্রমশ নিম্ন অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় এগিয়ে গেছে। বন্য মানুষেরা যে-সমস্ত কৌশলের সাহায্যে জীবন নির্বাহ করে, সেগুলি অদ্ভুতরকম স্থায়ী। উন্নত কোন কৌশল যদি না তাদের হটিয়ে দেয়, তাহলে সেগুলি কখনোই লুপ্ত হয় না। এইসমস্ত কৌশলের সাহায্যে এবং সামাজিক সংগঠনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ বিকাশের এক নিয়ম ধরে এগিয়ে গেছে, যদিও বহু শতাব্দী তার প্রগতি অনুভব করা যায়নি। জাতি ও ব্যক্তি উভয়ের ক্ষেত্রেই এ-কথা সত্য, যদিও কোন কোন জাতি ও গোষ্ঠী তাদের নির্দিষ্ট জাতিতাত্ত্বিক জীবন খণ্ডিত হওয়ার ফলে লুপ্ত হয়ে গেছে এমনও ঘটেছে।

এই লেখকের যতদূর পর্যন্ত জানা আছে তাতে অস্ট্রেলিয়ান শ্রেণীসমূহই হচ্ছে গোত্র-ভিত্তিক সামাজিক সংগঠন ও আরো প্রাচীন লিঙ্গ-ভিত্তিক সংগঠনের প্রথম এবং একমাত্র উদাহরণ। এর মধ্যে আমরা এমন এক সমাজকে দেখতে পাই যা আদিম রূপের নিকটতম। অন্যান্য জাতির মধ্যে দাম্পত্যের পরিসর যতই সংকীর্ণ হয়েছে, গোত্র প্রথা ততই এগিয়েছে। সমাজের অন্তর্গত কাঠামোকে উন্নত করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এইসব অধিকার লোপ পেয়েছে আর পরিবার যতই বিভিন্ন রূপের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে ততই প্রগতির উন্নত ধাপে উঠেছে মানুষ।

অন্যান্য মহাদেশের জাতিসমূহ যখন গোত্রপ্রথাকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে, তার বিভিন্ন

BanglaBook.org

স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে এবং সভ্যতা অর্জনের পর তাকে ত্যাগ করেছে, তখন অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিরা শ্রেণী-সমাজের স্তরেই হাজার হাজার বছর ধরে রয়ে গেছে এবং তাদের যদি আবিষ্কার করা না যেত তাহলে হয়তো তারা আজও সেখানেই থেকে যেত। লিঙ্গভিত্তিক ও আত্মীয়তাভিত্তিক সমাজের মতো সমাজ-সংগঠনের ক্রমানুবর্তী রূপগুলি জাতিতত্ত্বের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের প্রাচীন ইতিহাসকে যদি পুনরুদ্ধার করতে হয়, তাহলে এগুলো সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের প্রয়োজন অপরিসীম। পলিনেশিয় জাতিদের মধ্যে গোত্র ব্যাপারটা অজানা ছিল, কিন্তু হাওয়াই দ্বীপের পুনালুয়া প্রথার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ানদের শ্রেণী-সমাজের মতো একটা ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ছাড়াই স্বাধীনভাবে সৃষ্ট ধারণার সংখ্যা সাধারণত খুবই কম। মানুষের ভাবনাচিন্তার সম্পূর্ণ মৌলিকতা কতটুকু তা যদি দেখা যায়, তাহলে বিস্মিত হতে হবে তার স্বল্পতা দেখে। মানব-প্রগতির নিয়মই হল ক্রমবিকাশ।

এই তথ্যের আলোকে দেখলে আধুনিক সভ্যতার কিছু বিচিত্র ব্যাপার, যেমন, মরমোনিজ্‌মকে (Mormonism), মানবমস্তিষ্কে এখনও রয়ে যাওয়া বন্য যুগের অবশেষ বলে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রাচীন যুগে বর্বর ও বন্য মানষদের খুলির মধ্যে যে মস্তিষ্ক কাজ করত, প্রজননের ফলে আমরা সেই মস্তিষ্কই লাভ করেছি। এইসব অন্তর্বর্তী যুগের চিন্তা, আশা ও আবেগের দ্বারা ভারাক্রান্ত অবস্থায় তা আমাদের কাছে এসেছে। সেই একই মস্তিষ্ক বহু যুগের অভিজ্ঞতার ফলে প্রাচীন ও বৃহৎ হয়েছে মাত্র। এইসব বন্য আচরণের প্রকাশ তার প্রাচীন প্রবৃত্তিসমূহের পুনরাবৃত্তি মাত্র। এদের এক ধরনের মানসিক পুনরাবর্তন বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

প্রাচীনযুগের চিন্তার কয়েকটি বীজ থেকে মানুষের সমস্ত প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। বন্যতার যুগে শুরু হয়ে, বর্বরতার যুগে পরিণতিপ্রাপ্ত হতে হতে, সভ্যতার যুগেও তাদের বিকাশ এগিয়ে চলেছে। চিন্তার এই বীজগুলির বিবর্তন এক স্বাভাবিক যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে যা মস্তিষ্কের এক বিশেষ গুণ। এই নীতি অভিজ্ঞতার সমস্ত ক্ষেত্রে, সমস্ত সময়ে এমন অভ্রান্তভাবে কাজ করেছে যে তার ফল হয়েছে সমতাসম্পন্ন, যুক্তিপূর্ণ এবং অনুসন্ধানের পক্ষে অনুকূল। এইসমস্ত ফল থেকেই ভবিষ্যতে মানুষের উৎপত্তির ঐক্য সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। অনুমান করা যেতে পারে যে প্রতিষ্ঠানসমূহ, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত মানুষের মানসিক ইতিহাস আসলে একটি জাতির ইতিহাস যা ব্যক্তির মধ্য দিয়ে চিরায়ত হয়েছে ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। এই আদি চিন্তার বীজগুলির মধ্যে মানবমনের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে তার শাসনতন্ত্র, পরিবার, ভাষা, ধর্ম ও সম্পত্তি সংক্রান্ত চিন্তা। বহুকাল আগে বন্যতার যুগে এক নির্দিষ্ট সময় থেকে তাদের উৎপত্তি ও যুক্তিপূর্ণ প্রগতির শুরু, কিন্তু আজও তাদের চূড়ান্ত কোন রূপ স্থির হয়নি, কারণ তাদের প্রগতি এখনো চলছে এবং চিরদিনই চলতে থাকবে।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইরোকোয়াদের গোত্রবিভাগ

বৈজ্ঞানিক অর্থে 'পরিকল্পনা' শব্দটিকে ব্যবহার করলে বলা যায় মানবজাতির অভিজ্ঞতায় দুই ধরনের শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা বিকশিত হয়েছে। দুটিই ছিল সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রথাবদ্ধ রূপে। প্রথম এবং সর্বপ্রাচীন ধরন ছিল গোত্র, ভ্রাতৃত্ব এবং গোষ্ঠীর ভিত্তিতে একটি সামাজিক সংগঠন। দ্বিতীয় এবং কালের বিচারে আধুনিক সংগঠনটি ছিল একটি রাজনৈতিক সংগঠন যা এলাকা ও সম্পত্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটিতে সৃষ্টি হয়েছিল একটি গোত্রভিত্তিক সমাজ যেখানে গোত্র ও গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনুযায়ী ব্যক্তিদের শাসন করত সরকার। এই সম্পর্কগুলি ছিল শুধুমাত্র ব্যক্তিগত। দ্বিতীয়টিতে এক রাজনৈতিক সমাজ তৈরি করা হয়েছিল যেখানে সরকার এলাকার সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের ভিত্তিতে শাসন করত তাদের। যেমন শহর, তালুক বা ছোট রাজ্য। এই সম্পর্কগুলি ছিল শুধুমাত্র এলাকাভিত্তিক। দুটি পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। একটি প্রাচীন সমাজে, অন্যটি আধুনিক সমাজে প্রচলিত।

গোত্রভিত্তিক সংগঠন হল মানবজাতির প্রাচীনতম এবং বহুল প্রচলিত প্রতিষ্ঠান। একে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন সমাজসমূহের সর্বজনীন রূপ বলা চলে। এটাই ছিল সমাজকে সংগঠিত করার ও ধরে রাখার মাধ্যম। বন্য যুগ থেকে শুরু হয়ে ধারাবাহিকভাবে বর্বর যুগের তিনটি স্তর পার হয়ে গিয়েও এটা প্রচলিত ছিল যতক্ষণ না সভ্যযুগের সূচনায় রাজনৈতিক সমাজের পত্তন হল। গ্রীকদের গোত্র, ভ্রাতৃত্ব এবং গোষ্ঠীসমূহ, রোমান গোত্র, কিউরিয়া ও গোষ্ঠীগুলির তুলনা পাওয়া যায় আমেরিকার আদিবাসীদের গোত্র, ভ্রাতৃত্ব এবং গোষ্ঠীর মধ্যে। একইভাবে আইরিশ সেপ্ট, স্কটিশ ক্ল্যান, আলবানিয়ানদের ফ্রারা এবং সংস্কৃত গণসমূহও আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের গোত্রের সঙ্গে তুলনীয়, যাকে সাধারণভাবে ক্ল্যান বলা হয়। আমরা যতদূর জানি প্রাচীন বিশ্বের সর্বত্র, সব মহাদেশেই এই ধরনের সংগঠন চালু ছিল, এবং যে-সব গোষ্ঠী সভ্যতা অর্জন করেছিল তারা ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত একে বহন করে এনেছিল। শুধু তা-ই নয়, গোত্রভিত্তিক সমাজের সাংগঠনিক কাঠামো এবং নীতিও সর্বত্রই এক, কেবল জাতির প্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তা নিম্ন রূপ থেকে উচ্চতর রূপে উন্নীত হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলি থেকেই এক আদি চিন্তার বিকাশের ইতিহাস পাওয়া যায়।

লাতিন, গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় জেনস, জেনোস ও গণস শব্দের প্রাথমিক অর্থ হল জ্ঞাতি। এর মধ্যে এইসব ভাষার গিগ্‌নো, গিগ্‌নোমাই ও গণমাই (অর্থাৎ জন্ম

BanglaBook.org

দেওয়া) শব্দের উপাদান রয়েছে। এই শব্দগুলির প্রতিটিই তাই একটি গোত্রের সদস্যদের এক সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তিকেই বোঝায়। অতএব একটি গোত্র এক সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে নেমে আসা জ্ঞাতিগোষ্ঠী, যাদের একটি গোত্র-নাম রয়েছে এবং যাদের মধ্যে রয়েছে রক্তসম্পর্ক। এই উত্তরপুরুষদের একটা অংশমাত্র এই গোত্রের অন্তর্গত। বংশপরম্পরা যেখানে মাতৃকুল অনুযায়ী, যেটা প্রাচীনযুগে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল, সেখানে একজন নারী ও তার নারী-উত্তরাধিকারীদের স্ত্রী-সন্তানদের দ্বারা গোত্র গঠিত হত। বংশপরম্পরা যেখানে পিতৃকুল অনুযায়ী, গোষ্ঠীগত সম্পত্তির আবির্ভাবের পরে সর্বত্রই এই পরিবর্তন ঘটে যায়, সেখানে একজন পুরুষ-পূর্বপুরুষ ও তার সন্তানরা এবং তার পুরুষ-সন্তানদের নিয়ে পরম্পরাগতভাবে গোত্র গঠিত হত। আমাদের পারিবারিক নাম পিতৃকুল অনুযায়ী প্রাপ্ত পরম্পরা ধরে প্রচলিত গোত্র-নামের উদাহরণ। আধুনিক পরিবার, যা নামের সাহায্যে পরিচিত, তা একটি অসংগঠিত গোত্র, যার জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যার সদস্যরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু সেখানেও পারিবারিক নাম দেখতে পাওয়া যায়।

যে-সমস্ত জাতির কথা বলা হল, তাদের মধ্যে গোত্রকে একটা বিশেষ ধরনের সামাজিক সংগঠন হিসেবে দেখা গেছে, যা এত প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে যে তার উৎপত্তির ইতিহাস হারিয়ে গেছে দূর অতীতের ধূসরতায়। এটা প্রাচীন সমাজের সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাংগঠনিক একক (unit) এবং মূল ভিত্তি। লাতিন, গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এটা একটা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠলেও শুধু তাদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল না। আর্য জাতিসমূহের অন্যান্য শাখায়, সেমিটিক, উরালিয় এবং তুরানিয় জাতিগুলির মধ্যে, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার উপজাতি-গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এবং আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যেও এর প্রচলন দেখা গেছে।

প্রথমত আমাদের গোত্রের প্রাথমিক উপাদানগুলি কী কী এবং এই প্রথার উপযোগিতা, অধিকার ও সুবিধাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। তারপর যত বিস্তৃতভাবে সম্ভব মানবজাতির বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রথার তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে এর মূল ঐক্যকে প্রমাণ করার চেষ্টা করব। তখন দেখা যাবে যে গোত্র হল মানবজাতির আদিমতম প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম।

মানুষের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গোত্রসমূহ তার প্রাথমিক রূপ থেকে চূড়ান্ত রূপের দিকে বিকাশের ধারাবাহিক স্তরসমূহের মধ্য দিয়ে ক্রমশ বিবর্তিত হয়েছে। প্রধানত দু'ভাবে এই পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমত, বংশপরম্পরার ক্ষেত্রে, আগে যা মাতৃকুল অনুযায়ী ছিল, তার পরিবর্তন, যেমন গ্রীক ও রোমান গোত্রসমূহের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক অবস্থায় গোত্রের মৃত সদস্যের সম্পত্তি গোত্রের অধিকারে আসত, সেটা পরিবর্তিত হয়ে প্রথমে তার জ্ঞাতিদের ও শেষে তার সন্তানদের অধিকারে আসার নিয়ম চালু হয়। এই পরিবর্তনগুলি খুব সামান্য বলে মনে হলেও এগুলি আসলে অবস্থার বিরাট রূপান্তরের সূচনা করে এবং প্রগতির লক্ষ্যে প্রবল অগ্রগতির ইঙ্গিত বহন করে।

গোত্রীয় সংগঠন, যার সূচনা বন্য যুগে, তা বর্বর যুগের তিনটি উপ-ভাগের মধ্যে দিয়ে

BanglaBook.org

এগিয়ে গিয়ে অবশেষে উন্নত জাতিসমূহের সভ্যতা অর্জনের সূচনায় ভেঙে পড়ে, কারণ সভ্যতার দাবি মেটানোর ক্ষমতা তার ছিল না। গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সমাজ গোত্রভিত্তিক সমাজকে হটিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তা-ও সভ্য যুগের সূচনার আগে নয়। স্থায়ী সম্পত্তি ও বসবাসকারী নাগরিকদের নিয়ে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত নগর ও পৌর এলাকাগুলি এক নতুন একক এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক শাসনতন্ত্রের বীজ হিসেবে দেখা দিল। রাজনৈতিক সমাজ সংগঠিত হওয়ার পর এই প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ গোত্রভিত্তিক সমাজ এবং তার থেকে বিকশিত ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ক্রমশ তার স্থান ছেড়ে দিতে থাকে। এই বইতে আমি বন্য যুগে এর উৎপত্তি থেকে সভ্যতার সূচনায় এর অবসান পর্যন্ত সম্পূর্ণ ইতিহাসকে অনুসরণ করতে চাই। কারণ গোত্রভিত্তিক সমাজ-সংগঠনের মধ্য থেকেই মানবজাতির কয়েকটি শাখা বন্য থেকে বর্বর অবস্থায় উন্নীত হয়েছিল এবং তাদেরই বংশধরেরা বর্বরতা থেকে সভ্যতা অর্জন করেছিল। গোত্রভিত্তিক সমাজপ্রতিষ্ঠান মানবজাতির একটা অংশকে বর্বরতা থেকে সভ্যতা পর্যন্ত বহন করে নিয়ে গিয়েছিল।

বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে এই সংগঠনের বর্তমান ও প্রাচীন রূপ সম্বন্ধে গবেষণা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে গোত্রের প্রাচীন রূপ থেকে শুরু করে এগিয়ে-থাকা বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে তা কিভাবে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে এবং এইসব পরিবর্তনের কারণ কী তার অনুসন্ধান করাই শ্রেয়। তাই আমি বর্তমানে আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে গোত্রপ্রথা তার প্রাচীন রূপে যেভাবে টিকে রয়েছে, তার আলোচনা শুরু করব। গ্রীক ও রোমানদের ঐতিহাসিক গোত্রসমাজের থেকে এদের মধ্যে এই প্রথার রীতিনীতি ও তার বাস্তব প্রয়োগ অনুসন্ধান করা অনেক সহজ হবে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেকার গোত্রপ্রথা, তার উপযোগিতা, অধিকার, সুবিধা, দায়িত্ব ইত্যাদি জানতে পারলে গ্রীক ও রোমান গোত্রসমাজকে বোঝাও সহজ হবে। আমেরিকান জাতিতত্ত্বের আলোচনায় গোত্রপ্রথার সার্বজনীনতা সম্বন্ধে ধারণা না থাকার দরুণ গোষ্ঠী (tribe) ও বংশ (clan)-কে গোত্রের সমার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আগের সমস্ত লেখায় পূর্বসূরীদের অনুসরণে আমিও এইভাবেই এদের ব্যবহার করেছি।[১] ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর সঙ্গে গ্রীক ও রোমান গোত্রসমূহের তুলনা করলেই গঠন ও কাজের দিক থেকে তাদের মিল ধরা পড়ে। ভ্রাতৃত্ব (phratry) ও গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও এই সাদৃশ্য দেখা যায় এবং বিভিন্ন নামের এই সংগঠনগুলির মধ্যে সংশয়াতীত সাদৃশ্য বুঝতে হলে লাতিন ও গ্রীক পরিভাষার ব্যবহারে ফিরে যাওয়াই ভাল, কারণ সেগুলি যথাযথ এবং ইতিহাসভিত্তিক। আমি এখানে প্রয়োজনমত

১। "লেটার্স অন দ্য ইরোকোয়া স্কেন্যানডোয়া"—'আমেরিকান রিভিউ' পত্রিকায় ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত ; 'লীগ অফ দ্য ইরোকোয়া'—১৮৫১ সালে প্রকাশিত এবং "সিস্টেম অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি অ্যান্ড অ্যাফিনিটি অফ দ্য হিউম্যান ফ্যামিলি" —১৮৭১ সালে প্রকাশিত ("স্মিথসোনিয়ান কনট্রিবিউশন টু নলেজ", খণ্ড ১৭)। 'গোত্র'-র জায়গায় আমি সমার্থক শব্দ হিসাবে "গোষ্ঠী" শব্দটি ব্যবহার করেছিলাম, তবে গোত্রর একটা যথাযথ সংজ্ঞাও দিয়েছিলাম সেইসঙ্গে।

BanglaBook.org

বিকল্প নামের ব্যবহার করেছি এবং দেখাতে চাইছি যে এইসব সংগঠন পরস্পরের সমান্তরাল বা একই ধরনের।

আমেরিকান আদিবাসীদের শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত পরিকল্পনার শুরু হয় গোত্র- সংগঠন থেকে এবং তার চূড়ান্ত পরিণতি মিত্রসংঘ। এই মিত্রসংঘই হচ্ছে তার শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ রূপ। গোত্র থেকে মিত্রসংঘে পৌঁছনোর ক্রমটি এইরকম: প্রথমত, গোত্র অর্থাৎ একই গোত্রনামের অন্তর্গত জ্ঞাতিদের সংঘ; দ্বিতীয়ত, ভ্রাতৃত্ব (phratry) বা কয়েকটি সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য সংগঠিত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত গোত্রসমূহের সংগঠন; তৃতীয়ত, গোষ্ঠী (tribe) বা ভ্রাতৃত্বে সংগঠিত কতকগুলি গোত্রের সমন্বয় যার সমস্ত সদস্যরা একই উপভাষায় কথা বলে; এবং চতুর্থত, কয়েকটি গোষ্ঠীর এক মিত্রসংঘ যারা একই উৎস থেকে উদ্ভূত কিন্তু বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলে। এরই পরিণতি হল গোত্রভিত্তিক সমাজ (soceitas), যা রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্র (civitas) থেকে একেবারেই আলাদা। এই দুইয়ের মধ্যে কার পার্থক্য মৌলিক ও বিশাল। আমেরিকা আবিষ্কারের সময়ে সেখানে কোন রাজনৈতিক সমাজ বা নাগরিক বা রাষ্ট্র বা সভ্যতা—কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের সবচেয়ে উন্নত গোষ্ঠীগুলির অবস্থা এবং সভ্যতার মধ্যে ব্যবধান ছিল পুরো একটি জাতিতাত্ত্বিক (Ethnical) যুগের।

একইভাবে গ্রীসের গোষ্ঠীসমূহের শাসনতন্ত্র ও সভ্যতা পূর্ববর্তীকালে এই একই রকমের ক্রমানুবর্তী সংগঠনে বিভক্ত ছিল, কেবল শেষেরটি ছাড়া। তাদের গঠন ছিল এইরকম: প্রথমত, এক সাধারণ গোত্রসম্পন্ন জ্ঞাতিদের সংগঠন গোত্র; দ্বিতীয়ত, সামাজিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে মিলিত কয়েকটি গোত্রের সংগঠন ভ্রাতৃত্ব; তৃতীয়ত, একই বংশধারাবাহী ভ্রাতৃত্বে সংগঠিত বিভিন্ন গোত্রের সমন্বয়ে গোষ্ঠী; এবং চতুর্থত, এক গোত্রীয় সমাজে একটি সাধারণ অঞ্চলে সম্মিলিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমাহার জাতি (nation)। যেমন অ্যাটিকায় এথেনিয়দের চারটি গোষ্ঠী এবং স্পার্টার তিনটি ডোরিয়ান গোষ্ঠী। মিত্রসংঘে মিলিত হওয়ার থেকে একসঙ্গে মিশে জাতি গঠন করাটা উন্নততর ব্যাপার। মিত্রসংঘের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজস্ব স্বাধীন অঞ্চলেই বাস করত।

রোমানদের ক্ষেত্রেও ক্রমটা প্রায় একইরকম: প্রথমত, এক গোত্র-নাম সম্পন্ন জ্ঞাতিদের সংগঠন; দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় কারণে ও শাসনের জন্য মিশ্রিত উন্নততর সংগঠন, বিভিন্ন গোত্রের সমষ্টি কিউরিয়া (curiae); তৃতীয়ত, কিউরিয়াতে সংগঠিত বিভিন্ন গোত্রের সমাহার গোষ্ঠী; এবং চতুর্থত, জাতি অর্থাৎ গোত্রভিত্তিক সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠী মিশে গিয়ে যার সৃষ্টি। প্রাচীন রোমানরা সঠিকভাবেই নিজেদের পপুলাস রোমানাস বা রোমান জাতি বলত।

গোত্রভিত্তিক সমাজ-সংগঠন যেখানেই ছিল, সেখানেই রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আগে আমরা গোত্রভিত্তিক-সমাজ দ্বারা গঠিত জাতির অস্তিত্ব দেখতে পাই। এছাড়া অন্য কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না তখন। ছিল না রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। তাদের শাসনপ্রণালী

BanglaBook.org

ছিল মূলত গণতান্ত্রিক, যেহেতু গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠী ছিল গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত। এই শেষ প্রস্তাবটি যদিও সাধারণভাবে গৃহীত মতের বিপরীত, তবুও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকান আদিবাসীদের এবং গ্রীক ও রোমানদের গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর আলোচনার সাহায্যে এ-কথার সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। যেহেতু এই সমাজসংগঠনের বীজ-স্বরূপ গোত্র ছিল মূলত গণতান্ত্রিক, তাই বিভিন্ন গোত্রের সংগঠন ভ্রাতৃত্ব বা বিভিন্ন ভ্রাতৃত্ব দ্বারা গঠিত গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয় বা মিশ্রণের দ্বারা গঠিত গোত্রভিত্তিক সমাজও ছিল গণতান্ত্রিক।

গোত্র যদিও জাতিপ্রথার ওপরে প্রতিষ্ঠিত এক অত্যন্ত প্রাচীন সামাজিক সংগঠন, তবুও এক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত সমস্ত বংশধরেরা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তার কারণ যখন গোত্র-প্রথা চালু হয়, তখন শুধুমাত্র দুজনের মধ্যে বিবাহ অজানা ছিল এবং তাই পিতৃকুল অনুযায়ী বংশপরম্পরা সঠিকভাবে নির্ধারিণ করা বেশ শক্ত ছিল। সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বোঝা যেত তাদের মায়ের সূত্র ধরে। প্রাচীন গোত্রগুলিতে বংশপরম্পরা নির্ধারিত হত মাতৃকুল অনুযায়ী। এক গোত্রনামের অধিকারী যারা তাদের সকলকেই এক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হত এবং মনে করা হত যে এক আদি-নারী থেকে মাতৃকুলে তাদের উৎপত্তি। এই আদি-নারী ও তার সন্তানেরা এবং তার নারী-সন্তানদের সন্তানেরা এবং এইভাবে মাতৃকুল ধরে বংশপরম্পরায় উত্তরসূরীরা এক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত। কিন্তু ঐ আদিনারীর পুরুষ-সন্তানেরা এবং পুরুষ-বংশধরদের সন্তানেরা অন্য গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত। অর্থাৎ তারা তাদের নিজ নিজ মায়ের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত। প্রাচীন রূপে গোত্রের অবস্থা ছিল এইরকম, যখন সন্তানদের পিতৃপরিচয় জানা সহজ ছিল না এবং মায়ের পরিচয়ই ছিল বংশ বা কুল জানার একমাত্র উপায়।

এইরকম বংশকুলজী, যা বন্যযুগের মধ্য অবস্থা থেকে পাওয়া যায় (যেমন অস্ট্রেলিয়ান-দের মধ্যে), কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই বন্য-যুগের উচ্চ অবস্থা থেকে বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থা পর্যন্ত চালু ছিল। বর্বর যুগের মধ্য অবস্থায় ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলিতে বংশধারা মাতৃকুল থেকে পিতৃকুলে পরিবর্তিত হল, যখন জোড়বাঁধা পরিবার অর্থাৎ এক পুরুষের সঙ্গে এক নারীর বিবাহের চরিত্র নিতে শুরু করল। বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থায় গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে লিসিয়ানরা ছাড়া এবং ইতালিয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এট্রুসকানরা ছাড়া সকলেরই বংশধারা পিতৃকুলে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। একবিবাহভিত্তিক পরিবার, যা সন্তানদের পিতৃ পরিচয় নিশ্চিত করেছিল, তার ওপর এবং মাতৃকুল থেকে পিতৃকুলে বংশধারার এই পরিবর্তনের ওপর সম্পত্তি ও তার উত্তরাধিকারের প্রভাব নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হবে। বংশধারার এই দুই ধরনের নিয়মের মধ্যে হাজার বছরব্যাপী তিনটি সম্পূর্ণ জাতিতাত্ত্বিক যুগের ব্যবধান রয়েছে।

পিতৃকুল অনুযায়ী বংশপরম্পরার নিয়ম অনুসারে এক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে তারাই যারা এক আদি-পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত পুরুষ-সন্তানদের পরম্পরা ধরে জন্মেছে, এবং যা তাদের একই গোত্রনাম থেকে প্রমাণিত হয়। এই আদিপুরুষ আর তার

সন্তানেরা, তার পুত্র-সন্তানদের সন্তানেরা এবং তার পুরুষ-বংশধরদের সন্তানেরা পিতৃকুল ধরে বংশপরম্পরায় এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু এই পূর্বপুরুষের মেয়েদের সন্তানেরা ও তার বংশের মেয়ে-উত্তরসূরীদের সন্তানেরা মাতৃকুল ধরে বংশ-পরম্পরায় অন্য গোত্রের অন্তর্গত। অর্থাৎ তারা তাদের নিজ নিজ পিতার গোত্রভুক্ত। একটি গোত্রে যাদের ধরে রাখা হয়েছে, অন্য গোত্রে তারা স্বভাবতই বাদ গেছে। এক-বিবাহের মধ্যে দিয়ে সন্তানদের পিতৃত্ব যখন নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব হল, তখনই প্রকাশ পেল গোত্রপ্রথার চূড়ান্ত রূপ। গোত্রের এই এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তনটি হল খুব সহজভাবে, পুরনো প্রথাকে উৎখাত না করেই। এই পরিবর্তনের পিছনে, পরে আমরা দেখব, একটা জোরালো প্রয়োজন নিহিত ছিল। বংশধারা পিতৃকুলে পরিবর্তিত হলেও গোত্রই রইল সমাজের মূল এককরূপে। প্রথম রূপটির মধ্যে দিয়ে না গেলে দ্বিতীয় রূপটি অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হত না।

গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ থাকার ফলে রক্তসম্পর্কিত বিবাহের কুফল থেকে নিস্তার পাওয়া গেল এবং তা গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেছিল। তিনটি ধারণার ওপর গড়ে উঠেছিল গোত্র প্রথা ঃ জ্ঞাতিদের ঐক্য, মাতৃকুল ধরে বংশপরম্পরা নির্ণয় এবং গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ করা। গোত্রের ধারণা যখন গড়ে উঠল তখন স্বাভাবিকভাবেই তা গড়ে উঠল জোড়া গোত্র নিয়ে, কারণ পুরুষ-সন্তানদের গোত্র থেকে বাদ দেওয়া হত এবং যেহেতু পুরুষ ও নারী উভয় বংশধরদেরই সংগঠিত করার প্রয়োজন ছিল। দুটি গোত্র গড়ে উঠলেই মূল উদ্দেশ্যটা সাধিত হওয়া সম্ভব ছিল। কারণ এক গোত্রের পুরুষ ও নারীরা অপর গোত্রের নারী ও পুরুষদের বিবাহ করতে পারত এবং সন্তানেরা তাদের মায়েদের গোত্র অনুযায়ী বিভক্ত হয়ে যেত। গোত্রের ঐক্যের সূত্র ছিল জ্ঞাতিত্বের বন্ধন এবং প্রতিটি সদস্যকে তা এক ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দিত যা অন্য কোন শক্তির পক্ষেই দেওয়া সম্ভব হত না।

গোত্রের সদস্যদের অধিকার, সুবিধা ও দায়দায়িত্ব নিয়ে আলোচনার পরে ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠী ও মিত্রসংঘের সঙ্গে গোত্র কীভাবে সম্পর্কিত তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, যাতে এর ব্যবহার, সুবিধা ও নীতিসমূহকে বোঝা যায়, পরবর্তী সমাজে গোত্রের প্রভাব এবং তা কোন্ কোন্ নীতির জন্ম দিয়েছিল তা বোঝা সম্ভবপর হয়। ম্যানোয়ানিয়ান শাখার মধ্যে ইরোকোয়াদের গোত্রবিভাগকেই এই প্রথার আদর্শ উদাহরণ বলা যেতে পারে। তাদের শাসনতন্ত্রে গোত্র থেকে মিত্রসংঘ পর্যন্ত প্রতিটি অংশকে তারা পূর্ণভাবে বিকশিত করেছিল এবং এর ফলে গোত্রীয় সমাজের প্রাচীন রূপের পূর্ণ সম্ভাবনার তা এক আদর্শ উদাহরণ। যখন তাদের আবিষ্কার করা হয় তখন ইরোকোয়ারা বর্বরতার নিম্ন অবস্থায় ছিল এবং সেই অবস্থায় জীবনযাপনের কলাকৌশলগুলি যতদূর সম্ভব আয়ত্ত করেছিল। গাছের ছাল থেকে তারা জাল, শক্ত সুতো ও দড়ি বানাত। এই জিনিস থেকেই টানা-পোড়েনের সাহায্যে তারা তৈরি করত কটিবন্ধ ও বোঝা বাঁধবার দাঁড়। কাদামাটি ও বালি মিশিয়ে মৃৎপাত্র ও নল তৈরি করত তারা এবং আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করত সেগুলোকে। এগুলোর মধ্যে কোন কোনটায় বৃত্তাকার অলংকরণ

BanglaBook.org

থাকত। বাগানে ভুট্টা, বীন, স্কোয়াশ ও তামাকের চাষ করত এবং ভুট্টাকে গুঁড়ো করে তা মাটির পাত্রে সেদ্ধ করে মোটা মোটা রুটি তৈরি করত।[১] পশু-চামড়া ট্যান করে তৈরি করত ছোট পোশাক ও জুতো। প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত তীর-ধনুক ও মুষল, ব্যবহার করত চকমকি পাথর ও হাড়ের জিনিসপত্র। তারা চামড়ার পোশাক পরত এবং দক্ষ শিকারী ও জেলে ছিল। দীর্ঘ ও বৃহৎ বাড়ি তৈরি করত, যাতে সেখানে পাঁচ, দশ বা কুড়িটি পরিবার একসঙ্গে থাকতে পারে এবং প্রতিটি বাড়ির লোকেরা সাম্যবাদী প্রথায় থাকত। কিন্তু তারা গৃহনির্মাণে পাথর বা রোদে-পোড়া ইঁট ব্যবহার করত না এবং দেশীয় ধাতুর ব্যবহার জানত না। নিউ মেক্সিকোর উত্তরে তারাই ছিল মানসিক ক্ষমতা ও প্রগতির বিচারে ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে অগ্রগামী। জেনারেল এম. এ. ওয়াকার দুটি অনুচ্ছেদে তাদের যুদ্ধ-ক্ষমতার বর্ণনা দিয়েছেন: "ইরোকোয়াদের শক্তি ছিল ভয়ংকর। মহাদেশের অন্যান্য আদিবাসীদের কাছে তারা ছিল ঈশ্বরের ক্রুদ্ধ শক্তির মত।"[২]

কালের ব্যবধানের জন্য ইরোকোয়া গোষ্ঠীগুলোর গোত্রের সংখ্যা ও নামে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। সর্বাধিক গোত্রের সংখ্যা হল আট। এগুলি নিম্নরূপ:

সেনেকা—১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। কচ্ছপ, ৪। বীবর, ৫। হরিণ, ৬। কাদাখোঁচা, ৭। বক, ৮। বাজপাখি।

ক্যায়ুগা—১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। কচ্ছপ, ৪। বীবর, ৫। হরিণ, ৬। কাদাখোঁচা, ৭। বানমাছ, ৮। বাজপাখি।

ওনোনডাগা—১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। কচ্ছপ, ৪। বীবর, ৫। হরিণ, ৬। কাদাখোঁচা, ৭। বানমাছ, ৮। গুটি (Ball)।

ওনীডা—১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। কচ্ছপ।

মোহক—১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। কচ্ছপ।

টাসকারোরা—১। ধূসর নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। বড় কচ্ছপ, ৪। বীবর, ৫। হলদে নেকড়ে, ৬। কাদাখোঁচা, ৭। বানমাছ, ৮। ছোট কচ্ছপ।

এই পরিবর্তনগুলি থেকে বোঝা যায় যে কালের সঙ্গে সংগ্রামে কয়েকটি গোষ্ঠীর কিছু কিছু গোত্র লুপ্ত হয়ে গেছে এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যায় ভারাক্রান্ত গোত্রের বিভাজনের ফলে আরো কয়েকটি নতুন গোত্রের সৃষ্টি হয়েছে।

একটি গোত্রের সদস্যদের অধিকার, সুবিধা ও দায়দায়িত্বগুলি কী ছিল জানতে পারলে, সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির বীজ হিসেবে তার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা এবং তা কীভাবে ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠী ও মিত্রসংঘের উচ্চতর সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত তা আরো ভালোভাবে বোঝা সম্ভব হবে।

গোত্র তার সদস্যদের ওপর নিম্নলিখিত অধিকার, সুযোগসুবিধা ও দায়দায়িত্ব অর্পণ করত, যাকে গোত্রের শাসনতন্ত্র (jus gentilicium) বলা চলে।

১। এই রুটি বা পিঠেগুলির ব্যাস হত প্রায় ছয় ইঞ্চি করে এবং প্রস্থে ছিল প্রায় এক ইঞ্চি পুরু।

২। "নর্থ আমেরিকান রিভিউ", এপ্রিল সংখ্যা, ১৮৭৩, পৃঃ ৩৭০, টীকা।

১। সাকেম ও প্রধানদের নির্বাচিত করার অধিকার।
২। সাকেম ও প্রধানদের ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার।
৩। নিজ গোত্রের মধ্যে বিবাহ না করার নিষেধবিধি।
৪। মৃত সদস্যদের সম্পদ বণ্টনের প্রশ্নে সকলের সমানাধিকার।
৫। সাহায্য, প্রতিরক্ষা এবং আঘাতের পরিচর্যা করার ব্যাপারে পারস্পরিক দায়িত্ব।
৬। সদস্যদের নামপ্রদানের অধিকার।
৭। বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার।
৮। সাধারণ ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাস পালন।
৯। সাধারণ সমাধিক্ষেত্র।
১০। গোত্রসমূহের পরিষদ গঠন।

এইসমস্ত কাজকর্ম এবং দায়দায়িত্ব গোত্রকে যেমন করে তুলেছিল প্রাণবন্ত, তেমনই দিয়েছিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং সুরক্ষিত করেছিল তার সদস্যদের ব্যক্তিগত অধিকারকে।

১। সাকেম ও প্রধানদের নির্বাচিত করার অধিকার

প্রায় সমস্ত আমেরিকান ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীরই দুই ধরনের প্রধান ছিল—সাকেম এবং সাধারণ প্রধান। প্রতিটি গোত্রের সদস্যদের দ্বারা তারা নির্বাচিত হত। যেহেতু বংশ-পরম্পরা ছিল মাতৃকুল অনুযায়ী, তাই কোন প্রধানের ছেলে প্রধান হতে পারত না, কারণ সে অন্য গোত্রের সদস্য এবং কোন গোত্রই নিজ গোত্র থেকে ছাড়া প্রধান বা সাকেম নির্বাচিত করত না। সাকেম-এর পদটি ছিল বংশগত, এই অর্থে সাকেম পদটি শূন্য হলে সঙ্গে সঙ্গেই তা পূরণ করা হত। কিন্তু প্রধানদের পদ বংশগত ছিল না, কারণ তা ব্যক্তিগত গুণের পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হত এবং ব্যক্তির মৃত্যু বা পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গেই অবসান ঘটত তার। তাছাড়া সাকেমের দায়িত্ব ছিল শুধুমাত্র শান্তির সময়কার ব্যাপার-স্যাপার দেখা। সাকেম হিসেবে সে যুদ্ধে যেতে পারত না। অন্যদিকে, যে-সব প্রধানরা তাদের ব্যক্তিগত বীরত্ব, কর্মক্ষেত্রে বিচক্ষণতা বা পরিষদে বাগ্মিতার জন্য এই পদে উন্নীত হত, তারা গোত্রের ওপর কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে না হলেও কর্মকুশলতায় অধিকতর দক্ষ শ্রেণী ছিল। সাকেমের সম্পর্ক ছিল প্রধানত গোত্রের সঙ্গে, ঘোষিতভাবে সে যার প্রধান ছিল। কিন্তু প্রধানের সম্পর্ক ছিল প্রধানত গোষ্ঠীর সঙ্গে, সে ও সাকেম উভয়েই যে গোষ্ঠী-পরিষদের সদস্য ছিল।

সাকেম পদটির স্বাভাবিক ভিত্তি ছিল গোত্রের মধ্যে। রক্তসম্পর্কিত ব্যক্তিদের এই সংগঠনের একজন মুখ্য প্রতিনিধির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পদ হিসেবে এর অস্তিত্ব ছিল গোত্র-সংগঠনেরও আগে থেকে, কারণ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে এই সংগঠন ছিল না, তাদের মধ্যেও এই পদের অস্তিত্ব ছিল। পুনালুয়ান বা আরও প্রাচীন দল সংগঠনের মধ্যেও সাকেমের অস্তিত্ব দেখা যায়। গোত্রের মধ্যে সাকেম পদটি ছিল সুনির্দিষ্ট, তার সম্পর্কের ভিত্তি স্থায়ী এবং তার দায়িত্বসমূহ ছিল পিতৃস্থানীয়। এই পদটি গোত্রের

BanglaBook.org

মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তব্য হলেও পুরুষদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হত। ইণ্ডিয়ানদের জ্ঞাতিসম্পর্ক প্রথায় দেখা যাবে যে গোত্রের সমস্ত পুরুষ-সদস্যেরা হয় পরস্পরের সহোদর বা সমান্তরাল ভাই অথবা নিজের বা সমান্তরাল কাকা-ভাইপো, কিংবা সমান্তরাল ঠাকুর্দা ও নাতি।[১] এর থেকে বোঝা যাবে কেন সাকেমের পদটি উত্তরাধিকারসূত্রে ভাই থেকে ভাইয়ের হাতে, বা কাকা থেকে ভাইপোর হাতে এবং কদাচিৎ ঠাকুর্দা থেকে নাতির হাতে যেত। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীরা সাধারণত মৃত সাকেমের ভাইকে বা তার বোনের ছেলেদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচিত করত। এক্ষেত্রে তার নিজের ভাই বা নিজের বোনের ছেলেকেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করা হত। আপন বা সমান্তরাল ভাইদের মধ্যে এবং আপন বা সমান্তরাল বোনেদের ছেলেদের মধ্যে কোন অধিকারভেদ ছিল না, কারণ গোত্রের সমস্ত পুরুষ সদস্যরাই সমান অধিকারী ছিল। তাদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করাটা ছিল নেহাতই পছন্দের ব্যাপার।

সেনেকা-ইরোকোয়াদের মধ্যে কোন সাকেমের মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারী নির্বাচনের নিয়ম অনুযায়ী তাদের গোত্র-প্রতিনিধিদের পরিষদের (gentiles)[২] সভা ডাকা হত। তাদের প্রথা অনুযায়ী দুজনকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হত এবং তাদেরকে অবশ্যই গোত্রের সদস্য হতে হত। তার কাকে পছন্দ তা বলার জন্য প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীকেই আহ্বান জানানো হত এবং দুজনের মধ্যে যে সর্বাধিক ভোট পেত সেই নির্বাচিত হত। কিন্তু নির্বাচন সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য বাকি সাতটি গোত্র-পরিষদেরও অনুমোদন প্রয়োজন হত। এই উদ্দেশ্যে সমবেত এইসব গোত্রের সদস্যরা যদি ওই নির্বাচিত ব্যক্তিটিকে অনুমোদন না করত, তাহলে তাকে সদস্য পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কাউকে নির্বাচন করতে অগ্রসর হত গোত্রের সদস্যরা। যদি গোত্রের নির্বাচিত ব্যক্তি অন্য গোত্রগুলির দ্বারাও অনুমোদিত হয় তবেই নির্বাচন সম্পূর্ণ হত। কিন্তু তবু তার দায়িত্বভার গ্রহণের আগে এই নতুন সাকেমকে তাদের ভাষা-ভঙ্গী ও রীতিনীতি অবগত হতে হত বা মিত্রসঙ্ঘের পরিষদ তাকে দায়িত্বভার অর্পণ করত। শাসনভার দেওয়ার পদ্ধতি ছিল এটাই। এইভাবে বিভিন্ন গোত্রের সুখ-সুবিধা ও অধিকার আলোচিত এবং রক্ষিত হত। কারণ গোত্রের সাকেম পদাধিকার বলেই গোষ্ঠী-পরিষদের এবং মিত্রসঙ্ঘের উচ্চতর পরিষদের সদস্য। একই কারণে প্রধান পদের নির্বাচনের জন্য একই ধরনের অনুমোদন ও সমর্থনের নিয়ম অনুসৃত হত। কিন্তু সাকেমের থেকে নিম্নপদের প্রধানদের নির্বাচনের জন্য কখনই সাধারণ পরিষদের সভা ডাকা হত না। তার জন্য সাকেম-নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত।

BanglaBook.org

১। বিভিন্ন বোনের ছেলেরা পরস্পরের আপন ভাই, মাসতুতো ভাই নয়। মাসতুতো ভাইদের এখানে জ্ঞাতিভাই হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এইভাবে, কোন ব্যক্তির ভাই এর ছেলে মানে তারই ছেলে, ভাইপো নয়। তার জ্ঞাতি-বোনের ছেলেরা এবং তার নিজের বোনের ছেলেরা হচ্ছে তার ভাগ্নে। জ্ঞাতি-বোনের ছেলেদেরকে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে জ্ঞাতি-ভাগ্নে হিসেবে।

২। লাতিন ভাষা যাঁদের জানা নেই, তাঁদের সুবিধার্থে বলে দেওয়া যায় যে এর উচ্চারণটা হচ্ছে "gen-ti-les".

গোত্র-সদস্যদের তাদের সাকেম ও প্রধান নির্বাচনের অধিকার, এই পদ যাতে কেউ অন্যায়-ভাবে দখল করতে না পারে তার জন্য এত নিয়মকানুনের সৃষ্টি এবং এই নির্বাচনের ওপর অন্যান্য গোত্রের কিছুটা ক্ষমতা—এ-সবই গোত্রপ্রথা থেকে উদ্ভূত গণতন্ত্রের নীতির পরিচয় বহন করে।

গোত্রের সদস্যদের সংখ্যার অনুপাতে তার প্রধানদের সংখ্যা নির্ধারিত হত। সেনেকা-ইরোকোয়াদের মধ্যে প্রতি পঞ্চাশজনের জন্য একজন প্রধান। নিউইয়র্কে এখন তাদের সংখ্যা প্রায় তিনহাজার এবং তাদের রয়েছে আটজন সাকেম ও প্রায় ষাটজন প্রধান। সম্ভবত আগের থেকে এখন প্রধানদের সংখ্যা অনুপাতে বেশি। কোন গোষ্ঠীতে লোকের সংখ্যা যত বেশি হয়, গোত্রের সংখ্যাও তত বাড়ে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এই সংখ্যার তফাৎ রয়েছে। দেলাওয়ার ও মুন্সেদের মধ্যে তিন থেকে শুরু করে ওজিবোয়া এবং ক্রীকদের মধ্যে তা কুড়িরও বেশি। তবে সাধারণত আট বা দশটি করে গোত্র থাকে।

২। সাকেম ও প্রধানদের ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার

গোত্রের সদস্যদের এই অধিকারও ছিল, যা নির্বাচন করার অধিকারের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদিও নামে এই পদ সারাজীবনের জন্য ছিল, কিন্তু পদচ্যুত করার অধিকার থাকার ফলে বাস্তবে যতদিন ভালো আচরণ করত ততদিনই কেউ এই পদে থাকতে পারত। সাকেমের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার প্রতীক ছিল তার 'শিঙ পরে নেওয়া' বা 'শিঙ খুলে ফেলা'-র মধ্যে। বহু দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ পদ ও ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে শিঙ ব্যবহৃত হত। টাইলর বলছেন—সম্ভবত তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে শিঙওয়ালা পুরুষ-পশুদের বিশাল চেহারাই এর উৎস। সাকেম বা প্রধান কোন অযোগ্য আচরণ করলে বা লোকের বিশ্বাস হারালেই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যেত। একজন সাকেম বা প্রধান তার গোত্র-পরিষদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর একজন সাধারণ ব্যক্তিতে পরিণত হত। গোত্রের সাধারণ সভার জন্য অপেক্ষা না করে বা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গোত্র-পরিষদ সাকেম বা প্রধানদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারত। এই ক্ষমতার অস্তিত্ব কদাচিৎ প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে গোত্র-পরিষদ সাকেম ও প্রধানদের ওপরে তার ক্ষমতাকে প্রযুক্ত ও সুরক্ষিত করত। এর মধ্যে গোত্রের গণতান্ত্রিক নিয়মবিধিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। নিজ গোত্রের মধ্যে বিবাহ না করার নিষেধবিধি

নঙর্থক প্রস্তাব হলেও এটি ছিল একটি মূল নিয়ম। প্রত্যেক গোত্র সংগঠনেরই একটা প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল তথাকথিত এক পূর্বপুরুষের বংশধরদের অর্ধাংশকে অন্যদের থেকে পৃথক রাখা এবং জ্ঞাতিত্বের কারণে তাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা। যখন গোত্রের সৃষ্টি হল তখন ভাইয়েরা পরস্পরের স্ত্রীদের বিবাহ করত আর বোনেরা পরস্পরের স্বামীদের গ্রহণ করত এবং এতে গোত্রের নিয়মে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু ভাই ও বোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল যা সম্ভব হয়েছিল এই আলোচ্য নিয়মের

BanglaBook.org

ফলেই। গোত্রপ্রথা যদি সম্পূর্ণ বিবাহ ব্যবস্থাকেই নির্মূল করার চেষ্টা করত তাহলে তা সাধারণভাবে গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। গোত্র, যা সম্ভবত বন্যদের কোন ছোট একটি দলের বুদ্ধির দ্বারা প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল, তা অনতিবিলম্বেই উন্নতমানের মানুষ সৃষ্টি করে তার উপযোগিতা প্রমাণ করল। প্রাচীন জগতে এই প্রথার বিশ্বজনীন ব্যবহারই এর উপযোগিতাকে প্রমাণ করে। বন্যতা ও বর্বরতার যুগে মানুষের চাহিদাকেও সে পূরণ করতে পেরেছিল এবং নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল। ইরোকোয়ারা এখনও কঠোরভাবে নিজ গোত্রে বিয়ে না করার এই নিয়ম মেনে চলে।

৪। মৃত সদস্যদের সম্পদবণ্টনের প্রশ্নে সকলের সমানাধিকার

বন্য অবস্থায় এবং বর্বরতার নিম্ন অবস্থায় সম্পদের পরিমাণ ছিল সামান্য। প্রথম অবস্থায় সম্পত্তি বলতে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্রকেই বোঝাত, পরবর্তী অবস্থায় যৌথ গৃহ ও বাগান ইত্যাদিতে তার অধিকার স্বীকৃত হল। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার সবচেয়ে মূল্যবান ব্যক্তিগত সম্পত্তিসমূহও সমাধিস্থ হত। তবে সম্পত্তির প্রকার ও পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন ওঠাটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। ফলে আমরা দেখেছি যে বর্বর যুগে, এমনকি বন্য যুগেও, নিয়ম হয়েছিল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি গোত্রের হাতে থাকবে এবং গোত্রের সদস্যদের মধ্যে তা বণ্টিত হবে। বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থায় গ্রীক ও লাতিন গোত্রগুলোর মধ্যে এটা একটা প্রচলিত নিয়ম ছিল এবং সভ্য যুগে এসে এটা লিখিত আইনে পরিণত হল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারী হবে গোত্র। এথেনিয়দের মধ্যে সোলোন-এর শাসনের পরে তা কেবল মৃত ব্যক্তি উইল না করে গেলেই প্রযুক্ত হত। সম্পত্তির উত্তরাধিকার কে হবে এই প্রশ্ন থেকে উত্তরাধিকারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম পর পর সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত—মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি গোত্র-প্রতিনিধিদের মধ্যে বণ্টিত হওয়া উচিত। এটাই ছিল বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থায় এবং বন্য যুগের সময়কার নিয়ম। দ্বিতীয়ত—মৃত ব্যক্তির স্বগোত্রীয় জ্ঞাতিদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টিত হওয়া উচিত এবং অন্যান্য গোত্রের সদস্যদের বাদ দেওয়া উচিত। বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থায় এই নিয়মের সূচনা এবং মধ্য অবস্থায় তা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয়ত —মৃত ব্যক্তির সন্তানেরা সম্পত্তির অধিকারী হবে, অন্যান্য স্বগোত্রীয় জ্ঞাতিরা কিছুই পাবে না। বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থায় এই নিয়মটি চালু হয়।

তত্ত্বগতভাবে ইরোকোয়ারা ছিল প্রথম নিয়মের অধীন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মৃতের সম্পত্তি গোত্রের মধ্যে তার নিকটতম আত্মীয়রাই ভাগ করে নিত। পুরুষের ক্ষেত্রে তার ভাই-বোনেরা এবং মামারা মৃতের সম্পত্তি ভাগ করে নিত নিজেদের মধ্যে। গোত্র-সম্পর্কের জ্ঞাতির উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির এই বাস্তব সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আত্মীয়দের উত্তরাধিকারের বীজ রয়েছে। নারীর ক্ষেত্রে তার সম্পত্তি তার সন্তানেরা ও বোনেরা পেত, কিন্তু তার ভায়েরা কিছুই পেত না। তবে সব ক্ষেত্রেই সম্পত্তি গোত্রের হাতেই থেকে যেত। মৃত পুরুষের সন্তানেরা তাদের পিতার কাছ থেকে কিছুই পেত না, কারণ তারা অন্য গোত্রের সদস্য। এই একই কারণে স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে বা স্ত্রী স্বামীর

BanglaBook.org

কাছ থেকে কিছু পেত না। উত্তরাধিকারের এই পারস্পরিক অধিকার শক্তিশালী করেছিল গোত্রের স্বনির্ভরতাকে।

৫। সাহায্য, প্রতিরক্ষা এবং আঘাতের পরিচর্যা করার ব্যাপারে পারস্পরিক দায়িত্ব

সভ্য সমাজে ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সম্পত্তির সুরক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার ফলে জ্ঞাতিত্বের বন্ধন এখন অনেক শিথিল হয়ে এসেছে। কিন্তু গোত্রভিত্তিক সমাজে ব্যক্তি তার নিরাপত্তার জন্য গোত্রের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তীকালে সমাজে যে স্থান রাষ্ট্র পেয়েছে, তখন সমাজে গোত্রের ছিল সেই স্থান এবং তার অভিভাবকত্বকে কার্যকর করার জন্য তার সদস্যসংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। এর সদস্যদের মধ্যে জ্ঞাতিত্বের বন্ধন পারস্পরিক নির্ভরতার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। কোন ব্যক্তিকে আঘাত করার অর্থ ছিল গোটা গোত্রকেই আঘাত করা এবং কোন ব্যক্তিকে সমর্থন করার অর্থ ছিল সমস্ত জ্ঞাতিগোত্র নিয়ে তার পিছনে দাঁড়ান।

কঠিন সমস্যা ও অসুবিধার ক্ষেত্রে গোত্রের সদস্যরা পরস্পরকে সাহায্য করত। ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীদের মধ্যে থেকে দু' তিনটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। য়ুকাতানের মায়াদের সম্পর্কে হেরেরা মন্তব্য করেছেন, "কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির যদি গরীব হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিত, তাহলে আত্মীয়েরা তাকে সাহায্য করত।"[১] এখানে আত্মীয় শব্দের অর্থ আমরা সঠিকভাবেই গোত্র বলে ধরতে পারি। ফ্লোরিডা ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ "যখন তাদের ভাই বা ছেলে মারা যেত, তখন বাড়ির লোকেরা তিনমাস ধরে উপোস করত কিন্তু কারো কাছ থেকে কোন খাদ্য চাইত না। কিন্তু জ্ঞাতি ও আত্মীয়েরা তখন প্রয়োজনীয় সবকিছুই তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিত।"[২] কোন পরিবার যদি গ্রাম থেকে চলে যায়, তাহলে তারা তাদের কৃষিজমি বা যৌথ-বাড়িতে তাদের অংশের অধিকার গোত্রভুক্ত জ্ঞাতিদের ছাড়া বাইরের কাউকে দিয়ে যেতে পারত না। নিকারাগুয়ার ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীদের এই রীতির কথা বলেছেন হেরেরা ঃ "কেউ যদি এক শহর থেকে অন্য শহরে চলে যেত, তাহলে সে তার সম্পত্তি বিক্রি করে যেতে পারত না, তবে নিকটতম আত্মীয়কে দিয়ে যেতে পারত।"[৩] তাদের সম্পত্তির এতটাই যৌথ মালিকানায় থাকত যে তাদের জীবনধারায় এর কোন অংশ অন্য কোন গোত্রের লোকের হাতে যাওয়া অসম্ভব ছিল। কোন ব্যক্তির সম্পত্তির মালিকানা ততক্ষণই থাকত যতক্ষণ তা তার অধিকারে থাকত, ছেড়ে দিলেই তা গোত্রের হাতে ফিরে যেত। পেরুভিয়ান আন্দিজের গোষ্ঠীগুলোর সম্পর্কে গার্সিলাসো দ্য লা ভেগা বলেছেন, "যখন সাধারণ কেউ বিয়ে করত তখন জনসম্প্রদায়ের

১। হিস্ট্রি অফ আমেরিকা, লণ্ডন সংস্করণ, ১৭২৫. স্টিভেনকৃত অনুবাদ, ৪, ১৭১।
২। ঐ, ৪, ৩৪।
৩। ঐ, ৩, ২৯৮।

লোকেরা তাদের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দিতে বাধ্য ছিল।"[১] জনসম্প্রদায় বলতে এখানে আমরা সঠিকভাবেই গোত্রকে বুঝতে পারি। ঐ একই গোষ্ঠীগুলোর সম্পর্কে বলতে গিয়ে হেরেরা মন্তব্য করেছেন, "উপজাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ে জাতি বিভক্ত হওয়ার ফলেই ভাষার এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।"[২] এখানে গোত্রের অন্য সদস্যরা সদ্য-বিবাহিত দম্পতিদের জন্য গৃহনির্মাণে সাহায্য করত।

মানবজাতির বিভিন্ন শাখায় রক্তের বদলে রক্ত, এই প্রকার প্রতিশোধ নেওয়ার যে প্রাচীন রীতি দেখা যায়, গোত্রেই তার প্রথম সূত্রপাত। যে-কোন সদস্যের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করত গোত্র। অপরাধীদের বিচারের জন্য বিচারসভা এবং তাদের শাস্তির জন্য আইন গোত্রভিত্তিক সমাজে অনেক পরে চালু হয়। রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টির বহু আগেই অবশ্য এর সূত্রপাত হয়। আবার হত্যার অপরাধ মানবসমাজে মানবেতিহাসের মতই পুরনো এবং জ্ঞাতিদের দ্বারা প্রতিশোধগ্রহণের মাধ্যমে তার শাস্তি এই অপরাধেরই সমান বয়স্ক। ইরোকোয়া এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে স্বগোত্রীয় ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ নেওয়াটা সাধারণত সর্বস্বীকৃত ছিল।[৩]

অবশ্য হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি, উভয়ের গোত্রেরই দায়িত্ব ছিল চরম পথ নেওয়ার আগে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করা। দুটি গোত্রের সদস্যদের আলাদা আলাদা করে সভা হত এবং হত্যাকারীর পক্ষ থেকে অনুশোচনা প্রকাশ করে এবং যথেষ্ট মূল্যবান উপহার দিয়ে তার অপরাধ কিছুটা লাঘব করার চেষ্টা হত। পরিস্থিতি অনুকূল হলে সাধারণত একটা আপোস-মীমাংসা হয়ে যেত, কিন্তু নিহত ব্যক্তির শোকার্ত আত্মীয়েরা যদি অনড় মনোভাব দেখাত তাহলে গোত্র তার সদস্যদের মধ্য থেকে কয়েকজনের ওপর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করার দায়িত্ব অর্পণ করত। তারা এই কাজ করতে পারলে মৃতের গোত্রের কেউ অভিযোগ করতে পারত না, কারণ জীবনের বদলে জীবন নিয়ে ন্যায়বিচারের দাবি মেটান হয়েছে।

গোত্রের অন্য একজনের দুঃখ দূর করা এবং আঘাত ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে তাকে রক্ষা করার মধ্যে এই একই ধরনের ভ্রাতৃসুলভ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

৬। সদস্যদের নাম প্রদানের অধিকার

বন্য ও বর্বর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কোন পারিবারিক নাম বা পদবী ছিল না। একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব নামগুলি কিন্তু তাদের মধ্যেকার কোন পারিবারিক সম্পর্ককে নির্দেশ করে না। সভ্য যুগ শুরু হওয়ার সময় থেকেই এই পারিবারিক নাম

১। রয়্যাল কমেন্টারিজ, লণ্ডন সংস্করণ, ১৬৮৮, রাইকট কর্তৃক অনূদিত, পৃঃ ১০৭।

২। হেরেরা, ৪, ২৩১।

৩। "রক্তের বদলে রক্ত না ঝরানো পর্যন্ত ওদের মনের মধ্যে দিবারাত্র অনির্বাণ আগুন জ্বলে দাউ দাউ করে। নিজেদের কোন আত্মীয়ের অথবা গোষ্ঠীর বা পরিবারের কারোর, এমনকি কোন বৃদ্ধার হত্যার স্মৃতিও বাবার কাছ থেকে ছেলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।" অ্যাডেয়ার, 'হিস্ট্রি অফ আমেরিকান ইণ্ডিয়ানস,' লণ্ডন সংস্করণ, ১৭৭৫, পৃঃ ১৫০।

বা পদবীর সৃষ্টি হয়েছে।[১] কোন ইণ্ডিয়ানের নিজস্ব নাম থেকে একই গোষ্ঠীভুক্ত অন্য গোত্রের লোকেরা বুঝতে পারত যে ঐ লোকটি কোন্ গোত্রের সদস্য। নিয়মানুসারে প্রতিটি গোত্রের সদস্যদের নিজস্ব নাম থাকে, আর এইসব নাম শুধু ঐ গোত্রেরই একান্ত সম্পত্তি এবং একই গোষ্ঠীর অন্যান্য গোত্রগুলি এইসব নাম ব্যবহার করতে না। গোত্রীয় নাম পাওয়া মানেই গোত্রীয় অধিকার অর্জন করা। হয় নামধারীর গোত্রের তাৎপর্য প্রকাশ করত এইসব নাম, না হলে তা জানা যেত সাধারণ পরিচিতির সাহায্যে।[২]

কোন সন্তান জন্মানোর পর তার মা তার জন্য একটা নাম বাছাই করত। এক্ষেত্রে এমন কোন নামই বাছাই করতে হত, যে নাম গোত্রের মধ্যে আর কারুর নেই। তারপর সেই মায়ের নিকটতম আত্মীয়রা নামটার ব্যাপারে একমত হলে শিশুটিকে ঐ নামই দেওয়া হত। কিন্তু গোষ্ঠীর পরবর্তী সভায় তার মায়ের নাম ও গোত্র এবং বাবার নাম সহ শিশুটির জন্মগ্রহণের কথা ও নাম ঘোষণা না করা পর্যন্ত তার নামকরণ সম্পূর্ণ হত না। কোন লোক মারা গেলে তার জীবিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবদ্দশায় ঐ মৃত লোকটির নাম আর কেউ ব্যবহার করতে পারত না—অবশ্য তার পুত্র সম্মতি দিলে ঐ নামটা ব্যবহার করা যেত।[৩]

নাম ছিল দু'ধরনের—একটা শৈশবের নাম, আর একটা বয়ঃপ্রাপ্তির পরের নাম। উপযুক্ত সময়ে ঐ একই পদ্ধতিতে একটা নামের বদলে আর একটা নাম দেওয়া হত। ওদের ভাষায়—একটা নাম কেড়ে নেওয়া হয়, তার জায়গায় দেওয়া হয় আরেকটা নাম। ও-উই-গো, 'নদীতে ভাসমান নৌকো' এবং আহ্-উয়ো-নে-অন্ত্, 'ঝুলন্ত ফুল'—সেনেকা-ইরোকোয়াদের মধ্যে মেয়েদের নাম হত এইরকম। আর-গা-নে-ও-দি-ইও, 'সুন্দর হ্রদ', এবং দো-নে-হো-গা-ওয়েহ্, 'দ্বাররক্ষী'—এইরকম ছিল তাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের নাম। ষোল বা আঠারো বছর বয়সের সময় প্রথম নামটা নিয়ে নেওয়া হত—সাধারণত গোত্রের কোন প্রধানই তা করতেন—আর তার জায়গায় দেওয়া হত দ্বিতীয়

১। মম্‌সেন-এর "হিস্ট্রি অফ রোম", স্ক্রিব্‌নার সংস্করণ, ডিক্সনের অনুবাদ, ১, ৪৯।

২। ওমাহাদের বারোটা গোত্রের মধ্যে একটা ছিল লা-তা-দা, অর্থাৎ বাজপাখি। এদের মধ্যে এই ধরনের নাম চালু ছিল :

॥ ছেলেদের নাম ॥

আহ্-হিসে-না-দা, "দীর্ঘ ডানা।"
গ্রা-দান্-নোহ্-চে, "শূন্যে উড্ডীয়মান বাজপাখি।"
নেস্-তাসে-কা, "শ্বেতচক্ষু পাখি।"

॥ মেয়েদের নাম ॥

মে-তা-না, "দিনের আলোয় কূজনরত পাখি।"
লা-তা-দা-উইন্, "একটি পাখি।"
ওয়া-তা-না, "পাখির ডিম।"

৩। অন্যভাবে বলা না থাকলে বুঝতে হবে যে প্রতিটি নির্দিষ্ট প্রথার ক্ষেত্রে ইরোকোয়াদের কথাই বলা হচ্ছে।

নামটা। গোত্র-পরিষদের পরবর্তী সভায় এই নাম পরিবর্তনের কথাটা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হত। ব্যক্তিটি পুরুষ হলে এই ঘোষণার পর সে পুরুষের কর্তব্য করার অধিকার পেত। কিছু কিছু ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ম ছিল যে তরুণদের যুদ্ধ করতে যেতে হবে আর সেখানে তার নিজস্ব বীরত্বের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে অর্জন করে নিতে হবে দ্বিতীয় নামটা। প্রচণ্ড অসুস্থতার পর কেউ কেউ নিজের দ্বিতীয় নামটা আবার পাল্টাতে চাইত, এবং তা করাও হত। কুসংস্কারই ছিল এইভাবে নাম পাল্টাতে চাওয়ার কারণ। খুব বৃদ্ধ বয়সেও কখনো কখনো আবার নাম পাল্টানো হত। কেউ যখন সাকেম্ বা প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হত, তখন তার নামটা নিয়ে নেওয়া হত এবং অভিষেকের সময় তাকে দেওয়া হত নতুন একটা নাম। এই নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে অবশ্য ঐ ব্যক্তির কিছুই করার ছিল না। এটা ছিল শুধু তার নারী-জ্ঞাতিদের আর প্রধানদের বিশেষ অধিকার। তবে কোন প্রধানকে তার নতুন নামটা পরিষদের সভায় ঘোষণা করার ব্যাপারে রাজি করাতে পারলে প্রাপ্তবয়স্করা তাদের নিজেদের নাম পাল্টাতে পারত। একজন ব্যক্তির কোন বিশেষ নামের ওপর অধিকার থাকত, যেমন মৃত পিতার নামটার ওপর তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের। অন্য গোত্রের কোন বন্ধুকে সেই নামটা সে ধার দিতেও পারত। কিন্তু ঐ বন্ধুটির মৃত্যুর পর ঐ নামটা আবার পুরনো গোত্রের হাতেই ফিরে আসত।

শাওনী আর দেলাওয়ারদের মধ্যে মায়েদের নিজেদের ইচ্ছেমত যে-কোন গোত্রের নামে নিজের সন্তানের নামকরণ করতে পারার অধিকার বর্তমান। যে গোত্রের নামে নামকরণ করা হয়, শিশুটি সেই গোত্রের সদস্য হয়ে যায়। তবে এটা প্রাচীনকালের রীতির একটা ব্যতিক্রম মাত্র। এর ফলে গোত্রের বংশধারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এলোমেলো হয়ে যায়। ইরোকোয়া এবং অন্যান্য ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এখন যে-সব নাম ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, সেগুলি প্রধানত গোত্রের মধ্যে সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসা নাম।

কোন গোত্রের নিজস্ব নামগুলিকে ব্যবহার করার ব্যাপারে এই সতর্কতা থেকেই এগুলির গুরুত্ব এবং এগুলির সঙ্গে যুক্ত গোত্রীয় অধিকারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্যক্তির এই নিজস্ব নামের বিষয়টার নানান দিক থাকলেও তার সবকটা আমার বর্তমান উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমি শুধু সেইসব সাধারণ প্রথা নিয়েই আলোচনা করব যেগুলি গোত্রের সদস্যদের মধ্যেকার সম্পর্ককে বুঝতে সাহায্য করে। পারিবারিক মিলন-সভায় অথবা পরস্পর পরিচিত দুজন আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের মধ্যে দেখা হলে তারা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে প্রীতিসম্ভাষণ বিনিময় করে। এই দুজন পরস্পরের আত্মীয় হলে আত্মীয়তার সম্পর্ক অনুযায়ী সম্ভাষণ করে, আর আত্মীয় না হলে সম্ভাষণ করে "বন্ধু হে" বলে। কোন ইণ্ডিয়ানকে তার নিজস্ব নাম ধরে ডাকা অথবা তার কাছ থেকেই তার নাম জানতে চাওয়াটা খুবই অশোভন ব্যাপার।

নর্ম্যান বিজয়ের সময় পর্যন্ত স্যাক্সন পূর্বপুরুষদের মাত্র একটা ক'র নিজস্ব নাম থাকত। সেই নামের সঙ্গে কোন পদবী থাকত না। এ থেকে বোঝা যা । যে তাদের

BanglaBook.org

মধ্যে তখনও একবিবাহভিত্তিক পরিবার সৃষ্টি হয় নি। সেই কারণে অনুমান করা যেতে পারে যে অতীতে একসময় একটা স্যাক্সন গোত্রের অস্তিত্ব ছিল।

৭। বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার

আরেকটি বিশেষ অধিকার গোত্রের ছিল, তা হল নতুন সদস্য গ্রহণ করার অধিকার। যুদ্ধের সময় যাদেরকে বন্দী করা হত, তাদেরকে হয় হত্যা করা হত নয়ত কোন-একটা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হত। বন্দী-হওয়া নারী ও শিশুদেরকে সাধারণত কোন-একটা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেই মার্জনা করা হত। গোত্রের মধ্যে যাকে গ্রহণ করা হত, সে গোত্রীয় অধিকারটুকু তো পেতই, সেইসঙ্গেই পেত ঐ গোষ্ঠীর জাতিত্বও। যে ব্যক্তি কোন বন্দীকে তার গোত্রের মধ্যে গ্রহণ করতে চাইত, সে তাকে নিজের ভাই বা বোন হিসেবে বরণ করে নিত। কাউকে মা হিসেবে গ্রহণ করতে হলে নিজেকে তার ছেলে বা মেয়ে হিসেবে পরিচয় দিতে হত। তারপর থেকে গৃহীত ব্যক্তিটির সঙ্গে এমন আচরণ করা হত যেন সে সত্যিই তার ভাই বা বোন বা মা। বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থায় বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করা হত। কিন্তু বন্য যুগের নিম্ন অবস্থার গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দাসত্বের কোন চিহ্নই ছিল না। গোত্রের মধ্যে গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দীরাও কিছু সুযোগ পেত। শাস্তিপ্রাপ্ত কোন বন্দী কষ্ট সহ্য করে বা অন্যদের পক্ষপাতিত্বের ফলে সৈন্যসারির মধ্যে দিয়ে নিরাপদে শেষপর্যন্ত দৌড়ে যেতে পারলে তাকে গ্রহণ করা হত গোত্রের মধ্যে। কোন পরিবারের যুদ্ধে নিহত সদস্যরা পরিবারের যে পদে ছিল, অনেক সময় গৃহীত বন্দীদের সেই পদেই গ্রহণ করা হত। অর্থাৎ এইভাবে চেষ্টা করা হত আত্মীয়তার ছিন্ন সূত্রকে জোড়া দেওয়ার। ধ্বংসোন্মুখ কোন গোত্র তার মৃত সদস্যদের শূন্য পদ বাইরে থেকে কাউকে গ্রহণ করে পূরণ করতে পারত, তবে এরকম ঘটনা একান্তই বিরল। একসময় সেনেকাদের বাজপাখি গোত্রটির লোকসংখ্যা খুবই কমে গিয়েছিল এবং গোত্রটির বিলোপ আসন্ন হয়ে উঠেছিল। তখন এই গোত্রটিকে রক্ষা করার জন্য নেকড়ে গোত্র থেকে কিছু লোককে দলবদ্ধভাবে গ্রহণ করা হয় বাজপাখি গোত্রে। দু'পক্ষের সম্মতি নিয়েই এ কাজ করা হয়েছিল। গোত্রের মধ্যে কাউকে গ্রহণ করার অধিকারটা প্রতিটা গোত্রের বিচারবুদ্ধির ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হত।
ইরোকোয়াদের মধ্যে এই গ্রহণ করার অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন হত গোষ্ঠীর সার্বজনীন সভায় আর গোটা ঘটনাটা যেন একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চেহারা নিত।[১]

১। গোষ্ঠী-পরিষদের বাড়িতে লোকেরা জমায়েত হওয়ার পর কোন-একজন প্রধান একটা ভাষণ দিত। যে লোকটিকে গ্রহণ করা হচ্ছে, তার সম্বন্ধে সেই ভাষণে কিছু বলা হত—কেন তাকে গ্রহণ করা হচ্ছে, যে গ্রহণ করছে তার নাম ও গোত্র কী এবং গৃহীত ব্যক্তিটিকে কী নাম দেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি। তারপর দুজন প্রধান তার দুটি হাত ধরে পরিষদ-গৃহের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেত, আবার ফিরে আসত, আর গেয়ে চলত গ্রহণ করার গান। প্রতিটি স্তবকের শেষে উপস্থিত লোকজনরা সমবেত কণ্ঠে ধুয়ো ধরত। গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলত এই পদচারণা। এইভাবে মোট তিন-পাক ঘুরতে হত। তারপর শেষ হত অনুষ্ঠান। আমেরিকানদেরকেও কখনো কখনো সৌজন্য দেখানর জন্য এইভাবে গ্রহণ করা হয়। কয়েক বছর আগে আমাকেও এইভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল সেনেকাদের বাজপাখি গোত্রের মধ্যে। এই অনুষ্ঠানটি সেইসময়ও করা হয়েছিল।

৮। সাধারণ ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাস পালন

গ্রীক আর লাতিন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে এইসব অনুষ্ঠান পালিত হত। সেই সময় ধর্মের সবথেকে উন্নত যে বহু-ঈশ্বরবাদী রূপটি চালু ছিল, তা সেইসব গোত্রের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছিল যেখানে সর্বদাই পালিত হত ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এগুলির মধ্যে কয়েকটিকে অত্যন্ত পবিত্র বলে বিবেচনা করে সারা জাতির অনুষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছিল। কিছু কিছু শহরে কয়েকটি দেবতার প্রধান পুরোহিতের পদ উত্তরাধিকারসূত্রে কোন-একটা বিশেষ গোত্রেরই হাতে থেকে যেত।[১] ধর্মগত বিকাশের স্বাভাবিক কেন্দ্রবিন্দুতে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহের জন্মভূমিতে পরিণত হয়েছিল গোত্র।

গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে যেভাবে বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও অনেকটা সেভাবেই তা গড়ে উঠলেও গ্রীক ও রোমান গোষ্ঠীর গোত্রগুলির মতো ধর্মীয় বিকাশের ব্যাপ্তি তারা অর্জন করতে পারেনি। ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিশেষ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচলিত নেই বললেই চলে, যদিও তাদের ধর্মীয় উপাসনা কমবেশি প্রত্যক্ষভাবে গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এই গোত্রের মধ্যেই সহজভাবে ধর্মীয় ধারণার অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল এবং ক্রমশ বৃদ্ধিলাভ করেছিল। তৈরি হয়েছিল উপাসনার পদ্ধতি। কিন্তু এগুলি বিশেষ কোন-একটা গোত্রের মধ্যেই শুধু আবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল সারা গোষ্ঠীতেই। ইরোকোয়াদের মধ্যে ছয়টি বার্ষিক ধর্মীয় উৎসব দেখা যায় (মেপল্, বৃক্ষরোপন, বেত্র, সবুজ-শস্য, ফসল তোলা এবং নববর্ষ)।[২] গোষ্ঠীর সবকটি গোত্রই এইসব উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। বছরের এক-একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে পালিত হয় এই উৎসবগুলি।

প্রতিটি গোত্রে কয়েকজন নারী ও পুরুষকে "বিশ্বাসরক্ষক" হিসেবে নিযুক্ত করা হত। এইসব উৎসবাদি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করার দায়িত্বভার থাকত এদের ওপর।[৩] এক-একটা গোত্রে এই পদে কতজন আছে, তা দিয়েই যাচাই করা হত তাদের ধর্মবিশ্বাসের গভীরতা। এই বিশ্বাসরক্ষকরা উৎসবের দিনক্ষণ স্থির করত, উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য

১। গ্রোটে-র "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", ১, ১৯৪।

২। লীগ অফ দ্য ইরোকোয়া, পৃঃ ১৮২।

৩। ঠিক যেমন বহু প্রধান থাকত এদের মধ্যে, তেমনি "বিশ্বাসরক্ষক"-ও থাকত প্রচুর। প্রতিটি গোত্রের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা আর প্রবীনা মহিলারা এদের নির্বাচিত করত। নির্বাচিত হওয়ার পর গোষ্ঠী-পরিষদ এদেরকে ঐ পদে অভিষিক্ত করত, কিছু আচার-অনুষ্ঠানও করা হত সেইসঙ্গে। নির্বাচিত ব্যক্তিদের নামগুলি কেড়ে নিয়ে তার বদলে বিশ্বাসরক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট নাম দেওয়া হত তাদের। প্রায় সমান সংখ্যক নারী ও পুরুষকে নির্বাচন করা হত। জনসাধারণের চরিত্র-পরীক্ষক হিসেবে কাজ করত এরা, লোকেদের খারাপ কাজকর্মের কথা পরিষদকে জানাত। এই পদে নির্বাচিত হলে পদটা গ্রহণ করাই ছিল লোকেদের কর্তব্য। কিন্তু বেশ কিছুদিন কাজ করার পর যে-কেউ তার পদ ত্যাগ করতে পারত। তখন বিশ্বাসরক্ষক হিসেবে তার নতুন নামটা ছেড়ে দিয়ে নিজের পুরনো নামটাই ফিরিয়ে নিতে হত তাকে।

প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করত এবং গোষ্ঠীর সাকেম্ ও প্রধানদের সঙ্গে একযোগে উৎসব পরিচালনা করত। গোষ্ঠীর সাকেম্ ও প্রধানরা তাদের পদাধিকার বলেই "বিশ্বাসরক্ষক" হিসেবে গণ্য হত। এদের কোন সরকারি কর্তা ছিল না, ছিল না কোন পুরোহিত। ঐ বিশ্বাসরক্ষকরাই এ-সব দায়িত্ব পালন করত। নারী "বিশ্বাস-রক্ষয়িত্রী"-দের বিশেষ দায়িত্ব ছিল ভোজসভার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা। প্রতিদিন উৎসবের শেষে উপস্থিত প্রতিটি ব্যক্তিকেই এইসমস্ত খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হত। এ ছিল এক সার্বজনীন ভোজসভা। এইসব উৎসবের সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে আমি পূর্ববর্তী একটি রচনায় আলোচনা করেছি।[১] এখানে আর এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। এইটুকু শুধু বলা যেতে পারে যে আসলে এদের উপাসনাটা ছিল ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পন্থাবিশেষ। মন্ত্রোচ্চারণ করে ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হত আর ভূত-প্রেত ইত্যাদির কাছে চাওয়া হত আশীর্বাদ।

বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থা থেকে মানবজাতি ঐ যুগের মধ্য অবস্থায় এগিয়ে যাওয়ার পর, বিশেষত বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থায় পৌঁছনর পর, গোত্র আরও বেশি বেশি করে ধর্মীয় প্রভাবের কেন্দ্র এবং ধর্মগত বিকাশের উৎসস্থল হয়ে উঠল। আমরা শুধু আজটেকদের ধর্মীয় ব্যবস্থার সাধারণ দিকটুকুর কথাই জানি। কিন্তু জাতীয় স্তরের দেবদেবী ছাড়াও তাদের মধ্যে সম্ভবত অন্যান্য আরও কিছু দেবদেবীরও অস্তিত্ব ছিল। ভ্রাতৃত্বের নীচের স্তরের লোকজনরাই উপাসনা করত এইসব দেবতার।

আজটেকদের মধ্যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও পুরোহিততন্ত্রের অস্তিত্ব আমাদের এই দিকনির্দেশ করে যে ইরোকোয়াদের মধ্যে গোত্রের সঙ্গে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের যতটা নিকট সম্পর্ক ছিল, তার থেকে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল আজটেকদের গোত্রের সঙ্গে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের। কিন্তু তাদের সামাজিক সংগঠনের মতই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও পাল-পার্বনের কথাও ঢাকা পড়ে আছে এক আঁধারী কুয়াশার অন্তরালে।

৯। সার্বজনীন কবরস্থান

প্রাচীনকালে কবর দেওয়ার অন্যতম পদ্ধতি ছিল মৃতদেহটিকে একটা উঁচু মাচার ওপর রেখে দেওয়া। সমস্ত মাংসটুকু খসে না যাওয়া পর্যন্ত এইভাবে রেখে দেওয়া হত মৃত-দেহটিকে। তারপর মাচা থেকে পেড়ে এনে গাছের ছাল দিয়ে তৈরি চোঙের মধ্যে রাখা হত হাড়গুলি। এইসব হাড়-ভর্তি চোঙগুলি রাখার জন্যই বানানো হত একটা বাড়ি। একই গোত্রের লোকদের হাড় সাধারণত একই বাড়িতে রাখা হত। ১৮২৭ সালে রেভারেণ্ড ডক্টর সাইরাস বাইংটন চোক্‌টাদের মধ্যে এই প্রথা লক্ষ করেছিলেন। অ্যাডেয়ার বলেছেন যে চেরোকীদের মধ্যেও এই একই প্রথা চালু ছিল। তিনি লিখেছেন, "ওদের একটা শহরে খুব কাছাকাছি এই ধরনের তিনটি বাড়ি দেখেছিলাম আমি। এক-একটা বাড়িতে এক-একটা গোষ্ঠীর মৃত ব্যক্তিদের হাড় রাখা হত। হাড় রাখার পেটিকাগুলি দেখতে হত অদ্ভুত ধরনের আর প্রতিটি পেটিকার ওপর এক-একটা

১। লীগ অফ দ্য ইরোকোয়া, পৃঃ ১৮২।

BanglaBook.org

পরিবারের (গোত্রের) নাম লেখা থাকত চিত্রমূলক বর্ণমালায় (hierographical figures)। কোন আত্মীয়ের হাড়ের সঙ্গে কোন বহিরাগতের হাড় মিশিয়ে ফেলাটাকে অত্যন্ত অধার্মিক কাজ বলে মনে করত ওরা। কারণ প্রত্যেকের নিজের লোকেদের হাড়-মাংস সবসময় একসঙ্গেই রাখা উচিত—এটাই ছিল ওদের বিশ্বাস।"[১] প্রাচীনকালে ইরোকোয়ারাও মাচা ব্যবহার করত, গাছের ছাল দিয়ে তৈরি চোঙের মধ্যে রেখে দিত মৃত আত্মীয়দের হাড়গুলি। মৃত ব্যক্তিটি যে বাড়িতে বসবাস করত, সাধারণত সেই বাড়িতেই রাখা হত তার হাড়। মাটির নীচে মৃতদেহ কবর দেওয়ার প্রথাও চালু ছিল ইরোকোয়াদের মধ্যে। অবশ্য গ্রামের কোন সার্বজনীন কবরস্থান না থাকলে একই গোত্রের লোকদেরকে সবসময় একই জায়গায় পাশাপাশি কবর দেওয়া সম্ভবপর হত না। প্রয়াত রেভারেণ্ড আশুর রাইট, যিনি সেনেকাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধর্মপ্রচারক হিসেবে কাজ করেছেন এবং যিনি আমেরিকান ধর্মপ্রচারকদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তিনি আমাকে লিখেছিলেন—"মৃতদের কবর দেওয়ার জায়গায় বংশানুযায়ী কবর দেওয়ার কোন চিহ্ন খুঁজে পাইনি আমি। আমার মনে হয় যথেচ্ছভাবে কবর দিত এরা। তবে এরা বলে যে আগেকার দিনে বিভিন্ন বংশের লোকেরা এখনকার তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় একত্রে বসবাস করত। একটাই পরিবার হিসেবে বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে পারিবারিক অনুভূতির প্রভাব ছিল অনেক বেশি, ব্যক্তিগত স্বার্থ সেখানে তেমন মাথাচাড়া দিতে পারত না। তবু কোথাও কোথাও দেখা যায় যে কোন-একটা কবরস্থানে সমাধিস্থদের একটি বড় অংশই হয়ত একই বংশের লোক।" মিঃ রাইট অত্যন্ত সঠিক-ভাবেই বলেছিলেন যে একটা নির্দিষ্ট গ্রামে বসবাসকারী সমস্ত গোত্রের লোকেদেরকেই একটা নির্দিষ্ট কবরস্থানে কবর দেওয়ার প্রথা এদের মধ্যে চালু ছিল। তবে একই গোত্রের লোকদেরকে হয়ত ঐ কবরস্থানের মধ্যেই একটা দিকে পাশাপাশি কবর দেওয়া হত।

এ ব্যাপারে একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত সম্প্রতি লিউইস্টনের কাছে টুস্কারোরাদের বসবাসের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় দেখতে পাওয়া গেছে। এখানে প্রোটা গোষ্ঠীর জন্য একটাই সার্বজনীন কবরস্থান রয়েছে, আর ঐ কবরস্থানে এক-একটা গোত্রের লোকেদেরকে এক-একটা সারিতে কবর দেওয়া হয়ে থাকে। একটা সারিতে কবর দেওয়া হয় বীবর গোত্রের মৃত সদস্যদের, দুটি সারি রয়েছে ভালুক গোত্রের জন্য, একটা সারি ধূসর নেকড়ে গোত্রের, একটা সারি বড় কচ্ছপ গোত্রের—এইভাবে মোট আটটা সারি রয়েছে এখানে। স্বামী ও স্ত্রীদেরকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা আলাদা সারিতে কবর দেওয়া হয়ে থাকে। পিতা আর তার সন্তানদেরকেও কবর দেওয়া হয় আলাদা আলাদা সারিতে। কিন্তু মা ও তার সন্তানদের এবং ভাই-বোনদের কবর দেওয়া হয় একই সারিতে। এ থেকে বোঝা যায় যে গোত্রগত অনুভূতিটা এদের মধ্যে কত জোরদার আর পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে কত দ্রুত এরা নিজেদের প্রাচীন প্রথায় ফিরে

১। হিস্ট্রি অফ দ্য আমেরিকান ইণ্ডিয়ানস।

BanglaBook.org

যেতে পারে। কারণ, টুসকারোরারা বর্তমানে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে, কিন্তু এই প্রথাটা তারা পরিত্যাগ করে নি। জনৈক ওনোন্‌ডাগা ইণ্ডিয়ান আমাকে বলেছিল যে ওনোন্‌ডাগা ও ওনেইতাদের কবরস্থানে এক-একটা গোত্রের লোকদের আলাদা আলাদা সারিতে কবর দেওয়ার প্রথা এখনও চালু আছে। এইভাবে কবর দেওয়ার প্রথাটা হয়ত সমস্ত ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু এ-কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে এইভাবে কবর দেওয়ার দিকে একটা প্রবণতা প্রাচীন যুগে তাদের মধ্যে ছিল এবং এই পদ্ধতিটাকেই তারা পছন্দ করত বেশি।

ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে যা সত্য, অগ্রগতির একই অবস্থায় থাকা অন্যান্য ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠী-গুলির ক্ষেত্রেও তা সাধারণভাবে সত্য। ইরোকোয়াদের মধ্যে দেখা যায় যে গোত্রের কোন-একজন সদস্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় বাকি সকলেই বিলাপ করে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বক্তব্য পেশ করা, কবর প্রস্তুত করা এবং মৃতদেহ কবরস্থ করা—এ-সব কাজগুলি কিন্তু অন্য গোত্রের লোকেরা করে দেয়।

মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে মৃতদেহ সৎকার করার কোন বাঁধাধরা পদ্ধতি ছিল না। কখনও মৃতদেহ মাচায় রেখে দেওয়া হত, আবার কখনও-বা মাটিতেই কবর দেওয়া হত। তবে শুধু প্রধানদের এবং বিশিষ্ট লোকদের মৃতদেহই মাচায় রাখা হত।

১০। গোত্র-পরিষদ

এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকা—সব জায়গার প্রাচীন সমাজেই গোষ্ঠী-পরিষদ ছিল এক গুরুত্বসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগঠন। বন্য যুগ থেকে সভ্য যুগ পর্যন্ত এটাই হচ্ছে গোত্রের প্রতিষ্ঠান। এই পরিষদ ছিল শাসনব্যবস্থার প্রধান উপাদান এবং গোত্র, গোষ্ঠী ও মিত্রসঙ্ঘের ওপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকত এর। মামুলী ব্যাপারগুলির মীমাংসা করে দিতেন প্রধানরা। কিন্তু যে-সব ব্যাপারের সঙ্গে সবাইকার স্বার্থ জড়িয়ে থাকত, সেগুলির সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব পরিষদের ওপরেই ন্যস্ত করা হত। গোত্র-ভিত্তিক সমাজের মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল পরিষদ, তাই এই দুটি প্রতিষ্ঠান একসঙ্গেই এগিয়ে এসেছে নানা যুগের পথ বেয়ে। মানবজাতির প্রজ্ঞাকে উন্নত করার এবং মনুষ্য-সমাজের ক্ষেত্রে সেই প্রজ্ঞাকে প্রয়োগ করার প্রাচীন পদ্ধতির ছাঁব দেখা যায় প্রধানদের পরিষদের মধ্যে। গোষ্ঠীগত এবং মিত্রসঙ্ঘগত পরিষদের ইতিহাস জানতে পারলে শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারণার বিকাশের গোটা ইতিহাসটাকেই জানা সম্ভবপর হবে। তারপর একসময় দেখা দিয়েছিল রাজনৈতিক সমাজ। তখন এই পরিষদ ব্যবস্থাপক-সভায় (senate) রূপান্তরিত হয়ে রাজনৈতিক সমাজের মধ্যেও টিকে থেকেছিল।

পরিষদের সরলতম ও নিম্নতম রূপ ছিল গোত্র-পরিষদ। গোত্র-পরিষদ হচ্ছে একটা গণতান্ত্রিক সভা, কারণ এই পরিষদে আলোচনার জন্য নিয়ে আসা যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ অবাধে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারত। গোষ্ঠী-পরিষদ তার সাকেম্‌ ও প্রধানদের নির্বাচিত করত এবং প্রয়োজনে বরখাস্ত করতে

BanglaBook.org

পারত, বিশ্বাসরক্ষকদের নির্বাচিত করত, গোত্রের কোন সদস্যের হত্যার বদলা নিত অথবা হত্যাকারীকে মার্জনা করত, এবং বহিরাগতদের গোত্রের মধ্যে গ্রহণ করত। এটাই ছিল উচ্চতর গোষ্ঠী-পরিষদের এবং আরও উচ্চতর মিত্রসঙ্ঘের পরিষদের ভ্রূণরূপ। এই গোষ্ঠী-পরিষদ আর মিত্রসঙ্ঘের পরিষদ—দুটিই গড়ে উঠত গোত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ শুধুমাত্র তাদের প্রধানদের নিয়েই।

এই সবই ছিল ইরোকোয়া গোত্রের লোকজনদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব। যতদূর অনুসন্ধান চালানো গেছে তাতে মনে হয় যে সাধারণভাবে সমস্ত ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার গোত্রের লোকজনদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্বও প্রায় একইরকম ছিল। গ্রীক-লাতিন গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও শুধু ১, ২ এবং ৬-নং বিষয়-গুলি বাদে বাকি এই সমস্ত অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্বই প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে ঐ তিনটিও সম্ভবত বিদ্যমান ছিল, তবে তার প্রমাণ হয়ত এখন আর যোগাড় করা সম্ভব হবে না।

ইরোকোয়া গোত্রের প্রতিটি সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন এবং তারা একে অপরের স্বাধীনতা রক্ষা করতে বাধ্য। এরা প্রত্যেকেই সমান সুযোগ-সুবিধা ও ব্যক্তিগত অধিকার ভোগ করে, সাকেম্ ও প্রধানরা অন্যদের থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার পায় না। আর জ্ঞাতিত্বের বন্ধনের ফলে তাদের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ববোধও কাজ করে। গোত্রের মৌলিক নীতি ছিল স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব—যদিও ব্যাপারটাকে এভাবে কখনও সূত্রায়িত করা হয়নি। এই বিষয়গুলি একেবারেই বাস্তব, কারণ গোত্রই ছিল সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাথমিক একক, আর এই ভিত্তির ওপরেই গড়ে উঠেছিল ইণ্ডিয়ানদের সমাজকাঠামো। এই ধরণের একক নিয়ে গড়ে ওঠা একটা সমাজকাঠামোর মধ্যে তাদের চরিত্রের ছাপ থাকতে বাধ্য, কারণ প্রাথমিক এককটার চরিত্রের ওপরেই এর সামগ্রিক কাঠামোটা কেমন হবে তা নির্ভর করে। সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের চরিত্রের মধ্যে স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত মর্যাদার যে বোধ মিশে আছে, তাকে এই দিয়েই উপলব্ধি করা যায়।

সামাজিক ব্যবস্থায় গোত্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেখা যায় যে আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে প্রাচীনকালে যেমন গোত্রের অস্তিত্ব ছিল, তেমনি বহু ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে আজও পূর্ণ সতেজতা নিয়ে বেঁচে আছে এই গোত্র। গোত্রই ছিল ভ্রাতৃত্বের, গোষ্ঠীর এবং গোষ্ঠীগুলির মিত্রসঙ্ঘের বনিয়াদ। এর কার্যকলাপকে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করা যায়, তবে এর স্থায়ী এবং মজবুত চরিত্রকে তুলে ধরার জন্য যথেষ্টই আলোচনা করেছি আমরা

ইয়োরোপবাসীরা যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল, তখনকার আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের গোষ্ঠীগুলি মূলত গড়ে উঠেছিল গোত্রকে ভিত্তি করেই, যেখানে বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী। কয়েকটি গোষ্ঠীতে, যেমন ডাকোটাদের মধ্যে, আর গোত্রের অস্তিত্ব ছিল না। আবার ওজিবোয়া, ওমাহা এবং ইয়ুকাতানের মায়াদের গোত্র-গুলিতে স্ত্রী-ধারা বদলে পুরুষ-ধারায় উত্তরাধিকার নির্ণয় শুরু হয়েছিল। আমেরিকার

BanglaBook.org

আদিবাসী-অধ্যুষিত সমস্ত এলাকাতেই গোত্রের নামকরণ করা হত কোন পশু অথবা জড় পদার্থের নাম অনুসারে, কখনোই কোন মানুষের নামে গোত্রের নামকরণ করা হত না। সমাজের এই প্রারম্ভিক অবস্থায় ব্যক্তিদের সত্তা মিশে যেত সমগ্র গোত্রের জীবনের সঙ্গে। এটুকু অন্তত ধরে নেওয়া যেতে পারে যে গ্রীক ও লাতিন গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও পুরনো আমলে এইভাবেই গোত্রের নামকরণ করা হত। কিন্তু ইতিহাস যখন তাদের দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছে, তখন সে দেখেছে যে এদের গোত্রগুলির নামকরণ করা হয়েছে এক-একজন মানুষের নামে। কিছু কিছু গোষ্ঠী, যেমন নিউ মেক্সিকোর মোকি ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে গোত্রের সদস্যরা দাবি করে যে, যে পশুটির নামে তাদের গোত্রের নামকরণ করা হয়েছে, সেই পশুটি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে তারা। তারা বলে যে তাদের সেই বহু যুগ আগেকার পুরুষকে ঈশ্বর রূপান্তরিত করেছিলেন পশু থেকে মানুষে। ওজিবোয়াদের সারস গোত্রের মধ্যেও এইরকম উপকথা চালু আছে। একটা গোত্রের মধ্যে কতজন লোক থাকবে, তা নির্ভর করত গোত্রের সংখ্যার ওপর এবং গোষ্ঠীর অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি বা অবনতির ওপর। তিন হাজার সেনেকা সমানভাগে আটটি গোত্রে বিভক্ত ছিল, অর্থাৎ প্রতিটি গোত্রে গড়ে তিনশ পঁচাত্তর জন করে লোক ছিল। পনের হাজার ওজিবোয়া সমানভাবে বিভক্ত ছিল তেইশটি গোত্রে, অর্থাৎ প্রতিটি গোত্রে গড়ে ছয়শ পঞ্চাশ জন করে লোক। চেরোকীদের এক-একটা গোত্রে এক হাজারেরও বেশি লোক থাকত। বর্তমানে প্রধান প্রধান ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এক-একটা গোত্রে একশ থেকে এক হাজারের মত করে লোক আছে।

মানবজাতির একটা প্রাচীনতম ও সর্বাধিক ব্যাপকভাবে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে গোত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গেছে মানবপ্রগতির সমগ্র ইতিহাসের সঙ্গে, আর এই প্রগতিতে সে রেখে গেছে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিভিন্ন মহাদেশের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বন্য অবস্থায়, বর্বর যুগের নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ অবস্থায় এবং সভ্য যুগ শুরু হওয়ার পরেও গ্রীক ও লাতিন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে গোত্রকে দেখা গেছে সক্রিয় ভূমিকায়। একমাত্র পলিনেশিয়রা ছাড়া বাকি প্রতিটি মানবগোষ্ঠীর মধ্যেই গোত্রভিত্তিক সমাজ-কাঠামো সৃষ্টি হয়েছে আর এই সমাজকাঠামোই টিকিয়ে রেখেছে মানবজাতিকে, যুগিয়েছে প্রগতির উপকরণ। গোত্রভিত্তিক সমাজকাঠামো যত দীর্ঘদিন ধরে টিকে রয়েছে, মানবজাতির ইতিহাসে তত দীর্ঘদিন টিকে থাকার একমাত্র নজির রক্তসম্বন্ধযুক্ত নারী-পুরুষদের মধ্যে বিবাহভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার জন্ম আরও প্রাচীন-কালে এবং আজ পর্যন্তও তা টিকে আছে। তবে যে-সব বিবাহ-প্রথার মধ্যে দিয়ে এর সূচনা হয়েছিল, সে-সব প্রথা লুপ্ত হয়ে গেছে অনেককাল আগেই।

গোত্র গড়ে উঠেছিল বহুযুগ আগে এবং এখনও সে টিকে রয়েছে। এ থেকে যথেষ্ট ভালভাবেই বোঝা যায় যে বন্য ও বর্বর অবস্থায় মানবজাতির পক্ষে গোত্র কতটা প্রয়োজনীয় ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইরোকোয়া ভ্রাতৃত্ব

নাম থেকেই বোঝা যায় যে এই 'ভ্রাতৃত্ব' সংগঠনটি হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের দ্যোতক এবং এটা গড়ে উঠেছিল গোত্র সংগঠনের এক স্বাভাবিক বিকাশ হিসেবেই। আসলে ভ্রাতৃত্ব ছিল কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একই গোষ্ঠীর দুই বা ততোধিক গোত্রের একটা সম্মিলিত সঙ্ঘ বা সংস্থা। সাধারণত কোন-একটা মূল গোত্রের বিভাজনের ফলে সৃষ্ট গোত্রগুলিই এই সংস্থার মধ্যে থাকত।

গ্রীক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে, যেখানে ভ্রাতৃত্ব সংগঠন প্রায় গোত্র সংগঠনের মতই দৃঢ়-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে এটা এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা দিয়েছিল। এথেনিয়দের চারটি গোষ্ঠীর প্রত্যেকটির মধ্যেই ছিল তিনটি করে ভ্রাতৃত্ব, প্রতিটি ভ্রাতৃত্বে ছিল ত্রিশটা করে গোত্র। অর্থাৎ মোট বারোটা ভ্রাতৃত্ব আর তিনশ ষাটটা গোত্র। প্রতিটা ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর গঠনে এইরকম সুস্পষ্ট সংখ্যাগত মিল শুধুমাত্র স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় গোত্রগুলির বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হতে পারে না। মিঃ গ্রোটে বলেছেন যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগঠন গড়ে তোলার জন্য আইনী ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে এইরকম সংখ্যাগত মিল সৃষ্টি করা হয়েছিল। একটা গোষ্ঠীর মধ্যেকার সবকটা গোত্রের সমস্ত ব্যক্তিই ছিল একই পূর্বপুরুষের বংশধর এবং তাদের প্রত্যেকেরই একটা সাধারণ গোষ্ঠীগত নাম থাকত। কাজেই প্রতিটা ভ্রাতৃত্বে নির্দিষ্ট সংখ্যক গোত্র এবং প্রতিটা গোষ্ঠীতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভ্রাতৃত্ব রাখাটা এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না। তবে একটা মূল গোত্রের বিভাজনের ফলে যে গোত্রগুলি সৃষ্টি হত, সেগুলির সদস্যদের মধ্যেকার প্রত্যক্ষ জ্ঞাতিত্ব-সম্পর্কই ছিল ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের স্বাভাবিক ভিত্তি। গ্রীকদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠন এই ভিত্তির ওপরেই প্রথমে গড়ে উঠেছিল। অমেরিকান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের যথাযথ সংখ্যাগত বিন্যাস সৃষ্টি করা হয়েছিল বাইরের গোত্রকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে এবং কোন কোন গোত্রকে তাদের স্বেচ্ছাক্রমে বা জোর করে অন্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে।

রোমানদের 'কিউরিয়া' ছিল গ্রীক ভ্রাতৃত্বের সমতুল সংগঠন। এই কিউরিয়াকে ডায়োনিসায়াস্ সারাক্ষণ ফ্রাত্রা (ভ্রাতৃত্ব) হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।[১] প্রতিটা কিউরিয়ায় ছিল দশটা করে গোত্র, আর রোমানদের তিনটি গোষ্ঠীর প্রতিটাতে দশটা করে কিউরিয়া। অর্থাৎ মোট ত্রিশটা কিউরিয়া আর তিনশটা গোত্র। গ্রীকদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা যতটা জেনেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি জানা গেছে রোমানদের

১। —"ডায়োনিসায়াস", lib. II, Cap, vii ; এবং vid. lib. II, C, xiii.

BanglaBook.org

এই কিউরিয়া সম্পর্কে। এবং এই কিউরিয়া ছিল গ্রীকদের ভ্রাতৃত্বের চেয়ে উচ্চ মাত্রার সংগঠন, কারণ সরকার সংক্রান্ত কার্যকলাপের সঙ্গে কিউরিয়া প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। গোষ্ঠী-পরিষদকে (comitia curiata) নির্বাচিত করত কিউরিয়াগুলিই। এই নির্বাচনে প্রতিটা কিউরিয়া একটা করে যৌথ-ভোট দিতে পারত। সার্ভিয়াস তিউলিয়াস-এর আমল পর্যন্ত এই গোত্র-পরিষদই ছিল রোমান জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতার আধার।

গ্রীক ভ্রাতৃত্বের কার্যকলাপের মধ্যে ছিল বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা, ভ্রাতৃত্বের কোন সদস্যের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া বা হত্যাকারীকে মার্জনা করা এবং কোন হত্যাকারী শাস্তি পাওয়ার হাত থেকে নিস্তার পেলে সমাজে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য তার শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা করা।[১] পরবর্তীকালে এথেনিয়দের মধ্যে এই ভ্রাতৃত্ব সংগঠন এথেন্সে ক্লাইস্থেনিস-এর আমলের রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থার সময় পর্যন্ত টিকে ছিল। নাগরিকদের নাম ঠিকমত তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে কি না, সেটা দেখাশোনা করত ভ্রাতৃত্ব সংগঠন। এইভাবে বংশ-পরম্পরা আর নাগরিকত্ব প্রমাণ করার অভিভাবকে পরিণত হয়েছিল সে। বিবাহের পর স্ত্রীর নাম তার স্বামীর ভ্রাতৃত্বের তালিকাভুক্ত করা হত, তাদের সন্তানদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হত বাবার গোত্রের ও ভ্রাতৃত্বের তালিকায়। ভ্রাতৃত্বের কোন সদস্যের হত্যাকারীকে আদালতের কাছে অভিযুক্ত করাও ছিল এই সংগঠনেরই দায়িত্ব। প্রাচীন যুগে ও পরবর্তী যুগে এদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে এইসব কথাই জানা গেছে। এর সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জানা গেলে হয়ত দেখা যেত যে সার্বজনীন ভোজসভা, সার্বজনীন খেলাধুলো, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, একেবারে প্রারম্ভিক অবস্থার সামরিক সংগঠন, পরিষদের কার্যকলাপ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধার তত্ত্বাবধান—এ-সব কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিল এদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠন।

আমেরিকান আদিবাসীদের বহু গোষ্ঠীর মধ্যেই ভ্রাতৃত্বের অস্তিত্ব ছিল। এই আদিবাসী-দের ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছিল বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই, আর গ্রীক ও লাতিন গোষ্ঠীগুলির মতই এদের মধ্যেও ঐ সাংগঠনিক পরম্পরায় ভ্রাতৃত্ব ছিল দ্বিতীয় স্থানে। গোত্র, গোষ্ঠী এবং মিত্রসঙ্ঘের মত কোন প্রকৃত শাসনগত কাজ ভ্রাতৃত্বকে করতে হত না। কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা এর হাতে কিছু কিছু কার্যকরী ক্ষমতা তুলে দিত, কারণ গোত্রের চেয়ে বড় আর গোষ্ঠীর থেকে ছোট একটা সংগঠন গড়ে তোলার কাজটা একটা সামাজিক প্রয়োজন হিসেবেই দেখা দিয়েছিল এবং গোষ্ঠীর আয়তন বড় হলে এই প্রয়োজন আরও বিশেষভাবে অনুভূত হত। আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের দিক থেকে একই প্রতিষ্ঠান হওয়ার ফলে এদের ভ্রাতৃত্বের মধ্যে এই সংগঠনের প্রাচীন রূপ এবং প্রাচীন কার্যকলাপের হদিশ মেলে। গ্রীক ও রোমানদের ভ্রাতৃত্বকে ভালোভাবে বুঝতে হলে আগে ইণ্ডিয়ানদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠনকে ভালোভাবে জানা প্রয়োজন।

সেনেকা-ইরোকোয়া গোষ্ঠীর আটটি গোত্র নিম্নলিখিত দুটি ভ্রাতৃত্বে বিভক্ত ছিল ঃ

১। ভ্রাতৃত্ব কর্তৃক এই শুদ্ধিকরণের বর্ণনা দিয়েছেন এস্কাইলাস ঃ 'ইউমেনাইড্‌স,' ৬৫৬।

প্রথম ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—১। ভালুক, ২। নেকড়ে, ৩। বীবর, ৪। কচ্ছপ।

দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—৫। হরিণ, ৬। কাদাখোঁচা, ৭। সারস, ৮। বাজপাখি।

নাম থেকেই বোঝা যায় যে প্রতিটা ভ্রাতৃত্ব সংগঠন বা ফ্রাত্রী (দে-এ-নন্-দা-ইয়োহ্) হচ্ছে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক। একই ভ্রাতৃত্বের মধ্যেকার গোত্রগুলি হচ্ছে পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রতিম গোত্র এবং এরা অপর ভ্রাতৃত্বের গোত্রগুলির জ্ঞাতি-ভ্রাতা গোত্র। উভয় গোত্রের মর্যাদা, চরিত্র ও সুযোগ-সুবিধার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের সঙ্গে গোত্রগুলির সম্পর্কের কথা বলার সময় সেনেকারা নিজেদের ভ্রাতৃত্বের মধ্যেকার গোত্রগুলিকে বলে ভ্রাতৃপ্রতিম গোত্র আর অপর ভ্রাতৃত্বের গোত্রগুলিকে বলে জ্ঞাতিভ্রাতা গোত্র। একই ভ্রাতৃত্বের নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ প্রথমে নিষিদ্ধই ছিল। কিন্তু একটা ভ্রাতৃত্বের সদস্যরা অপর ভ্রাতৃত্বের যে-কোন গোত্রের সদস্যকে বিবাহ করতে পারত। এই নিষেধাজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, কোন-একটা আদি গোত্র থেকেই প্রতিটা ভ্রাতৃত্বের মধ্যেকার গোত্রগুলি সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এই নিষেধাজ্ঞা অনেক আগেই তুলে নেওয়া হয়েছে, শুধু নিজের গোত্রের মধ্যে বিবাহ করাটা আজও নিষিদ্ধই রয়ে গেছে। সেনেকাদের মধ্যে প্রচলিত একটা প্রথা থেকে বোঝা যায় যে ভালুক এবং হরিণ গোত্র দুটিই ছিল আদি গোত্র, বাকি গোত্রগুলি আসলে এই দুটি গোত্রেরই শাখা মাত্র। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, যে গোত্রগুলিকে নিয়ে একটা ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠত, সেই গোত্রগুলির মধ্যেকার জ্ঞাতিত্ব-সম্পর্কই ছিল সংগঠনের স্বাভাবিক বনিয়াদ। লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে এক-একটা গোত্রের কয়েকটা করে শাখা তৈরি হল। তখন এইসব গোত্রগুলির প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটা উচ্চতর সংগঠনে মিলিত হওয়ার ঝোঁক দেখা দিল। ইরোকোয়াদের বাকি গোষ্ঠীগুলির ভ্রাতৃত্বের গঠন নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা দেখতে পাব যে একটা ভ্রাতৃত্বের মধ্যেকার গোত্রগুলি বরাবর ঐ একই ভ্রাতৃত্বের মধ্যে থাকে না। কোন কোন গোত্রকে অনেক সময় একটা ভ্রাতৃত্বের বদলে অন্য কোন ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হত। আসলে ভ্রাতৃত্বগুলির মধ্যে একটা সংখ্যাগত ভারসাম্য থাকত আর সেই ভারসাম্য কোনভাবে নষ্ট হয়ে গেলে এইভাবে তা বজায় রাখা হত। আমাদের জানা দরকার যে প্রাচীন সমাজের সামাজিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এই সংগঠনটি কিভাবে গড়ে উঠেছিল এবং কত সাবলীলভাবে এই সংগঠনকে পরিচালনা করা হত। গোত্রের লোকসংখ্যা বেড়ে ওঠার ফলে তার সদস্যরা আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ত। দেখা দিত বিভাজন। অন্য এলাকায় সরে যাওয়া লোকেরা নতুন একটা গোত্রীয় নাম গ্রহণ করত। কিন্তু এই দুটি অংশের মধ্যেকার পূর্বতন ঐক্যের ঐতিহ্যটা নষ্ট হত না এবং এই ঐতিহ্যই তাদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠনে পুনর্মিলিত হওয়ার বনিয়াদ হিসেবে কাজ করত।

ক্যায়ুগা-ইরোকোয়াদের মধ্যেও দুটি ভ্রাতৃত্বে মোট আটটি গোত্র আছে, কিন্তু দুটি ভ্রাতৃত্বে সমান সংখ্যক গোত্র নেই। ভাগাভাগিটা এ-রকম ঃ

BanglaBook.org

প্রথম ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—১। ভালুক, ২। নেকড়ে, ৩। কচ্ছপ, ৪। কাদাখোঁচা, ৫। বানমাছ।

দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—৬। হরিণ, ৭। বীবর, ৮। বাজপাখি।

দেখা যাচ্ছে, এদের সাতটা গোত্র ঠিক সেনেকাদের গোত্রগুলির মতই। শুধু সারস গোত্রটার বদলে এখানে এসেছে বানমাছ গোত্র। আরও দেখা যাচ্ছে যে সেনেকাদের ক্ষেত্রে সারস গোত্রটা ছিল দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্বের মধ্যে আর এদের ক্ষেত্রে বানমাছ গোত্রটা রয়েছে প্রথম ভ্রাতৃত্বে। তাছাড়া বীবর গোত্রটা প্রথম ভ্রাতৃত্বের বদলে দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্বে এসেছে আর কাদাখোঁচা গোত্রটা দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্বের বদলে প্রথম ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একই ভ্রাতৃত্বের গোত্রগুলিকে ক্যায়ুগারা পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রতিম গোত্র বলে এবং অপর ভ্রাতৃত্বের গোত্রগুলিকে বলে জ্ঞাতিভ্রাতা গোত্র।

ওনোন্‌ডাগা-ইরোকোয়াদের মধ্যেও আটটা গোত্র দেখা যায়, কিন্তু এদের দুটি গোত্রের নাম সেনেকাদের থেকে আলাদা। নিম্নলিখিত দুটি ভ্রাতৃত্বে এই আটটা গোত্র রয়েছে ঃ

প্রথম ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—১। নেকড়ে, ২। কচ্ছপ, ৩। কাদাখোঁচা, ৪। বীবর, ৫। গুটি।

দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—৬। হরিণ, ৭। বানমাছ, ৮। ভালুক।

দেখা যাচ্ছে এদের মধ্যেও ভ্রাতৃত্বের গঠন সেনেকাদের থেকে আলাদা। দুজনদের মধ্যেই প্রথম ভ্রাতৃত্বের তিনটি গোত্র একই। কিন্তু ভালুক গোত্রটা চলে গেছে অপর ভ্রাতৃত্বের মধ্যে, তারা এখন বসবাস করছে হরিণ গোত্রের সঙ্গে। ক্যায়ুগাদের মত ওনোন্‌ডাগা-দেরও উভয় ভ্রাতৃত্বে সমান সংখ্যক গোত্র নেই। একই ভ্রাতৃত্বের গোত্রগুলিকে বলে জ্ঞাতি-ভ্রাতা গোত্র। ওনোন্‌ডাগাদের মধ্যে বাজপাখি গোত্রটা অনুপস্থিত, আবার সেনেকাদের মধ্যে কোন বানমাছ গোত্র নেই। কিন্তু এই দুটি গোত্রের লোকেদের মধ্যে দেখা হলে তারা পরস্পরের ভাই হিসেবেই মেলামেশা করে এবং দাবি করে যে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছেই।

মোহক্‌ আর ওনেইডাদের মধ্যে মাত্র তিনটি করে গোত্র আছে—ভালুক, নেকড়ে এবং কচ্ছপ। এদের কোন ভ্রাতৃত্ব নেই। যখন মিত্রসঙ্ঘ গঠিত হয়, তখন সেনেকাদের আটটা গোত্রের মধ্যে সাতটাই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজ করছিল—এ-সব গোত্রে সাকেম পদের প্রচলন থেকেই এর প্রমাণ মেলে। কিন্তু এ-সময় মোহক্‌ আর ওনেইডাদের মধ্যে ছিল মাত্র তিনটি করে গোত্র। অর্থাৎ এদের একটা গোটা ভ্রাতৃত্বই তখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং যদি ধরে নেওয়া যায় যে মূল গোষ্ঠীগুলি একদা ঐ একই গোত্রগুলিকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল, তাহলে বুঝতে হয় যে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ভ্রাতৃত্বটার একটা গোত্র তখনও টিকে ছিল। গোত্র এবং ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সংগঠিত কোন গোষ্ঠী যখন বিভাজিত হয়, তখন তা ভ্রাতৃত্ব সংগঠন অনুযায়ীও বিভাজিত হতে পারে। গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে অবিরাম এক মিশ্রণ-প্রক্রিয়া চললেও, ভ্রাতৃত্বের প্রতিটা গোত্র গঠিত

BanglaBook.org

হয় কিছু নারী এবং তাদের সন্তান ও স্ত্রী-ধারার বংশধরদের নিয়ে—এরাই হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের বনিয়াদ। স্বাভাবিকভাবেই এরা একই জায়গায় থাকতে চাইত আর তার ফলে একটা আলাদা দল হিসেবে পৃথক হয়ে পড়ত। গোত্রের পুরুষ-সদস্যরা অন্য গোত্রের নারীদের বিবাহ করত এবং স্ত্রীদের সঙ্গেই বসবাস করত। এদের নিয়ে গোত্রের কোন মাথাব্যথা ছিল না, কেননা ঐ পুরুষদের সন্তানরা তাদের গোত্রের সদস্য নয়। ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির বিশদ ইতিহাস জানতে হলে প্রতিটা গোষ্ঠীর গোত্র আর ভ্রাতৃত্বগুলির মধ্যে দিয়েই তা জানতে হবে। এ-রকম কোন অনুসন্ধান চালাতে হলে খুঁজে দেখতে হবে যে ভ্রাতৃত্বগুলি কখনও গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছিল কি না। তবে এ কাজটা করা প্রায় অসম্ভব।

অতীতকালের কোন-এক অজানা সময়ে টুস্‌কারোরা-ইণ্ডিয়ানরা মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যখন তাদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়, তখন তারা উত্তর ক্যারোলিনার নিউস্‌ নদীর আশপাশের অঞ্চলে বসবাস করছিল। ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ এদেরকে ঐ এলাকা থেকে হঠিয়ে দেওয়া হয়। তখন এরা চলে যায় ইরোকোয়াদের এলাকায় এবং তারা এদেরকে মিত্রসঙ্ঘের ষষ্ঠ সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে। এই টুস্‌কারোরাদের মধ্যে দুটি ভ্রাতৃত্ব আর আটটি গোত্র আছে ঃ

প্রথম ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—১। ভালুক, ২। বীবর, ৩। বড় কচ্ছপ, ৪। বানমাছ।

দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—৫। ধূসর নেকড়ে, ৬। হলুদে নেকড়ে, ৭। ছোট কচ্ছপ, ৮। কাদাখোঁচা।

ক্যায়ুগা আর ওনোন্‌ডাগাদের ছয়টি গোত্রের সঙ্গে, সেনেকাদের পাঁচটি গোত্রের সঙ্গে এবং মোহক্‌ ও ওনেইডাদের তিনটি গোত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে এদের গোত্রগুলির। একসময় এদের মধ্যে হরিণ গোত্রটাও ছিল, কিন্তু এখন সেটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আরও দেখা যাচ্ছে যে নেকড়ে গোত্রটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—ধূসর নেকড়ে আর হলুদে নেকড়ে। কচ্ছপ গোত্রটাও ভাগ হয়েছে দু'ভাগে—বড় কচ্ছপ আর ছোট কচ্ছপ। এদের প্রথম ভ্রাতৃত্বের তিনটি গোত্র আর সেনেকা ও ক্যায়ুগাদের প্রথম ভ্রাতৃত্বের তিনটি গোত্র একই, শুধু নেকড়ে গোত্রটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। নিজেদের স্বগোত্রীয়দের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টুস্‌কারোরাদের চলে যাওয়া আর তাদের আবার ফিরে আসার মধ্যে বেশ কয়েকশ বছর কেটে গিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে একটা গোত্র দীর্ঘদিন একলা টিকে থাকতে পারত। অন্যান্য গোষ্ঠীর মতই এরাও একই ভ্রাতৃত্বের অন্যান্য গোষ্ঠীকে বলে ভ্রাতৃপ্রতিম গোত্র আর অন্য ভ্রাতৃত্বের গোত্রগুলিকে বলে জ্ঞাতি-ভ্রাতা গোত্র।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভ্রাতৃত্বগুলির গঠনের মধ্যে নানান পার্থক্য দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় যে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য মাঝেমাঝে ভ্রাতৃত্বগুলি তাদের গোত্রের মধ্যে কিছু কিছু অদল-বদল ঘটাত। কোন কোন গোত্রের শ্রীবৃদ্ধি ঘটত, লোকসংখ্যা বাড়ত, কোনটা দুর্দশাগ্রস্ত হত বা হতশ্রী হয়ে পড়ত, আবার

BanglaBook.org

কোন কোন গোত্র হয়ত-বা বিলুপ্তই হয়ে যেত। এর ফলে প্রতিটা ভ্রাতৃত্বের লোকসংখ্যায় একটা সমতা রাখার জন্য অনেক সময় কোন গোত্রকে একটা ভ্রাতৃত্ব থেকে অন্য কোন ভ্রাতৃত্বে বদলি করে দেওয়া হত। ইরোকোয়াদের মধ্যে সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে। আজ থেকে চারশ বছরের কিছু আগে গড়ে উঠেছিল মিত্রসংঘ। ভ্রাতৃত্ব সংগঠন সম্ভবত তারও আগে থেকে বিদ্যমান ছিল। এই ভ্রাতৃত্বের গঠনের মধ্যেকার, অর্থাৎ এদের গোত্রগুলির মধ্যেকার পার্থক্য থেকে বোঝা যায় ঐ মধ্যবর্তী সময়ে প্রতিটি গোত্র কোন্ কোন্ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল। যে-কোন ভাবে বিচার করলেই দেখা যায় যে, গোত্রগুলির মধ্যে তেমন কিছু পরিবর্তন ঘটেনি, আর এ থেকে ভ্রাতৃত্ব এবং গোত্রের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইরোকোয়া গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মোট আটত্রিশটা গোত্র আছে, আর চারটি গোষ্ঠীতে আছে মোট আটটা ভ্রাতৃত্ব।

ইরোকোয়া ভ্রাতৃত্বের লক্ষ্য ও কার্যকলাপ গ্রীক ভ্রাতৃত্বের থেকে নিম্ন স্তরের ছিল, যদিও গ্রীক ভ্রাতৃত্বের কার্যকলাপ সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। তাছাড়া, রোমানদের ভ্রাতৃত্বের কার্যকলাপের থেকেও ইরোকোয়াদের ভ্রাতৃত্বের কার্যকলাপ নিম্ন স্তরের ছিল। রোমান ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে ইরোকোয়া ভ্রাতৃত্বের তুলনা করতে হলে আমাদের পুরো দুটি ঐতিহাসিক যুগ পিছিয়ে যেতে হবে, গিয়ে পৌঁছতে হবে সমাজের এক সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায়। এদের পার্থক্যটা আসলে অগ্রগতির মাত্রার পার্থক্য, কোন বিশেষ বস্তুর পার্থক্য নয়। কারণ এই উভয় জাতির মধ্যে একই প্রতিষ্ঠান দেখা গেছে, যে-সব প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে একই বা একইরকম কোন সূত্র থেকে এবং উভয় জাতিই এইসব প্রতিষ্ঠানকে তাদের সমাজব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে সুদীর্ঘকাল ধরে রক্ষা করেছে। রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগে পর্যন্ত গ্রীক ও রোমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে গোত্র-ভিত্তিক সমাজ একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবেই টিকে ছিল। আর ইরোকোয়ারা যেহেতু সভ্য যুগের থেকে পুরো দুটি ঐতিহাসিক যুগ পিছিয়ে ছিল, তাই তাদের মধ্যে গোত্রভিত্তিক সমাজ তখনও পর্যন্ত টিকেই ছিল। কাজেই ইণ্ডিয়ানদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের কার্যকলাপ ও রীতিনীতি সংক্রান্ত যে-কোন তথ্যই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সমাজের উন্নততর অবস্থায় যে প্রতিষ্ঠানটি অত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল, তার প্রাচীন চরিত্রটাকে এইসব তথ্য থেকেই সম্যক বুঝতে পারা যায়।

ইরোকোয়াদের মধ্যে এই ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের কাজ ছিল অংশত সামাজিক এবং অংশত ধর্মীয়। বাস্তব দৃষ্টান্ত থেকেই এর কার্যকলাপ ও রীতিনীতিকে সবথেকে ভালোভাবে বোঝা যাবে। একেবারে ছোট একটা দৃষ্টান্ত দিয়েই শুরু করা যাক—খেলাধুলো। গোষ্ঠীর ও মিত্রসঙ্ঘের পরিষদে প্রায়ই খেলাধুলোর ব্যবস্থা করা হত। এ ব্যাপারে সেনেকাদের বল খেলার কথা উল্লেখ করা যায়। এখানে একটা ভ্রাতৃত্ব খেলতে নামে অন্য একটা ভ্রাতৃত্বের বিরুদ্ধে। খেলার ফলাফল নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে বাজি ধরে। প্রতিটা ভ্রাতৃত্ব তার সেরা খেলোয়াড়দের পাঠায়। এক-একটা দলে সাধারণত ছয় থেকে দশজন করে খেলোয়াড় থাকে। যে মাঠে খেলা হচ্ছে, সেই মাঠের দুদিকে দু'পক্ষের

BanglaBook.org

লোকেরা আলাদা আলাদা করে জমায়েত হয়। খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে উভয় ভ্রাতৃত্বের সদস্যরাই খেলার ফলাফলের ওপর তাদের নানান ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বাজি রাখে। এইসব জিনিস তত্ত্বাবধায়কদের জিম্মায় রাখা হয়। খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে খেলা অনুষ্ঠিত হয়, প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি হয় খেলার মধ্যে। মাঠের দু'দিক থেকে দু'পক্ষের লোকেরা আগ্রহভরে খেলা দেখে এবং নিজেদের দল কোন সাফল্য পেলেই চিৎকার করে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেয়।[১]

ভ্রাতৃত্ব সংগঠন নানানভাবে নিজেকে মূর্ত করে তোলে। গোষ্ঠী-পরিষদে উভয় ভ্রাতৃত্বের সাকেম্ ও প্রধানরা সাধারণত একটা কাল্পনিক পরিষদ-অগ্নির দুটি বিপরীত দিকে বসে। এই দু'দিকে বসা দল দুটিকে বক্তারা তাদের নিজ নিজ ভ্রাতৃত্বের প্রতিনিধি হিসেবেই সম্বোধন করে থাকে। ব্যবসায়িক লেনদেনের কাজে এই ধরণের আনুষ্ঠানিকতা লাল-মানুষদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ব্যাপার।

এছাড়া আরও কিছু কাজও ভ্রাতৃত্ব করত। কেউ নিহত হলে তার গোত্র-পরিষদ আলোচনায় বসত। ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে ঐ হত্যার বদলা নেওয়ার ব্যবস্থাও করত। হত্যাকারীর গোত্রও তাদের পরিষদের সভা ডাকত। নিহত ব্যক্তির গোত্রের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার বা মার্জনা আদায়ের চেষ্টা করত তারা। কিন্তু হত্যাকারী আর নিহত ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভ্রাতৃত্বের সদস্য হয়ে থাকলে হত্যাকারীর গোত্র সাধারণত অপর গোত্রটির ভ্রাতৃত্বকে আহ্বান জানাত তাদের সঙ্গে মিলে ঐ হত্যাকারীটির জন্য মার্জনা আদায় করতে। এক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বটি তার পরিষদের একটা সভা ডাকে, তারপর অন্য ভ্রাতৃত্বটির কাছে একটা প্রতিনিধি-দল পাঠায়। এই প্রতিনিধি-দলের সঙ্গে থাকে একটা ওয়াম্পাম্ বা সামুদ্রিক গুটিকার সাদা রঙের কোমরবন্ধনী। এরা ঐ ভ্রাতৃত্বটিকে তাদের পরিষদের সভা ডেকে ব্যাপারটার একটা বোঝাপড়া করার অনুরোধ জানায়। নিজেদের অনুতাপের নমুনা হিসেবে তারা মৃত ব্যক্তির পরিবার ও গোত্রকে নানান মূল্যবান ক্ষতিপূরণ দেয়। ভালো-মন্দ একটা-কিছু সিদ্ধান্ত না-হওয়া পর্যন্ত দুটি পরিষদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলতেই থাকে। কোন-একটা গোত্রের প্রভাবের চেয়ে অনেকগুলি গোত্র নিয়ে গড়ে ওঠা ভ্রাতৃত্বের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই বেশি হয়ে থাকে। আর অন্য ভ্রাতৃত্বটাকে কাজে নামাতে পারলে মার্জনালাভের সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়, বিশেষ করে অপরাধের গুরুত্ব লাঘব হওয়ার মত পরিস্থিতি থাকলে তো কথাই নেই। এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি সভ্যতার যুগ আসার আগে গ্রীক ভ্রাতৃত্বগুলি কত স্বাভাবিকভাবে হত্যা সংক্রান্ত বিষয়ের একমাত্র না হলেও প্রধান দায়িত্বভার পেয়েছিল, আর সেইসঙ্গেই পেয়েছিল কোন হত্যাকারী শাস্তির হাত থেকে নিস্তার পেলে তার শুদ্ধিকরণের দায়িত্বও। এছাড়াও আমরা দেখতে পাই যে রাজনৈতিক সমাজ গড়ে ওঠার পর কোন হত্যাকারীকে আদালতের সামনে অভিযুক্ত করার দায়িত্বটাও অত্যন্ত সঙ্গত-ভাবে ভ্রাতৃত্বের ওপরেই ন্যস্ত হয়েছিল।

গোষ্ঠীর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ভ্রাতৃত্ব সংগঠন এক বিচিত্র উপায়ে নিজের

১। "লীগ অফ দ্য ইরোকোয়াজ্", পৃঃ ২৯৪।

BanglaBook.org

ভূমিকা পালন করত। মৃত ব্যক্তির আপন ভ্রাতৃত্বের লোকেরা শবানুগমন করত আর অন্য ভ্রাতৃত্বের লোকজনেরা দায়িত্ব নিত যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের। কোন সাকেম্ মারা গেলে, তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হওয়ার পরেই অন্য ভ্রাতৃত্বের লোকেরা ঐ সাকেমের সামুদ্রিক গুটিকার কোমরবন্ধনীটা পাঠিয়ে দিত ওনোন্ডাগায় কেন্দ্রীয় পরিষদ-অগ্নির কাছে—আসলে এইভাবে তার মৃত্যুর কথাটা জানানো হত সব জায়গায়। পরবর্তী সাকেমের অভিষেক না-হওয়া পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করা হত এই কোমরবন্ধনীটা। নতুন সাকেমের অভিষেকের সময় তার পদের তক্‌মা হিসেবে এই কোমরবন্ধনী তাকে প্রদান করা হত। সেনেকাদের আটজন সাকেমের অন্যতম 'সুন্দর হ্রদ'-এর (না-নে-ও-দি-ইও) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় (কয়েক বছর আগে এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল) সাতাশ জন সাকেম্ ও প্রধান এবং উভয় ভ্রাতৃত্বের প্রচুর সংখ্যক লোক জমায়েত হয়েছিল। ঐ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মৃতদেহের উদ্দেশে প্রথাগত ভাষণ এবং মৃতদেহ অপসারণের আগে অন্যান্য ভাষণ দেওয়ার কাজ অন্য ভ্রাতৃত্বের সদস্যরাই করেছিল। ভাষণ শেষ হওয়ার পর, অন্য ভ্রাতৃত্বের মধ্যে থেকে বাছাই-করা কিছু লোক মৃতদেহটাকে বহন করে নিয়ে যায় কবরের কাছে। এদের ঠিক পিছনে চলে সাকেম্ ও প্রধানরা, তারপর মৃত ব্যক্তির পরিবার ও গোত্রের লোকেরা, তাদের পিছনে ঐ ভ্রাতৃত্বের অন্য সদস্যরা, সবশেষে অপর ভ্রাতৃত্বের লোকজনরা। মৃতদেহটাকে কবরে শুইয়ে দেওয়ার পর, মাটি দিয়ে গর্তটা ভরাট করার জন্য সাকেম্ ও প্রধানরা তার চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়াল। সবথেকে বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি, তিনি প্রথমে মাটি ঢাললেন। তারপর বাকিরা পালাক্রমে তিন কোদাল করে মাটি দিল কবরে। এদের ধর্মীয় ব্যবস্থায় এই তিন সংখ্যাটার এক বিশেষ গুরুত্ব আছে—প্রথম কোদালের মাটিটা ঈশ্বরের জন্য, দ্বিতীয়টা সূর্যের আর তৃতীয়টা মাতা-ধরিত্রীর উদ্দেশে নিবেদিত। কবর দেওয়া শেষ হওয়ার পর বয়োজ্যেষ্ঠ সাকেম্ একটা ভাষণ দিলেন এবং মৃত সাকেমের "শিঙের মুকুট"টাকে (এই শিঙ হচ্ছে সাকেম্ পদের প্রতীক) তার কবরের মাথার কাছটায় রেখে দিলেন। পরবর্তী সাকেমের অভিষেক না-হওয়া পর্যন্ত ঐ শিঙের মুকুটটা ওখানেই থাকবে। এই পরবর্তী সাকেমের অভিষেকের সময় "শিঙের মুকুট"-টাকে মৃত সাকেমের কবরের ওপর থেকে তুলে নিয়ে তার উত্তরসূরীর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হবে।[১] এই একটা বিষয় থেকেই ভ্রাতৃত্বের সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপ এবং প্রাচীন সমাজের সাংগঠনিক ব্যবস্থায় এর একান্ত স্বাভাবিক অবস্থাকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

১। ইরোকোয়ারা মনে করে যে দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া আত্মার পৃথিবী থেকে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছতে দশ দিন সময় লাগে। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর দশ দিন পরে রাত্রিবেলা লোকেরা তার উদ্দেশে বিলাপ করার জন্য সমবেত হয়, অপরিসীম দুঃখ বেদনায় ভেঙে পড়ে তারা। অন্ত্যেষ্টিকালীন সঙ্গীত বা বিলাপ মেয়েরাই করে থাকে। ঐ দশদিন প্রতিরাতে মৃতের কবরে আগুন জ্বালানো এদের একটা প্রাচীন প্রথা। এগার দিনের দিন একটা ভোজসভার আয়োজন করা হয়—মৃতের আত্মা তখন পৌঁছে গেছে স্বর্গে, চিরবিশ্রামের দেশে, কাজেই আর তো বিলাপ করার কোন মানে নেই। ভোজসভা সাঙ্গ হলেই গোটা ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটে।

বেশ কিছু গোত্রের সাকেম্ ও প্রধান নির্বাচনের ব্যাপারেও ভ্রাতৃত্ব সরাসরিভাবে যুক্ত ছিল। এই নির্বাচনকে খারিজ করা বা বহাল রাখার ক্ষমতা ভ্রাতৃত্বের হাতে থাকত। আগেই বলা হয়েছে যে কোন মৃত সাকেমের গোত্র তার উত্তরসূরীকে বা দ্বিতীয় সারির কোন প্রধানকে নির্বাচিত করার পর উভয় ভ্রাতৃত্বকে দিয়েই সেই নির্বাচন স্বীকার ও অনুমোদন করাতে হত। ধরেই নেওয়া হত যে মৃত সাকেমের নিজের গোত্রের ভ্রাতৃত্বটি এই নির্বাচনকে অনুমোদন করবেই। কিন্তু অপর ভ্রাতৃত্বটির সম্মতিও আবশ্যক ছিল এবং এরা কখনও কখনও ঐ নির্বাচনের বিরোধিতাও করত। উভয় ভ্রাতৃত্বই তাদের পরিষদের সভা ডাকত। ঐ সভা থেকেই ঘোষণা করা হত যে নতুন সাকেমের নির্বাচনকে মেনে নেওয়া হচ্ছে নাকি বাতিল করা হচ্ছে। উভয় ভ্রাতৃত্বই এই মনোনয়নকে মেনে নিলে নির্বাচন সম্পূর্ণ হত। কিন্তু কোন-একটা ভ্রাতৃত্ব যদি তা মেনে না নিত, তাহলে ঐ মনোনয়ন বাতিল হয়ে যেত এবং গোত্র তখন আবার নতুন একজনকে নির্বাচিত করত। আগেই বলা হয়েছে যে গোত্রের এই নির্বাচনকে ভ্রাতৃত্বগুলি মেনে নিলেই কিন্তু সব কাজ শেষ হত না। নতুন সাকেম্ বা নতুন প্রধানকে তার পদে নিযুক্ত করত মিত্রসঙ্ঘের পরিষদ। এই অধিকার একমাত্র এই পরিষদেরই ছিল।

আধুনিক যুগে এসে সেনেকারা তাদের 'আরোগ্য নিকেতন'-গুলিকে (Medicine Lodges) আর টিকিয়ে রাখতে পারে নি। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত এগুলি ছিল তাদের ধর্মীয় ব্যবস্থার এক বিশিষ্ট অঙ্গ। একটা আরোগ্য নিকেতন থাকার অর্থই ছিল তাদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা, সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুপ্ত অনুষ্ঠানাদির চর্চা করা। এদের দুটি ভ্রাতৃত্বেরই একটা করে আরোগ্য নিকেতন ছিল। এ থেকে ধর্মাচরণের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে আরো ভালোভাবে বোঝা যায়। এইসব আরোগ্য নিকেতন সম্বন্ধে অথবা তাদের উৎসব প্রসঙ্গে তেমন কিছু জানা যায় নি। দুটি নিকেতনই ছিল আসলে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক, একটা আনুষ্ঠানিক দীক্ষাদানের সাহায্যে নতুন সদস্যদের এর মধ্যে গ্রহণ করা হত।

একেবারে সঠিক অর্থে বললে, ভ্রাতৃত্বের কোন সরকারী কার্যকলাপ ছিল না। এই কাজের দায়িত্ব শুধু গোত্র, গোষ্ঠী এবং মিত্রসঙ্ঘের হাতেই ছিল। তবে সামাজিক বিষয়-গুলির ব্যাপারে ভ্রাতৃত্বের হাতে বিপুল পরিমাণ প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকত এবং মানুষের অবস্থার উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্মীয় বিষয়সমূহের সঙ্গে নিজেকে আরো বেশি বেশি করে যুক্ত করে ফেলতে পেরেছিল সে। গ্রীকদের ভ্রাতৃত্বের এবং রোমান-দের কিউরিয়ার একজন করে নেতা থাকত, কিন্তু ইরোকোয়াদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের এ-রকম কোন নেতা থাকত না। এদের ভ্রাতৃত্বের কোন প্রধান থাকত না এবং গোত্র ও গোষ্ঠীর থেকে পৃথক কোন ধর্মীয় কর্তাব্যক্তিও থাকত না। ইরোকোয়াদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের একেবারে প্রাথমিক ও প্রাচীন রূপটিই চালু ছিল, কিন্তু স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী বিকাশের ধারায় এটি সজীব হয়ে উঠেছিল। আর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কর্তব্য সমাধা করার দৌলতে এটি নিজের স্থান পাকা করে নিতে পেরেছিল। মানবজাতির ইতিহাসে যে-সব প্রতিষ্ঠান স্থায়িত্ব অর্জন করতে পেরেছে, সেগুলির প্রতিটিই মানুষের কোন-না-

BanglaBook.org

কোন স্থায়ী প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। গোত্র, গোষ্ঠী এবং মিত্রসঙ্ঘের উপস্থিতি ভ্রাতৃত্বের অস্তিত্বকে সুনিশ্চিত করেছিল। তবে যে-সব বিষয়ের উন্নতির কাজে ভ্রাতৃত্ব সাহায্য করতে পারত, সেইসব বিষয়কে মূর্ত করে তোলার জন্য দরকার ছিল আরও সময় এবং আরও অভিজ্ঞতা।

সাধারণ নীতি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও ভ্রাতৃত্বের অস্তিত্ব ছিল। সম্ভবত ইরোকোয়াদের থেকে এদের ভ্রাতৃত্ব ছিল আরও উন্নত ও প্রভাবশালী সংগঠন। দুর্ভাগ্যবশত, স্পেনের বিজয়ের পরবর্তী একশ বছরে স্পেনীয় লেখকরা যে প্রাথমিক বর্ণনাটুকু দিয়েছিলেন, সেটুকু ছাড়া এদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠন সম্বন্ধে আমাদের হাতে আর কোন তথ্যই নেই। ত্লাস্কালার পুয়েব্লোর চারটি অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়েছিল যে ত্লাস্কালানরা, তাদের মধ্যে চারটি "বংশ" ছিল এবং খুব সম্ভবত চারটি ভ্রাতৃত্বও ছিল। এদের যা লোকসংখ্যা ছিল, তাতে অনায়াসেই চারটি গোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু যেহেতু তারা ঐ পুয়েব্লোর অঞ্চল দখল করেছিল এবং তাদের ভাষাতেই কথা বলত, সেহেতু ভ্রাতৃত্ব সংগঠন গড়ে তোলা তাদের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল। প্রতিটি বংশ বা ভ্রাতৃত্বের একটা করে নিজস্ব সামরিক সংগঠন থাকত, থাকত একটা নিজস্ব উর্দি ও নিশান এবং একজন সমরপ্রধান (Teuctli)। এই সমরপ্রধানই ছিল তাদের সামরিক সর্বাধিনায়ক। যুদ্ধে যাওয়ার সময় এক-একটা গোটা ভ্রাতৃত্বই যুদ্ধে যেত। হোমারের যুগের গ্রীকদের মধ্যেও ভ্রাতৃত্ব এবং গোষ্ঠীভিত্তিক সামরিক সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল। তাই দেখি নেস্টার অ্যাগামেননকে পরামর্শ দিচ্ছেন, "সৈন্যবাহিনীকে ভ্রাতৃত্ব অনুযায়ী এবং গোষ্ঠী অনুযায়ী ভাগ করে দাও, তাতে করে একটা ভ্রাতৃত্ব অন্য ভ্রাতৃত্বকে সাহায্য করতে পারবে, একটা গোষ্ঠী সাহায্য করতে পারবে আর-একটা গোষ্ঠীকে।"[১] সবথেকে উন্নত ধরণের গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে জ্ঞাতিত্বের নীতিই সামরিক সংগঠনের প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়। একই-ভাবে, আজটেকরাও যখন মেক্সিকোর পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ানদের এলাকা জয় করে, তখন এই পুয়েব্লোরা চারটি স্পষ্ট ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি ভাগের লোকেদের নিজেদের মধ্যে যত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, তত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক একটা ভাগের লোকেদের সঙ্গে অন্য ভাগের লোকেদের ছিল না। ত্লাস্কালানদের মতই এদের মধ্যেও চারটি পৃথক বংশ ছিল, আর খুব সম্ভবত চারটি পৃথক পৃথক ভ্রাতৃত্বে সংগঠিত ছিল এরা। এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা প্রথা ও আচার ছিল এবং এরা যুদ্ধে যেত পৃথক পৃথক বাহিনী হিসেবে। এদের ভৌগোলিক এলাকাটাকে বলা হত মেক্সিকোর চার শিবির। এ বিষয়ে পরে আবার আলোচনা করা হবে।

বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থায় থাকা ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এই সংগঠনটির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন অনুসন্ধান চালানো হয়নি বললেই চলে। তবে, সাংগঠনিক ধারা-বাহিকতার এক অত্যাবশ্যক স্তর হিসেবে, একান্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এর উদ্ভবকে এবং

১। ইলিয়াড, II, ৩৬২।

BanglaBook.org

শাসন সংক্রান্ত কাজ ছাড়া যে-সমস্ত কাজ সে করত সেগুলিকে বিচার-বিবেচনা করলে মনে হয় প্রধান প্রধান সমস্ত গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই ভ্রাতৃত্বের অস্তিত্ব ছিল।

কিছু কিছু গোষ্ঠীর সংগঠনে ভ্রাতৃত্বগুলি এক বিশিষ্ট চেহারায় দেখা দেয়। যেমন, চোক্‌টাদের গোত্রগুলির মধ্যে দুটি ভ্রাতৃত্ব আছে। গোত্রগুলির পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্ককে চিহ্নিত করার জন্য এই ভ্রাতৃত্বগুলির কথা উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক। প্রথম ভ্রাতৃত্বটাকে বলা হয় "বিভক্ত মানুষেরা"। এই ভ্রাতৃত্বে আছে চারটি গোত্র। দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্বটার নাম হল "প্রিয় মানুষেরা"। এর মধ্যেও চারটি গোত্র আছে। গোত্রগুলি এইভাবে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলেই দুটি ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। এই ভ্রাতৃত্বগুলির কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করা অবশ্যই দরকার। কিন্তু তা না জানলেও, শুধু গোত্রগুলির এই বিভাজন থেকেই ভ্রাতৃত্বের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এক জোড়া গোত্র থেকে (কোন গোষ্ঠীতেই দুয়ের থেকে কম গোত্র দেখা যায় না) বিবর্তিত হয়ে মিত্রসংঘের স্তরে উপনীত হওয়ার সমগ্র প্রক্রিয়াটাকে ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদের জানা তথ্যের সাহায্যে তত্ত্বগতভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। প্রক্রিয়াটা এ-রকম—কোন একটা গোত্রের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তা ভেঙে দুটি গোত্রের সৃষ্টি হল ; কালক্রমে এই গোত্র দুটিও বিভাজিত হল এবং একসময় এরা দুটি বা তিনটি ভ্রাতৃত্বে পুনর্মিলিত হল ; এই ভ্রাতৃত্বগুলিকে নিয়ে গড়ে উঠল একটা গোষ্ঠী, যে গোষ্ঠীর সকল সদস্য একই ভাষায় কথা বলে ; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীর মধ্যেও বিভাজন দেখা দিল, সৃষ্টি হল বেশ কিছু গোষ্ঠী। গোষ্ঠীগুলি একসময় পুনর্মিলিত হল মিত্রসঙ্ঘে। অর্থাৎ, একজোড়া গোত্র থেকে শুরু করে, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর পথ বেয়ে মানুষ পেঁছিলো মিত্রসঙ্ঘের স্তরে।

চিকামাদের মধ্যে দুটি ভ্রাতৃত্ব দেখা যায়। একটা ভ্রাতৃত্বে আছে চারটি গোত্র, অপরটাতে আছে আটটা গোত্র। নীচে এদের নাম দেওয়া হল ঃ

ক। চিতাবাঘ ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—১। বনবিড়াল, ২। পাখি, ৩। মাছ, ৪। হরিণ।

খ। সবুজ কাঁচপোকা ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—৫। র‍্যাকুন, ৬। সবুজ কাঁচপোকা, ৭। শিং-ওলা শিকারী কুকুর (Royal), ৮। হাশ্‌কোনি (Hushkoni), ৯। কাঠবিড়ালী, ১০। বড় কুমীর, ১১। নেকড়ে, ১২। শ্যামা পাখি।

চোক্‌টা এবং চিকামাদের ভ্রাতৃত্বের বিশদ বিবরণ দিতে আমি অক্ষম। প্রায় চোদ্দ বছর আগে রেভারেণ্ড ডক্টর সাইরাস বাইংটন এবং রেভারেণ্ড চার্লস সি. কোপল্যাণ্ড এদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের কথা জানিয়েছিলেন আমাকে, কিন্তু এগুলির কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁরা তেমন কিছুই জানাননি।

গোত্রগুলির বিভাজনের ফল হিসেবে এক স্বাভাবিক বিকাশের পথ চেয়ে কিভাবে ভ্রাতৃত্ব সংগঠন গড়ে ওঠে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ নজির দেখতে পাওয়া যায় মোহেগান্ গোষ্ঠীর মধ্যে। এদের তিনটি মূল গোত্র ছিল—নেকড়ে, কচ্ছপ এবং টার্কি।

কালক্রমে এই তিনটি গোত্রের মধ্যেই বিভাজন ঘটে, এদের প্রতিটি উপ-শাখা এক-একটা গোত্রে পরিণত হয়। কিন্তু এই গোত্রগুলি তাদের নিজ নিজ ভ্রাতৃত্বের নাম হিসেবে নিজেদের মূল গোত্রগুলির নামকেই চালু রাখে। অর্থাৎ প্রতিটা গোত্রের উপশাখাগুলি এক-একটা ভ্রাতৃত্বে পুনর্মিলিত হয়। এ থেকে স্থিরনিশ্চিতভাবে সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটিকে বুঝতে পারা যায়, যে প্রক্রিয়ায় একটা গোত্র কালক্রমে বিভাজিত হয়ে অনেকগুলি গোত্রের জন্ম দেয় এবং এই গোত্রগুলি একটা ভ্রাতৃত্ব সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটার প্রমাণ মেলে ভ্রাতৃত্বের নামকরণের মধ্যে। নীচে তালিকা দেওয়া হল ঃ

১। নেকড়ে ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। কুকুর, ৪। অপোস্যাম্ (Opossum)।

২। কচ্ছপ ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—৫। ছোট কচ্ছপ, ৬। কাদা-কচ্ছপ, ৭। বড় কচ্ছপ, ৮। হলুদ বানমাছ।

৩। টার্কি ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—৯। টার্কি, ১০। সারস, ১১। মুরগিছানা।

দেখা যাচ্ছে যে মূল নেকড়ে গোত্রটা বিভক্ত হয়েছে চারটি গোত্রে, কচ্ছপ গোত্রটাও বিভক্ত হয়েছে চারটি গোত্রে, আর টার্কি গোত্রটা থেকে সৃষ্টি হয়েছে তিনটি গোত্র। প্রতিটা নতুন গোত্রই একটা করে নতুন নাম নিয়েছে, শুধু মূল গোত্রটা তার আদি নামটাকেই বজায় রেখেছে। আর আদি গোত্র হওয়ার দরুন এই মূল গোত্রের নাম অনুযায়ীই ভ্রাতৃত্বের নামকরণ করা হয়েছে। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে গোত্রের বাহ্যিক সংগঠনের এইভাবে বিভাজিত হওয়া আর তারপর এক-একটা অংশের নিজ নিজ ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠার এ-রকম সোজা-সরল নজির একান্তই বিরল। এদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সংগঠন গড়ে ওঠে গোত্রগুলির মধ্যেকার জ্ঞাতিত্ব-সম্পর্কের ভিত্তিতে। যে মূল গোত্রটি থেকে বাকি গোত্রগুলি গড়ে ওঠে, তার নাম প্রায় কখনোই জানা যায় না। তবে ঐ নামটা সর্বদাই ভ্রাতৃত্বের নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্রীকদের মতো এদের ভ্রাতৃত্বও ছিল মূলত একটা সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন, কোন সরকারী সংগঠন নয়। আর তাই এর বাহ্যিক চেহারাটা সমাজ পরিচালনার কাজে একান্ত আবশ্যক ঐ গোত্র বা গোষ্ঠীর মতো নজর-কাড়া হতে পারেনি। এথেনিয়দের বারোটি ভ্রাতৃত্বের মধ্যে মাত্র একটার নামই আমরা জানতে পেরেছি। ইরোকায়াদের ভ্রাতৃত্বগুলির কোন নাম ছিল না, সেগুলিকে শুধু ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক হিসেবেই চিহ্নিত করা হত।

দেলাওয়ার এবং মান্‌সীদের মধ্যেও ঐ তিনটি গোত্রই দেখা যায়—নেকড়ে, কচ্ছপ এবং টার্কি। দেলাওয়ারদের প্রতিটা গোষ্ঠীতে বারোটা করে প্রাথমিক গোত্র আছে, কিন্তু এগুলির বংশপরম্পরা গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং কোন গোত্রীয় নামও এদের নেই। তবে এই প্রাথমিক গোত্রগুলি আসলে আলাদা গোত্র গঠনের দিকেই একটা পদক্ষেপ।

BanglaBook.org

উত্তর-পশ্চিম উপকূলের থিন্‌কীট্‌দের মধ্যেও ভ্রাতৃত্বের দেখা মেলে। এখন এদের দুটি ভ্রাতৃত্ব বর্তমান আছে ঃ

১। নেকড়ে ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—১। ভালুক, ২। ঈগল, ৩। শুশুক, ৪। হাঙর, ৫। এল্‌কা।

২। দাঁড়কাক ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—৬। ব্যাঙ, ৭। হংসী, ৮। সিন্ধুঘোটক, ৯। পেঁচা, ১০। স্যামন মাছ।

ভ্রাতৃত্বের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রতিটা ভ্রাতৃত্বের গোত্রগুলি একটা আদি গোত্র থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল।[১] নেকড়ে ভ্রাতৃত্বের যে-কোন গোত্রের সদস্যরা দাঁড়কাক ভ্রাতৃত্বের যে-কোন গোত্রের সদস্যকে বিবাহ করতে পারত, আবার দাঁড়কাক ভ্রাতৃত্বের যে-কোন গোত্রের সদস্য বিবাহ করতে পারত নেকড়ে ভ্রাতৃত্বের যে-কোন গোত্রের সদস্যকে।

ওপরের তথ্যগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে আমেরিকান আদিবাসীদের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অনেকগুলির মধ্যেই ভ্রাতৃত্বের অস্তিত্ব আছে। আমরা যে-সব গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করেছি, তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অস্তিত্ব থেকে অনুমান করা চলে যে গ্যানোয়ানিয়ান্‌ বর্গের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই ভ্রাতৃত্বের অস্তিত্ব ছিল। ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের গোত্র ও গোষ্ঠীতে লোকসংখ্যা ছিল খুব বেশি। তাই এদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন, তার ফলে সংগঠনটি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ারও সুযোগ পেয়েছিল। প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর রূপটা তখনও আদিম ধরনের হলেও, তখনই এর মধ্যে গ্রীক ও রোমানদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের মৌলিক উপাদানগুলি বিদ্যমান ছিল। এখন এটা জোর দিয়েই বলা চলে যে প্রাচীন সমাজের পুরো সাংগঠনিক পরম্পরাটা—অর্থাৎ গোত্র, ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীগুলির মিত্রসংঘ—আমেরিকা মহাদেশে অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবেই টিকে আছে। পরে আরও নানান নজির উপস্থাপিত করে আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করব যে পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশেই এই গোত্রভিত্তিক সংগঠনের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল।

পরবর্তীকালে যদি শুধু আমেরিকান আদিবাসীদের গোষ্ঠীগুলির ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের কার্যকলাপ নিয়ে কোন অনুসন্ধান চালানো হয়, তাহলে আমাদের এই অর্জিত জ্ঞানটুকু ইণ্ডিয়ানদের জীবন ও আচার-আচরণের নানান দুর্বোধ্য বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে সাহায্য করবে, আলোকপাত করবে তাদের রীতি-নীতি ও প্রথার ওপর, জীবন ও শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনার ওপর।

BanglaBook.org

১। ব্যান্‌ক্রফ্‌ট-এর "নেটিভ রেসেস অফ দ্য প্যাসিফিক্‌ স্টেট্‌স",—I, পৃঃ ১০৯।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইরোকোয়া গোষ্ঠী

কোন ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীকে তার ইতিবাচক উপাদানগুলির সাহায্যে উপস্থাপিত করা মোটেই সহজসাধ্য কাজ নয়। তা সত্ত্বেও এটা এক বিশিষ্ট সংগঠন এবং আমেরিকার বিপুল সংখ্যক আদিবাসীদের সর্বোচ্চ সংগঠন। বিভাজনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এই আদিবাসীরা বহু সংখ্যক পৃথক পৃথক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সংখ্যার এই প্রাচুর্যটাই ছিল তাদের অবস্থার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রতিটা গোষ্ঠীর আলাদা আলাদা নাম ছিল, আলাদা আলাদা উপ-ভাষা (dialect) ছিল, নিজের নিজের সর্বোচ্চ সরকার এবং একটা করে ভূখণ্ডও ছিল। এই ভূখণ্ডটাকে গোষ্ঠী তার নিজস্ব সম্পদ হিসেবে রক্ষা করত। যত উপ-ভাষা, প্রায় ততগুলিই গোষ্ঠী ছিল, কারণ ভাষাগত পার্থক্য শুরু হওয়ার আগে মানুষদের বিভাজন প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হয় নি। অর্থাৎ, কিছু ইণ্ডিয়ান আদিবাসী একটা জায়গায় বসবাস করত, একসময় তারা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তারপর তাদের ভাষার মধ্যে দেখা দিল পার্থক্য, একেক দিকে ছড়িয়ে পড়ল তারা, প্রত্যেকেই হয়ে উঠল স্বাধীন—বিকাশের এই স্বাভাবিক গতিপথেই গড়ে উঠেছে ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলি।

আমরা আগেই দেখেছি যে ভ্রাতৃত্ব সংগঠনটা ঠিক কোন শাসন ব্যবস্থাগত সংগঠন ছিল না, এটা ছিল একটা সামাজিক সংগঠন। আর গোত্র, গোষ্ঠী ও মিত্রসংঘ ছিল সরকার সংক্রান্ত ধারণার বিকাশের পথে একেকটা একান্ত প্রয়োজনীয় ও যুক্তিসম্মত স্তর। গোত্র-ভিত্তিক সমাজে গোষ্ঠীর বনিয়াদের ওপরেই টিকে থাকে মিত্রসংঘ। আবার গোত্র ছাড়া গোষ্ঠীও টিকে থাকতে পারে না, কিন্তু ভ্রাতৃত্ব ছাড়াও এগুলি টিকে থাকতে পারে। এই পরিচ্ছেদে আমি দেখাতে চেষ্টা করব যে কিভাবে সম্ভবত একটিই জনসম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে এই অসংখ্য গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছিল, কী কী কারণে তাদের মধ্যে অবিরাম এক বিভাজন প্রক্রিয়া চলতে পেরেছিল এবং কোন্ কোন্ প্রধান বৈশিষ্ট্য কোন ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীকে একটা সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে।

অনেক ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর একেবারে নিজস্ব একটা উপ-ভাষা এবং ভূখণ্ড থাকার ফলে, তাদের জনসংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও তাদেরকে প্রায়শই 'জাতি' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু 'গোষ্ঠী' আর 'জাতি'—এ দুটি ঠিক পরস্পরের সমতুল শব্দ নয়। গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, একই শাসনব্যবস্থার অধীনে ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠীগুলি যতক্ষণ না এক হয়ে মিশে যাচ্ছে, ততক্ষণ কোন জাতি গঠিত হতে পারে না। অ্যাটিকায় এইভাবে একাঙ্গীভূত হয়েছিল চারটি এথেনিয় গোষ্ঠী, স্পার্টায় তিনটি ডোরিয়ান গোষ্ঠী এবং রোমে তিনটি লাতিন ও স্যাবাইন্ গোষ্ঠী। রোম যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠে

BanglaBook.org

পৃথক পৃথক অঞ্চলে বসবাসকারী স্বাধীন গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে, কিন্তু এই একাঙ্গীভবন তাদেরকে আরও উন্নত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একই অঞ্চলে ঐক্যবদ্ধ করে। তবে গোত্র ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে স্থানীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতাটা রয়েই যায়। জাতির সঙ্গে সবথেকে বেশি সাদৃশ্য রয়েছে মিত্রসঙ্ঘের, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দুটি পুরোপুরি এক জিনিস নয়। যেখানে গোত্রভিত্তিক সংগঠন বিদ্যমান থাকে, সেখানে ঐ সাংগঠনিক পরম্পরা যে-কোন বিষয়কে ঠিক ঠিক ভাবে চিহ্নিত করার মত অভিধাই প্রয়োগ করে থাকে।

একটা ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠী গড়ে ওঠে অনেকগুলি গোত্রকে নিয়ে, যে গোত্রগুলির উদ্ভব ঘটেছে একটি বা দুটি মূল গোত্র থেকে। এর সমস্ত সদস্যই বিবাহসূত্রে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং এরা সকলে একই উপ-ভাষায় কথা বলে থাকে। বাইরের লোকেরা গোষ্ঠীকে দেখতে পায়, কিন্তু গোত্রকে দেখতে পায় না। অন্য ভাষাভাষী লোকেরাও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—এমন ঘটনা আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে একান্তই বিরল। এ-রকম ঘটনা একমাত্র তখনই ঘটে, যখন দুটি সদৃশ ভাষাভাষী গোষ্ঠী—যাদের মধ্যে একটা দুর্বল, আর একটা শক্তিশালী—মিলিত হয়। যেমন ওটো-রা মিসৌরীদেরকে পরাজিত করার পর এই দুটি গোষ্ঠী মিলিত হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক আদিবাসীদের পৃথক পৃথক স্বাধীন গোষ্ঠীতে সংগঠিত হয়ে থাকার ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, গোত্রভিত্তিক সংগঠনে সরকার সংক্রান্ত ধারণা অত্যন্ত শ্লথ গতিতে ও দুরূহ পথে বিকশিত হয়েছিল। শুধুমাত্র তাদের জ্ঞাত একটা ক্ষুদ্র অংশই সর্বোচ্চ স্তরটিতে, অর্থাৎ মিত্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত একই মূল ভাষার বিভিন্ন উপ-ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলিতে উপনীত হতে পেরেছিল। আমেরিকার কোথাও কিছু গোষ্ঠী কখনোই একটা জাতি হিসেবে একাঙ্গীভূত হয়নি।

গোত্রভিত্তিক সংগঠনের উপাদানগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা সর্বদাই বিরাজ করত। বন্য ও বর্বর গোষ্ঠীগুলির অগ্রগতির পথে এই প্রবণতা ছিল এক বিরাট প্রতিবন্ধক। ভাষাগত বিভিন্নতার দিকেও একটা ঝোঁক দেখা দেয় এবং তা ঐ বিচ্ছিন্নতার প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। তাদের সামাজিক অবস্থা এবং বসবাসের বিশাল এলাকাই এই ভাষাগত বিভিন্নতাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। একটা মৌখিক ভাষার শব্দরাজি যতই দৃঢ়মূল হোক আর তার ব্যাকরণগত আঙ্গিক যতই মজবুত হোক না কেন, মৌখিক ভাষা কখনও চিরস্থায়ী হতে পারে না। মানুষেরা নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল আর কালক্রমে দেখা দিল ভাষার বিভিন্নতা। এরই ফলে ধীরে ধীরে দেখা দিল স্বার্থের সংঘাত এবং অবশেষে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেল। এই গোটা ব্যাপারটা কিন্তু একদিনে ঘটেনি। কেটে গেছে শত শত বছর। সব মিলিয়ে সময় লেগেছে কয়েক হাজার বছর। শুধু এস্কিমোদের ভাষাটা বাদে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিপুল সংখ্যক উপ-ভাষা ও মূল ভাষাগুলি খুব সম্ভবত একটা আদি ভাষা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। এইসব ভাষা গড়ে উঠতে পুরো তিনটি ঐতিহাসিক যুগ (ethnical period) সময় লেগেছিল।

BanglaBook.org

বিকাশের স্বাভাবিক ধারায় সারাক্ষণই গড়ে উঠেছিল নতুন নতুন গোষ্ঠী, নতুন নতুন গোত্র। আমেরিকা মহাদেশের বিস্তার ঘটার ফলে এই প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত হয়। পদ্ধতিটা একান্তই সরল। প্রথমত, জীবনযাপনের উপকরণগুলির ব্যাপারে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন কোন-একটা জনাকীর্ণ ভৌগোলিক এলাকা থেকে কিছু লোক আস্তে আস্তে অন্য এলাকায় সরে গেল। এইভাবে চলল বছরের পর বছর। ফলে গোষ্ঠীর আদি বাসস্থান থেকে কিছু দূরে শুরু হল বেশ কিছু মানুষের বসবাস। কালক্রমে এই দেশান্তরীদের স্বার্থ মূল গোষ্ঠীর স্বার্থের থেকে আলাদা হয়ে গেল, তাদের অনুভূতি পাল্টে গেল, এবং অবশেষে দেখা দিল ভাষার তফাৎ। তখন এরা মূল গোষ্ঠীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, হয়ে উঠল স্বাধীন। তবে, এরা বসবাস করতে লাগল মূল গোষ্ঠীর পাশাপাশি অঞ্চলেই। অর্থাৎ জন্ম হল নতুন একটা গোষ্ঠীর। সংক্ষেপে বললে, আমেরিকান আদিবাসীদের গোষ্ঠীগুলি এভাবেই গড়ে উঠেছিল এবং এটাই হচ্ছে ঐ অঞ্চলের সার্বজনীন সত্য। নতুন ও পুরনো এলাকায় যুগ যুগ ধরে এই একই ঘটনা ঘটে চলার ফলে এটা গোত্রভিত্তিক সংগঠনের এক স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবেই দেখা দিয়েছিল, আর তাদের অবস্থার পক্ষে এটা প্রয়োজনীয়ও ছিল। লোক-সংখ্যা বেড়ে ওঠার ফলে টান পড়ত জীবনযাপনের উপকরণে। জনসংখ্যার উদ্বৃত্ত অংশটা তখন সরে যেত নতুন একটা এলাকায়। সেখানে তারা নিজেদেরকে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারত, কারণ যে-কোন গোত্রের অথবা একটা দলে ঐক্যবদ্ধ বেশ কিছু গোত্রের পরিচালন-ব্যবস্থা সর্বদাই অত্যন্ত যথাযথ হত।

ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল। কোন-একটা গ্রামে লোকসংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেলে একদল লোক ঐ একই নদীপথ বরাবর ওপর দিকের অঞ্চলে চলে গিয়ে একটা নতুন গ্রামের পত্তন করত। এ-রকম ঘটনা মাঝে-মধ্যেই ঘটার ফলে গড়ে উঠল বেশ কিছু নতুন গ্রাম। প্রতিটি গ্রামই স্বাধীন এবং প্রত্যেকেরই ছিল একটা করে নিজস্ব পরিচালন সংস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই গ্রামগুলি পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য একটা লীগ বা মিত্রসঙ্ঘে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তারপর একসময় দেখা দিল ভাষাগত বিভিন্নতা এবং তখন এই গ্রামগুলি পরিণত হল এক-একটা গোষ্ঠীতে।

একটা গোষ্ঠী থেকে আরেকটা গোষ্ঠী কিভাবে সৃষ্টি হয়, সেটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে সরাসরিভাবে দেখানো যায়। একের থেকে অপরের বিচ্ছিন্নতা ঘটে কিছুটা ঐতিহ্যগত কারণে, কিছুটা একই গোত্রসমষ্টির মধ্যে কয়েকটি গোত্র উভয়ের দখলে থাকার দরুণ, এবং কিছুটা তাদের উপ-ভাষাগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের ফল হিসেবে। একটা মূল গোষ্ঠী থেকে ভেঙে যে গোষ্ঠীগুলি গড়ে ওঠে, তাদের সকলকার মধ্যেই কয়েকটি সাধারণ গোত্র থাকে এবং এই গোষ্ঠীগুলি একই ভাষার নানান উপ-ভাষায় কথা বলে। পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বেশ কয়েকশ বছর পরেও এদের মধ্যে কিছু সাধারণ গোত্র থেকেই যায়। তাই দেখা যায় যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অন্তত চারশ বছর পরেও হুরণদের (এখন এরা ওইয়ান্‌ডোট্‌ নামে পরিচিত) মধ্যেকার ছয়টি গোত্রের নাম আর সেনেকা-ইরোকোয়াদের ছয়টি গোত্রের নাম একই রয়ে গেছে। পোটাওয়াত্তামি-দের

BanglaBook.org

আটটি গোত্রের আর ওজিবোয়াদের আটটি গোত্রের একই নাম, আবার প্রথমোক্তদের ছয়টি আর শেষোক্তদের চোদ্দটি গোত্রের আলাদা নাম আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে গোষ্ঠী দুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তাদের উভয়ের মধ্যেই আবার বিভাজন ঘটেছে, সৃষ্টি হয়েছে আরও নতুন নতুন গোত্র। মিয়ামি-রা হচ্ছে ওজিবোয়াদের একেবারে প্রথম দিকের প্রশাখা, অথবা ওজিবোয়া ও পোটাওয়াতামিদের আদি গোষ্ঠীটিরই একটা প্রশাখা এরা। এই মিয়ামিদের তিনটি গোত্র আর ওজিবোয়াদের তিনটি গোত্র একই—নেকড়ে, লুনপাখি এবং ঈগল। গ্যানোয়ানিয়ান বর্গের গোষ্ঠীগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ সামাজিক ইতিহাস লুকিয়ে আছে গোত্রগুলির জীবন আর ক্রমোন্নতির পাকে পাকে। যদি কখনো এই পথে ঠিকমতো অনুসন্ধান চালানো হয়, তাহলে দেখা যাবে যে একই উৎস থেকে সৃষ্ট গোষ্ঠীগুলির এবং সম্ভবত যাবতীয় আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ক্রমপর্যায়ের ব্যাপারে গোত্রই হচ্ছে সবথেকে নির্ভরযোগ্য দিক্‌দিশারী।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি বর্বর যুগের মধ্য অবস্থার গোষ্ঠীগুলির থেকে নেওয়া হয়েছে। মিসৌরীদের আটটি গোষ্ঠী যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন মিসৌরী নদীর তীরবর্তী সহস্রাধিক মাইল এলাকা তাদের দখলে ছিল। তাছাড়া এই মিসৌরীর উপনদী কান্‌সাস ও প্ল্যাটের তীরভূমি এবং আইওয়ার ছোট ছোট নদীগুলির তীরভূমিও ছিল তাদেরই দখলে। আর্কান্‌সাস বরাবর মিসিসিপির পশ্চিম তীরও তাদের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। এদের উপ-ভাষা থেকে বোঝা যায় যে শেষবার বিভাজনের আগে এরা তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। প্রথমটা হচ্ছে পুনাকা ও ওমাহা, দ্বিতীয়টা হচ্ছে আইওয়া, ওটো ও মিসৌরী এবং তৃতীয়টাতে ছিল কাও, ওসেজ্‌ আর কোয়াপ্পা-রা। নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে এই তিনটিই হচ্ছে আসলে একটা আদি গোষ্ঠীর উপশাখা, কারণ যে মূল ডাকোটিয়ান্‌ ভাষার অন্তর্গত এরা, তার অন্যান্য উপ-ভাষার তুলনায় এদের বেশ কিছু উপ-ভাষার একটার সঙ্গে আরেকটার মিল খুবই বেশি। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে কোন-একটা আদি গোষ্ঠী থেকে এদের উৎপত্তির পিছনে একটা ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তাও ছিল। মিসৌরী নদীর কোন-একটা মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে নদীর তীর বরাবর ওপর দিকে আর নীচের দিকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল এরা। বসবাসের এলাকার দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন জায়গার লোকের মধ্যে দেখা দিল স্বার্থের পার্থক্য। তারপরে এল ভাষার বিভিন্নতা এবং অবশেষে প্রত্যেকে আলাদা স্বাধীন গোষ্ঠীতে পরিণত হল। এইভাবে নদীর ধার বরাবর একটা তৃণময় (prairie) অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া কোন জনসম্প্রদায় প্রথমে তিনটি, ক্রমশ আটটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আলাদা বসতি স্থাপন করতে পারে, তারপর প্রত্যেকটি বিভাজিত গোষ্ঠীরই নিজস্ব সংগঠন একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করে। বিভক্ত হয়ে যাওয়াটা তাদের কাছে কোন আঘাত বা দারুণ দুঃখময় কোন ব্যাপার ছিল না। তাদের কাছে এটা ছিল একান্তই স্বাভাবিক, বিস্তারের পথে ভাগ ভাগ হয়ে আরও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়া, তারপর একসময় একেবারে পৃথক হয়ে এগিয়ে যাওয়া। মিসৌরী নদী অঞ্চলে সবথেকে ওপরের দিকে থাকত পুন্‌কা-রা,

BanglaBook.org

নায়োব্রারা নদীর মোহনার কাছে বাস করত এরা। আর সবথেকে নীচে, মিসিসিপির সঙ্গে আর্কানসাসের মোহনার কাছে বাস করত কোয়াপ্পা-রা। এই ওপর ও নীচের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল প্রায় পনেরশ মাইল। মধ্যবর্তী অঞ্চলটায়, অর্থাৎ মিসৌরীর পার্শ্ববর্তী অরণ্যময় অঞ্চলে, বাস করত বাকি ছয়টি গোষ্ঠী। এরা ছিল পুরোপুরিভাবেই নদীনির্ভর গোষ্ঠী।

সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও এইরকম আর-একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। একটা আদি গোষ্ঠী থেকে ভেঙে সৃষ্টি হয়েছিল তিনটি গোষ্ঠী—ওজিবোয়া, ওটাওয়া[১] এবং পোটাওয়াত্তামি। এদের মধ্যে ওজিবোয়ারা হচ্ছে মূল ধারার প্রতিনিধি, কারণ তারা হ্রদের নির্গমপথের ওপর বড় বড় মেছো ঘেরিগুলির কাছে গোষ্ঠীর আদি বাসভূমিতেই রয়ে গিয়েছিল। তাছাড়াও, বাকি দুটি গোষ্ঠীর লোকেরা এদেরকে "বড় ভাই" বলে ডাকে। ওটাওয়াদের বলা হয় "মেজ ভাই" আর পোটাওয়াত্তামিদের ডাকা হয় "ছোট ভাই" নামে। এই পোটাওয়াত্তামিরাই যে প্রথমে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল আর তাদের পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল ওটাওয়ারা, তা বোঝা যায় এদের ভাষাগত বিভিন্নতার মধ্যে তুলনা করলে। এই তুলনা থেকে দেখা যায় যে পোটাওয়াত্তামিদের মধ্যেই ভাষাগত পার্থক্য সবথেকে বেশি করে ঘটেছে। আবিষ্কৃত হওয়ার সময়, অর্থাৎ ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে, ওজিবোয়ারা বসবাস করত সুপিরিয়র হ্রদের নির্গমপথের কাছের উৎরাই অঞ্চলে। এখান থেকে এরা ছড়িয়ে পড়েছিল হ্রদের দক্ষিণ তীর বরাবর ওণ্টোজাগোন্‌দের এলাকায়, হ্রদের উত্তর-পশ্চিম তীর বরাবর এবং সেণ্ট মেরী নদীর পাশ দিয়ে একেবারে লেক হুরণ পর্যন্ত। এই গোটা অঞ্চলটায় প্রচুর পরিমাণ মাছ আর জন্তু-জানোয়ার পাওয়া যেত এবং তারা ভুট্টা বা অন্য কোন গাছপালার চাষ করত না বলে জীবনধারণের জন্য এই মাছ আর জন্তু-জানোয়ারের ওপরেই সবথেকে বেশি করে নির্ভরশীল ছিল।[২] একমাত্র কলম্বিয়া উপত্যকা ছাড়া গোটা উত্তর আমেরিকার আর কোথাও এই ধরণের সুবিধা পাওয়া যেত না। এই ধরণের সুবিধা পাওয়ার ফলে এই ইণ্ডিয়ানদের লোক-সংখ্যা খুবই দ্রুত বেড়ে উঠেছিল এবং তাদের মধ্যে থেকে একের পর এক দল লোক দেশান্তরী হয়ে আলাদা গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল। পোটাওয়াত্তামিরা বাস করত আপার মিচিগান আর উইস্‌কন্‌সিন-এর সীমান্ত এলাকায়, যেখান থেকে ১৬৪১ সালে তাদেরকে বিতাড়িত করেছিল ডাকোটারা। ওটাওয়ারা প্রথমদিকে সম্ভবত কানাডার ওটাওয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বাস করত। ঐ ১৬৪১ সাল নাগাদই এদেরকেও চলে যেতে হয় পশ্চিমদিকে। জর্জিয়ান উপসাগর, মানিতোলিন দ্বীপপুঞ্জ এবং ম্যাকিনও অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে এরা। এখান থেকে তারা আবার দক্ষিণদিকে লোয়ার

১। ও-টা-ওয়া।

২। এখনকার দিনের ওজিবোয়ারা বলে যে প্রাচীনকালে তাদের পূর্বপুরুষরা মাটির হুঁকো, জলের কলসী এবং নানান ধরণের জলপাত্র তৈরি করত। সল্ট সেণ্ট মেরী অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে খননকার্য চালিয়ে ইণ্ডিয়ানদের মৃৎশিল্পের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। ওজিবোয়ারা বলে যে এগুলি তাদের পূর্বপুরুষদেরই করা।

মিচিগান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আদিতে এই তিনটি গোষ্ঠীর লোকেরা ছিল একই গোষ্ঠীর সদস্য, এদের গোত্রগুলিও ছিল একই। কালক্রমে একটা বিরাট এলাকা অধিকার করতে পেরেছিল এরা। কিছু লোকের এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া এবং তাদের বসবাসের এলাকাগুলির মধ্যেকার দূরত্বের দরুণ, তাদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার অনেক আগেই গড়ে উঠেছিল নানান উপ-ভাষা, জন্ম নিয়েছিল গোষ্ঠীগত স্বাধীনতা। সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী এই তিনটি গোষ্ঠী তাদের পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য একটা মিত্রতা স্থাপন করেছিল, যাকে আমেরিকানরা "ওটাওয়া মিত্রসংঘ" বলত। এটা ছিল আসলে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার একটা সংঘ এবং সম্ভবত ইরোকোয়াদের মত কোন ঐক্যবদ্ধ মিত্রসংঘ নয়।

এইসব বিচ্ছিন্নতার আগে এদের আরেকটি গোষ্ঠী মিয়ামি-রা মূল ওজিবোয়া গোষ্ঠী থেকে কিংবা আদি গোষ্ঠীটি থেকে ভেঙে বেরিয়ে যায়। এরা বসবাস করতে শুরু করে মধ্য ইলিনয় এবং পশ্চিম ইণ্ডিয়ানা অঞ্চলে। এদের পরে এই একই পথ ধরে দেশান্তরী হয় ইলিয়ানরা। এরাও ছিল ঐ একই আদি গোষ্ঠীর পরের দিকের একটা প্রশাখা। এই ইলিয়ানরা পরে চারটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়—পিওরিআ, কাস্‌কাস্‌কিআ, উইআও এবং পায়ান্‌কেশাও। এদের আর মিয়ামিদের উপ-ভাষার সঙ্গে সবথেকে বেশি মিল দেখা যায় ওজিবোয়াদের ভাষার, আর তারপর ক্রী-দের ভাষার।[১] সুপিরিয়র হ্রদের বড় বড় মেছো ঘেরির সেই কেন্দ্রীয় আবাসভূমি থেকে এইসব গোষ্ঠীর বেরিয়ে আসাটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, কারণ এ থেকেই বোঝা যায় যে জীবনযাপনের উপকরণ-বিশিষ্ট প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলিতে কিভাবে এক-একটা গোষ্ঠী গড়ে উঠত। নিউ ইংল্যাণ্ড, দেলাওয়ার, মেরীল্যাণ্ড, ভার্জিনিয়া এবং ক্যারোলিনা অ্যাল্‌গন্‌কিন্‌স্‌—এই গোষ্ঠী-গুলি খুব সম্ভবত একই আদি গোষ্ঠী থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমে উল্লিখিত উপ-ভাষাগুলি গড়ে উঠতে এবং বর্তমানে এগুলির মধ্যে যে বিভিন্নতা দেখা যায় তা সৃষ্টি হতে নিশ্চয়ই বেশ কয়েকশ বছর সময় লেগে গিয়েছিল।

কোন্ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় একটা গোষ্ঠী আরেকটা গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে কিংবা কোন সুবিধাজনক জায়গায় বসবাসকারী একটা আদি গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে জন্ম নেয়—ওপরের উদাহরণগুলি থেকে তা বোঝা যায়। ঠিক ঠিক ভাবে বললে, প্রতিটা দেশান্তরী দলের চরিত্রের মধ্যে একটা সামরিক উপনিবেশের ধাঁচ থাকত, নতুন একটা এলাকা দখল করার চেষ্টা করত এরা এবং মূল গোষ্ঠীর সঙ্গে যতদিন সম্ভব যোগাযোগ বজায় রাখত। এইভাবে একের পর এক জায়গায় যাওয়ার মধ্যে দিয়ে তারা তাদের যৌথ এলাকা বাড়াতে চাইত এবং তারপর নিজেদের সীমানার মধ্যে বাইরের লোকেদের অনুপ্রবেশে বাধা দিত। একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে, একই মূল ভাষার বিভিন্ন উপ-ভাষায় কথা বলে যে-সব ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলি, তাদের যৌথ এলাকা যত বড়ই হোক না কেন সাধারণত

১। পোটাওয়াতামিরা আর ক্রী-রা প্রায় একইরকমভাবে মূল কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পোটাওয়াতামিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর ওজিবোয়া, ওটাওয়া আর ক্রী-রা সম্ভবত একই ভাষায় কথা বলত।

তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ থাকবেই। একই ভাষাভাষী যে-কোন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই এটা মূলগতভাবে সত্য। এর কারণ হল এই যে, একটা ভৌগোলিক কেন্দ্র থেকে নানান দিকে ছড়িয়ে পড়া লোকেরা জীবনধারণের জন্য এবং নতুন এলাকায় দখল কায়েম করার জন্য কঠিন সংগ্রাম চালাতে বাধ্য হত এবং সেইসঙ্গেই বিপদের সময় সাহায্য ও দুর্দশার সময় আশ্রয় পাওয়ার জন্য নিজেদের জন্মভূমির সঙ্গে যোগাযোগটা বজায় রেখে চলাকে তারা আবশ্যিক বলে মনে করত।

উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলার ফলে মানুষকে দেশান্তরে যাওয়ার কথা ভাবতে হত। এখন, কোন-একটা জায়গাকে প্রথমবার দেশান্তরের পক্ষে উপযুক্ত হয়ে উঠতে হলে সেখানে জীবনধারণের উপকরণগুলির যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার।[১]

এই ধরনের প্রাকৃতিক অঞ্চল উত্তর আমেরিকায় মাত্র তিনটি ছিল। প্রথমটা হচ্ছে কলম্বিয়া নদীর উপত্যকা অঞ্চল। ভুট্টা আর অন্যান্য ফসল চাষের যুগ শুরু হওয়ার আগে পৃথিবীর আর কোথাও জীবনধারণের এত প্রচুর ও বিভিন্ন ধরনের উপকরণ পাওয়া যেত না। দ্বিতীয়টা হচ্ছে সুপিরিয়র, হুরণ এবং মিচিগান হ্রদের মধ্যেকার উপদ্বীপ অঞ্চল। এখানে বসবাস করত ওজিবোয়ারা। তাছাড়াও বহু ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠী প্রথমে এই অঞ্চলেই বাস করত। তৃতীয়টা হল মিনেসোটার হ্রদ অঞ্চল। এই অঞ্চলটাই ছিল আজকের দিনের ডাকোটা গোষ্ঠীগুলির আদি আবাসস্থল। শুধুমাত্র এই তিনটি অঞ্চলকেই উত্তর আমেরিকার জীবনধারনের প্রাকৃতিক কেন্দ্র এবং উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার প্রাকৃতিক উৎসস্থল বলা চলে। এটা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে ডাকোটাদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার আগে মিনেসোটা অঞ্চলটা অ্যাল্‌গন্‌কিন এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং অন্যান্য গাছপালার চাষ শুরু হওয়ার পর মানুষরা এক-একটা ছোট ছোট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করল আর জনসংখ্যাও বেড়ে উঠল অনেক। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোটা মহাদেশের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ঐ অঞ্চলের সবথেকে উন্নত গোষ্ঠী ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের হাতে চলে যায়নি, যদিও চাষবাসই ছিল এদের জীবনধারণের প্রায় প্রধান অবলম্বন। বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থায় থাকা প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল বাগান-চাষ, ফলে তাদের অবস্থার প্রভূত উন্নতি দেখা দিল। উত্তর আমেরিকার

১। অরণ্য আর তৃণভূমি মিলিয়ে এই জায়গাটা শিকার করার পক্ষে একেবারে আদর্শ জায়গা ছিল। তৃণভূমিতে প্রচুর পরিমাণ কামাশ্‌ জন্মাত। কামাশ্‌ হচ্ছে এক ধরণের গমের কন্দ। গ্রীষ্মকালে ফলতো প্রচুর বেরী ফল। কিন্তু এগুলি এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কলম্বিয়া নদীতে এবং উপকূলের অন্যান্য নদীতে স্যামন্‌ মাছের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এইসব নদীতে লক্ষ লক্ষ স্যামন্‌ জন্মাত এবং মাছ-ধরার মরশুমে খুব সহজেই প্রচুর পরিমাণ মাছ সংগ্রহ করত ওখানকার বাসিন্দারা। মাছগুলি কেটে রোদ্দুরে শুকনো করা হত। তারপর সেগুলিকে বেঁধে-ছেদে নিজেদের গ্রামে নিয়ে যেত তারা। এই শুকনো মাছই ছিল তাদের সারা বছরের প্রধান খাদ্য। এছাড়া উপকূল অঞ্চলে অনেক শামুকজাতীয় প্রাণী পাওয়া যেত। এগুলো থেকে তাদের শীতকালীন খাদ্যের প্রয়োজন অনেকটাই মিটতো। এইসব সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে যোগ হয়েছিল সারা বছরব্যাপী প্রশান্ত ও সুষম জলবায়ু—অনেকটা টেনেসী আর ভার্জিনিয়া অঞ্চলের মত। শস্যের ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞ গোষ্ঠীগুলির কাছে এই অঞ্চলটা ছিল স্বর্গ-সমান।

বিরাট বিরাট এলাকাগুলি আবিষ্কারের সময় দেখা গিয়েছিল যে অ-কৃষিজীবী ও কৃষিজীবী গোষ্ঠীগুলিই দখল করে রেখেছে ঐ এলাকাগুলি এবং গোটা মহাদেশ জুড়েই ছড়িয়ে আছে কৃষিজীবী মানুষেরা।[১]

গোষ্ঠী আর তার উপ-ভাষার সংখ্যাবৃদ্ধির ফলেই আদিবাসীদের একের সঙ্গে অপরের অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন মূল ভাষায় যারা কথা বলত, সেইসব গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই সবথেকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলতে দেখা যেত। যেমন চলত ইরোকোয়া ও অ্যাল্‌গন্‌কিন্‌ গোষ্ঠীর মধ্যে এবং ইরোকোয়া ও ডাকোটা গোষ্ঠীর মধ্যে। অথচ এই ডাকোটা আর আর অ্যাল্‌গন্‌কিন্‌রা কিন্তু সাধারণত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করত না, কারণ তা না হলে তারা পাশাপাশি এলাকায় বসবাসই করতে পারত না। এ ব্যাপারে সবথেকে খারাপ ব্যতিক্রম হল ইরোকোয়ারা। এরা এদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী এরি, নিউট্রাল নেশন্‌, হুরণ এবং সাস্‌কেহ্যানক্‌স্‌দের ধ্বংস করার জন্য অবিরাম যুদ্ধ চালাত। একই মূল ভাষার বিভিন্ন উপ-ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলি পরস্পরের সঙ্গে মৌখিকভাবে কথাবার্তা চালাতে পারে আর তাই নিজেদের বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারে। একই বংশ থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে স্বাভাবিক মিত্র হিসেবে পরস্পরের ওপর নির্ভর করতেও শিখেছিল এরা।

১। মোটামুটিভাবে ধরেই নেওয়া যায় যে কলম্বিয়া উপত্যকা অঞ্চলই গ্যানোয়ানিয়ান বর্গের গোষ্ঠীগুলির জন্মস্থান। অতীতকালে এই অঞ্চল থেকেই একের পর এক দল মানুষ দেশান্তরী হত। মহাদেশের উভয় ভাগই অধিকৃত না হওয়া পর্যন্ত এই দেশান্তর গমন বন্ধ হয়নি। তারপরেও, ইয়োরোপিয়ানরা এই মহাদেশ আবিষ্কার করার আগে পর্যন্ত ঐ অঞ্চল থেকে বহু মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে মহাদেশের উভয় ভাগেই। ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির মানুষদের শারীরিক গঠন, তুলনামূলক অবস্থা আর ভাষাগত সম্পর্ককে বিচার করলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে পনেরশ মাইলেরও বেশি আর পূর্ব থেকে পশ্চিমে এক সহস্রাধিক মাইলব্যাপী সুবিস্তীর্ণ কেন্দ্রীয় তৃণভূমি অঞ্চল উত্তর আমেরিকা মহাদেশের প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও আতলান্তিক মহাসাগরীয় দিক দুটির মধ্যে অবাধ যোগাযোগের পথে এক দারুণ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছিল। তাই মনে হয় যে কলম্বিয়া উপত্যকা অঞ্চল থেকে উদ্ভূত কোন আদি গোষ্ঠী নানান প্রাকৃতিক কারণে দেশান্তরী হওয়ার সময় যতদিনে ফ্লোরিডায় পেঁছিতে পারত, তার থেকে অনেক আগে পেঁছে যেতে পারত পাটাগোনিয়ায়। আমাদের জানা তথ্যগুলি এই অঞ্চলটিকেই ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির আদি বাসস্থান হিসেবে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে, আর তাই এর সঙ্গে আর সামান্য কিছু প্রমাণ দাখিল করতে পারলেই প্রকল্পটা একেবারে পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে।

ভুট্টার আবিষ্কার ও তার চাষ ঘটনাপ্রবাহকে বস্তুগতভাবে পাল্টে দেয় নি অথবা পূর্বতন কাজ-কাজকর্মকে বাতিলও করে দেয় নি। তবে এই আবিষ্কার প্রগতির এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছিল। এই খাদ্যশস্যটা আমেরিকার দেশজ ছিল কি না, জানা যায় না। তবে মধ্য আমেরিকার যে ক্রান্তীয় অঞ্চলে গাছপালা অত্যন্ত দ্রুত বাড়তে পারে, যেখানে প্রচুর ভুট্টা ফলে, এবং যেখানে ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের প্রাচীনতম আবাসস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে সেই ক্রান্তীয় অঞ্চলটিকেই এর সম্ভাব্য উৎসস্থল বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ চাষাবাদ শুরু হয়েছে মধ্য আমেরিকায়, সেখান থেকে প্রথমে তা ছড়িয়ে পড়েছে মেক্সিকোয়, তারপর নিউ মেক্সিকোয় আর মিসিসিপি উপত্যকায়, আবার সেখান থেকে পূর্বদিকে আতলান্তিকের তীরবর্তী অঞ্চলে। মধ্য আমেরিকায় চাষের যে পরিমাণ ক্ষেত্র ছিল, প্রান্তসীমায় এসে তা অনেক কমে যায়। বর্বরতর গোষ্ঠীগুলি স্বাভাবিক-

একটা এলাকায় কতজন লোক থাকবে, তা নির্ভর করত সেই এলাকায় লভ্য জীবন-ধারনের উপকরণগুলির ওপর। যখন মাছ আর পশুমাংসই ছিল মানুষের প্রধান খাদ্য, তখন একটা ছোট গোষ্ঠীকেও বেঁচে থাকার জন্য বিশাল এলাকা জুড়ে ঘোরাফেরা করতে হত। মাছ আর পশুমাংসের সঙ্গে তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য যোগ হওয়ার পরেও এক-একটা গোষ্ঠী যতটা এলাকা জুড়ে বসবাস করত, তা তাদের জন-সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট বড় এলাকাই ছিল। সাতচল্লিশ হাজার বর্গমাইল এলাকাবিশিষ্ট নিউ ইয়র্কে কখনোই পঁচিশ হাজারের বেশি ইণ্ডিয়ান বসবাস করেনি। এদের মধ্যে হাড্‌সনের পূর্ব তীরে ও আইল্যাণ্ডে বসবাস করত ইরোকোয়ারা আর অ্যাল্‌গন্‌-কিন্‌রা, এবং এরি ও নিউট্রাল নেশনের লোকেরা বাস করত প্রদেশের পশ্চিমভাগে। গোষ্ঠীগুলি পরস্পরের থেকে বেশ কিছুটা দূরে দূরে বসবাস না করলে গোত্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পৃথক সরকারের পক্ষে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া ও তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো উপযুক্ত কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে কাজ করা সম্ভব হত না।

নিউ মেক্সিকো, মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কোন-একটা ছোট এলাকায় জনসংখ্যা খুব বেড়ে গেলেও বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া তার ফলে কোনভাবেই ব্যাহত হত না। প্রতিটা পুয়েব্লো গোষ্ঠীই ছিল এক-একটা স্বাধীন, স্বশাসিত জন-

---

ভাবেই জীবনধারণের এই নতুন উপকরণটিকে আয়ত্ত করতে চাইত, আর তাদের সেই আকাঙ্ক্ষার ফলেই ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের কোন সাহায্য ছাড়াই এই চাষ ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। তবে ভুট্টা চাষ কখনোই নিউ মেক্সিকো পার হয়ে কলম্বিয়া উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েনি, যদিও আপার মিসৌরী অঞ্চলে মিনিট্যারীজ্‌ ও মান্দান্‌দের মধ্যে, উত্তর আমেরিকার রেড রিভার অঞ্চলের শিয়ান্‌স্‌-দের মধ্যে, কানাডার সিম্‌কো হ্রদ অঞ্চলের হুরণদের মধ্যে, কেন্‌বেক্‌-এর অ্যাবেনাকি-দের মধ্যে এবং মিসিসিপি ও আতলান্তিকের মধ্যবর্তী অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে চাষের চলন ছিল। কলম্বিয়া উপত্যকা থেকে দেশান্তরী হওয়া দলগুলি তাদের পূর্বসূরীদের মতই নিউ মেক্সিকো ও মেক্সিকোর ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের ওপরে চেপে বসত এবং বাস্তুহারা ও টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া গোষ্ঠীগুলিকে জোর করে ইশ্‌থ্‌মাস্‌-এর মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। ভিলেজ ইণ্ডিয়ানরা প্রগতির যে প্রথম বীজের জন্ম দিয়েছিল, এইসব বিতাড়িত দলগুলিই তাকে অন্য জায়গায় বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। এইরকম ঘটনা মাঝে-মধ্যেই ঘটার ফলে দক্ষিণ আমেরিকায় এমন একদল লোকের বসবাস শুরু হয় যারা আগেকার বন্য দলগুলির থেকে অনেক উন্নত এবং যারা চলে আসার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তরাঞ্চল। ফলস্বরূপ, নিকৃষ্টতর এলাকা হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ আমেরিকা অধিকতর উন্নত হয়ে উঠতে পেরেছিল। পেরুতে মাঙ্কো কাপাক্‌ আর সামা ওলো-র একটা উপকথা চালু আছে। এরা ছিল সূর্যের সন্তান। এরা পরস্পরের ভাই-বোন, আবার স্বামী-স্ত্রীও বটে। এই উপকথা থেকে জানা যায় যে (যদি এ থেকে জানার মতো আদৌ কিছু থেকে থাকে) আন্দিজ অঞ্চলে কিছু দূর থেকে একদল ভিলেজ ইণ্ডিয়ান দেশান্তরী হয়ে চলে এসেছিল, তবে এরা সরাসরিভাবে উত্তর আমেরিকা থেকে আসেনি। এই ভিলেজ ইণ্ডিয়ানরা আন্দিজ অঞ্চলের বন্য গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করে এবং তাদেরকে জীবনধারণের উন্নততর পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলে। এদেরকে তারা ভুট্টা ও গাছপালার চাষও শেখায়। একান্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই এই উপকথা থেকে বাদ পড়ে গেছে দেশান্তরীদের গোটা দলটার কথা, রয়ে গেছে শুধু দলপতি আর তার স্ত্রীর কথাটুকুই।

গোষ্ঠী। যেখানে একই নদীর ধারে পরস্পরের কাছাকাছি কিছু পুয়েব্লো জনগোষ্ঠী থাকত, সেখানে দেখা যেত যে এই গোষ্ঠীগুলি আসলে একই বংশের নানান শাখা এবং একটা গোষ্ঠীগত বা মৈত্রীবন্ধ সরকার এদেরকে পরিচালিত করত। নিউ মেক্সিকোতে এইরকম মৈত্রীবন্ধ সরকারই পরিচালিত করত এদেরকে। শুধু নিউ মেক্সিকোতেই সাতটা মূল ভাষা আছে, আবার প্রতিটারই আছে বেশ কয়েকটা করে উপ-ভাষা। করোলাডো-র অভিযানের সময়, অর্থাৎ ১৫৪০-১৫৪২ সালে, ঐ অঞ্চলে অসংখ্য ছোট ছোট গ্রাম ছিল। সিবোলা, টুকায়ান, কুইভিরা আর হেমেজ্-দের প্রত্যেকের ছিল সাতটা করে গ্রাম, টিগুয়েক্সদের ছিল বারোটা[১], এছাড়া আরও কিছু গোষ্ঠীও ছিল। এ থেকে এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে একটা ভাষাগত সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রতিটা গোষ্ঠী মৈত্রীবন্ধ ছিল কিনা, জানা যায় না। মোকিদের সাতটা পুয়েব্লো (করোলাডোর অভিযানের সময়কার টুকায়ানদের গ্রামগুলি) বর্তমানে মৈত্রীবন্ধ হয়েছে এবং সম্ভবত আবিষ্কৃত হওয়ার সময়েও তা-ই ছিল।

ওপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে বিভাজনের যে প্রক্রিয়ার কথা জানা গেল, তা আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। এই প্রক্রিয়ায় শুধু উত্তর আমেরিকাতেই অন্তত চল্লিশটা মূল ভাষার জন্ম হয়েছে। প্রতিটা মূল ভাষারই কিছু উপ-ভাষা আছে, এক-একটা স্বাধীন গোষ্ঠী এক-একটা উপ-ভাষায় কথা বলে। এশিয়া, ইওরোপ এবং আফ্রিকার গোষ্ঠীগুলি যখন এদের মত অবস্থায় ছিল, তখন তাদের মধ্যেও সম্ভবত এই একই ঘটনা ঘটেছিল।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের গোষ্ঠীগুলি খুবই সাদাসিধে সংগঠন। একটা গোষ্ঠী গঠন করা এবং সেই গোষ্ঠীটাকে গ্যানোয়ানিয়ান বর্গের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মাত্র কয়েকশ, বড়জোর কয়েক হাজার লোক হলেই চলত।

এবার ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপ ও লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা দরকার। ব্যাপারটা এইভাবে সাজানো যায়ঃ

১। নিজস্ব ভূখণ্ড ও নাম।
২। একটা উপ-ভাষার ওপর একচেটিয়া অধিকার।
৩। গোত্র কর্তৃক নির্বাচিত সাকেম্ ও প্রধানদের নিয়োগ করার অধিকার।
৪। এইসব সাকেম্ ও প্রধানদের বরখাস্ত করার অধিকার।
৫। ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপাসনার অধিকার।
৬। প্রধানদের পরিষদ নিয়ে গঠিত একটা সর্বোচ্চ সরকার।
৭। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান হিসেবে কাজ করে থাকে গোষ্ঠীর একজন সাকেম্।

গোষ্ঠীর এই লক্ষণগুলি নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক।

১। "Coll. Ternux-Compans," IX, পৃঃ ১৮১-১৮৩।

১। নিজস্ব ভুখণ্ড ও নাম।

কোন গোষ্ঠী যতটা এলাকা জুড়ে বসবাস করত, আশেপাশের যতটা এলাকা জুড়ে শিকার করত ও মাছ ধরত, এবং যতটা এলাকাকে অন্যান্য গোষ্ঠীর দখলদারির হাত থেকে বাঁচাতে পারত, ততটা এলাকাই ছিল সেই গোষ্ঠীর নিজস্ব ভুখণ্ড। এই ভুখণ্ডের বাইরে থাকত একটা বিরাট নিরপেক্ষ অঞ্চল। তাদের নিকটতম প্রতিবেশীরা ভিন্ন ভাষাভাষী হলে এই নিরপেক্ষ অঞ্চলই দুটি গোষ্ঠীকে পৃথক করে রাখত। এই অঞ্চলটুকুর ওপর কারোরই কোন অধিকার থাকত না। কিন্তু প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলি একই ভাষার বিভিন্ন উপ-ভাষাভাষী হলে এই নিরপেক্ষ অঞ্চলের পরিধি হত খুবই কম এবং তা তত স্পষ্টভাবে চিহ্নিতও হত না। এইরকম ত্রুটিপূর্ণভাবে নির্ধারিত ছোট বা বড় ভূভাগই ছিল এক-একটা গোষ্ঠীর অধিকৃত ভুখণ্ড। অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি তাদের অধিকার স্বীকার করে নিত এবং তারা নিজেরা ঐ ভুখণ্ডকে রক্ষা করত।

যথাসময়ে গোষ্ঠীগুলির এক-একটা নিজস্ব নাম দেখা দিল। তাদের স্বাভাবিক চরিত্রকে বিচার করলে বোঝা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই এইসব নাম তারা ভেবে-চিন্তে দেয় নি, বরং আকস্মিকভাবেই নামগুলি সৃষ্টি হয়েছিল। সেনেকারা নিজেদেরকে বলত "বড় পাহাড়ের মানুষ" (জান্-দা-ওয়া-ও নো), টুস্কারোরা-রা নিজেদেরকে বলত "জামা-পরা মানুষ" (দাম্-গা-টো-ওয়েহ্-ও-নো), সিসেটন্দের নাম ছিল "জলাময় গ্রাম" (সিস্-সে-টো-ওয়ান), ওগালাল্লাদের নাম ছিল "শিবির পরিবর্তনকারী" (ও-গা-লাল-লা), ওমাহারা নিজেদেরকে বলত "উজান-টানা মানুষ" (ও-মা-হা), আইওয়ারা নিজে-দেরকে বলত "ধূলিমলিন জাত" (পা-হো-চা), মিনিট্যারীজ্-দের নাম ছিল "দূরাগত মানুষ" (এ-নাট-জা), চেরোকীদের নাম ছিল "মহান মানুষ" (ৎমা-লো-কী), শাওনীরা নিজেদেরকে বলত "দক্ষিণদেশী" (মা-ওয়ান-ওয়াকী), মোহেগান্রা নিজেদেরকে বলত "সাগরতীরের মানুষ" (মো-হে-কান্-এউক্), স্লেভ্লেক্ ইণ্ডিয়ানদের নাম ছিল "নিম্ন-ভূমির মানুষ" (আ-চাপ-টিন্-নে)।[১] মেক্সিকোর ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সোচি-মিল্কোম্রা নিজেদেরকে বলত "মোহনার মানুষ", টেপনেকান্দের নাম ছিল "সেতুর মানুষ", টেজ্কুকান্ বা কুল্হুয়াদের নাম ছিল "কুটিল মানুষ", আর ত্লাস্কালানরা নিজেদেরকে বলত "রুটির মানুষ।" আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে যে-সময়ে ইউরোপিয়রা উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে, সেই সময় তারা ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির নাম অন্য গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে সংগ্রহ করত। এই গোষ্ঠীগুলি নিজেদের ইচ্ছামত অন্য গোষ্ঠীগুলির এক-একটা নাম দেয়, যেগুলি ঐ-সব ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর নিজস্ব নাম নয়। ফলস্বরূপ ইতিহাসে এখন কিছু গোষ্ঠীর এমন সব নাম পাওয়া যায়, যে নাম তারা নিজেরা স্বীকার করে না।

১। অ্যাকস্টা, "দ্য ন্যাচারাল অ্যান্ড মরাল হিস্ট্রি অফ দ্য ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজ", লণ্ডন সংস্করণ, ১৬০৪, গ্রিমস্টোন-এর অনুবাদ, পৃঃ ৫০০-৫০৩।

২। একটা উপ-ভাষার ওপর একচেটিয়া অধিকার।

গোষ্ঠী আর উপ-ভাষা সাধারণত পরস্পরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ে, তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে কখনও কখনও এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন, ডাকোটাদের বারোটা দল এখন সঠিক অর্থে গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, কারণ তাদের স্বার্থ আর সংগঠন এখন পরস্পরের থেকে পৃথক। কিন্তু অতীতে আমেরিকানরা আগ বাড়িয়ে এসে তাদের আদি বাসভূমি কেড়ে নেওয়ার দরুণ বাধ্য হয়ে তাদেরকে সমতলভূমিতে নেমে আসতে হয়েছিল। এই বিভাজন ছিল তাদের পক্ষে একান্তই অকালোচিত। অতীতে তাদের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে বিভাজনের পরে মিসৌরী অঞ্চলে মাত্র একটাই নতুন উপভাষার সৃষ্টি হতে পেরেছিল—টীটন্ উপ-ভাষা। মিসিসিপি অঞ্চলে এদের মূল ভাষা ছিল 'ইসাউণ্ট'। কয়েকশ বছর আগে চেরোকীদের লোকসংখ্যা ছিল ছাব্বিশ হাজার। যুক্তরাষ্ট্রের চৌহদ্দীতে একই ভাষাভাষী আর কোন গোষ্ঠীর এত লোকসংখ্যা আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। তবে জর্জিয়ার পার্বত্য প্রদেশগুলিতে এদের ভাষার মধ্যে সামান্য পার্থক্য ঘটেছে, কিন্তু তাকে একটা আলাদা উপ-ভাষা বলা চলে না। এ-রকম আরও কিছু দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে, কিন্তু এগুলি আদিবাসী যুগের সাধারণ নিয়মকে, অর্থাৎ গোষ্ঠী আর উপ-ভাষার তাল মিলিয়ে বাড়ার নিয়মকে, নস্যাৎ করে দেয় না। আজও পর্যন্ত অ-কৃষিজীবী হিসেবে টিকে থাকা ওজিবোয়াদের লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় পনের হাজার এবং এরা সকলে একই উপ-ভাষায় কথা বলে থাকে। ডাকোটা গোষ্ঠীগুলির মোট জনসংখ্যা এখন প্রায় পঁচিশ হাজার এবং এরা দুটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত উপ-ভাষায় কথা বলে। এই গোষ্ঠীগুলি অস্বাভাবিক রকম বড় আয়তনের। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ আমেরিকার এক-একটা গোষ্ঠীতে গড়ে দু হাজারেরও কম লোকসংখ্যা দেখা যায়।

৩। গোত্র কর্তৃক নির্বাচিত সাকেম্ ও প্রধানদের নিয়োগ করার অধিকার।

ইরোকোয়াদের মধ্যে নিয়ম আছে যে কোন নির্বাচিত প্রধানকে প্রধানদের একটা পরিষদ যতক্ষণ না তার পদে নিয়োগ করছে, ততক্ষণ সে প্রধান হিসেবে স্বীকৃত হবে না। যেহেতু গোত্রের প্রধানদের নিয়েই গড়ে উঠত গোষ্ঠী-পরিষদ এবং সার্বভৌমীন স্বার্থ রক্ষা করার ক্ষমতা তাদেরই হাতে থাকত, সেহেতু কোন ব্যক্তিকে তার পদে নিয়োগ করার দায়িত্ব গোষ্ঠী-পরিষদের হাতে ন্যস্ত করাটা ছিল একান্তই যুক্তিযুক্ত কাজ। মিত্রসঙ্ঘ গঠিত হওয়ার পর সাকেম্ ও প্রধানদেরকে এই "তুলে ধরা"র ক্ষমতাটা গোষ্ঠী-পরিষদের বদলে মিত্রসঙ্ঘের পরিষদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। সাধারণভাবে গোষ্ঠীগুলির সম্বন্ধে বলা যায় যে, আমাদের হাতে যেটুকু তথ্য আছে তা তাদের নিয়োগ-পদ্ধতি সংক্রান্ত রীতিনীতিকে ব্যাখ্যা করার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির সামাজিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে যে অসংখ্য বিষয় সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান চালানো দরকার, এটা তার অন্যতম। মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই সাকেম্ ও প্রধানদের পদ নির্বাচনমূলক ছিল। মহাদেশের অন্যান্য অংশেও এই একই নিয়মের অস্তিত্বের পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

BanglaBook.org

দেলাওয়ারদের প্রতিটা গোত্রে একজন করে সাকেম্ (সা-কেমা) থাকত। গোত্রের মধ্যে এদের পদ উত্তরাধিকারসূত্রে নির্ধারিত হত। এছাড়া থাকত দুজন করে সাধারণ প্রধান, দুজন করে সমর-প্রধান। অর্থাৎ তিনটি গোত্রে মোট পনের জন সাকেম্ ও প্রধান থাকত এবং এদেরকে নিয়েই গঠিত হত গোষ্ঠী-পরিষদ। ওজিবোয়াদের মধ্যে এক-একটা এলাকায় সাধারণত কোন-একটা গোত্রের লোকসংখ্যা বেশি হত। প্রতিটা গোত্রে একজন করে সাকেম্ থাকত, যার পদ গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে নির্ধারিত হত। এছাড়া থাকত কয়েকজন সাধারণ প্রধান। যেখানে একই গোত্রের বহুসংখ্যক লোক এক জায়গায় বসবাস করত, সেখানেও এইভাবেই সংগঠিত হত তারা। একটা গোত্রে কতজন প্রধান থাকবে, তার কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। সাকেম্ ও প্রধানদের নির্বাচন ও নিয়োগ করার ব্যাপারে বেশ কিছু ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে নিঃসন্দেহেই কিছু প্রথা চালু ছিল, যে বিষয়ে কখনোই অনুসন্ধান চালানো হয় নি। এগুলিকে জানা একান্তই দরকার। পরবর্তী পরিচ্ছেদে সাকেম্ ও প্রধানদের "তুলে ধরা"-র ব্যাপারে ইরোকোয়াদের পদ্ধতির ব্যাখ্যা করা হবে।

৪। সাকেম্ ও প্রধানদের বরখাস্ত করার অধিকার।

এই অধিকারটা মূলত গোত্রের হাতেই থাকলেও গোষ্ঠী-পরিষদেরও এই অধিকার থাকে। গোত্রের অনুমতি ছাড়াই, এমনকি গোত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, কোন সাকেম্ বা প্রধানকে বরখাস্ত করতে পারে সে। বন্য যুগে এবং বর্বর যুগের নিম্ন ও মধ্য অবস্থায় কাউকে কোন পদ দেওয়া হত সারা জীবনের জন্য কিংবা যতদিন সে ভালো আচার-আচরণ করবে, ততদিনের জন্য। কোন নির্বাচিত পদের মেয়াদ কয়েক বছরের সময়-সীমায় বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারটা মানবজাতি তখনও পর্যন্ত শিখে উঠতে পারেনি। তাই স্ব-শাসনের নীতি পালন করার ক্ষেত্রে বরখাস্ত করার অধিকারটা একান্ত আবশ্যক হয়ে ওঠে। এই অধিকারটা ছিল গোত্রের এবং গোষ্ঠীর সার্বভৌমত্বের এক স্থায়ী প্রমাণ। এই সার্বভৌমত্বকে তারা হয়ত অস্পষ্টভাবেই বুঝেছিল, তবুও তা ছিল একান্তই বাস্তব।

৫। ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপাসনার অধিকার।

বর্বরদের মত আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরাও ধর্মবিশ্বাসী ছিল। বছরের বিভিন্ন নির্দিষ্ট ঋতুতে নানান ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন করত গোষ্ঠীগুলি। ঐ-সব উৎসবে নানা ধরনের উপাসনা, নাচ ও খেলাধুলো হত। বহু গোষ্ঠীতে আরোগ্য-নিকেতনগুলিই ছিল এইসব অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল। উৎসবের ব্যাপারে জনসাধারণের আগ্রহ জাগিয়ে তোলার জন্য কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস আগে থেকেই কোন-একটা আরোগ্য-নিকেতন দখলে নেওয়া হত এবং তা সবাইকে জানিয়েও দেওয়া হত। আদিবাসীদের ধর্মীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আংশিক কিছু অনুসন্ধানই শুধু চালানো হয়েছে। ভবিষ্যতের কোন গবেষক খোঁজ করলে এর মধ্যে বহু উপাদানের সন্ধান পাবেন। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপাসনা-পদ্ধতি উন্নত করে তোলার ব্যাপারে এইসব গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা মানবজাতির সমগ্র অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডারেরই একটা অংশ। তুলনামূলক ধর্মবিষয়ক বিজ্ঞানে এইসব তথ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

BanglaBook.org

এদের ধর্মীয় ব্যবস্থা ছিল কম-বেশি অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট, প্রচুর আদিম কুসংস্কারে ভর্তি। প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা চালু ছিল, অগ্রসর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দেখা যেত বহু-ঈশ্বরবাদের প্রবণতা। যেমন, ইরোকোয়ারা ঈশ্বর ও ভুত-প্রেতের অস্তিত্বে এবং আরও অসংখ্য অদ্ভুত ভৌতিক বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত, বিশ্বাস করত আত্মার অমরত্বে এবং পুনর্জন্মে। ঈশ্বরকে তারা মানুষের আকারে কল্পনা করত। মানুষের আকারেই তারা কল্পনা করত বজ্রের ভুত 'হে-নো'-কে, ঝড়ের ভুত 'গা-ওহ্'কে এবং 'তিন বোন' অর্থাৎ ভুট্টার দেবী, শিমের দেবী এবং লাউয়ের দেবীকে। এই শেষোক্তদেরকে বলা হত "আমাদের জীবন" এবং "আমাদের সাহায্যকারী"। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গাছ ও লতা-পাতার এবং বহতা নদীর দেব-দেবীর কথাও কল্পনা করত তারা। এই অসংখ্য দেব-দেবীর অস্তিত্ব ও কাজকর্মকে তারা কল্পনা করতে পারত খুবই দুর্বলভাবে। বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থার গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মূর্তিপূজার কোন চলন ছিল না।[১] আজটেকদের মধ্যে এক-একটা বিষয়ে এক-একজন দেব-দেবী থাকত, তাদের এক-একটা কল্পিত মূর্তি থাকত এবং এইসব দেব-দেবীর উপাসনা করা হত মন্দিরে। এদের ধর্মীয় ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ ঠিক ঠিক ভাবে জানা গেলে ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির সার্বজনীন বিশ্বাসের মধ্যে থেকে এই ব্যবস্থার উদ্ভবের ইতিহাসও হয়ত জানা যেত।

নৃত্য ছিল আমেরিকার আদিবাসীদের অন্যতম উপাসনা পদ্ধতি। সমস্ত ধর্মীয় উৎসবেই নৃত্যের অনুষ্ঠান করা হত। পৃথিবীর আর কোথাও বর্বরদের মধ্যে নৃত্যের এত সুচিন্তিত বিকাশ দেখা যায় নি। প্রতিটা গোষ্ঠীর জন্য দশটা থেকে তিরিশটা পর্যন্ত নির্দিষ্ট নৃত্য আছে। প্রতিটি নৃত্যের নিজস্ব নাম, গান, বাদ্যযন্ত্র, পদবিন্যাস, ছক এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক থাকে। কিছু নৃত্য সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই চালু ছিল, যেমন সমর-নৃত্য। কিছু কিছু নৃত্য আবার একটা গোত্রের অথবা ঐ নৃত্যের চর্চা বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট সংগঠনের বিশেষ সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত। মাঝেমাঝে এইসব সংগঠনে নতুন সদস্য নেওয়া হত। ডাকোটা, ক্রী, ওজিবোয়া, ইরোকোয়া এবং নিউ মেক্সিকোর পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে নৃত্যের সাধারণ চরিত্র, পদবিন্যাস, ছক এবং সঙ্গীত একইরকম। যতদূর জানা গেছে তা থেকে মনে হয় যে আজটেকদের নৃত্যের সাধারণ চরিত্র, পদবিন্যাস, ছক ও সঙ্গীতও এদের মতই ছিল। ইণ্ডিয়ানদের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই নৃত্যের এই ব্যবস্থা এখনও চালু আছে এবং তাদের ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনা ব্যবস্থার সঙ্গে নৃত্যেরও একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে।

১। গত শতাব্দীর শেষদিকে সেনেকা-ইরোকোয়ারা তাদের অ্যালেগানি নদীর তীরবর্তী একটা গ্রামে কাঠ দিয়ে একটা মূর্তি নির্মাণ করে। ঐ মূর্তির চারদিকে তারা নৃত্য করত এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। এ খবর আমাকে যিনি দিয়েছিলেন, সেই প্রয়াত উইলিয়াম পার্কার এই মূর্তিটাকে একটা নদীতে ভেসে থাকতে দেখেছিলেন। ঐ নদীতেই মূর্তিটাকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। মূর্তিটা কোন্ দেবতার ছিল, তা তিনি জানতে পারেন নি।

BanglaBook.org

৬। প্রধানদের পরিষদ নিয়ে গঠিত সর্বোচ্চ সরকার।

গোত্রের প্রধানদের নিয়েই গড়ে উঠত পরিষদ, তাই গোত্রগুলির মধ্যে পরিষদের একটা স্বাভাবিক ভিত্তি থাকতই। পরিষদ একটা একান্ত আবশ্যিক চাহিদা পূরণ করত, তাই গোত্রভিত্তিক সমাজ যতদিন টিকে থাকত, ততদিন পরিষদের টিকে থাকাও নিশ্চিত ছিল। গোত্রের প্রতিনিধি ছিল প্রধানরা আর গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ছিল গোত্রের ঐ প্রধানদের নিয়ে গঠিত গোষ্ঠী-পরিষদ। এই পরিষদ ছিল তাদের সামাজিক ব্যবস্থার এক স্থায়ী বৈশিষ্ট্য, গোটা গোষ্ঠীর ওপর এর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকত। সবারই জানা কোন পরিস্থিতিতে এর সভা ডাকা হত। জনসাধারণের মাঝখানেই বসত এই সভা। পরিষদের সকল সদস্যই সভায় বক্তব্য পেশ করতে পারত। এই সবকিছুর ফলে আসলে জনসাধারণের প্রভাবাধীনেই কাজ করত গোষ্ঠী-পরিষদ। রূপের দিক থেকে অল্প-সংখ্যক ব্যক্তির শাসন হলেও, আসলে এটা ছিল একটা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। প্রতিনিধিরা সারা জীবনের জন্যই নির্বাচিত হত, কিন্তু প্রয়োজনে তাদেরকে বরখাস্তও করা যেত। প্রতিটি গোত্রের সদস্যদের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং যে-কোন পদের ব্যাপারে নির্বাচন-ভিত্তিক নীতি—এই দুটিই ছিল তাদের গণতান্ত্রিক নীতির বীজ ও ভিত্তি। মানবজাতির অগ্রগতির এই প্রাথমিক স্তরের অন্যান্য মহান নীতিগুলির মতই গণতন্ত্রও বিকশিত হয়েছিল ত্রুটিপূর্ণভাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইসব মানবগোষ্ঠীগুলির মধ্যে গণতন্ত্রের এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য দেখা যায়।

গোষ্ঠীর সার্বজনীন স্বার্থের তত্ত্বাবধান এবং তা রক্ষা করার দায়িত্ব পরিষদের ওপরেই বর্তেছিল। গোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি ও অস্তিত্ব নির্ভর করত তার সদস্যদের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের ওপর এবং পরিষদের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির ওপর। অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকার দরুণ গোষ্ঠীর মধ্যে সারাক্ষণই নানান প্রশ্ন উত্থিত হত ও নানান জরুরি প্রয়োজন দেখা দিত। সেগুলির সমাধানের জন্য তাদের ঐ-সমস্ত গুণকে কাজে লাগানো হত। তাই পরিষদের ওপর জনসাধারণের প্রচণ্ড প্রভাব থাকা একান্তই অপরিহার্য ছিল। কোন সার্বজনীন প্রশ্ন সম্পর্কে যে-কোন ব্যক্তিই পরিষদের সামনে বক্তব্য পেশ করতে পারত। এমনকি মেয়েরাও কোন-একজন লোককে নিজেদের মুখপাত্র করে তার মারফৎ নিজেদের ইচ্ছা ও মতামত প্রকাশ করতে পারত। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকত পরিষদের হাতেই। ইরোকোয়াদের মধ্যে পরিষদের কার্যকলাপের ব্যাপারে সকলকার সম্মতি নেওয়াটা ছিল একটা মৌলিক নীতি। তবে এই রীতিটা সব জায়গাতেই চালু ছিল কিনা, তা আমি বলতে পারছি না।

সামরিক ব্যাপারে সাধারণত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্যকলাপের নীতিই মেনে চলা হত। তত্ত্বগতভাবে বলা যায়, যে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কোন শান্তি চুক্তি হয়নি, তারা প্রত্যেকেই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। যে-কোন লোকই একটা সেনাদল তৈরি করে যেখানে খুশি অভিযান চালাতে পারত। একটা সমর-নৃত্যের আয়োজন করে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে সে তার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করত। তার উদ্যোগ জনসাধারণ কতটা গ্রহণ করছে, তা এই পদ্ধতিতে হাতে হাতে প্রমাণ হয়ে

BanglaBook.org

যেত। যারা তার সঙ্গে ঐ সমর-নৃত্যে যোগ দিত, তাদেরকে নিয়েই গড়ে উঠত সেনা-দল। সেনাদল গঠন করতে সক্ষম হলে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযাত্রা করত তারা। বিভিন্ন জায়গায় গঠিত এইসব সেনাদলকে একটা কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ঐক্যবদ্ধ করা হত, প্রতিটি দলকে নেতৃত্ব দিত তাদের নিজস্ব সেনাপতি, আর গোটা বাহিনীর যৌথ কার্যকলাপ পরিচালনা করত এইসব সেনাপতিদের পরিষদ। তাদের মধ্যে কোন সুখ্যাত সেনাপতি থাকলে তিনিই গোটা বাহিনীকে নেতৃত্ব দিতেন। এই কথাগুলি বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থার গোষ্ঠীগুলির সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। আজটেক আর ত্লাস্কালান্দের প্রতিটা ভ্রাতৃত্ব সংগঠন আলাদা আলাদা ভাবে যুদ্ধে যেত, প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব সেনাপতি থাকত এবং একটা বিভাগের থেকে অপর বিভাগের উর্দি ও নিশানও আলাদা ধরণের হত।

সামরিক কার্যকলাপের ব্যাপারে ইণ্ডিয়ানদের গোষ্ঠীগুলি, এমনকি মিত্রসংঘগুলিও, সাংগঠনিক দিক দিয়ে খুবই দুর্বল ছিল। আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল ইরোকোয়া ও আজটেক গোষ্ঠীগুলি। বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থার গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের (ইরোকোয়ারাও যাদের অন্যতম ছিল) সবথেকে ধ্বংসাত্মক ব্যাপার ছিল যখন-তখন নানান তুচ্ছ কারণে সেনাদল বানিয়ে ফেলা এবং দূর-দূরান্তে অভিযান চালানো। সেনাদলের খাদ্য ছিল শুষ্ক শস্যচূর্ণ। প্রতিটি যোদ্ধার কোমর-বন্ধনীর সঙ্গে আটকানো একটা থলিতে এই শস্যচূর্ণ থাকত। এছাড়া চলার পথে শিকার, মাছ বা জীবজন্তু যা পাওয়া যায়, তা তো থাকতই। সেনাদলের এই যুদ্ধযাত্রা এবং ফিরে আসার পর তাদের গণ-সংবর্ধনা—এগুলি ইণ্ডিয়ানদের জীবনযাত্রার অত্যন্ত বিশিষ্ট ঘটনা ছিল। এই ধরণের যুদ্ধযাত্রার জন্য পরিষদের কাছ থেকে কোন অনুমতি চাওয়া হত না, তার কোন দরকারও ছিল না।

গোষ্ঠী-পরিষদ যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারত, আবার শান্তি স্থাপনও করতে পারত। কোথাও দূত পাঠাতে পারত এবং অন্য গোষ্ঠীর দূতকে গ্রহণ করতেও পারত। অন্যদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করার ক্ষমতাও থাকত পরিষদের হাতে। এত সাদামাটা আর এত অল্প কাজবিশিষ্ট একটা সরকারের যা যা ক্ষমতা থাকা দরকার, গোষ্ঠী-পরিষদের হাতে তার সবই ছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদান চালাতো বিজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রধানদের নিয়ে গঠিত প্রতিনিধিদল। কোন গোষ্ঠী যখন এইরকম কোন প্রতিনিধিদলের আসার খবর পেত, তখন তারা পরিষদের সভা ডেকে ঐ প্রতিনিধিদলের অভ্যর্থনা ও তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর ব্যবস্থা পাকা করে ফেলত।

৭। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান হিসেবে কাজ করে থাকে গোষ্ঠীর একজন সাকেম্।

ইণ্ডিয়ানদের কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে একজন সাকেম্কে প্রধান হিসেবে মনোনীত করা হত। অন্যান্য সাকেমদের থেকে এর পদ-মর্যাদাও অধিক হত। আসলে গোষ্ঠী-পরিষদের অধিবেশন যখন বসছে না, তখন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন স্বীকৃত প্রধানের কিছুটা প্রয়োজন অনুভব করত তারা। তবে এই সাকেম-প্রধানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা খুব কমই থাকত। গোষ্ঠী-পরিষদ চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও সব-

BanglaBook.org

সময় তো আর তার অধিবেশন বসত না। সেই অন্তর্বর্তী সময়ে তাৎক্ষণিক কোন ব্যাপারে গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন স্বীকৃত ব্যক্তির প্রয়োজন হতেই পারত। তবে তার কাজকর্মকে গোষ্ঠী-পরিষদের দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নেওয়াটাও আবশ্যক ছিল। বর্তমান লেখকের জ্ঞান অনুসারে, এইটাই ছিল সাকেম-প্রধানের পদের একমাত্র ভিত্তি। কিছু কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে এই পদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু একজন কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের হাতেও যেটুকু ক্ষমতা থাকে, সেটুকু ক্ষমতাও থাকত না ঐ সাকেম-প্রধানের হাতে। প্রাচীনকালের কিছু লেখক এদেরকে রাজা বলে অভিহিত করেছেন। ব্যাপারটা পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির সরকার সংক্রান্ত জ্ঞান তখনও এতদূর অগ্রসর হয়নি যাতে করে একজন প্রধান কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ধারণা তাদের মধ্যে জন্ম নিতে পারে। ইরোকোয়াদের গোষ্ঠীতে কোন সাকেম-প্রধান থাকত না, এমনকি তাদের মিত্রসঙ্ঘেও থাকত না কোন কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা। নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানদের পদের কার্যকাল নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে পদচ্যুত হওয়ার ব্যাপারে নির্বাচিত ব্যক্তিটির বাধ্যবাধকতা—এ দিয়েই নির্ধারিত হত পদটির চরিত্র।

বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে, ইণ্ডিয়ান প্রধানদের পরিষদের তেমন কোন মূল্য নেই। কিন্তু আধুনিক সংসদ (parliament), মহাসভা (congress) এবং বিধানমণ্ডলের (legislature) ভ্রূণ হিসেবে মানবজাতির ইতিহাসে এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

বন্য যুগে যখন গোত্র সংগঠন গড়ে ওঠে, তখন থেকেই সরকার সংক্রান্ত একটা ধারণাও দেখা দেয় মানুষের মধ্যে। বন্য যুগে এর সূচনা হওয়া থেকে শুরু করে সভ্যতার যুগে এসে রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে এই ধারণা বিকাশের তিনটি বড় বড় স্তর অতিক্রম করে আসে। প্রথম স্তরটি হল গোত্র কর্তৃক নির্বাচিত প্রধানদের পরিষদ নিয়ে গঠিত গোষ্ঠীর সরকার। এটাকে বলা যায় 'এক শক্তি'-র সরকার, অর্থাৎ পরিষদের সরকার। সাধারণত বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থার গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই এর অস্তিত্ব দেখা যেত। দ্বিতীয় স্তরটা হল প্রধানদের পরিষদ এবং একজন সামরিক নেতার সমন্বয়মূলক সরকার, যেখানে পরিষদ দেখাশোনা করত আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি আর সামরিক নেতা সামরিক কাজকর্মের দেখাশোনা করত। বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থায় মিত্রসঙ্ঘ গঠিত হওয়ার পর থেকেই এই দ্বিতীয় রূপটি প্রকাশ পেতে শুরু করে এবং বর্বর যুগের মধ্য অবস্থায় তা স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

সেনাপতি অথবা প্রধান সামরিক নেতার নেতার পদটাই ছিল প্রধান কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, রাজা, সম্রাট আর রাষ্ট্রপতি পদের ভ্রূণরূপ। এটাকে বলা যায় 'দুই শক্তি'-র সরকার, অর্থাৎ প্রধানদের পরিষদ আর সেনাপতির সরকার। তৃতীয় স্তরটা হল প্রধানদের পরিষদ, গণ-পরিষদ আর সামরিক নেতাকে নিয়ে গঠিত জনগণের বা জাতির সরকার। বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থায় উন্নীত হওয়া গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই এই সরকার সৃষ্টি হয়, যেমন হোমারের যুগের গ্রীকদের মধ্যে, রোমুলাসের সময়কার ইতালিয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে। একটা জাতিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া জনগণের প্রচুর সংখ্যাবৃদ্ধি, প্রাচীরঘেরা শহরে তাদের বসবাস শুরু করা এবং কোষাগারে সম্পদ সঞ্চয় ও প্রচুর গবাদি

BanglaBook.org

পশু সংগ্রহ করা—এইগুলিই গণ-পরিষদকে সরকারের অন্যতম অঙ্গে পরিণত করে। তখনও পর্যন্ত টিকে থাকা প্রধানদের পরিষদ জনমতের চাপে পড়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সার্বজনীন বিষয়গুলিকে গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করার দায়িত্ব গণ-পরিষদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। এইভাবেই সৃষ্টি হয় গণ-পরিষদ। এই পরিষদ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করত না। এর কাজ ছিল শুধু কোনকিছুকে গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করা এবং এর সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হত। প্রথম আবির্ভাবের সময় থেকেই এই গণ-পরিষদ সরকারের একটা স্থায়ী শক্তি হয়ে ওঠে। প্রধানদের পরিষদ এখন আর কোন গুরুত্বপূর্ণ সার্বজনীন বিষয়ের পদক্ষেপ নির্ধারিণ করে না, এর কাজ হল বিষয়গুলিকে শুধু আগে থেকে বিবেচনা করা। সার্বজনীন বিধি-বিধান রচনা করা ও তা পূর্ণাঙ্গ করে তোলার ক্ষমতা তার হাতেই থাকে, কিন্তু গণ-পরিষদ অনুমোদন না করলে তা বলবৎ হতে পারে না। তাই এই সরকারকে বলা যায় 'তিন শক্তি'-র সরকার, অর্থাৎ বিবেচনা-কারী পরিষদ, গণ-পরিষদ এবং সেনাপতির সরকার। রাজনৈতিক সমাজ প্রবর্তিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সরকারের এই রূপটিই চালু ছিল। মানবজাতি রাজনৈতিক সমাজে উপনীত হওয়ার পর কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন, এথেনিয়দের মধ্যে প্রধানদের পরিষদ পরিণত হয় ব্যবস্থাপক সভায় (senate) আর গণ-পরিষদ পরিণত হয় লোকসভা (ecclesia) বা জনপ্রিয় পরিষদে। আজদের দিনের সংসদ, মহাসভা ও বিধানমণ্ডলের দুটি করে কক্ষের মধ্যে ঐ পুরনো দিনের সংগঠনের চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়। একইভাবে, তাদের ঐ সামরিক নেতার পদটাই ছিল আধুনিক কালের কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পদের ভ্রূণরূপ।

আবার গোষ্ঠীর কথায় ফেরা যাক। গোষ্ঠীতে থাকত অল্প সংখ্যক মানুষ, শক্তির দিক থেকে সে দুর্বল, এবং তার সঙ্গতিও ছিল সামান্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোষ্ঠী ছিল এক সম্পূর্ণ সংগঠিত সমাজ। বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থায় মানবজাতির কী অবস্থা ছিল, তা গোষ্ঠীর মধ্যে থেকেই জানা যায়। বর্বর যুগের মধ্য অবস্থায় গোষ্ঠীগুলির লোকসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, তাদের অবস্থাও বেশ উন্নত হয়। কিন্তু তখনও গোত্র-ভিত্তিক সমাজ টিকেই ছিল এবং তার কোন মূলগত পরিবর্তনও ঘটেনি। মানবসমাজ তখনও পর্যন্ত এতটা অগ্রসর হতে পারে নি, যার ফলে রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি হতে পারে। গোষ্ঠীর মধ্যে সংগঠিত গোত্রগুলি আগের মতই রয়ে গিয়েছিল। তবে এই সময়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশি সংখ্যায় মিত্রসংঘ গড়ে উঠেছিল। কোন কোন এলাকায়, যেমন মেক্সিকো উপত্যকা অঞ্চলে, বহু গোষ্ঠী একটাই সাধারণ সরকারের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, তাদের জীবনযাপন প্রণালীরও অনেক উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে গোত্রভিত্তিক সমাজ ধ্বংস হয়ে তার জায়গায় রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল—এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোন রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্র কখনো গোত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে ভূখণ্ড, ব্যক্তি নয়। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার একক হচ্ছে শহর, তাই অন্য একটা সামাজিক ব্যবস্থার একক, অর্থাৎ গোত্র, তার একক হতে পারে না।

BanglaBook.org

সমাজব্যবস্থার এইরকম মৌলিক পরিবর্তনের প্রস্তুতি হিসেবে প্রয়োজন ছিল অনেক সময় এবং প্রচুর অভিজ্ঞতা, আর সেই পরিমাণ অভিজ্ঞতা ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির ছিল না। গ্রীক ও রোমানদের মত মানসিক গুণসম্পন্ন মানুষেরও দরকার ছিল। বহুকাল ধরে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত ও ক্রমান্বয়ে কার্যকরী হয়ে উঠেছিল এক নতুন ধরণের সরকার। আজকের দিনের সভ্য রাষ্ট্রগুলিতে আমরা এই সরকারই দেখতে পাই।

ধারাবাহিক সাংগঠনিক ক্রমটিকে চিনে নেওয়ার গতিপথে এবার আমরা গোষ্ঠীগুলির মিত্রসঙ্ঘের আলোচনায় প্রবেশ করব। এই মিত্রসঙ্ঘের মধ্যে গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীকে আমরা দেখতে পাব এক নতুন সম্পর্কের বাঁধনে। বর্বর যুগের মানবজাতির অবস্থা ও প্রয়োজনের পক্ষে গোত্রভিত্তিক সংগঠন কত চমৎকারভাবে নিজেকে উপযোগী করে তুলেছিল, তা নিয়েও আলোচনা করব আমরা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইরোকোয়া মিত্রসঙ্ঘ

জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কযুক্ত এবং কাছাকাছি এলাকায় বসবাসকারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য মৈত্রীবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছিল। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যেমে কোন ঐক্যের সুবিধাগুলি উপলব্ধি করা গেলে ঐক্যবদ্ধ সংগঠনটিতে—প্রথমে যা সঙ্ঘ রূপে ছিল—ক্রমান্বয়ে একটা মৈত্রীবদ্ধ ঐক্য সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহের যে অবস্থার মধ্যে তারা বাস করত, তা এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে আরও দ্রুত তালে সক্রিয় করে তোলে। আর এই ঘটনা বিশেষভাবে ঘটে সেইসব গোষ্ঠীর মধ্যে, যাদের বুদ্ধিমত্তা এবং জীবনযাপন প্রণালী যথেষ্ট উন্নত ছিল। আসলে এটা ছিল একটা নিম্নতর সংগঠন থেকে উচ্চতর সংগঠনে উত্তরণের প্রক্রিয়া মাত্র। যে নীতির ভিত্তিতে গোত্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এক-একটা গোষ্ঠীতে, সেই নীতিরই সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সমাজ এই উচ্চতর সংগঠনের স্তরে পৌঁছেছিল।

উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অংশ যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেইসব জায়গায় বেশ কিছু মিত্রসঙ্ঘের অস্তিত্ব ছিল। এর মধ্যে কয়েকটির পরিকল্পনা ও কাঠামো ছিল অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইরোকোয়াদের পাঁচটি স্বাধীন গোষ্ঠীর একটা মিত্রসঙ্ঘ ছিল, ছয়টি গোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছিল গ্রীকদের মিত্রসঙ্ঘ, ওটাওয়াদের তিনটি গোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছিল ওটাওয়া মিত্রসঙ্ঘ, "সাতটি পরিষদ অগ্নি" মিলে ডাকোটা সঙ্ঘ, সাতটি পুয়েব্লো নিয়ে নিউ মেক্সিকোর মোকি মিত্রসঙ্ঘ এবং মেক্সিকো উপত্যকায় আজটেকদের তিনটি গোষ্ঠী মিলে আজটেক মিত্রসঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল। খুব সম্ভবত মেক্সিকোর অন্যান্য অঞ্চলে এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় ভিলেজ ইণ্ডিয়ানরা তাদের দুই বা ততোধিক জ্ঞাতিত্বসম্পর্কযুক্ত গোষ্ঠীকে মিলিত করে বিভিন্ন মিত্রসঙ্ঘ গড়ে তুলেছিল। তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির চরিত্র এবং সেগুলির বিকাশকে নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মের বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে তাদের পক্ষে মিত্রসঙ্ঘমুখী প্রগতি ছিল একান্তই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও, এ ধরণের উপাদানের মধ্যে থেকে এবং এরকম পরিবর্তনশীল ভৌগোলিক সম্পর্কের সাহায্যে একটা মিত্রসঙ্ঘ গড়ে তোলা যথেষ্টই দুরূহ কাজ ছিল। ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের পুয়েব্লোগুলি পরস্পরের খুবই কাছাকাছি হত এবং এগুলির আয়তনও হত খুব ছোট, ফলে তাদের পক্ষেই মিত্রসঙ্ঘ গড়ে তোলা সবথেকে সহজ ছিল। তবে, বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থায় থাকা গোষ্ঠীগুলি, বিশেষত ইরোকোয়ারাও, কোথাও কোথাও এই মিত্রসঙ্ঘ গড়ে তুলতে পেরেছিল। যে-কোন জায়গায় একটা মিত্রসঙ্ঘ গড়ে ওঠার ঘটনা থেকে সেই জায়গার মানুষের উন্নততর বুদ্ধিমত্তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

BanglaBook.org

উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির মিত্রসঙ্ঘের দুটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হল ইরোকোয়াদের মিত্রসঙ্ঘ ও আজটেকদের মিত্রসঙ্ঘ। সামরিক শক্তি হিসেবে এই গোষ্ঠীগুলির নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের দরুণ দুটি মিত্রসঙ্ঘই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পেরেছিল। ইরোকোয়া মিত্রসঙ্ঘের কাঠামো ও নীতি সম্পর্কে আমাদের কিছু সুনির্দিষ্ট ও সুসম্পূর্ণ ধারণা আছে, কিন্তু আজটেক মিত্রসঙ্ঘের ইতিহাস বিষয়ে বিভিন্ন জন এমনভাবে আলোচনা করেছেন যা থেকে স্পষ্ট করে বোঝা যায় না যে এটা তিনটি জ্ঞাতিত্বসম্পর্কযুক্ত গোষ্ঠীর একটা 'আক্রমণ ও আত্মরক্ষামূলক সঙ্ঘ' মাত্র ছিল, নাকি ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে যা সত্য, তা আজটেকদের ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে সত্য ছিল। কাজেই, একটাকে ভালোভাবে জানতে পারলে অন্যটাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

খুবই সহজ-সরল পরিস্থিতিতে আর একান্ত সাধারণ নীতির ভিত্তিতে গড়ি উঠেছিল মিত্রসঙ্ঘ। নিতান্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই কালক্রমে এর জন্ম হয়। যেখানে একটা গোষ্ঠী থেকে ভেঙে অনেকগুলি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল এবং এই গোষ্ঠীগুলি পরস্পরের পাশাপাশি নিজের নিজের এলাকায় বসবাস করত, সেখানে এই মিত্রসঙ্ঘ তাদেরকে এক উচ্চতর সংগঠনে পুনর্মিলিত করেছিল। মিত্রসঙ্ঘের ভিত্তি ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেকার জ্ঞাতিত্বের মনোভাব এবং একই মূল ভাষা থেকে সৃষ্ট উপ-ভাষা। গোষ্ঠীর মধ্যেকার সাধারণ গোত্রগুলি এবং একই মূল ভাষা থেকে, একই বংশ থেকে গোত্রগুলির উদ্ভব আর পরস্পরের বোধগম্য নানান উপ-ভাষা—এগুলিই ছিল মিত্রসঙ্ঘের বস্তুগত উপাদান। অর্থাৎ গোত্রগুলি ছিল মিত্রসঙ্ঘের ভিত্তি ও কেন্দ্রবিন্দু, আর মূল ভাষাটি ছিল এর পরিধিরেখা। প্রতিটি গোষ্ঠীই এই মূল ভাষার কোন-না-কোন উপ-ভাষায় কথা বলত। এই স্বাভাবিক বাধাটাকে অগ্রাহ্য করলে অন্য বংশোদ্ভূত লোকেরাও এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারত। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন বিদ্যমান মিত্রসঙ্ঘের মধ্যে কোন ভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর একটা অংশকে হয়ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল নাৎচেজ্‌দের[১]। কিন্তু এই ধরণের ব্যতিক্রম সাধারণ নিয়মকে বাতিল করে দেয় না। একই বংশ থেকে উদ্ভব না হলে কোন ইণ্ডিয়ান শক্তির পক্ষে গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত গোষ্ঠীগুলির মিত্রসঙ্ঘ মারফৎ আমেরিকা মহাদেশে মাথা তুলে দাঁড়ানো এবং সাধারণ একটা কর্তৃত্বমূলক জায়গায় পৌঁছোনো সম্ভব হত না। বহু মূল ভাষার অস্তিত্ব থেকেই এদের সেই জায়গায় পৌঁছোতে ব্যর্থ হওয়ার কারণটাও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কোন-একটা গোত্র ও গোষ্ঠীর সদস্য না হলে এবং এবং একই ভাষাভাষী না হলে কোন মিত্রসঙ্ঘের সঙ্গে সমমর্যাদায় সম্পর্কযুক্ত হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও থাকত না।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে বর্বর যুগের নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ অবস্থায় পৃথিবীর কোথাওই গোত্রভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কোন রাজত্ব গড়ে

১। ফরাসিদের হাতে পরাজিত হওয়ার পর এদেরকে ক্রীক্‌দের মিত্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

BanglaBook.org

ওঠা সম্ভব ছিল না। গোত্র, ভ্রাতৃত্ব এবং গোষ্ঠীর ভিত্তিতে সংগঠিত প্রাচীন সমাজের কাঠামো ও নীতির প্রতি পাঠকের আরও একাগ্র মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য আমাদের আলোচনার এই প্রারম্ভিক স্তরেই আমি এই ব্যাপারটার উল্লেখ করলাম। গোত্রভিত্তিক সমাজের পক্ষে রাজতন্ত্র একেবারেই বেমানান। সভ্য যুগের পরের দিকে রাজতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল। বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থায় কোন কোন গ্রীক গোষ্ঠীতে স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু এগুলি গড়ে উঠেছিল নিতান্তই জোর জবরদস্তির সাহায্যে। লোকে এগুলিকে অবৈধ বলে মনে করত এবং প্রকৃতপক্ষে এগুলি গোত্রভিত্তিক সমাজের সঙ্গে একেবারেই বেমানান ছিল। গ্রীকদের পীড়নমূলক রাজতন্ত্র ছিল আসলে জবরদস্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বৈরতন্ত্র এবং পরবর্তীকালের রাজত্বগুলির ভ্রূণস্বরূপ। আর মহাকাব্যীয় যুগের (heroic age) তথাকথিত রাজত্বগুলি আসলে ছিল সামরিক গণতন্ত্র।

সুপরিকল্পিত বিধি-বিধানের সাহায্যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কিভাবে একটা মিত্রসংঘ গড়ে ওঠে, তার চমৎকার উদাহরণ দেখা যায় ইরোকোয়াদের মধ্যে। আসলে এরা মিসিসিপির ওপার থেকে দেশান্তরী হয়ে চলে এসেছিল এবং সম্ভবত এরা ছিল ডাকোটা বংশেরই একটা শাখা। প্রথমে এরা চলে আসে সেণ্ট লরেন্স উপত্যকা অঞ্চলে এবং মন্ট্রিলের কাছাকাছি এলাকায় বসবাস করতে শুরু করে। চারপাশের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির শত্রুতার দরুণ এদেরকে এই অঞ্চল থেকে সরে যেতে হয়। তখন নিউ ইয়র্কের মধ্যাঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে এরা। ক্যানোয় চেপে ওণ্টারিও হ্রদের পূর্ব উপকূল বরাবর এগিয়ে গিয়ে অস্‌ওয়েগো নদীর মোহনার মুখে বসতি স্থাপন করে এরা। লোকসংখ্যা অল্প ছিল বলেই তাদের পক্ষে এইভাবে ক্যানোয় চেপে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। এদের উপকথা থেকে বোঝা যায় যে এই অঞ্চলে এরা বসবাস করেছিল। ইরোকোয়াদের মধ্যে সেইসময় অন্তত তিনটি পৃথক পৃথক গোষ্ঠী ছিল—মোহক্, ওনোন্‌ডাগা আর সেনেকা। পরবর্তীকালে সেনেকারা কানাডাইগুয়া হ্রদের উৎসমুখে বসতি স্থাপন করে। ওনোন্‌ডাগা উপত্যকা অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে ওনোন্‌ডাগারা। আর মোহক্‌রা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে উটিকার কাছে ওনেইডা অঞ্চলে বসবাস শুরু করে, সেখান থেকে এদের মূল অংশটা আরও এগিয়ে গিয়ে মোহক্ উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। ওনেইডা অঞ্চলে যারা রয়ে যায়, তারা তখন ওনেইডা নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। ওনোন্‌ডাগা কিংবা সেনেকাদের একটা অংশ ক্যায়ুগা হ্রদের পূর্ব তীরে বসবাস শুরু করে এবং এরা ক্যায়ুগা নামে পরিচিত হয়। ইরোকোয়ারা নিউ ইয়র্কে বসবাস শুরু করার আগে এই অঞ্চলটা সম্ভবত অ্যাল্‌গন্‌কিন গোষ্ঠীর এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। ইরোকোয়াদের উপকথা থেকে জানা যায় যে পূর্বদিকে হাড্‌সন অঞ্চলে এবং পশ্চিমদিকে জেনেসী অঞ্চলে ধীরে ধীরে নিজেদের বসতি স্থাপন করার সময় তারা এই এলাকার আদি বাসিন্দাদের ওখান থেকে বিতাড়িত করেছিল। এদের উপকথা থেকে আরও জানা যায় যে এরা নিউ ইয়র্কে বসতি স্থাপন করার বহুদিন পরে গড়ে উঠেছিল মিত্রসংঘ। এই মধ্যবর্তী সময়কালে নিজেদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তারা এক হয়ে লড়েছিল

BanglaBook.org

আর তার ফলে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার ব্যাপারে মৈত্রীবদ্ধতার নীতির সুবিধাগুলি তারা বুঝে নিতে পেরেছিল। গ্রামে বাস করত এরা। এইসব গ্রামের চারদিক বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হত। মাছ, পশুমাংস আর সামান্য কিছু কৃষিজ ফসলই ছিল এদের খাদ্য। এদের লোকসংখ্যা কখনোই ২০ হাজারের বেশিতে পৌঁছোয়নি। অনিশ্চিত জীবনযাপন এবং অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহের ফলে কোন আদিবাসী গোষ্ঠীর লোকসংখ্যাও খুব বেশি হতে পারত না। ভিলেজ ইণ্ডিয়ানরাও তার ব্যতিক্রম নয়। সেইসময় সারা নিউ ইয়র্কে বিস্তৃত বড় বড় অরণ্যগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল ইরোকোয়ারা। এদের অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৬০৮ সাল নাগাদ, যখন এরা পৌঁছেছিল উন্নতির চরম সীমায়। এই সময় একটা বিশাল এলাকা এদের অধিকারভুক্ত ছিল—নিউ ইয়র্ক, পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া এবং ওহিও-র অধিকাংশ অঞ্চল[১], আর কানাডার ওণ্টারিও হ্রদের উত্তর তীরবর্তী অঞ্চল। এদের অস্তিত্ব যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন বুদ্ধিমত্তা ও অগ্রগতির দিক থেকে এরাই ছিল নিউ মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলের রেড রেস (Red Race)-দের পুরোধা, যদিও জীবনযাপনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে উপসাগরীয় অঞ্চলের কোন কোন গোষ্ঠী এদের থেকেও উন্নত হয়ে উঠেছিল। মানসিক গুণাবলীর বিচারে আমেরিকার ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ইরোকোয়াদের স্থান ছিল একেবারে সামনের সারিতে। সংখ্যায় হ্রাস পেলেও, এখনও নিউ ইয়র্কে এদের লোকসংখ্যা চার হাজার, কানাডায় প্রায় এক হাজার এবং পশ্চিমাঞ্চলেও প্রায় এক হাজার। এই ঘটনা থেকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে বর্বরদের জীবনযাপন পদ্ধতির কার্যকারিতা ও সক্ষমতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। শোনা যাচ্ছে এদের সংখ্যা নাকি এখন একটু একটু করে বাড়ছে।

১৪০০-১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ যখন মিত্রসংঘ গঠিত হয়[২], তখনও পূর্বোল্লিখিত পরিস্থিতিই বিদ্যমান ছিল। সে-সময় ইরোকোয়াদের পাঁচটা পৃথক পৃথক গোষ্ঠী ছিল। পরস্পরের বোধগম্য বিভিন্ন উপ-ভাষায় কথা বলত এরা। তাছাড়া আগেই দেখানো হয়েছে যে কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু সাধারণ গোত্রও ছিল। একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশ হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে এই সাধারণ গোত্রগুলি মিত্রসংঘের এক স্বাভাবিক ও স্থায়ী বনিয়াদ সৃষ্টি করেছিল। এইসব উপাদানগুলি হাতের কাছে মজুত থাকার ফলে মিত্রসংঘ গড়ে তোলার জন্য দরকার ছিল শুধু বুদ্ধিমত্তা আর দক্ষতা। মহাদেশের অন্যান্য অংশেও বহু লোকসংখ্যাবিশিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঠিক

১। ১৬৫১-১৬৫৫ সাল নাগাদ এরা নিজেদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী এরিদেরকে গেনেসী নদী ও এরি হ্রদের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে, তার কিছুদিন পরেই নিউট্রাল নেশন্‌দের বিতাড়িত করে নিকারাগুয়া নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে। এইভাবে, শুধু নিম্ন হাড্‌সন অঞ্চল ও লং আইল্যাণ্ড বাদে গোটা নিউ ইয়র্ক'টাকেই তারা দখল করে নেয়।

২। ইরোকোয়ারা দাবি করে যে ইওরোপিয়দের সঙ্গে তাদের প্রথম সাক্ষাতের অন্তত দেড়শো-দুশো বছর আগে থেকেই তাদের মধ্যে মিত্রসংঘের অস্তিত্ব ছিল। ডেভিড কুসিক্‌ (জনৈক টুসকারোরা) লিখিত ইতিহাসে সাকেমদের বংশ-পরম্পরার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে মনে হয় যে আরো প্রাচীনকালেই গড়ে উঠেছিল এই মিত্রসংঘ।

এই ধরণেরই অবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং এই গোষ্ঠীগুলি তখনও পর্যন্ত কোন মিত্রসংঘ গড়ে তুলতে পারেনি। ইরোকোয়ারাই প্রথম মিত্রসংঘ গড়ে তোলে। এটাকে তাদের উন্নততর যোগ্যতারই পরিচায়ক। অধিকন্তু, আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে যেহেতু মিত্রসংঘই ছিল সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তর, তাই শুধুমাত্র সবথেকে বুদ্ধিমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই এর অস্তিত্ব সম্ভবপর ছিল।

ইরোকোয়ারা বলে যে তাদের পাঁচটা গোষ্ঠীর অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রধানদের একটা পরিষদই তাদের মিত্রসংঘ গঠন করেছিল। সাইরাকিউস্‌দের এলাকার কাছাকাছি ওনোন্‌ডাগা হ্রদের উত্তর তীরে তারা মিলিত হয়েছিল মিত্রসংঘ গঠন করার জন্য। অধিবেশন চলাকালীনই সংগঠনের একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ নির্দিষ্ট করে ফেলা হয় এবং মিত্রসংঘ তৎক্ষণাৎ নিজের কাজ শুরু করে দেয়। সাকেম্‌দের তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠিত জমায়েতে তারা আজও পর্যন্ত বলে থাকে যে বিধি-বিধান রচনার দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টার ফল হিসেবেই সৃষ্টি হয়েছিল মিত্রসংঘ। সম্ভবত পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য সম্পাদিত পূর্বতন কোন মৈত্রীর ফলস্বরূপই সৃষ্টি হয়েছিল এই মিত্রসংঘ, যে মৈত্রীর সুবিধা-গুলি তারা উপলব্ধি করেছিল এবং তাকে এক স্থায়ী মৈত্রীতে পরিণত করতে চেয়েছিল।

ইরোকোয়ারা বলে যে মিত্রসংঘের পরিকল্পনা এক পৌরাণিক বা বহু প্রাচীন ব্যক্তির মাথাতেই প্রথম এসেছিল। তার নাম ছিল 'হা-ইয়ো-ওয়েণ্ট-হা', যাকে লংফেলো তাঁর সুবিখ্যাত একটা কবিতায় হায়াওয়াথা নামে চিহ্নিত করেছেন। এই হা-ইয়ো-ওয়েণ্ট-হা ঐ প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত ছিল এবং যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তার ওপরেই ন্যস্ত করা হয়েছিল। পরিষদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর কাজে নিজের দোভাষী ও মুখপাত্র হিসেবে সে 'দা-গো-নো-ওয়ে-দা' নামে জনৈক প্রাজ্ঞ ওনোন্‌ডাগাকে বেছে নেয়। এর মারফৎই প্রস্তাবিত মিত্রসংঘের কাঠামো ও নীতিগুলির ব্যাখ্যা করে সে। ঐ একই উপকথায় বলা হয়েছে যে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর হা-ইয়ো-ওয়েণ্ট-হা একটা সাদা ক্যানোয় চেপে অলৌকিক উপায়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ক্যানোটা নাকি তাকে নিয়ে শূন্যে উঠে উধাও হয়ে গিয়েছিল। এই উপকথা থেকেই জানা যায় যে অন্যান্য অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিল এবং তারা মিত্রসংঘ গঠনের প্রস্তাব সমর্থনও করেছিল। এই মিত্রসংঘকে ইরোকোয়ারা আজও পর্যন্ত ইণ্ডিয়ানদের প্রজ্ঞার এক উজ্জ্বলতম নজির বলে মনে করে। ব্যাপারটা সত্যিই তাই। গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশে এটা তাদের প্রতিভার এক বিশিষ্ট স্বাক্ষর হিসেবেই চিরদিন জ্বলজ্বল করবে ইতিহাসের পাতায়। বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থার যাবতীয় অসুবিধার মধ্যে থেকেও মানবজাতির কোন্ গোষ্ঠীগুলি একটা শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছিল—তা-ও জানা যায় এদের এই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্‌টালে।

ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে কে ছিল মিত্রসংঘের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, তা বলা মুস্কিল। নির্বাকি

BanglaBook.org

হা-ইয়ো-ওয়েণ্ট-হা সম্ভবত ইরোকোয়া বংশেরই লোক ছিল।[১] কিন্তু লোককাহিনী তাকে এমনভাবে অতিপ্রাকৃতের ঘেরাটোপে ঢেকে দিয়েছে যে তাকে আর ইরোকোয়ারা নিজেদের লোক বলে মনে করতে পারে না। হায়াওয়াথা কোন বাস্তব ব্যক্তি হয়ে থাকলে, দা-গো-নো-ওয়ে-দা অবশ্যই তার একজন অধীনস্থ লোক ছিল। কিন্তু প্রথম জন কোন পৌরাণিক ব্যক্তি হয়ে থাকলে মিত্রসঙ্ঘের রূপায়ণের কৃতিত্ব শেষোক্ত জনের ওপরেই বর্তায়।

ইরোকোয়ারা বলে থাকে যে ঐ অধিবেশনে গঠিত মিত্রসঙ্ঘ তার ক্ষমতা, কার্যকলাপ ও শাসনপদ্ধতি সমেত এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্মে হস্তান্তরিত হতে হতে এসে পৌঁছেছে আজকের যুগে, এবং এই গোটা সময়কালে তার আভ্যন্তরীণ সংগঠনের প্রায় কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। পরবর্তীকালে যখন টুস্কারোরাদেরকে এই মিত্রসঙ্ঘের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল, তখন তাদের সাকেম্‌দেরকে সৌজন্যের খাতিরে সাধারণ পরিষদে অন্যদের সমকক্ষ হিসেবে বসতে দেওয়া হলেও, মিত্রসঙ্ঘের মূল সাকেমের সংখ্যা কিন্তু বাড়ানো হয় নি। সঠিক অর্থে বললে, টুস্কারোরাদের সাকেম্‌দেরকে মিত্রসঙ্ঘের পরিচালক সংস্থার সদস্য বলে আদৌ মনে করা হত না।

ইরোকোয়া মিত্রসঙ্ঘের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে এইভাবে সাজানো যেতে পারে ঃ

১। মিত্রসঙ্ঘ ছিল একই সরকারের অধীনে সমতার ভিত্তিতে মিলিত পাঁচটা গোষ্ঠীর একটা যৌথ সংগঠন, যে গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন সাধারণ গোত্র নিয়ে গঠিত। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে প্রতিটা গোষ্ঠী সমস্ত দিক থেকেই স্বাধীন ছিল।

২। মিত্রসঙ্ঘ সাকেম্‌দের একটা সাধারণ পরিষদ গঠন করেছিল। এই পরিষদে অল্প কয়েকজন সাকেম্‌ থাকত, এদের প্রত্যেকের পদমর্যাদা ও কর্তৃত্ব সমান সমান হত, এবং পরিষদ মিত্রসঙ্ঘের এক্তিয়ারভুক্ত থাকত।

৩। পঞ্চাশটা সাকেম্‌ পদ সৃষ্টি করা হয় এবং তাদের নামকরণ করা হয়, গোত্রের মধ্যে বরাবরের জন্য এইসব পদ চালু হয়ে যায়। যখনই এইসব পদ শূন্য হত, তখনই নিজেদের সদস্যদের মধ্যে থেকে নতুন সাকেম্‌ নির্বাচন করার এবং উপযুক্ত কারণে তাদেরকে বরখাস্ত করার অধিকার ঐ গোত্রগুলির থাকত। কিন্তু এইসব সাকেম্‌দেরকে তাদের পদে নিয়োগ করার অধিকার একমাত্র সাধারণ পরিষদেরই ছিল।

৪। মিত্রসঙ্ঘে যে সাকেম্‌রা থাকত, তারাই ছিল তাদের নিজ নিজ গোষ্ঠীরও সাকেম্‌। একেকটি গোষ্ঠীর সাকেম্‌ ও প্রধানদের নিয়ে গড়ে উঠত সেই সেই গোষ্ঠীর পরিষদ। পুরোপুরিভাবে গোষ্ঠীর এক্তিয়ারভুক্ত যে-কোন ব্যাপারে এই পরিষদই ছিল চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

৫। যে-কোন সার্বজনীন কাজের ব্যাপারে মিত্রসঙ্ঘের পরিষদে সকলকার সম্মতি ছিল একান্ত আবশ্যক।

১। আমার বন্ধু বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক হোরেশিও হেল্‌ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলেন এবং আমাকে তা জানিয়েও ছিলেন।

৬। সাধারণ পরিষদে সাকেম্‌দেরকে নির্বাচিত করত গোষ্ঠীগুলি। এর ফলে প্রতিটা গোষ্ঠীর হাতেই অপর গোষ্ঠীগুলির নির্বাচনকে বাতিল করার অধিকার থাকত।

৭। সাধারণ পরিষদের সভা ডাকার অধিকার প্রতিটা গোষ্ঠীরই ছিল। কিন্তু সাধারণ পরিষদ কখনোই নিজের সভা নিজেই ডাকতে পারত না।

৮। সাধারণ পরিষদে সার্বজনীন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সময় যে-কোন লোক তার বক্তব্য পেশ করতে পারত। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শুধু পরিষদের হাতেই থাকত।

৯। মিত্রসঙ্ঘের কোন প্রধান কার্যনির্বাহী বিচারক বা সাংগঠনিক কর্তা থাকত না।

১০। একজন প্রধান সামরিক নেতার প্রয়োজন উপলব্ধি করে তারা প্রধান সামরিক নেতার দুটি পদ সৃষ্টি করে। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনে অপরকে নিবৃত্ত করতে পারা। এদের দুজনের হাতেই সমান ক্ষমতা থাকত।

উল্লিখিত সমস্ত বিষয়গুলিকেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব আমি, তবে ঠিক ঐ তালিকার ক্রম অনুসারে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করছি না।

মিত্রসঙ্ঘ পঞ্চাশটা সাকেম্‌ পদ সৃষ্টি করে ও তাদের নামকরণ করে। নির্দিষ্ট গোত্রগুলিতে এইসব পদ বরাবরের জন্য চালু হয়ে যায়। এগুলির মধ্যে মাত্র দুটি পদে একবার করে সাকেম্‌ মনোনয়নের পর আর তা করা হয় নি। কিন্তু বাকি পদগুলিতে সেই সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহু মানুষ সাকেম্‌ হিসেবে মনোনীত হয়েছে। যে সাকেম্‌ যখন পদে থাকত, তখন তার সাকেম্‌ পদের নামটাই তার ব্যক্তিগত নামে পরিণত হত। আবার সাকেম্‌ পদের ঐ নামটাই উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তাতো পরবর্তী সাকেমের ওপর। এইসব সাকেম্‌দের অধিবেশনই ছিল মিত্রসঙ্ঘের পরিষদ। এই পরিষদের ওপরেই ন্যস্ত থাকত আইন প্রণয়ন, শাসনকার্য এবং বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা। তবে সে যুগে এইসব কাজকে ঠিক এইভাবে ভাগ ভাগ করা সম্ভব ছিল না। সাকেম্‌ পদের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যথাযথ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটা ব্যবস্থা নেওয়া হত। যে-সব গোত্রে এই পদ উত্তরাধিকারমূলক ছিল, সেইসব গোত্রে সাকেমের পদ শূন্য হলে নিজ নিজ সদস্যদের মধ্যে থেকে নতুন সাকেম্‌ নির্বাচন করার অধিকার গোত্রগুলির হাতে থাকত—এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। অধিকতর নিরাপত্তার জন্য যে-কোন সাকেম্‌ নির্বাচিত ও অনুমোদিত হওয়ার পর, তাকে তার পদে নিয়োগ করত মিত্রসঙ্ঘের পরিষদ। পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর তার নিজের নামটা "কেড়ে নেওয়া" হত এবং তার বদলে দেওয়া হত সাকেম্‌ পদের জন্য নির্দিষ্ট নামটা। অতঃপর ঐ নামেই সে পরিচিত হয়ে উঠত। সমস্ত সাকেমের পদমর্যাদা, কর্তৃত্ব এবং সুযোগ-সুবিধা সমান সমান হত।

পাঁচটা গোষ্ঠীর সবকটাতে সমান সংখ্যক সাকেম্‌ ছিল না বটে, কিন্তু কারোর হাতেই অন্যের চেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকত না। শেষ তিনটি গোষ্ঠীর সবকটা গোত্রেও সমান সংখ্যক সাকেম্‌ ছিল না। মোহক্‌দের মধ্যে ছিল নয় জন সাকেম, ওনেইডাদের নয় জন, ওনোন্‌ডাগাদের চোদ্দ জন, ক্যায়ুগাদের দশ জন আর সেনেকাদের মধ্যে আট জন।

BanglaBook.org

শুরুর সময় হিসেবটা এ-রকমই ছিল এবং আজ পর্যন্ত এর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সাকেম্ পদের একটা সারণী এখানে দেওয়া হল। সাকেম্দের নামগুলি দেওয়া হচ্ছে সেনেকা উপ-ভাষায়। পরিষদের সভায় কিভাবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, তা বোঝার সুবিধার উপযোগী করে বিন্যস্ত করা হয়েছে নামগুলিকে। এইসব নামের অর্থ এবং এরা কে কোন্ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত—তা পাদটীকায় দেওয়া হল।

মিত্রসংঘ গঠনের সময় ইরোকোয়াদের সাকেম্ পদের সারণী এবং প্রথম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত সাকেমদের পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত নাম ঃ

॥ মোহক্ ॥

ক) ১। ডা-গা-এ-ও-গা,[১] ২। হা-ইয়ো-ওয়েণ্ট-হা,[২] ৩। ডা-গা-নো-ওয়ে-ডা[৩]।

খ) ৪। সো-আ-এ-ওয়াহ্[৪], ৫। ডা-ইও-হো-গো[৫], ৬। ও-আ-আ-গো-ওয়া[৬]।

গ) ৭। ডা-আন্-নো-গা-এ-নেহ্[৭], ৮। সা-ডা-গা-এ-ওয়া-ডেহ্[৮], ৯। হাস্ডা-ওয়েহ্-সে-ওণ্ট-হা[৯]।

॥ ওনেইডা ॥

ক) ১। হো-ডাস্-হা-তেহ্[১], ২। গা-নো-গোহ্-ইয়ো-ডা[২], ৩। ডা-ইয়ো-হা-গোয়েন্-ডা[৩]।

খ) ৪। সে-নো-সাসে[৪], ৫। তো-নো-আ-গা-ও[৫], ৬। হা-ডে-আ-ডান্-নেণ্ট-হা[৬]।

গ) ৭। ডা-ওয়া-ডা-ও-ডা-ইয়ো[৭], ৮। গা-নে-আ-ডাস্-হা-ইয়েহ্[৮], ৯। হো-ওয়ান্-হা-ডা-ও[৯]।

॥ ওনোন্ডাগা ॥

ক) ১। তো-ডো-ডা-হো[১০], ২। তো-নেস্-সা-আহ্, ৩। ডা-আট্-গা-ডোস্।[১১]

খ) ৪। গা নিয়া-ডা-জে-ওয়েক্[১২], ৫। আহ্-ওয়া-গা-ইয়াত্[১৩], ৬। ডা-আ-ইয়াত্-গোয়া-এ।

গ) ৭। হো-নো-ওয়ে-না-টো।[১৪]

নামগুলির অর্থ ঃ ১। 'নিরপেক্ষ' বা 'বম'; ২। 'ঝুঁটি-বাঁধা মানুষ'; ৩। 'অক্ষয়'; ৪। 'স্বল্প কথক'; ৫। 'সন্ধিস্থলে'; ৬। 'বড় নদীতে'; ৭। 'টেনে নিয়ে চলে শিঙা'; ৮। 'শান্তমেজাজী'; ৯। 'র‍্যাট্‌ল সাপ ঝুলিয়ে দেওয়া'। 'ক' শ্রেণীর সাকেম্রা কচ্ছপ গোত্রের, 'খ' শ্রেণীর সাকেম্রা নেকড়ে গোত্রের আর 'গ' শ্রেণীর সাকেম্রা ভালুক গোত্রের অন্তর্গত। ১। 'ভারবাহী মানুষ', ২। 'বিড়ালের ল্যাজে সর্বাঙ্গ-ঢাকা মানুষ', ৩। 'অরণ্যপথে যাত্রা', ৪। 'দীর্ঘ দাড়ি', ৫। 'যে মানুষের মাথায় যন্ত্রণা', ৬। 'নিজেকে গিলে ফেলা', ৭। 'প্রতিধ্বনির স্থান', ৮। 'ময়দানে যুদ্ধের গদা', ৯। 'নিজেকে যে বাষ্পে পরিণত করে'। 'ক' শ্রেণীর সাকেম্রা নেকড়ে গোত্রের, 'খ' শ্রেণীর সাকেম্রা কচ্ছপ গোত্রের আর 'গ' শ্রেণীর সাকেম্রা ভালুক গোত্রের অন্তর্গত। ১০। 'জালে জড়ানো', ভালুক গোত্র, ১১। 'প্রহরারত', ভালুক গোত্র। এই সাকেম্টি এবং এর আগের জন উত্তরাধিকারসূত্রে সাকেম্দের মধ্যে বিশিষ্টতম টো-ডো-ডা-হো-র উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করত। ১২। 'তিক্ত দেহ', কাদাখোঁচা গোত্র। ১৩। কচ্ছপ গোত্র। ১৪। এই সাকেমটি উত্তরাধিকারসূত্রে সামুদ্রিক গুটিকার কোমর-বন্ধনীটা রক্ষা করার দায়িত্ব পেত ; নেকড়ে গোত্র।

ঘ) ৮। গা-ওয়া-না-স্যান্-ডো[১৫], ৯। হা-এ-হো[১৬], ১০। হো-ইয়ো-নে-আ-নে[১৭], ১১। সা-ডা-কওন্-সেহ্।[১৮]

ঙ) ১২। সা-গো-গা-হা[১৯], ১৩। হো-সা-হা-হো[২০], ১৪। স্কা-নো-ওয়ান-ডে।[২১]

॥ ক্যায়ুগা ॥

ক) ১। ডা-গা-আ-ইয়ো[২২], ২। ডা-জে-নোডা-ওয়েহ্-ও[২৩], ৩। গা-ডা-গওন্-সা[২৪], ৪। সো-ইয়ো-ওয়াসে[২৫], ৫। হা-ডে-আস্-ইয়ো-নো।[২৬]

খ) ৬। ডা-ইয়ো-ও-ইও-গো[২৭], ৭। জোটে-হো-ওয়েহ্-কো[২৮], ৮। ডে-আ-ওয়াতে-হো।[২৯]

গ) ৯। টো-ডা-এ-হো[৩০], ১০। ডেস্-গা-হেহ্।[৩১]

॥ সেনেকা ॥

ক) ১। গা-নে-ও-ডি-ইয়ো[১], ২। সা-ডা-গা-ও-ইয়াসে[২]।

খ) ৩। গা-নো-গি-এ[৩], ৪। সা-গেহ্-জো-ওয়া[৭]।

গ) ৫। সা-ডে-আ-নো-ওয়াস্[৫], ৬। নিস্-হা-নে-আ-নেণ্ট[৬]।

ঘ) ৭। গা-নো-গো-এ-ডা-ওয়ে[৭], ৮। ডো-নে-হো-গা-ওয়েহ্[৮]।

এগুলির মধ্যে দুটি সাকেম্ পদে আজ পর্যন্ত মাত্র একবার সাকেম্ নির্বাচিত হয়েছে। হা-ইয়ো-ওয়েণ্ট-হা এবং ডা-গা-নো-ওয়ে-ডা—এরা দুজন মোহক্ সাকেম্দের মধ্যে নিজেদের পদ গ্রহণ করতে এবং তাদের মৃত্যুর পরে পদ দুটি শূন্য রাখার শর্তে সাকেম্দের তালিকা থেকে নিজেদের নাম বাদ দিতে রাজি হয়েছিল। এই শর্ত মেনে নিয়েই তাদেরকে পদে অভিষিক্ত করা হয় এবং শর্তটা আজও পর্যন্ত মেনে চলা হয়। সাকেম্দের অভিষিক্ত করার জন্য অনুষ্ঠিত প্রতিটি সভায় আজও তাদের নাম ডাকা হয়। আসলে এইভাবে তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানো হয়। কাজেই, এদের সাধারণ পরিষদে মোট আটচল্লিশ জন সদস্য আছে।

প্রত্যেক সাকেমের একজন করে সহকারী সাকেম্ থাকত। প্রধান সাকেমের নিজের গোত্রের সদস্যদের মধ্যে থেকেই তাকে নির্বাচিত করা হত এবং একইরকম অনুষ্ঠানের সাহায্যে তাকে তার পদে অভিষিক্ত করা হত। একে বলা হত—"সহায়ক"। সমস্ত

১৫। হরিণ গোত্র। ১৬। হরিণ গোত্র। ১৭। কচ্ছপ গোত্র। ১৮। ভালুক গোত্র। ১৯। 'পলকপাত', হরিণ গোত্র। ২০। 'বড় মুখ', কচ্ছপ গোত্র। ২১। 'খাঁড়ির ওপরে', কচ্ছপ গোত্র।

২২। 'আতঙ্কিত মানুষ', হরিণ গোত্র। ২৩। সারস গোত্র।

২৪। ভালুক গোত্র। ২৫। ভালুক গোত্র। ২৬। কচ্ছপ গোত্র।

২৭। অর্থ জানা যায়নি। ২৮। 'খুব ঠাণ্ডা', কচ্ছপ গোত্র।

২৯। সারস গোত্র। ৩০। কাদাখোঁচা গোত্র। ৩১। কাদাখোঁচা গোত্র।

১। 'সুন্দর হ্রদ', কচ্ছপ গোত্র। ২। 'মসৃণ স্বর্গ', কাদাখোঁচা গোত্র।

৩। কচ্ছপ গোত্র। ৪। 'বড় কপাল', বাজপাখি গোত্র।

৫। 'সহকারী', ভালুক গোত্র। ৬। 'পড়ন্ত দিন', কাদাখোঁচা গোত্র।

৭। 'দগ্ধ কেশ', কাদাখোঁচা গোত্র। ৮। 'খোলা দরজা', নেকড়ে গোত্র।

উৎসব-অনুষ্ঠানে সে তার ওপরওয়ালার পিছনে পিছনে থাকত, তার বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করত এবং সাধারণত তার নির্দেশ মতই চলত। এর ফলে এই সহায়ক ব্যক্তিটি আসলে একজন প্রধান হয়ে উঠত এবং ওপরওয়ালার মৃত্যুর পর সাকেম্ পদে নির্বাচিত হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকত তার। ইরোকোয়াদের আলঙ্কারিক ভাষায় সাকেমের এই সহকারীদের নাম ছিল "লম্বা বাড়িতে বর্ম"। এই কথাটা আসলে মিত্রসঙ্ঘেরই প্রতীক।

সেই প্রথম সাকেম্দেরকে যে-সব নাম দেওয়া হয়েছিল, সেই নামগুলিই তাদের নিজ নিজ উত্তরসূরীদের মধ্যে বরাবর বজায় থেকেছে। যেমন, সেনেকাদের আটজন সাকেমের অন্যতম গা-নে-ও-ডি-ইয়োর মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরীকে নির্বাচিত করে কচ্ছপ গোত্র। কচ্ছপ গোত্রে এই পদ উত্তরাধিকারীসূত্রেই বর্তায়। সাধারণ পরিষদ এই সাকেম্কে তুলে ধরার পর, অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে তার নিজের নামের বদলে এই সাকেম্ পদের জন্য নির্দিষ্ট নামটা তাকে দেওয়া হয়। ওনোন্ডাগা ও সেনেকাদের এলাকায় সাকেম্দের তুলে ধরার এই ধরনের বেশ কিছু অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছি আমি এবং উল্লিখিত ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করেছি। এই মুহূর্তে পুরনো দিনের সেই মিত্রসঙ্ঘের একটা ছায়ামাত্র অবশিষ্ট থাকলেও, সাকেম্ ও তার সহায়কদের সমন্বয়ে আজও তা এক পূর্ণাঙ্গ সংগঠন হিসেবেই টিকে আছে। এদের মধ্যে শুধু মোহক্ গোষ্ঠীটি ১৭৭৫ সাল নাগাদ কানাডায় চলে গিয়েছিল। কোন পদ শূন্য হলেই তা পূরণ করা হয়, নতুন সাকেম্ ও তাদের সহায়কদের নিয়োগ করার জন্য সাধারণ পরিষদের সভা ডাকা হয়। প্রাচীন কালের মিত্রসঙ্ঘের কাঠামো ও নীতির সঙ্গে আজকের দিনের ইরোকোয়ারা যথেষ্টই পরিচিত।

গোষ্ঠীগত শাসনব্যবস্থার যাবতীয় ব্যাপারে পাঁচটা গোষ্ঠীই ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। নির্দিষ্ট সীমানা-রেখা দিয়ে পরস্পরের এলাকা পৃথক করা ছিল এবং তাদের গোষ্ঠীগত স্বার্থও ছিল পৃথক পৃথক। সেনেকাদের আটজন সাকেম্ এবং অন্যান্য প্রধানদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল সেনেকাদের গোষ্ঠী-পরিষদ। এই পরিষদই তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম পরিচালনা করত। একইভাবে, অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির নিজ নিজ পরিষদই সেই সেই গোষ্ঠীর কাজকর্ম পরিচালনা করত। মিত্রসঙ্ঘ গড়ে ওঠার ফলে একটা সংগঠন হিসেবে গোষ্ঠীর কোন ক্ষতি হয়নি বা সে দুর্বল হয়েও পড়েনি। নিজের নিজের এলাকায় গোষ্ঠীগুলি ছিল অত্যন্ত কর্মচঞ্চল, অনেকটা আজকের দিনের কোন প্রজাতন্ত্রের মধ্যেকার রাজ্যগুলির মত। মনে রাখা ভালো যে সেই ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দেই ইরোকোয়ারা ঠিক তাদের মিত্রসঙ্ঘের মতই একটা উপনিবেশ-সঙ্ঘ গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের। বিভিন্ন উপনিবেশের সাধারণ স্বার্থ ও সাধারণ ভাষার মধ্যে তারা তাদের দূরদৃষ্টি অনুযায়ী একটা মিত্রসঙ্ঘ গড়ে তোলার উপাদান খুঁজে পেয়েছিল।

মিত্রসঙ্ঘের মধ্যে প্রতিটি গোষ্ঠীর অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব ছিল একেবারে সমান সমান। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ত কোন গোষ্ঠীকে কিছু কিছু ছাড়

BanglaBook.org

দেওয়া হত, কিন্তু তার কোন অর্থ কোন অসম চুক্তি করা নয় অথবা কোন অসম সুযোগ-সুবিধা দেওয়াও নয়।

কিছু সাংগঠনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী কয়েকটি গোষ্ঠী অন্যান্যদের চেয়ে আপাতভাবে বেশি ক্ষমতা পেয়েছিল। যেমন, ওনোন্‌ডাগাদেরকে চোদ্দজন সাকেম্‌ রাখার অনুমতি দেওয়া হয়, অথচ সেনেকাদের থাকত মাত্র আটজন সাকেম্‌। কোন গোষ্ঠীর সাকেমসংখ্যা বেশি হলে স্বাভাবিকভাবেই তারা কমসংখ্যক সাকেম্‌বিশিষ্ট গোষ্ঠীর তুলনায় অধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারত পরিষদের ওপর। কিন্তু এক্ষেত্রে সে-রকম কোন অতিরিক্ত ক্ষমতা পায়নি ওনোন্‌ডাগারা। কেননা যে-কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সব গোষ্ঠীর সাকেমদেরই সমান ভোট থাকত এবং অন্যদের মতামতকে বাতিল করার অধিকারও থাকত তাদের। পরিষদের সভায় সব গোষ্ঠীরই মতামত নেওয়া হত এবং যে-কোন সার্বজনীন কাজের ব্যাপারে সকলকার সম্মতি একান্ত আবশ্যক ছিল। ওনোন্‌ডাগারা ছিল "সামুদ্রিক গুটির কোমরবন্ধনীর রক্ষক" আর "পরিষদ-অগ্নির রক্ষক"। অধীনস্থ গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে "কর-গ্রহীতা" ছিল মোহক্‌রা এবং সেনেকারা ছিল বড় বাড়ির "দয়ার রক্ষক"। সকলকার সুবিধার জন্য এই ধরণের আরও কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

পারস্পরিক প্রতিরক্ষার জন্য গড়ে তোলা একটা মৈত্রী তাদের খুবই উপকার করেছিল। কিন্তু শুধু এ থেকেই মিত্রসঙ্ঘের দৃঢ়বদ্ধ ঐক্যের নীতিটা গড়ে ওঠেনি। জ্ঞাতিত্ব বন্ধনের মধ্যে এই নীতির এক গভীরতর বনিয়াদ রয়ে গিয়েছিল।

আপাতভাবে মিত্রসঙ্ঘের ভিত্তি ছিল গোষ্ঠীগুলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেকার সাধারণ গোত্রগুলিই ছিল এর মূল ভিত্তি। একই গোত্রের সমস্ত সদস্যারা—তা সে মোহক্‌, ওনেইডা, ওনোন্‌ডাগা, ক্যায়ুগা বা সেনেকা, যা-ই হোক না কেন—একই পূর্বপুরুষের বংশধর হওয়ার দরুণ পরস্পরের ভাই-বোন হিসেবেই পরিচিত ছিল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক আচরণ করত। তাদের যখন দেখা হত, তখন প্রথমে তারা পরস্পরের গোত্রের নাম জানতে চাইত, তারপর জানতে চাইত ঐ-সব গোত্রের সাকেম্‌দের বংশপরিচয়। তাদের মধ্যে প্রচলিত জ্ঞাতিত্বের বিচিত্র ব্যবস্থা অনুসারে[১] দুজন মানুষের সম্পর্কটা ঠিক কী, তা এইসব জানাজানির মারফৎ বুঝে নেওয়া যেত। পাঁচটি গোষ্ঠীর মধ্যে তিনটি সাধারণ গোত্র ছিল—নেকড়ে, ভালুক আর কচ্ছপ। তিনটি গোষ্ঠীতে এই তিনটি এবং আরও তিনটি গোত্র ছিল সাধারণ। একটা মূল গোষ্ঠী ভেঙে পাঁচ টুকরো হয়ে যাওয়ার ফলে নেকড়ে গোত্রটাও ভেঙে পাঁচ টুকরো হয়ে যায় এবং

১। বিভিন্ন ভাই-এর সন্তানরা পরস্পরের ভাইবোন। এই ভাইবোনদের সন্তানরাও পরস্পরের ভাইবোন। এই বংশধারা বরাবর এগোয়। বিভিন্ন বোনের সন্তান ও বংশধররাও পরস্পরের ভাইবোন। কোন ভাই-এর সন্তান আর তার বোনের সন্তানরা পরস্পরের মামাতো-পিসতুতো ভাইবোন এবং তাদের পরবর্তী সমস্ত প্রজন্মের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। একই গোত্রের সদস্যারা তাদের পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা কখনোই ভুলে যায় না।

প্রতিটা গোষ্ঠীতে থেকে যায় এই গোত্রের এক-একটা অংশ। ভালুক ও কচ্ছপ গোত্র সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। সেনেকা, ক্যায়ুগা আর ওনোন্‌ডাগাদের মধ্যে হরিণ, কাদাখোঁচা আর বাজপাখি গোত্রগুলি ছিল সাধারণ গোত্র। প্রতিটা গোত্রের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়া অংশগুলির সদস্যরা একই মূল ভাষার ভিন্ন ভিন্ন উপ-ভাষায় কথা বললেও তাদের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক থেকেই যেত, আর এই সম্পর্কই তাদেরকে বেঁধে রাখত এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে। মোহক্‌ গোষ্ঠীর নেকড়ে গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা ওনেইডা, ওনোন্‌ডাগা, ক্যায়ুগা বা সেনেকা গোষ্ঠীর নেকড়ে গোত্রভুক্ত লোকদেরকে নিজেদের ভাই বলেই মনে করত। এই সম্পর্কটা হয়ত খুব একটা আদর্শ ব্যাপার নয়। কিন্তু এর ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক এবং নিজেদের উপ-ভাষাগুলি সৃষ্টি হওয়ার থেকেও আগেকার যুগের এক পূর্বপুরুষের বংশধর বলে নিজেদের মনে করা—যে পূর্বপুরুষের সময়কালে তারা সকলেই ছিল একই বংশের সদস্য। প্রতিটি ইরোকোয়া যে-কোন গোষ্ঠীর নিজ গোত্রভুক্ত লোকদেরকে নিজের ভাই বলেই মনে করত। বিভিন্ন গোষ্ঠীর একই গোত্রভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেকার এই ধরণের আন্তঃসম্পর্ক ইরোকোয়াদের মধ্যে আজও সেই পুরনো রূপেই চালু আছে। পুরনো দিনের মিত্রসঙ্ঘের বিভিন্ন উপাদানগুলি কিভাবে আজও দৃঢ়বন্ধভাবে টিকে আছে, তা এ থেকেই বোঝা যায়। পাঁচটা গোষ্ঠীর মধ্যে যে-কোন একটা গোষ্ঠীও মিত্রসঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে গেলে এই জ্ঞাতিত্ব বন্ধনটা ছিন্ন হত—যদিও তা তেমনভাবে অনুভূত হয়ত হত না। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন কারণে সংঘাত বাধলে ফলটা কী দাঁড়াত? নেকড়ে গোত্রের মানুষেরা মারামারি করত তাদের স্বগোত্রীয় জ্ঞাতিদের সঙ্গে, ভালুক গোত্রের সঙ্গে ভালুক গোত্রের মারামারি হত—এককথায়, ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধে যেত। ইরোকোয়াদের ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে এই এই জ্ঞাতিত্ববন্ধন কত বাস্তব, কত সুদৃঢ় আর কত বিশ্বস্ততার সঙ্গে একে তারা মেনে চলত। মিত্রসঙ্ঘের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কখনো নৈরাজ্য দেখা দেয়নি বা মিত্রসঙ্ঘ ভেঙেও যায়নি।

'বড় বাড়ি' (হো-ডো-নো-সোতে) ছিল মিত্রসঙ্ঘের প্রতীক। ইরোকোয়ারা নিজেদেরকে বলত 'বড় বাড়ির বাসিন্দা' (হো-ডে-নো-সউ-নী)। একমাত্র এই নামেই তারা নিজেদেরকে চিহ্নিত করত। মিত্রসঙ্ঘ এমন একটা গোত্রভিত্তিক সমাজ সৃষ্টি করেছিল, যা কোন একটামাত্র গোষ্ঠীর গোত্রভিত্তিক সমাজের থেকে অনেক জটিল। তা সত্ত্বেও মিত্রসঙ্ঘের সমাজ গোত্রভিত্তিক সমাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এটা ছিল জাতি গড়ে ওঠার দিকে অগ্রগতির একটা স্তর, কারণ গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই জাতিত্ব অর্জিত হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ার সর্বশেষ স্তর হচ্ছে একাঙ্গীভবন। একই অঞ্চলের মধ্যে গোষ্ঠীগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে এবং তাদের মধ্যেকার ভৌগোলিক সীমারেখা ধীরে ধীরে মুছে যাওয়ার ফলে অ্যাটিকায় চারটি এথেনিয় গোষ্ঠী একাঙ্গীভূত হয়েছিল। তাদের গোষ্ঠীগত বিভাগ ঠিক আগের মতই রয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কারোরই আর কোন পৃথক ভূখণ্ড ছিল না। ডেমি (deme) বা শহরকে ভিত্তি করে যখন রাজনৈতিক সমাজ গড়ে ওঠে এবং সেখানকার সমস্ত বাসিন্দা যখন তাদের গোত্র বা

BanglaBook.org

গোষ্ঠী নিরপেক্ষভাবে একটা রাজনৈতিক সংঘে পরিণত হয়, তখনই সম্পূর্ণ হয় তাদের একাঙ্গীভবন।

এই প্রক্রিয়াতেই লাতিন ও স্যাবাইন গোত্রগুলি রোমান জনগণ ও জাতির সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়েছিল। এদের মধ্যেও সংগঠনের প্রথম তিনটি স্তর ছিল গোত্র, ভ্রাতৃত্ব আর গোষ্ঠী। চতুর্থ স্তর ছিল মিত্রসংঘ। কিন্তু বর্বর যুগের শেষ দিকে গ্রীক বা লাতিন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মিত্রসংঘ ছিল আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য সংগঠিত একটা ঢিলেঢালা সংঘ মাত্র। গ্রীক ও লাতিন মিত্রসংঘগুলির প্রকৃতি ও খুঁটিনাটি নানান বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ও অসম্পূর্ণ, কারণ যাবতীয় তথ্যরাজি ঘুমিয়ে আছে অজানার অন্ধকার গর্ভে। গোত্রভিত্তিক সমাজে মিত্রসংঘ সৃষ্টি হওয়ার পর দেখা দিয়েছিল একাঙ্গীভবনের প্রক্রিয়া। কিন্তু এটা ছিল প্রগতির এক অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর, যার সাহায্যেই গড়ে উঠেছিল জাতি, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সমাজ। ইরোকোয়া গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কিন্তু এই একাঙ্গীভবন দেখা যায় নি।

ওনোন্‌ডাগা উপত্যকা অঞ্চলেই নাকি ইরোকোয়াদের পরিষদ-অগ্নি অনির্বাণভাবে জ্বলে চলেছে। আদি গোষ্ঠীটি এই অঞ্চলেই বসবাস করত বলে মিত্রসংঘের পরিষদের অধিবেশন, সবসময় না হলেও, অধিকাংশ সময় এখানেই বসত। প্রাচীন আমলে প্রতি বছর শরৎকালে পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার নিয়ম ছিল। কিন্তু কার্যত বিভিন্ন জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে আরও ঘন ঘনই আহ্বান করতে হত এই অধিবেশন। যে-কোন গোষ্ঠীই পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে পারত, তার সময় ধার্য করতে পারত, এবং যখন কোন কারণে ওনোন্‌ডাগা উপত্যকায় অধিবেশন বসানো যেত না তখন যে-কোন গোষ্ঠীর পরিষদ-ভবনে সভা বসানোর ব্যবস্থা করতে পারত। কিন্তু মিত্রসংঘের পরিষদ নিজের অধিবেশন নিজে আহ্বান করতে পারত না।

প্রথম দিকে পরিষদের মূল কাজ ছিল কোন সাকেমের মৃত্যু হলে বা তাকে বরখাস্ত করা হলে তার জায়গায় অন্য কোন সাকেম্‌কে তুলে ধরা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সার্বজনীন কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ধরণের কাজকর্মই পরিচালনা করত এই পরিষদ। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের লোকসংখ্যাও বেড়ে উঠল, বাইরের গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে আদান-প্রদান বাড়লো। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়ে উঠল তিন ধরণের পরিষদ—আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ বিষয়ক, শোকপ্রকাশ সংক্রান্ত এবং ধর্মবিষয়ক। প্রথমটির কাজ ছিল প্রয়োজনে যুদ্ধ ঘোষণা করা বা শান্তি স্থাপন করা, কোথাও দূত পাঠানো এবং অন্যদের দূতকে অভ্যর্থনা জানানো, বাইরের গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে নানান চুক্তি করা, অধীনস্থ গোষ্ঠীগুলির বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সার্বজনীন কল্যাণের জন্য বহুবিধ পদক্ষেপ নেওয়া। দ্বিতীয়টির কাজ সাকেম্‌দের তুলে ধরা আর তাদেরকে তাদের পদে নিয়োগ করা। এর প্রথম অনুষ্ঠান ছিল মৃত শাসকের জন্য বিলাপ করা, সেই কারণে এর নাম ছিল শোকপ্রকাশ সংক্রান্ত পরিষদ। তৃতীয়টির কাজ ছিল সার্বজনীন ধর্মীয় উৎসবগুলি উদ্‌যাপন করা। সার্বজনীন ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য একটা সাধারণ পরিষদের তত্ত্বাবধানে একজোট হত মিত্রসংঘভুক্ত গোষ্ঠীগুলি। কিন্তু শোকপ্রকাশ

BanglaBook.org

সংক্রান্ত পরিষদটি যেহেতু এইসব অনুষ্ঠানের অনেকগুলিরই তত্ত্বাবধান করত, তাই কালক্রমে এই পরিষদের হাতেই ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের দায়িত্বও অর্পিত হয়েছিল। বর্তমানে ইরোকোয়াদের মধ্যে শুধু এই পরিষদটিই টিকে আছে, কারণ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর মিত্রসঙ্ঘের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতেই ন্যস্ত হয়েছিল।

পাঠকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি আভ্যন্তরীণ বিষয়ক ও শোকপ্রকাশ সংক্রান্ত পরিষদের কাজকর্মের পদ্ধতি সম্পর্কে একটু বিশদভাবে আলোচনা করতে চাই। গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সমাজের প্রাচীন অবস্থাটাকে এগুলির সাহায্যেই সবথেকে ভালোভাবে বোঝা যায়।

বাইরের কোন গোষ্ঠী মিত্রসঙ্ঘের সঙ্গে কোন লেনদেনের ব্যাপারে আলোচনা করতে চাইলে ঐ পাঁচটা গোষ্ঠীর যে-কোন একটার মাধ্যমেই তা করতে হত। যে গোষ্ঠীটির সঙ্গে বাইরের গোষ্ঠী যোগাযোগ করত, সেই গোষ্ঠীটিই স্থির করত বিষয়টা মিত্রসঙ্ঘের পরিষদের সভা ডাকার মত গুরুত্বপূর্ণ কিনা। সভা ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে ঐ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাদের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের নিকটতম গোষ্ঠীগুলির কাছে একজন দূত পাঠানো হত। এই দূতের সঙ্গে থাকত সামুদ্রিক গুটিকার একটা কোমরবন্ধনী। ঐ কোমরবন্ধনীর মধ্যে থাকত একটা বার্তা—অমুক জায়গায়, অমুক সময়ে এবং অমুক উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরীণ বিষয়ক পরিষদের (হো-ডে-ওস্‌-সেহ্‌) সভা ডাকা হচ্ছে। বার্তায় স্থান-কাল-উদ্দেশ্য নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে দেওয়া হত। যে গোষ্ঠীর হাতে বার্তাটা পৌঁছতো, তারা আবার তাদের নিকটতম গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিত সেটা। এইভাবে আস্তে আস্তে সবকটা গোষ্ঠীই জেনে যেত খবরটা।[১] আজ পর্যন্ত মিত্রসঙ্ঘের আভ্যন্তরীণ বিষয়ক পরিষদের যাবতীয় সভা এইভাবেই আহূত হয়েছে।

১। যে-কোন জাতিই আহ্বান করতে পারত, এমন একটা আভ্যন্তরীণ বিষয়ক পরিষদের সভা সাধারণত এইভাবে আহূত ও আরম্ভ হত: যেমন, ধরা যাক, ওনোন্‌ডাগারা এই সভা আহ্বান করছে। তারা প্রথমে পূর্বদিকে ওনেইডাদের কাছে এবং পশ্চিমদিকে ক্যায়ুগাদের কাছে দূত পাঠাত। এই দূতদের সঙ্গে থাকত একটা কোমরবন্ধনী। তাতে থাকত আমন্ত্রণপত্র—অমুক চান্দ্রমাসের অমুক দিনে ওনোন্‌ডাগা পরিষদ ভবনে পরিষদের সভা বসছে। কী উদ্দেশ্যে সভা, তা-ও উল্লেখ করা হত। ক্যায়ুগারা এই বার্তা পাঠিয়ে দিত সেনেকাদের কাছে, আর ওনেইডারা পাঠাত মোহকদের কাছে। কোন শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যের জন্য সভা আহূত হলে প্রতিটি সাকেম্‌ একগুচ্ছ শ্বেত সেডারের ডাল সঙ্গে করে নিয়ে আসত। শ্বেত সেডার ছিল শান্তির প্রতীক আর যুদ্ধবিগ্রহের জন্য সভা আহূত হলে তারা সঙ্গে আনত লাল সেডারের গুচ্ছ, যা ছিল যুদ্ধের প্রতীক।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাকেম্‌ ও তাদের অনুগামীরা অধিবেশনের দু' একদিন আগেই ঐ এলাকায় পৌঁছে গিয়ে খানিক দূরে শিবির খাটিয়ে বাস করত। নির্দিষ্ট দিনে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওনোন্‌ডাগাদের সাকেম্‌রা আনুষ্ঠানিকভাবে অন্য গোষ্ঠীর সাকেম্‌দের অভ্যর্থনা জানাত। আলাদা আলাদা শোভাযাত্রা করে পরিষদ ভবনের দিকে হেঁটে যেত তারা, প্রত্যেকের পরনে থাকত চামড়ার পোশাক আর হাতে থাকত সেডারের ডাল। পরিষদ-ভবনের সামনে ওনোন্‌ডাগাদের

নির্দিষ্ট সময়ে সাকেম্‌রা জমায়েত হওয়ার পর তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হত। তারপর তারা দু ভাগে ভাগ হয়ে পরিষদ-অগ্নির দুদিকে বসত। একদিকে বসত মোহক্‌, ওনোন্‌ডাগা আর সেনেকা গোষ্ঠীর সাকেম্‌রা। তারা যে গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধি, সেই গোষ্ঠীগুলি পরিষদের অধিবেশন চলাকালে পরস্পরের ভ্রাতৃস্বরূপ গোষ্ঠীর পিতৃস্বরূপ গোষ্ঠী। তাদের সাকেম্‌রা ছিল পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রতিম এবং অন্য দুটি গোষ্ঠীর সাকেম্‌দের পিতৃপ্রতিম। যে নীতি অনুযায়ী গোত্রগুলি একটা ভ্রাতৃত্ব সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ হত, সেই নীতিরই প্রসার ঘটিয়ে তারা গোষ্ঠীগুলির ও

সাকেম্‌রা একদল লোক নিয়ে অপেক্ষা করত তাদের জন্য। তারপর সব সাকেমরা মিলে একটা বৃত্ত রচনা করত। ওনোন্‌ডাগাদের যে সাকেম্‌টির ওপর সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হত, সে দাঁড়াত উদীয়মান সূর্যের দিকে ফিরে। একটা নির্দিষ্ট সংকেত পাওয়া মাত্র সাকেম্‌রা উত্তরদিকে গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করত। এখানে বলে রাখা যায় যে উত্তরদিকে বেড় দেওয়াকে বলা হত "ঠাণ্ডা দিক" (ও-টো-ওয়া-গা). পশ্চিমদিকে বেড় দেওয়াকে বলা হত "অস্তগামী সূর্যের দিক" (হা-গা-কোয়াস-গোয়া). দক্ষিণদিকের বেড়কে বলা হত "মধ্য গগনের সূর্যের দিক" (এন-ডে-ইহ-কোয়া) আর পূর্বদিকে বেড়কে বলা হত "উদীয়মান সূর্যের দিক" (ৎ-কা-গুইট্‌-কাস্‌-গোয়া)। প্রত্যেকে একের পর এক তিনবার করে ঐ বৃত্তের চারদিকে গোল হয়ে ঘোরার পর যখন সারির প্রথম ও শেষ সাকেম্‌টি পাশাপাশি আসত, তখন দলনেতা উদীয়মান সূর্যের দিকে দাঁড়িয়ে পড়ত এবং হাতের ডালগুলি রেখে দিত নিজের সামনেটায়। তারপর উত্তরদিক থেকে শুরু করে একের পর এক সাকেম্‌ তাদের নিজেদের হাতের ডালগুলি নামিয়ে দিত মাটিতে। ফলে সাকেম্‌দের বৃত্তের মধ্যে গড়ে উঠত ঐ ডালগুলির আরেকটা বৃত্ত। অতঃপর প্রতিটি সাকেম্‌ নিজের নিজের ডালগুলির সামনে চামড়ার পোশাকটা ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর বসে পড়ত। একটা পায়ের ওপর আরেকটা পা দিয়ে বসত তারা। প্রত্যেক সাকেমের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকত তাদের সহকারী সাকেম্‌রা। অল্প কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াত অনুষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাকেম্‌টি। নিজের থলি থেকে সে বার করত দু' টুকরো শুকনো কাঠ আর এক টুকরো জ্বালানী কাঠ। এ-গুলোকে ঘষে ঘষে আগুন জ্বালাত সে। আগুন জ্বলে উঠলে সে বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করে প্রথমে নিজের সেডারের ডালগুলিতে অগ্নিসংযোগ করত, তারপর একের পর এক বাকি প্রত্যেকটা ডালের বোঝাতেই আগুন লাগিয়ে দিত। সবকটা সেডারের স্তূপ জ্বলে ওঠার পর অনুষ্ঠানের দায়িত্বশীল সাকেম্‌টি একটা সংকেত দিত। তখন সমস্ত সাকেম্‌ উঠে দাঁড়িয়ে ঐ আগুনের বৃত্তের চারদিকে আগের মতই উত্তর দিক থেকে তিনবার গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে প্রত্যেকেই নানান পাশে ফিরত, যাতে করে আগুনের উষ্ণতার পরশ মেখে নেওয়া যায় সর্বাঙ্গে। অর্থাৎ তারা যেন পরস্পরকে উত্তাপ দান করত, যাতে করে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিষদের কাজ চালানো যায়। তারপর প্রত্যেকে আবার নিজের নিজের পোশাকের ওপর বসে পড়ত। অতঃপর আবার উঠে দাঁড়াত দায়িত্বপ্রাপ্ত সাকেম্‌টি, তার নিজের কাঠের আগুনটা থেকে অগ্নিসংযোগ করে শান্তির হুঁকোয় তিনবার টান দিত সে। প্রথমবারের ধোঁয়াটা ছেড়ে দিত আকাশের দিকে, দ্বিতীয়টা দিত মাটির দিকে আর তৃতীয়টা সূর্যের দিকে। আকাশের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে সে আসলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাত এতদিন তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং পরিষদের ঐ অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে সক্ষম করার জন্য। মাটির দিকে ধোঁয়া ছেড়ে সে ধন্যবাদ জানাত মাতা ধরিত্রীকে—নানান খাদ্য যুগিয়ে তিনিই তো তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আর সূর্যের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে সে সূর্যকে ধন্যবাদ জানাত সকলকার ওপরে দীপ্যমান অবিরাম আলোকধারার জন্য। এইসব কথা সে মুখে বলত না, কিন্তু এগুলিই ছিল তার কাজের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। অতঃপর উত্তরদিক বরাবর তার

সাকেম্‌দের একটা ভ্রাতৃত্ব গঠন করত। পরিষদ-অগ্নির বিপরীত দিকে বসত ওনেইডা ও ক্যায়ুগা গোষ্ঠীর সাকেম্‌রা এবং পরবর্তীকালে টুস্‌কারোরা গোষ্ঠীর সাকেম্‌রা। এই তিনটি গোষ্ঠী ছিল পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রতিম গোষ্ঠী এবং অন্য তিনটি গোষ্ঠীর পুত্রপ্রতিম গোষ্ঠী। তাদের সাকেম্‌রাও ছিল পরস্পরের ভ্রাতৃস্বরূপ এবং অপর তিনটি গোষ্ঠীর সাকেম্‌দের পুত্রস্বরূপ। এরাও একটা গোষ্ঠীগত ভ্রাতৃত্ব গঠন করত। যেহেতু ওনেইডারা ছিল মোহক্‌দের একটা উপ-শাখা আর ক্যায়ুগারা ছিল ওনোন্‌ডাগা বা সেনেকাদের উপ-শাখা, তাই কার্যত এরা কনিষ্ঠ গোষ্ঠীই ছিল। আর সেই কারণেই ঐ ধরণের জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্ব সংক্রান্ত নীতির প্রয়োগ দেখা যেত। পরিষদে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করার সময় মোহক্‌দের নামটাই সর্বাগ্রে উচ্চারিত হত। এদের গোষ্ঠীগত আখ্যা ছিল "বর্ম" (ডা-গা-ই-ওডা)। তারপর উল্লেখ করা হত ওনোন্‌-ডাগাদের নাম। এদের আখ্যা ছিল "নাম-বাহক" (হো-ডে-স্যান্‌-নো-গে-টা)। মূল পঞ্চাশজন সাকেমকে বাছাই করা ও তাদের নামকরণ করার ভার এদের ওপর ছিল বলেই এদের এই আখ্যা দেওয়া হয়েছিল[১]। তারপর "দুয়ার-রক্ষক" (হো-ন্যান্‌-নে-হো-ওণ্টে) আখ্যায় উল্লেখ করা হত সেনেকাদের নাম। তারা ছিল বড় বাড়ির পশ্চিম দুয়ারের স্থায়ী রক্ষক। চতুর্থ ও পঞ্চম দফায় উল্লিখিত হত ওনেইডা ও ক্যায়ুগাদের নাম, যথাক্রমে "বৃহৎ বৃক্ষ" (নে-আর-ডে-অন্‌-ডার-গো-ওয়ার) এবং "বড় হুঁকো" (সোনাম্‌-হো-গোয়ার-টু-ওয়ার) আখ্যায়। অনেক পরে মিত্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল যে টুস্‌কা-রোরারা, তাদের নাম একেবারে শেষে উল্লিখিত হত এবং তাদের কোন নির্দিষ্ট আখ্যাও ছিল না। প্রাচীন সমাজে এই ধরণের রীতিগুলি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের যুগে বসে আমরা হয়ত এই গুরুত্বটা ঠিকমত বুঝতে পারব না।

বাইরের কোন গোষ্ঠীর এই পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হলে তারা তাদের অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রধানদের একটা প্রতিনিধিদল পাঠাত। এই প্রতিনিধিদলটিই তাদের গোষ্ঠীর প্রস্তাব ইরোকোয়াদের মিত্রসংঘের সামনে পেশ করত। পরিষদের সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর এই প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিষদের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হত। তারপর কোন-একজন সাকেম্‌ একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিত। এই ভাষণে সে তাদের জীবিত রাখা এবং একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ

ডানদিকে যে সাকেম্‌টি থাকত, তার হাতে সে দিয়ে দিত হুঁকোটা। এই সাকেম্‌টিও তিনবার ধোঁয়া ছেড়ে হুঁকোটা তুলে দিত পরেরজনের হাতে। এইভাবে একে একে সমস্ত সাকেম্‌ একই কাজ করে যেত। এইভাবে হুঁকো থেকে ধূমপান করার সাহায্যে আরও বোঝানো হত যে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে আস্থা, বন্ধুত্ব ও মর্যাদা বজায় রাখার অঙ্গীকার জানাচ্ছে।

এইসব অনুষ্ঠানের দ্বারা পরিষদের অধিবেশনের উদ্বোধন সাঙ্গ হত। তারপর ঘোষণা করা হত—যে জন্য এই সভা ডাকা হয়েছে, এবার সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

১। এদের উপকথা থেকে জানা যায় যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর এলাকা পরিদর্শন করা এবং অবস্থা অনুযায়ী নতুন সাকেম্‌ বাছাই ও তাদের নামকরণ করার জন্য ওনোন্‌ডাগারা একজন প্রাজ্ঞব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে বিভিন্ন গোত্রে পদের সংখ্যা সমান সমান ছিল না।

জানাত ঈশ্বরকে। তারপর সে ঐ প্রতিনিধিদলকে জানাত যে এবার তারা পরিষদের সামনে নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে পারে। তখন যে-কোন একজন প্রতিনিধি যথোচিত রীতিমাফিক তাদের প্রস্তাব পেশ করত এবং নিজের সাধ্যমত যুক্তি দিয়ে সেই প্রস্তাবের নায্যতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করত। গোটা ব্যাপারটা ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তার বক্তব্য শুনত পরিষদের সদস্যরা। নিজেদের প্রস্তাব পেশ করে প্রতিনিধি দলটি পরিষদ ভবন থেকে বেরিয়ে কিছুটা দূরে গিয়ে পরিষদের মতামত জানার জন্য অপেক্ষা করত। পরিষদের সাকেম্‌রা তখন বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার সাহায্যে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পেঁছিনোর চেষ্টা করত। সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর গোটা পরিষদের সামনে সেটা ঘোষণা করার জন্য একজন বক্তাকে নির্বাচিত করা হত এবং তা শোনার জন্য ডেকে পাঠান হত ঐ প্রতিনিধি দলটিকে। যে গোষ্ঠীর ডাকে পরিষদের সভা বসেছে, সাধারণত সেই গোষ্ঠীরই কোন-একজন সাকেম্‌কে বক্তা হিসেবে নির্বাচিত করা হত। এই বক্তা এক আনুষ্ঠানিক ভাষণে গোটা বিষয়টার পর্যালোচনা করত। এই ভাষণেই ঘোষণা করা হত যে ঐ প্রতিনিধি দলের প্রস্তাব গ্রহণ করা হচ্ছে না প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে, নাকি আংশিকভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এই গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের কারণই বা কী। দু'পক্ষের মধ্যে মতৈক্য হলে চুক্তির প্রমাণ হিসেবে সামুদ্রিক গুটিকার কোমরবন্ধনী বিনিময় করা হত। অতঃপর শেষ হত পরিষদের অধিবেশন।

"এই কোমরবন্ধনীটার মধ্যেই রক্ষিত রইল আমার কথা"—পরিষদের সভায় এই কথাটা উচ্চারণ করত একজন ইরোকোয়া প্রধান। অতঃপর নিজের কথার প্রমাণ হিসেবে কোমরবন্ধনীটা অপর পক্ষের হাতে তুলে দিত সে। আলাপ-আলোচনা চলাকালীন এ-রকম বেশ কিছু কোমরবন্ধনী তুলে দেওয়া হত অপর পক্ষের হাতে। অপর পক্ষের যতগুলি প্রস্তাব গৃহীত হত, ততগুলি কোমরবন্ধনী তারাও প্রত্যর্পণ করত ইরোকোয়াদের হাতে। যে-কোন প্রস্তাবকে কার্যকরী করার ব্যাপারে নিজেদের সততা ও মর্যাদা বজায় রাখার জন্য প্রতিটি প্রস্তাবের একটা হুবহু প্রমাণ রেখে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল ইরোকোয়ারা। সেই উপলব্ধি থেকেই এই পদ্ধতিটি চালু করেছিল তারা।

সার্বজনীন স্বার্থবিজড়িত যে-কোন প্রশ্নে এবং যে-কোন সার্বজনীন কাজকে বৈধ করে তোলার ব্যাপারে সমস্ত সাকেমের সম্মতি ছিল একান্ত আবশ্যক। এটা ছিল মিত্রসঙ্ঘের একটা মৌলিক নিয়ম।[১] সকলকার ভোট নিয়ে পরিষদের সদস্যদের মতামতের যাথার্থ্য নির্ণয় করার পদ্ধতি সৃষ্টি করেছিল তারা। তাছাড়াও, পরিষদের কার্যকলাপের ব্যাপারে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর নীতির সঙ্গে তারা একেবারেই অপরিচিত ছিল।

---

১ আমেরিকান বিপ্লবের গোড়ার দিকে. পরিষদের সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারার ফলে ইরোকোয়ারা আমাদের মিত্রসঙ্ঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ব্যাপারে একমত হতে পারেনি। ওনেইডাদের কয়েকজন সাকেম্‌ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং শেষপর্যন্ত অন্যদের ঐকামতকে বাতিল করে দেয়। মোহক্‌দের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা আদৌ সম্ভব ছিল না, আর

BanglaBook.org

পরিষদে তারা গোষ্ঠীগতভাবে ভোট দিত এবং কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সমস্ত গোষ্ঠীর সাকেম্‌দের একমত হতে হত। সকলকার সম্মতিকে অত্যাবশ্যক নীতি হিসেবে গ্রহণ করে, সেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অর্জন করার পন্থা হিসেবে মিত্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতারা প্রতিটি গোষ্ঠীর সাকেম্‌দেরকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। কয়েক পৃষ্ঠা আগে আমরা ইরোকোয়া সাকেম্‌দের নামের যে সারণী দিয়েছি, তা থেকে এই শ্রেণী-বিভাগটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। নিজের শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য সাকেম্‌রা একমত না হলে এবং তারা নিজেদের মুখপাত্র হিসেবে মনোনীত না করলে কোন সাকেম্‌ই পরিষদের সামনে ভোটের আকারে কোন মতামত প্রকাশ করতে পারত না। দেখা যায় যে সেনেকাদের আটজন সাকেম্‌ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং তারা মোট চারটি মতামতই ব্যক্ত করতে পারত। ক্যায়ুগাদের দশজন সাকেম্‌ বিভক্ত ছিল তিনটি শ্রেণীতে, কাজেই তারা মোট তিনটি মতামতই প্রকাশ করতে পারত। এইভাবে, প্রতিটি শ্রেণীর সাকেমদেরকে প্রথমে নিজেদের মধ্যে একমত হতে হত। অতঃপর একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণী থেকে এক-একজন সাকেমকে বাছাই করা হত এবং তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করত। এরা যখন একমত হত, তখন এদের মধ্যে থেকে মনোনীত একজন সাকেম্‌ তাদের সমগ্র গোষ্ঠীর মতামত ব্যক্ত করত। এই চমৎকার পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাকেম্‌রা আলাদা আলাদা ভাবে ঐকমত্যে পৌঁছনোর পর সবকটা গোষ্ঠীর মতামত নিয়ে আলোচনা শুরু হত। সবকটা গোষ্ঠী একমত হলে, গৃহীত হত পরিষদের সিদ্ধান্ত। তাদের মধ্যে ঐকমত্য না হলে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত না এবং অধিবেশন সমাপ্ত হত। পাঁচটি গোষ্ঠীর মতামত প্রকাশ করার জন্য ইরোকোয়ারা পাঁচজন লোককে মনোনীত করত। এই ব্যাপারটা থেকে আজটেকদের মিত্রসঙ্ঘে ছ'জন নির্বাচককে নিয়োগ করা ও তাদের কাজকর্মের ব্যাপারটাকে বোঝা যেতে পারে। এ নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হবে।

ঐকমত্য অর্জন করার এই পদ্ধতির দ্বারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমতা ও স্বাধীনতাকে স্বীকার এবং রক্ষা করা হত। কোন সাকেম্‌ একেবারে অবুঝ হলে কিংবা অযৌক্তিক জেদ ধরলে অন্যসব সাকেম্‌ মিলে তার ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করত। এই প্রভাবটাকে সে ঠেকাতে পারত। ফলে তাদের পরিষদে সাধারণত কোন ঝামেলা বা অনিষ্ট ঘটতে পারত না। সকলকার সম্মতি আদায়ের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বিষয়টাকে মুলতুবী রাখা হত, কারণ সে বিষয়ে আর কিছু করা তখন সম্ভব হত না।

নতুন সাকেম্‌দের অভিষেক সাধারণ মানুষদের কাছে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার ছিল। অন্যান্য সাকেম্‌দের কাছেও এটা ছিল বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার, কারণ

সেনেকারা যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তখন ঠিক হয় যে প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের নিজেদের দায়িত্বে যুদ্ধ শুরু করতে পারে অথবা নিরপেক্ষও থাকতে পারে। এরিদের বিরুদ্ধে, নিউট্রাল নেশন্‌দের ও সাস্‌কেহ্যানক্‌দের বিরুদ্ধে এবং ফরাসিদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু যুদ্ধের ব্যাপারে সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আমাদের ঔপনিবেশিক নথিপত্রে ইরোকোয়া মিত্রসঙ্ঘের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভুরিভুরি নজির দেখা যায়।

নতুন সাকেম্ গ্রহণের ব্যাপারে তাদের হাতে কিছু ক্ষমতা থাকত। প্রধানত সাকেম্দের তুলে ধরার অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্যই গড়ে উঠেছিল সাধারণ পরিষদ। তৈরি হওয়ার সময়েই বা তার পরে কোন সময় এই পরিষদের নাম দেওয়া হয়েছিল শোকপ্রকাশ সংক্রান্ত পরিষদ (হেন্-নান্-ডো-নাহ্-মেহ্), কারণ এটি একই সঙ্গে দুটি কাজ করত—মৃত সাকেমের জন্য শোকপ্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং তার উত্তরসূরীকে অভিষিক্ত করা। কোন সাকেমের মৃত্যু হলে তার গোষ্ঠী সাধারণ পরিষদ আহ্বান করতে এবং তার সময় ও স্থান নির্ধারণ করতে পারত। মৃত সাকেম্ তার অভিষেকের সময় সামুদ্রিক গুটিকার যে কোমরবন্ধনীটা পেয়েছিল, সেই কোমরবন্ধনীটা সঙ্গে করে একজন দূত যেত বার্তা নিয়ে। ঐ সংক্ষিপ্ত বার্তায় বলা হত—"অমুকের জন্য" (মৃত সাকেমের নামটা উল্লেখ করা হত) "পরিষদের সভা ডাকা হচ্ছে"। সভার দিন ও স্থানও জানিয়ে দেওয়া হত। কখনও কখনও মৃত সাকেমের শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পরেই তার কোমর-বন্ধনীটা পাঠিয়ে দেওয়া হত ওনোন্ডাগায় কেন্দ্রীয় পরিষদ-অগ্নির কাছে। এইভাবে তার মৃত্যুর কথা জানানো হত সকলকে। পরিষদের সভা কখন বসবে, তা পরে ঠিক করে নেওয়া হত।

নতুন সাকেম্দের অভিষেকের পর নানারকম উৎসবের আয়োজন করত 'শোকপ্রকাশ সংক্রান্ত পরিষদ'। তাই এই পরিষদের উৎসবের একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। এর উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য তারা দূর-দূরান্ত থেকে দলে দলে আসত একবুক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে। এই উৎসবে নানান ধরণের অনুষ্ঠান হত। সাধারণত পাঁচদিন ধরে চলত উৎসব। প্রথমে শুরু হত মৃত সাকেমের জন্য শোকপ্রকাশের অনুষ্ঠান। ধর্মীয় কাজ হিসেবে এই শোকপ্রকাশ শুরু করা হত সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। পুব আকাশে রাঙা সূর্য চোখ মেললে মৃত সাকেমের গোষ্ঠীর অন্যান্য সাকেম্রা গোষ্ঠীর বাকি লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেত অন্যান্য গোষ্ঠীর সাকেম্ ও লোকজনদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানোর জন্য। এই অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকেরা আগে থেকেই ওখানে পৌঁছে গিয়ে কিছুটা দূরে শিবির করে নির্দিষ্ট দিনটির জন্য অপেক্ষা করত। পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর একটা শোভাযাত্রা শুরু করা হত। পরিষদের সভা যেখানে বসবে, সেই পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে যেত সকলে, আর চলবে পথে গানের সুরে ছন্দোবদ্ধভাবে বিলাপ করা হত। সমস্ত গোষ্ঠী মিলিতভাবে ধুয়ো ধরত সেই বিলাপে। এই সমবেত বিলাপের সাহায্যে মৃত সাকেমের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হত। আর এ কাজ শুধু তার গোত্র একাই করত না, অংশগ্রহণ করত তার সমগ্র গোষ্ঠী এবং গোটা মিত্রসংঘটাই। বর্বর অবস্থার মানুষদের কাছে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশের এমন সুমার্জিত নজির ঠিক যেন আশা করা যায় না। এইসব অনুষ্ঠান এবং পরিষদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সাঙ্গ হলে শেষ হত প্রথম দিনের অধিবেশন। দ্বিতীয় দিনে শুরু হত অভিষেক অনুষ্ঠান। সাধারণত চতুর্থ দিন পর্যন্ত চলত এই অনুষ্ঠান। ঠিক আভ্যন্তরীণ বিষয়ক পরিষদের মতই এখানেও দুভাগে ভাগ হয়ে বসত সাকেম্রা। যখন তিনটি জ্যেষ্ঠ গোষ্ঠীর কোন সাকেম্কে তুলে ধরা হত, তখন এই অনুষ্ঠানের

BanglaBook.org

যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করত কনিষ্ঠ গোষ্ঠীগুলির সাকেমরা এবং নতুন সাকেমটি অভিষিক্ত হত পুত্র হিসেবে। তাদের সামাজিক ও প্রশাসনিক জীবনের নিজস্ব চরিত্রকে পরিস্ফুট করার জন্যই এই বিশেষ অবস্থাগুলির কথা উল্লেখ করলাম। বক্তৃতার এইসব রূপ আর রীতি ইরোকোয়াদের কাছে অসীম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

ওরা বলত—সামুদ্রিক গুটিকার কোমরবন্ধনীর মধ্যে মিত্রসঙ্ঘের কাঠামো আর নীতির কথা "বলে দেওয়া হয়েছিল"। সদ্য অভিষিক্ত সাকেমটিকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য ঐ কোমরবন্ধনীগুলি নিয়ে আসা হত এবং তা পড়া বা ব্যাখ্যা করা হত। একজন প্রাজ্ঞ-ব্যক্তি (সে কোন সাকেম্ না-ও হতে পারত) একটার পর একটা কোমরবন্ধনী হাতে নিয়ে সাকেম্দের দুটি সারির মধ্যে দিয়ে ঘোরাঘুরি করত আর ঐগুলিতে প্রদত্ত নানান তথ্য ব্যাখ্যা করে শোনাত। ইণ্ডিয়ানরা বিশ্বাস করে যে এই কোমরবন্ধনীগুলি তাদের মধ্যে 'বলে দেওয়া' সঠিক বিধান, শর্ত বা কাজকর্মের কথা কোন-একজন ব্যাখ্যাতার মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারে এবং ঐ সব বিধান ইত্যাদির কথা ঐ কোমর-বন্ধনীতে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। বেগুনি কিংবা সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে গাঁথা গুটিকার সুতো অথবা একটা কোমরবন্ধনীর ওপর নানান রঙের পুঁতি দিয়ে দিয়ে গড়া বিভিন্ন মূর্তি—এগুলির মধ্যে কোন বিশেষ সুতো বা মূর্তি বিশেষ কোন ঘটনার প্রতীক হিসেবে কাজ করত। এইভাবে সমস্ত পরপর সাজিয়ে রাখা হত, আবার সেই সঙ্গেই আনুগত্য জানানো হত অতীত স্মৃতির উদ্দেশে। এইসব সুতো, পুঁথি আর কোমরবন্ধনীই ছিল ইরোকোয়াদের ঘটনাপঞ্জীর একমাত্র সুস্পষ্ট বিবরণী। কিন্তু এগুলির অর্থ বোঝার জন্য দরকার হত সুদক্ষ ব্যাখ্যাকার। এই ব্যাখ্যাকাররাই ঐ-সব সুতো আর মূর্তি থেকে উদ্ধার করে আনত সুপ্ত অতীতকে। ওনোন্ডাগাদের একজন সাকেমকে (হো-নো-ওয়ে-না-টো) "সামুদ্রিক গুটিকার কোমরবন্ধনীর রক্ষক" হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। তার সহকারী হিসেবে আরও দুজনকে নিয়োগ করা হয়। সাকেমের মত এদেরকেও ঐ কোমরবন্ধনীর ব্যাখ্যায় বিশারদ হয়ে উঠতে হত। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটির দক্ষতার ফলে ঐ-সব কোমরবন্ধনী আর সুতোর ব্যাখ্যা থেকে প্রথম মিত্রসঙ্ঘ গড়ে ওঠার সময়কার একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে উঠত। পরিষদের সভায় তারা সেই পুরনো প্রথার হুবহু পুনরাবৃত্তি করত এবং কোমরবন্ধনীতে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রথাকে আরও জোরদার করে তুলত। এইভাবে সাকেমদের তুলে ধরার পরিষদ একটা শিক্ষামূলক পরিষদে পরিণত হয়েছিল। মিত্রসঙ্ঘের কাঠামো, নীতি আর তার গড়ে ওঠার ইতিহাসকে ইরোকোয়াদের মনের মাঝে সারাক্ষণ অমলিন সজীবতায় উজ্জ্বল করে রাখত এই পরিষদ। পরিষদের সভায় প্রতিদিন দুপুর পর্যন্ত এইসব কাজই চলত। বিকালবেলায় হত খেলাধুলো, আমোদ-প্রমোদ। গোধূলির ছায়া যখন ছুঁয়ে যেত পৃথিবীকে, তখন প্রতিদিন উপস্থিত সকলকে একসঙ্গে খেতে দেওয়া হত। খাবার বলতে ঝোল আর সেদ্ধ মাংস। পরিষদ-ভবনের কাছেই এগুলি রান্না করা হত। রান্নার জায়গা থেকে খাবারগুলি বিভিন্ন কাঠের পাত্র, থালা ও হাতায় করে পরিবেশন করা হত। খাওয়া শুরুর আগে প্রার্থনা করা হত ঈশ্বরের করুণা।

BanglaBook.org

কোন-একজন লোক তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করত আর সুরের লয়ে এসে একেবারে চুপ করে যেত। তখন বাকি সকলে সমবেত কণ্ঠে ধুয়ো ধরত। সন্ধ্যেবেলায় হত নাচ। বেশ কয়েকদিন ধরে চলত এইসব অনুষ্ঠান, উৎসব, আর এভাবেই অভিষিক্ত হত সাকেমরা।

সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে সাকেমদেরকে তাদের পদে অভিষিক্ত করার দ্বারা মিত্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতারা তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিল—গোত্রের মধ্যে এক অবিরাম পরম্পরা রক্ষা করা, এর সদস্যদেরকে অবাধ নির্বাচনের সুবিধা ভোগ করতে দেওয়া এবং অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের নির্বাচনের ওপর তদারকি বজায় রাখা। শেষ কাজটি করার জন্য মনোনীত ব্যক্তিকে বাতিল করার অধিকারও পরিষদের হাতে থাকা দরকার ছিল। অভিষিক্ত করার অধিকারটাও পরিষদের হাতে থাকত কিনা, তা আমি বলতে পারছি না। কাউকে বাতিল করার কোন ঘটনার কথা আমি শুনি নি। একদল সাকেমের দেখাশোনা করার জন্য ইরোকোয়ারা যে সাকেমটিকে মনোনীত করত, সে কখনও কখনও কিছু মৌলিক অধিকার এবং তাদের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকার ভোগ করত। রূপের দিক থেকে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির শাসন (সবথেকে ভালো অর্থে) হলেও, আসলে এদের শাসনপদ্ধতিটা ছিল পুরনো ধাঁচের একটা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। জনমত নামক শক্তিশালী উপাদানটি গোটা সংগঠনে ছড়িয়ে পড়ে তার কাজকর্মকে সর্বদাই প্রভাবিত করত। নিজেদের সাকেম্ ও প্রধানদের নির্বাচিত ও বরখাস্ত করার ব্যাপারে গোত্রগুলির অধিকার, নিজেদের মধ্যে থেকেই মনোনীত করা কোন মুখপাত্রের মাধ্যমে পরিষদের সামনে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার ব্যাপারে জনসাধারণের অধিকার এবং সামরিক কাজকর্মের ব্যাপারে স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা—এই সবকিছুর মধ্যে ঐ প্রভাবেরই ছায়া দেখা যায়। ঐ যুগে এবং তার পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগে গণতান্ত্রিক নীতিমালাই ছিল গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ।

ইরোকোয়ারা সাকেমদেরকে বলত হো-ইয়ার-না-গো-ওয়ার, অর্থাৎ "জনসাধারণের উপদেষ্টা"। অবাধ গণতন্ত্রের ব্যবস্থায় কোন শাসকের পক্ষে অভিধাটা একেবারে লাগ্-সই। এই অভিধা থেকে তার পদটাকে স্পষ্টভাবে বোঝা তো যায়ই, তাছাড়া এ থেকে গ্রীসের প্রধানদের পরিষদের সদস্যদের প্রায় একইরকম আখ্যাটারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রীসের প্রধানদের বলা হত "জনসাধারণের মন্ত্রণাদাতা"[১]। ইরোকোয়াদের মধ্যে সাকেম্ পদটির চরিত্র ও ঐ পদে থাকার শর্তাবলী থেকে বোঝা যায় যে সাকেমরা স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন কোন শাসক ছিল না, তারা ছিল অবাধ নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত গোত্রের প্রতিনিধি। গোত্রভিত্তিক সংগঠন গ্রীকদেরকে সভ্যতার যুগে পেঁছে দেওয়ার পরেও তাদের মধ্যে ঐ পদটা প্রাচীন রূপেই টিকে ছিল, যে পদের জন্ম বন্য যুগে এবং বর্বর যুগের তিনটি উপ-পর্যায় জুড়ে যে পদ বিরাজমান—বিষয়টা অত্যন্ত লক্ষণীয়।

১। এস্কাইলাস্, "দ্য সেভেন এগেনস্ট থিবিস", ১০০৫।

BanglaBook.org

এ থেকেই বোঝা যায় যে গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় গণতন্ত্রের নীতি কত গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল মানুষের মনের গহনে।

দ্বিতীয় স্তরের প্রধানদের আখ্যা ছিল হা-সা-নো-ওয়া-না, অর্থাৎ "উন্নীত নাম"। এ থেকে বোঝা যায় যে ব্যক্তিগত উচ্চাশার একান্ত সাধারণ প্রেরণাকে বর্বর মানুষরা প্রশংসার চোখেই দেখত। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে মানুষ প্রগতির সোপানের উঁচুতেই থাক আর নীচুতেই থাক, তার প্রকৃতি সর্বত্রই এক। ইরোকোয়াদের বিশিষ্ট বক্তারা, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা আর যুদ্ধ-প্রধানরা প্রায় সর্বদাই দ্বিতীয় স্তরের প্রধান হিসেবেই গণ্য হত। এর একটা কারণ হয়ত এই যে তাদের সাংগঠনিক ব্যবস্থায় শান্তি সংক্রান্ত ব্যাপারগুলির দেখাশোনা করত সাকেমরা। আরেকটা কারণ হয়ত এই যে তাদের শাসক সংস্থায় যোগ্যতম লোকদেরকে নেওয়া হত না, কেননা ঐ-সব লোককে নিলে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে শাসনকার্যের ক্ষতি হতে পারে। আর প্রধানের পদটা যেহেতু গুণের ভিত্তিতেই দেওয়া হত, তাই স্বভাবতই ঐ পদ যোগ্যতম লোকেরাই পেত। রেড-জ্যাকেট, ব্র্যাণ্ডট্, গারাংগুলা কর্ণপ্ল্যাণ্টার, ফার্মার্স ব্রাদার, ফ্রস্ট জনসন এবং আরও কিছু বিশিষ্ট ইরোকোয়া প্রধানদের নাম পাওয়া যায়, যারা কিন্তু সাকেম্ ছিল না। অদ্যাবধি তাদের মধ্যে বহু লোক সাকেম্ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র লোগান্[১], সুন্দর হ্রদ[২] এবং সাম্প্রতিককালে এলি এস. পার্কার[৩] ছাড়া আর কেউই আমেরিকার ইতিহাসের পাতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। ইরোকোয়াদের নিজেদের মধ্যে ছাড়া বাকি সাকেম্দের কোন স্মৃতির রেখা কোথাও অবশিষ্ট নেই।

মিত্রসংঘ যখন গঠিত হয়, তখন ওনোন্ডাগা প্রধানদের মধ্যে সবথেকে বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ছিল টো-ডো-ডা-হো। মিত্রসংঘ গঠনের ফলে তার ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলই। তবু সে মিত্রসংঘ গঠনের পরিকল্পনাকে সমর্থন জানায়। এই ব্যাপারটাকে সকলেই খুব প্রশংসার চোখে দেখেছিল। ওনোন্ডাগাদের অন্যতম সাকেম্ হিসেবে তাকে তুলে ধরা হয় এবং সাকেম্দের তালিকায় তার নামটা একেবারে প্রথমে রাখা হয়। তার সহকারী হিসেবে কাজ করার জন্য আর বিভিন্ন সার্বজনীন অনুষ্ঠানে তার পিছনে দাঁড়ানোর জন্য দুজন সহকারী সাকেমকেও তুলে ধরা হয়। সেই প্রথম টো-ডো-ডা-হোর কাজকর্মের ফল হিসেবে এই পদটা মহীয়ান হয়ে ওঠে এবং আজ পর্যন্ত ইরোকোয়ারা তাদের মোট আটচল্লিশটা সাকেম্ পদের মধ্যে এই পদটাকে বিশিষ্টতম বলে মনে করে থাকে। উৎসুক ঔপনিবেশিকরা এক সময় এই পরিস্থিতিটাকে কাজে লাগিয়ে ঐ পদের সাকেম্কে ইরোকোয়াদের রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় আর তার ফলে

১। ক্যায়ুগাদের একজন সাকেম্।

২। ইরোকোয়াদের একজন সাকেম্ এবং ইরোকোয়াদের 'নতুন ধর্ম'-এর প্রতিষ্ঠাতা।

৩। সেনেকাদের একজন সাকেম্।

ইরোকোয়াদের প্রতিষ্ঠানগুলিও একটা বেখাপ্পা বোঝার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। সাধারণ পরিষদে এই টো-ডো-ডা-হো তার সমকক্ষ সাকেমদের সঙ্গেই বসত। মিত্রসংঘের কোন প্রধান কার্যনির্বাহী বিচারক ছিল না।

গোষ্ঠীগুলি একটা মিত্রসংঘে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরই সৃষ্টি হয়েছিল সেনাপতি (হোস্-গা-আ-গেহ্-ডা-গো-ওয়া বা "প্রধান যোদ্ধা"-র) পদ। মিত্রসংঘ গঠিত হওয়ার পর তার মধ্যেকার বিভিন্ন গোষ্ঠী অনেক সময় একযোগে কারুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হত। আর তখনই অনুভূত হত গোটা বাহিনীকে পরিচালিত করার জন্য একজন সর্বাধিনায়কের প্রয়োজনীয়তা। শাসনতন্ত্রের একটা স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসেবে এই পদ সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারটা মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে এক তাৎপর্যময় ঘটনা। এটা ছিল আসলে পৌর শক্তির থেকে সামরিক শক্তির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সূচনা। এই বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন তা শাসনতন্ত্রের বাহ্যিক রূপটাকে আমূল পাল্টে দেয়। কিন্তু অগ্রগতির পরবর্তী স্তরে, যখন সামরিক মেজাজটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে, তখনও শাসনতন্ত্রের মৌলিক চরিত্রটার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। গোত্রভিত্তিক সমাজই প্রতিহত করেছিল অন্যায় বলপ্রয়োগের সম্ভাবনাকে। সেনাপতির পদ সৃষ্টি হওয়ার ফলে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা এক শক্তির সরকার থেকে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে দুই শক্তির সরকারে পরিণত হয়। কালক্রমে সরকারের কার্যকলাপ এই দুই শক্তির সমন্বয়েই পরিচালিত হতে থাকে। এই নতুন পদটাই ছিল প্রধান কার্যনির্বাহী বিচারক পদের ভ্রূণরূপ, কারণ আগেই বলা হয়েছে যে এই সেনাপতির পদের মধ্যে থেকেই একে একে মাথা তুলেছিল রাজা, সম্রাট, রাষ্ট্রপতি ইত্যাদি পদ। সমাজের সামরিক প্রয়োজনের ফলেই পদটা সৃষ্টি হয়েছিল এবং এক যুক্তিসম্মত পথেই তার বিকাশ ঘটেছিল। সেই কারণেই আমাদের এই আলোচনায় পদটার সৃষ্টি আর তার পরবর্তী ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে আমি ইরোকোয়াদের 'প্রধান যোদ্ধা' থেকে শুরু করে আজটেকদের টিউক্‌ট্‌লি (Teuctli), গ্রীকদের ব্যাসিলিউস (Basileus) এবং রোমানদের রেক্স (Rex)—এই সবকটা পদেরই বিকাশের ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা করব। এদের সকলকার মধ্যেই পরপর তিনটি ঐতিহাসিক যুগে পদটা একই ছিল, অর্থাৎ এরা সকলেই ছিল এক-একটা সামরিক গণতন্ত্রের এক-একজন সেনাপতি বিশেষ। ইরোকোয়া, আজটেক ও রোমানদের মধ্যে একটা নির্বাচকমণ্ডলী এই সেনাপতিকে নির্বাচন বা অনুমোদন করত। মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যায় যে প্রাচীন যুগে গ্রীকদের মধ্যেও এই ব্যবস্থাই চালু ছিল। বলা হয় যে হোমারের যুগে গ্রীকদের মধ্যে ব্যাসিলিউস পদটা বাবার কাছ থেকে ছেলের ওপর উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তাতো। কথাটার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। পদটার আদি শর্তের সঙ্গে এই উত্তরাধিকারসূত্রে পদপ্রাপ্তির দূরত্ব এতই বেশি যে একেবারে ইতিবাচক কোন প্রমাণ ছাড়া কথাটা মেনে নেওয়া যায় না। গোত্রভিত্তিক সমাজে একটা নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক সেনাপতি নির্বাচন বা অনুমোদন করাটা একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল। বাবার কাছ থেকে ছেলের কাছে পদটা বর্তানোর প্রচুর সংখ্যক

BanglaBook.org

নজির পাওয়া গেলে ভাবা যেত যে পদটা উত্তরাধিকারসূত্রেই বর্তাতো। এটাকে এখন ঐতিহাসিক সত্য বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে, যদিও পদটা ঐ-রকম উত্তরাধিকারসূত্রে কখনোই বর্তাতো না। দুর্ভাগ্যবশত, সেই প্রাচীন যুগের সমাজের সংগঠন ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণাও আমাদের নেই। মানবিক কার্যকলাপের মূল নীতির পাশে পাশেই থাকে সেগুলিকে কার্যকরী করার সুনিশ্চিত পরিচালন-ব্যবস্থাও। খুব সম্ভবত উত্তরাধিকারসূত্রে পদপ্রাপ্তির ব্যাপারটা প্রথমদিকে জনসাধারণের সম্মতি নিয়ে চালু করা হয় নি, চালু করা হয়েছিল বলপ্রয়োগের সাহায্যে। আর হোমারের যুগের গ্রীক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এই প্রথা চালু ছিল না।

ইরোকোয়াদের মিত্রসঙ্ঘ গঠিত হওয়ার সময়ই অথবা তার কিছুদিন পরেই দুটি স্থায়ী সমরনায়কের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং সেগুলির নামকরণও করা হয়। এই দুটি পদই তুলে দেওয়া হয় সেনেকা গোষ্ঠীর হাতে। এদের একজনের পদ (টা-ওয়ান-নে-আর্স, অর্থাৎ সুঁচ-ভঙ্গকারী) নেকড়ে গোত্রের মধ্যে আর অপরজনের (সো-নো-সো-ওয়া, অর্থাৎ বড় ঝিনুকের খোলা) কচ্ছপ গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তাতো। নিজেদের এলাকার পশ্চিম প্রান্ত থেকে বাইরের শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি ছিল বলেই এই পদ দুটি সেনেকাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সাকেমরা যেভাবে নির্বাচিত হত, ঠিক সেইভাবেই এরাও নির্বাচিত হত। একটা সাধারণ পরিষদ এদেরকে তুলে ধরত এবং এই দুজনের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ছিল সমান সমান। আরেকটা সূত্র থেকে জানা যায় যে এই পদগুলি আরও পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছিল। মিত্রসঙ্ঘ গঠিত হওয়ার পরেই তারা উপলব্ধি করে যে তাদের ঐ বড় বাড়ির কাঠামোটা মোটেই পূর্ণাঙ্গ নয়, কারণ মিত্রসঙ্ঘের সামরিক নির্দেশগুলিকে কার্যকরী করার মত কোন কর্মকর্তা সেখানে নেই। এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য একটা পরিষদ ডাকা হয়। ঐ পরিষদই উপরোক্ত দুটি স্থায়ী সমরনায়কের পদ সৃষ্টি করে। সর্বাধিনায়ক হিসেবে মিত্রসঙ্ঘের যাবতীয় কার্যকলাপের দায়িত্ব এবং গোটা মিত্রসঙ্ঘের সম্মিলিত বাহিনীর যে-কোন অভিযানে নেতৃত্ব এই দুজনের ওপরেই ন্যস্ত থাকত। এই দুটির মধ্যে প্রথম পদটির দায়িত্বপ্রাপ্ত গভর্ণর ব্ল্যাক্‌স্নেক সম্প্রতি মারা গেছেন। বোঝা যায় যে সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে পদটা বরাবরই চালু থেকেছে। একজনের বদলে সমান ক্ষমতাসম্পন্ন দুজন সমরনায়কের পদ সৃষ্টি করাটা ছিল আসলে নিজেদের সামরিক ব্যাপার-স্যাপারে কোন একজন লোকের একচ্ছত্র কর্তৃত্বকে নিয়ন্ত্রণ করারই একটা সুকৌশলী ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ মাত্র। রোমানরা তাদের রেক্স পদটার বিলোপ ঘটিয়ে দুজন প্রধান শাসকের (consul) পদ সৃষ্টি করেছিল, আর তাদের এই অভিজ্ঞতার কথা না জেনেও একই কাজ করেছিল ইরোকোয়ারাও। রোমানদের দুজন প্রবীন শাসকের হাতে ভাগাভাগি করে সামরিক ক্ষমতা দেওয়া হত, ফলে কেউই চূড়ান্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারত না। ইরোকোয়াদের মধ্যে এই পদটা অবশ্য কখনোই তেমন প্রভাবশালী হয়ে ওঠেনি।

ইণ্ডিয়ানদের জাতিতাত্ত্বিক ইতিহাসে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গোত্র, ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠী

BanglaBook.org

আর মিত্রসংঘ। এগুলি থেকেই সমাজের গঠন-প্রণালীটা বুঝতে পারা যায়। গুরুত্বের বিচারে এগুলির পরেই আসে সাকেম্ ও প্রধান পদের শর্ত ও কার্যকলাপ, প্রধানদের পরিষদের কার্যকলাপ এবং প্রধান সমরনায়ক পদের শর্ত ও কার্যকলাপ। এগুলিকে ভালভাবে জানতে পারলেই ইণ্ডিয়ানদের সরকারী ব্যবস্থার কাঠামো ও নীতিগুলিকে জানা যাবে। তাদের রীতি-নীতি, প্রথা, শিল্প আর উদ্ভাবন, এবং জীবন-ভাবনা—এগুলিকে জানতে পারলে চিত্রটা একটা পূর্ণাঙ্গ চেহারা নেবে। প্রথমোক্ত বিষয়টির প্রতি আমেরিকান গবেষকরা অদ্যাবধি তেমন মনোযোগ দেন নি। অথচ এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালালে এখনও অনেক কিছুই জানার সম্ভাবনা আছে। এই মুহূর্তে আমাদের জ্ঞান নিছকই সাধারণ মাত্র। একে বিশদ ও তুলনামূলক জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করা দরকার। বর্বর যুগের নিম্ন ও মধ্য অবস্থায় থাকা ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলি বন্য যুগ থেকে অগ্রসর হয়ে সভ্য যুগে পৌঁছনোর দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরে রয়েছে। আমাদের বহু প্রাচীন পূর্ব পুরুষদেরকে একের পর এক ঠিক এইসব অবস্থার মধ্যে দিয়েই আসতে হয়েছিল এবং ঠিক এইরকম নানান প্রতিষ্ঠান আর রীতি-প্রথা তাদের সমাজেও চালু ছিল। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কোন কৌতূহল না-ও থাকতে পারে, কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায়—তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই যেন জেগে আছে আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার ইতিহাস। আমাদের মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্ম হয়েছিল অতীতের এক গোত্রভিত্তিক সমাজেই, যে সমাজের সাংগঠনিক ক্রম ছিল গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠী, আর যেখানে শাসনকার্য পরিচালনা করত প্রধানদের পরিষদ। আমাদের সেই প্রাচীন সমাজের সঙ্গে ইরোকোয়া ও অন্যান্য ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলিরপ্রাচীন সমাজের বহু সাদৃশ্য আছে। গোটা ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখলে মানবজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদৃশ প্রতিষ্ঠানগুলিকে জানাটা আরও বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

ইরোকোয়া মিত্রসংঘ হচ্ছে এই ধরণের গোত্রভিত্তিক সমাজের এক চমৎকার উদাহরণ। বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থার গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির যাবতীয় সক্ষমতা একীভূত হয়েছে এর মধ্যে। পরবর্তী অগ্রগতির সুযোগ মিত্রসংঘ রেখেছিল, কিন্তু রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি হওয়ার আগে পর্যন্ত তাদের শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত আর কোন রূপরেখা গড়ে ওঠেনি। ভূখণ্ড আর সম্পত্তির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক সমাজ, আর এই সমাজ গড়ে ওঠার ধাক্কায় ভেঙে পড়েছিল গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। এই দুটি ব্যবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থাটা ছিল একটা সংক্রমণশীল স্তর, টিকে ছিল সামরিক গণতন্ত্র। শুধু কোথাও কোথাও এই সামরিক গণতন্ত্রকে হঠিয়ে গড়ে উঠেছিল বলপ্রয়োগভিত্তিক স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা। ইরোকোয়াদের মিত্রসংঘ মূলগতভাবে গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্নই ছিল। কারণ এটি গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন গোত্রকে নিয়ে, আর এইসব গোত্র গড়ে উঠেছিল গণতন্ত্রের সাধারণ নীতিমালার ভিত্তিতে। এই নীতিমালা অবশ্য সর্বোচ্চ স্তরের নয়, বরং একেবারেই আদিম ধাঁচের। মিত্রসংঘের গণতান্ত্রিক চরিত্রের আরও একটা কারণ ছিল এই যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার গোষ্ঠীগুলির হাতেই রাখা হয়েছিল।

তারা নানান গোষ্ঠীকে পরাজিত করে তাদেরকে নিজেদের অধীনস্থ গোষ্ঠী হিসেবে রাখত—যেমনটা ঘটেছিল দেলাওয়ারদের ক্ষেত্রে। কিন্তু এই অধীনস্থ গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজ নিজ প্রধানদেরই পরিচালনাধীন থাকত এবং এদেরকে অধীনস্থ করে মিত্রসঙ্ঘের কিছুমাত্র শক্তিবৃদ্ধি হত না। সমাজের এই অবস্থায় বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলিকে একটামাত্র শাসনব্যবস্থার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করা এবং করদ গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে করটুকু ছাড়া আর কোন সুবিধা আদায় করা সম্ভব ছিল না।

ইরোকোয়া মিত্রসঙ্ঘের এই বর্ণনাটুকু মোটেই পর্যাপ্ত নয়, তবে বর্তমান আলোচনার পক্ষে যথেষ্টই বলা হয়েছে এখানে। ইরোকোয়ারা খুবই কর্মঠ আর বুদ্ধিমান ছিল, অনেকটা আর্যদের মত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিল তারা। চমৎকার বাগ্মিতা, যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রতিহিংসা-পরায়ণতা আর অদম্য অধ্যবসায়—এইসব বৈশিষ্ট্যের ফলে তারা ইতিহাসের বুকে নিজেদের আসন করে নিতে পেরেছে। তাদের সামরিক কার্যকলাপে নির্মমতার নানান স্বাক্ষর মিশে থাকলেও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা মানুষের কিছু উচ্চতম গুণের এক উজ্জ্বল ফসল। তাদের অন্যতম ঘোষিত লক্ষ্য ছিল শান্তি। পারস্পরিক আক্রমণের বিপদ এড়ানোর জন্য প্রথমে তারা নিজেদের গোষ্ঠীগুলিকে একটা শাসনব্যবস্থার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করে, তারপর একই নামবিশিষ্ট ও একই বংশোদ্ভূত অন্যান্য গোষ্ঠীগুলিকেও তার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এরি ও নিউট্রাল নেশন্‌দেরকে মিত্রসঙ্ঘের সদস্য হওয়ার অনুরোধ জানায় তারা। ঐ দুটি গোষ্ঠী এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে তাদেরকে নিজেদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয় ইরোকোয়ারা। শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ লক্ষ্য সম্বন্ধে এইরকম অন্তর্দৃষ্টি তাদের বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। সংখ্যায় তারা অল্পই ছিল, কিন্তু তার মধ্যেই ছিল বেশ সুদক্ষ মানুষ। এ থেকেই তাদের উচ্চ গুণমানের প্রমাণ পাওয়া যায়।

উত্তর আমেরিকার ওপর দখলদারি নিয়ে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলেছিল, নিজেদের অবস্থান এবং সামরিক শক্তির দরুণ সেই প্রতিযোগিতার ওপর এক সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল ইরোকোয়ারা। বিভিন্ন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম একশ বছরে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স উভয়েরই ক্ষমতা ও সম্পত্তি প্রায় সমান সমান ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ 'নতুন দুনিয়া'য় ফ্রান্সের সাম্রাজ্য স্থাপন করার স্বপ্নকে ব্যর্থ করার পিছনে ইরোকোয়াদের একটা বড় ভূমিকাই ছিল।

গোত্রের প্রাচীন রূপ এবং সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একক হিসেবে তার কার্যক্ষমতাকে জানার ফলে গ্রীক ও রোমানকের গোত্রকে বুঝতে (যা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব) আমাদের সুবিধে হবে। পুরো দুটো ঐতিহাসিক যুগ পেরিয়ে এসে গ্রীক ও রোমানরা যখন সভ্যতার সিংহদুয়ারে পৌঁছেছিল, তখনও তাদের মধ্যে গোত্র, ভ্রাতৃত্ব আর গোষ্ঠী নিয়ে গড়ে ওঠা সেই একই শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। তাদের বংশধারা নির্ণীত হত পুরুষ-ধারায়, স্বগোত্রীয় জ্ঞাতিদের বদলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত মালিকের সন্তানরা এবং পরিবার ক্রমশ একপতিপত্নীক রূপ নিতে শুরু করছিল। সম্পত্তি পরিণত হচ্ছিল এক নির্ধারিক উপাদানে। সম্পত্তির এই বৃদ্ধি এবং প্রাচীর-

BanglaBook.org

বেষ্টিত শহরগুলিতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি—এই দুটো ঘটনা দ্বিতীয় ধরণের সরকার, অর্থাৎ রাজনৈতিক সরকারের প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট করে তুলছিল। সমাজ যতই সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ততই পুরনো গোত্রভিত্তিক ব্যবস্থা সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা হারাচ্ছিল। ভুখণ্ড আর সম্পত্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটা রাষ্ট্রের ছবি ফুটে উঠছিল গ্রীক এবং রোমানদের সামনে, যে রাষ্ট্র ভেঙে দেবে গোত্র আর গোষ্ঠীকে। দ্বিতীয় ধরণের সরকারের স্তরে প্রবেশ করার জন্য শহর ও নগরগুলি থেকে গোত্রকে এবং সমগ্র এলাকা থেকে গোত্রভিত্তিক ব্যবস্থাকে বাতিল করা দরকার ছিল। গোত্রের অবসান আর সংগঠিত সহরের অভ্যুদয়—এটাই হচ্ছে বর্বর যুগের পৃথিবী আর সভ্য যুগের পৃথিবীর মধ্যেকার, প্রাচীন সমাজ আর আধুনিক সমাজের মধ্যেকার সীমারেখা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্যানোয়ানিয়ান্ বর্গের অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে গোত্র

আমেরিকা যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন সেখানকার আদিবাসীরা দুটি ভিন্ন ধরণের অবস্থায় বসবাস করত। প্রথমভাগে ছিল ভিলেজ ইণ্ডিয়ানরা, যারা বেঁচে থাকার জন্য প্রায় পুরোপুরিভাবেই নির্ভর করত চাষবাসের ওপর। নিউ মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার গোষ্ঠীগুলি এবং আন্দিজের মালভূমি অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলিও চাষবাসের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। দ্বিতীয় ভাগে ছিল অ-কৃষিজীবী ইণ্ডিয়ানরা, যাদের মূল খাদ্য ছিল মাছ, গম, কন্দ এবং পশুমাংস। কলম্বিয়া উপত্যকা, হাড্‌সন উপসাগর অঞ্চল, কানাডার কিছু অংশ এবং আমেরিকার অন্য কয়েকটি অঞ্চলের আদিবাসীরা ছিল এই দ্বিতীয় বিভাগটির অন্তর্ভুক্ত। এই দুটো অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থায় বসবাস করত কিছু আংশিকভাবে ভিলেজ এবং আংশিকভাবে কৃষিজীবী ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠী। যেমন ইরোকোয়ারা, নিউ ইংল্যাণ্ড ও ভার্জিনিয়ার ইণ্ডিয়ানরা, ক্রীক, চোক্‌টা, চেরোকী, মিনিট্যারী, ডাকোটা আর শাওনীরা। এইসব আদিবাসী গোষ্ঠীর অস্ত্রশস্ত্র, শিল্প, রীতি-নীতি, উদ্ভাবন, নাচ, গৃহনির্মাণ কৌশল, সরকারের রূপ এবং জীবনভাবনা—এই সবকিছুর মধ্যে অত্যন্ত সাদৃশ্য চোখে পড়ে এবং সেই একই মূল ধারণার বিকাশের ধারাবাহিক স্তরগুলিকে এদের মধ্যে দেখা যায়। আমাদের প্রথম ভুলটা হচ্ছে ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের অপেক্ষাকৃত অধিক অগ্রগতিকে বাড়িয়ে দেখা এবং দ্বিতীয় ভুলটা হল অ-কৃষিজীবী ও আংশিকভাবে ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের অগ্রগতিকে কমিয়ে দেখা। আর এই দুটো ভুল থেকেই সৃষ্টি হয়েছে তৃতীয় আরেকটা ভুল—আমরা এই দুটো ভাগকে পরস্পরের থেকে পৃথক করে ফেলেছি আর এদেরকে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হিসেবে ধরে নিয়েছি। তাদের অস্তিত্ব প্রায়শই যে অবস্থার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত, সেই অবস্থাগুলোর মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। অ-কৃষিজীবী কিছু গোষ্ঠী ছিল বন্যতার উচ্চ অবস্থায়, মধ্যবর্তী গোষ্ঠীগুলি ছিল বর্বরতার নিম্ন অবস্থায় আর ভিলেজ ইণ্ডিয়ানরা ছিল বর্বরতার মধ্য অবস্থায়। একটাই মূল গোষ্ঠী থেকে যে এদের সৃষ্টি হয়েছিল, সে ব্যাপারে এখন প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে। ফলে প্রশ্নটা নিয়ে বিতর্কের আর তেমন অবকাশ নেই, যদিও সকলে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেননি। এস্কিমোরা অবশ্য একটা ভিন্ন বর্গ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল।

আমার পূর্বতন একটা রচনায় আমি প্রায় সত্তরটা আমেরিকান ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর রক্ত-সম্বন্ধ বা জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। ঐ আলোচনায় আমি দেখিয়েছি যে তাদের সকলের মধ্যে একই ব্যবস্থা চালু ছিল এবং একই উৎস থেকে এই ব্যবস্থা

BanglaBook.org

গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে। আর এইসব ব্যাপারকে সামনে এনে তাদেরকে আমি মানবজাতির একটা নির্দিষ্ট বর্গের একটা বিশিষ্ট অংশ হিসেবেই দেখাতে চেয়েছি। মানবজাতির ঐ নির্দিষ্ট বর্গটির নাম গ্যানোয়ানিয়ান বর্গ বা "তীর-ধনুকের পরিবার"।[১]

প্রাচীন ধরণের গোত্রের কাজগুলি খতিয়ে দেখার পর আমাদের জানতে হবে যে গ্যানোয়ানিয়ান বর্গের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে গোত্র কতটা প্রভাবশালী ছিল। এই পরিচ্ছেদে ঐ-সব গোষ্ঠীর মধ্যে গোত্রের সন্ধান করব আমরা, প্রতিটা গোষ্ঠীর গোত্র-নাম উল্লেখ করব এবং সম্পত্তি ও বিভিন্ন পদের ব্যাপারে তাদের বংশধারা ও উত্তরাধিকারের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব। দরকার হলে আরও কিছু ব্যাখ্যাও দেওয়া হবে। এখানে আমাদের প্রধান বিবেচ্য হল—তাদের মধ্যে গোত্রভিত্তিক সংগঠন ছিল কি ছিল না। এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে যেখানেই গোত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেখানেই দেখা গেছে যে এদের গোত্রের মূল বিষয়গুলি ঠিক ইরোকোয়াদের গোত্রের মতই। তাই ঐ ব্যাপারে নতুন করে ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার নেই। অন্যভাবে বলা না থাকলে বুঝতে হবে যে কোন ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠী বা তার কোন সদস্যের কাছ থেকে বর্তমান লেখকই উল্লিখিত গোত্রটির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। "সিস্টেম্‌স্‌ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি" রচনায় যেভাবে গোষ্ঠীগুলির শ্রেণীবিভাগ করেছিলাম, এখানেও সেইভাবেই করা হল।

প্রথম ঃ হোডেনোসনিয়ান গোষ্ঠী

১। ইরোকোয়া

ইরোকোয়াদের গোত্রগুলি নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে[২]।

২। ওয়ান্‌ডোট

এই গোষ্ঠীটি আসলে প্রাচীন কালের হুরণদেরই অবশিষ্ট অংশ। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত আটটা গোত্র আছে ঃ

১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। বীবর, ৪। হরিণ, ৫। কচ্ছপ, ৬। সাপ, ৭। শজারু, ৮। বাজপাখি।[৩]

১। "সিস্টেমস অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি অ্যাণ্ড অ্যাফিনিটি অফ দ্য হিউম্যান ফ্যামিলি" ("স্মিথ্‌সোনিয়ান কন্‌ট্রিবিউশন্‌স টু নলেজ," খণ্ড ১৭, ১৮৭১, পৃঃ ১৩১)।

২। ১। নেকড়ে, টর-ইয়োহ্‌-নো, ২। ভালুক, নি-ই-আর-গাই-ঈ, ৩। বীবর, নন্‌-গার-নী-আর-গোহ্‌, ৪। কচ্ছপ, গা-নে-ই-আর-টেহ্‌-গো-ওয়া, ৫। হরিণ, না-ও-গেহ্‌, ৬। কাদাখোঁচা, ডু-ঈসে-ডু-উই, ৭। সারস, জো-অ্যাস্‌-সেহ্‌, ৮। বাজপাখি, ওস-সোয়েহ্‌-গা-ডা-গ-আহ্‌।

৩। ১। আহ্‌-না-রেসে, কোয়া, হাড় চর্বনকারী, ২। আহ্‌-নু-ইয়েহ্‌, বৃক্ষখাদক, ৩। ৎসো-টা-ঈ, ভীরু জন্তু, ৪। গে-আহ্‌-উইশ্‌, চমৎকার জমি, ৫। ওস্‌-কেন্‌-ও-টোহ্‌, পরিভ্রমণশীল, ৬। সাইন্‌-গেইন-সী, বুকে হেঁটে চলনশীল, ৭। ইয়া-রা-হ্যাট্‌স্‌-সী, লম্বা গাছ, ৮। ডা-মোক, উড়ন্ত।

বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারায় এবং গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ। সাকেম বা পৌর প্রধানের পদ গোত্রের মধ্যেই উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তালেও, গোত্রের সদস্যদের দ্বারা তাকে নির্বাচিত হতে হয়। এদের সাতজন সাকেম আর সাতজন সমর-প্রধান আছে। বাজপাখি গোত্রটা বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সাকেমের পদ এক ভাইয়ের কাছ থেকে অন্য ভাইয়ের কাছে অথবা মামার কাছ থেকে ভাগ্নের কাছে বর্তায়, কিন্তু সমর-প্রধানের পদ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না, পেতে হয় যোগ্যতার ভিত্তিতে। গোত্রের মধ্যে সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রেই বর্তাতো। ফলে সন্তানরা তাদের বাবার কাছ থেকে কিছুই পেত না, পেত মায়ের সম্পত্তি। এর পরে যখনই এই নিয়মের কথা বলা হবে, তখনই ধরে নিতে হবে যে বিবাহিত ও অবিবাহিত—সব মানুষই এই নিয়মের আওতায় ছিল। নিজ নিজ প্রধানদের নির্বাচিত করা ও তাদেরকে বরখাস্ত করার অধিকার প্রতিটা গোত্রেরই ছিল। ওয়ান্‌ডোটরা অন্তত চারশ বছর আগেই ইরোকোয়াদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে এখনও পাঁচটা সাধারণ গোত্র দেখা যায়। অবশ্য এইসব গোত্রের মধ্যে কয়েকটির নাম এমনভাবে পাল্টে গেছে যে তাদেরকে আর সনাক্ত করা যায় না, আবার কয়েকটা গোত্র কোন নতুন নামে চিহ্নিত হয়েছে।

বর্তমানে বিলুপ্ত অথবা অন্য কোন গোষ্ঠীর মধ্যে মিশে যাওয়া এরি, নিউট্রাল নেশন, টিউটেলো[১] এবং মাস্কেহ্যানক্‌রাও[২] এই বংশেরই শাখা ছিল। এরাও সম্ভবত গোত্রের ভিত্তিতেই সংগঠিত ছিল, কিন্তু তার সমস্ত প্রমাণই এখন হারিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় ঃ ডাকোটিয়ান গোষ্ঠী

আমেরিকার আদিবাসীদের এই বিরাট শাখাটার মধ্যে বহু গোষ্ঠী আছে। এদের অস্তিত্ব যখন আবিষ্কৃত হয় তখন এরা কয়েকটা ভাগে বিভক্ত ছিল এবং এদের ভাষারও কয়েকটা উপ-ভাষা ছিল। কিন্তু এরা মূলত পরস্পরের সন্নিহিত এলাকাতেই বসবাস করত। মিসিসিপির উৎস অঞ্চলটা এবং মিসৌরীর উভয় তীরের সহস্রাধিক মাইল এলাকা ছিল এদের দখলে। ইরোকোয়ারা আর তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীগুলি খুব সম্ভব এই ধারা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল।

১। ডাকোটা বা সিউক্স

ডাকোটাদের মধ্যে এখন বারোটা পৃথক গোষ্ঠী আছে। এরা গোত্র সংগঠনটা পরিত্যাগ করেছে। মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে একসময় এদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল, কারণ এদের নিকটতম জ্ঞাতি অর্থাৎ মিসৌরী অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলি এখনও

১। সম্প্রতি মিস্টার হোরেশিও হেল্‌ ইরোকোয়াদের সঙ্গে টিউটেলোদের সম্পর্কের কথা প্রমাণ করেছেন।

২। আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন সংক্রান্ত চমৎকার রচনামালার লেখক মিঃ ফ্রান্সিস পার্কম্যানই ইরোকোয়াদের সঙ্গে মাস্কেহ্যানক্‌দের সম্পর্কের কথা সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন।

গোত্রের ভিত্তিতেই সংগঠিত। এদের মধ্যে বিভিন্ন পশুর নামে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলি গোত্রের সমতুল। কিন্তু গোত্রের আর অস্তিত্ব নেই। কার্ভার, যিনি ১৭৬৭ সালে এদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলেছেন, "ইণ্ডিয়ানদের প্রতিটি শাখাই বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এরা যে যে জাতির অন্তর্গত, সেই সেই জাতির মধ্যে এরা এক-একটা ছোট ছোট দলে সংগঠিত হয়। প্রতিটা জাতির আলাদা আলাদা প্রতীক আছে, যা দিয়ে এরা একে অপরের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। একইভাবে প্রতিটা গোষ্ঠীরও আলাদা আলাদা অভিজ্ঞান (badge) থাকে আর সেটাই হচ্ছে তাদের গোষ্ঠী-নাম। যেমন—ঈগল, চিতাবাঘ, বাঘ, মহিষ প্রভৃতি। নডোউইসিদের (সিউক্স) একটা দলের প্রতীক হল সাপ, আরেকটা দলের প্রতীক কচ্ছপ, কারুর কাঠবিড়ালী, কারুর নেকড়ে, আবার কারুর-বা মাছ কিংবা মহিষ। প্রতিটা জাতির লোকেরাই নিজেদেরকে কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত করে এবং তাদের তুচ্ছতম মানুষটিও নিজের বংশধারা ও নিজের পরিবার সম্বন্ধে সচেতন।"[১] মিসিসিপির পূর্ব তীরে বসবাসকারী ডাকোটাদের সঙ্গে থেকেছিলেন কার্ভার। তাঁর এই বক্তব্যটা থেকে নিঃসন্দেহেই ধরে নেওয়া যায় যে সেই সময় তাদের মধ্যে গোত্রীয় সংগঠন অত্যন্ত সক্রিয়ভাবেই বিদ্যমান ছিল। আমি যখন ১৮৬১ সালে পূর্ব তীরের ডাকোটাদের আর ১৮৬২ সালে পশ্চিম তীরের ডাকোটাদের মধ্যে যাই, তখন এদের কারুর মধ্যেই আমি গোত্রের তেমন কোন চিহ্ন খুঁজে পাই নি। কার্ভারের দেখা আর আমার দেখার মধ্যবর্তী সময়ে ডাকোটাদের জীবনযাপন প্রণালীর একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। তারা বাধ্য হয়েছে সমতল অঞ্চলে নেমে আসতে এবং পরিণত হয়েছে যাযাবর গোষ্ঠীতে। আর সম্ভবত এই কারণেই তাদের সমাজে গোত্রের বিলোপ ঘটে গেছে।

পশ্চিম তীরের ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যে দু ধরণের প্রধান থাকে—এটাও লক্ষ্য করেছিলেন কার্ভার। ইরোকোয়াদের মধ্যেও আমরা তাই দেখেছি। কার্ভার লিখেছেন, "প্রতিটা দলে একজন করে প্রধান আছে, যাকে বলা হয় 'বড় প্রধান' বা প্রধান যোদ্ধা। তার যুদ্ধবিগ্রহের অভিজ্ঞতা এবং শৌর্যের ভিত্তিতেই তাকে ঐ পদের জন্য নির্বাচিত করা হয়। এই প্রধানের কাজ হল তাদের সামরিক কার্যকলাপ পরিচালনা করা এবং সে সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা। কিন্তু এই প্রধানটিকে রাষ্ট্রের পরিচালক হিসেবে গণ্য করা হয় না। যোদ্ধাসুলভ গুণাবলীর ভিত্তিতে নির্বাচিত এই প্রধান যোদ্ধার পাশাপাশি আর একজন প্রধান থাকে। জন্মসূত্রে পাওয়া অধিকারের দৌলতে সে এদের মধ্যে বিশিষ্টতম স্থান পায় এবং রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করে থাকে। এই প্রধানটিকে অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই সাকেম হিসেবে অভিহিত করা যায়। যে-কোন চুক্তির ব্যাপারে এর সম্মতি অত্যাবশ্যক। ঐ-সব দলিলে সে তাদের গোষ্ঠী অথবা জাতির প্রতীক চিহ্নটা লাগিয়ে দেয়।"[২]

১। "ট্র্যাভ্‌ল্‌স্‌ ইন নর্থ আমেরিকা", ফিলাডেলফিয়া সংস্করণ, ১৭৯৬, পৃঃ ১৬৪।

২। "ট্র্যাভ্‌ল্‌স্‌ ইন নর্থ আমেরিকা", পৃঃ ১৬৫।

২। মিসৌরী অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলি

ক) পুন্‌কা

এই গোষ্ঠীর মধ্যে আটটা গোত্র আছে ঃ ১। ধূসর ভালুক, ২। বহু লোক, ৩। এল্‌ক্‌ হরিণ, ৪। ভোঁদড়, ৫। মহিষ, ৬। সাপ, ৭। ওষুধ, ৮। বরফ।[১]

এই গোষ্ঠীটিতে সাধারণ নিয়মের বিপরীত একটা নিয়ম চোখে পড়ে—বংশধারা নির্ণীত হয় পুরুষ-ধারায়। সন্তানরা তাদের বাবার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ। সাকেমের পদ গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক, নির্বাচনের মাধ্যমে সাকেম নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু কোন মৃত সাকেমের ছেলেরা বাবার পদটা পেতে পারে। স্ত্রী-ধারা থেকে পুরুষ-ধারায় এই পরিবর্তন সম্ভবত কিছুদিন আগে ঘটেছে। কারণ দেখা যায় যে মিসৌরী অঞ্চলের আটটি গোষ্ঠীর মধ্যে দুটি গোষ্ঠী, অর্থাৎ ওটো ও মিসৌরীদের মধ্যে এবং মান্দানদের মধ্যে এখনও স্ত্রী-ধারা অনুযায়ীই উত্তরাধিকার নির্ণীত হয়। গোত্রের মধ্যে সম্পত্তিও উত্তরাধিকারসূত্রেই হস্তান্তরিত হয়।

খ) ওমাহা

এই গোষ্ঠীর মধ্যে বারোটা গোত্র আছে ঃ ১। হরিণ, ২। কালো, ৩। পাখি, ৪। কচ্ছপ, ৫। মহিষ, ৬। ভালুক, ৭। ওষুধ, ৮। কও (kaw), ৯। মাথা, ১০। লাল, ১১। বজ্র, ১২। বহু ঋতু।[২]

এদের বংশধারা, উত্তরাধিকার এবং বিবাহের নিয়ম ঠিক পুন্‌কাদের মতই।

গ) আইওয়া

আইওয়াদের মধ্যেও আটটা গোত্র আছে ঃ ১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। গরু-মহিষ, ৪। এল্‌ক্‌ হরিণ, ৫। ঈগল, ৬। পায়রা, ৭। সাপ, ৮। পেঁচা।[৩]

পা-কুহ্‌-থা নামে একটা বীবর গোত্র একসময় আইওয়া এবং ওটোদের মধ্যে ছিল, কিন্তু এখন সেটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এদের বংশধারা, উত্তরাধিকার এবং গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধকরণের নিয়ম ঠিক পুন্‌কাদের মতই।

---

১) ১। ওয়া-সা-বে, ২। ডে-আ-ঘে-টা, ৩। নো-কো-পোজ-না, ৪। মোহ্‌-কাব, ৫। ওয়া-শা-বা, ৬। ওয়া-ঝা-ঝা, ৭। নোহ্‌-গা, ৮। ওয়াহ্‌-গা।

২) ১। ওয়া-ঝেসে-টা, ২। ইন্‌কক্‌-কা-সা-বা, ৩। লা-টা-ডা, ৪। কা-ইহ্‌, ৫। ডা-থান্‌-ডা, ৬। ওয়া-সা-বা, ৭। হান্‌-গা, ৮। কুন্‌-জা, ৯। টা-পা, ১০। ইন্‌-গ্রা-ঝে-ডা, ১১। ইশ্‌-ডা-সুন-ডা, ১২। ও-নোন্‌-ই-কা-গা-হা।

৩) ১। মে-জে-রা-জা, ২। টু-নাম্‌-পে, ৩। আহ্‌-রো-হোয়া, ৪। হো-ড্যাশ্‌, ৫। চেহ্‌-হে-টা, ৬। লু-চিল্‌, ৭। ওয়া-কীহ্‌, ৮। মা-কচ্‌।

'হ' (H) বর্ণটা একটা গভীর ঘোষধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়। মিসৌরী অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এবং মিনিট্যারী ও ক্রোদের উপভাষায় এটা খুবই প্রচলিত।

ঘ) ওটো এবং মিসৌরী

এই গোষ্ঠীগুলি একাঙ্গীভূত হয়েছে এবং এদের মধ্যে আটটা গোত্র আছে ঃ ১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। গরু-মহিষ, ৪। এল্‌ক্‌ হরিণ, ৫। ঈগল, ৬। পায়রা, ৭। সাপ, ৮। পেঁচা।[১]

ওটো এবং মিসৌরীদের মধ্যে বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারায়, সন্তানরা তাদের মায়ের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। গোত্রের মধ্যে সাকেমের পদ এবং সম্পত্তি উত্তরাধিকারমূলক এবং গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ।

ঙ) কও (kaw)

কও-দের (কও-জা) মধ্যে চোদ্দটা গোত্র আছে ঃ ১। হরিণ, ২। ভালুক, ৩। মহিষ, ৪। ঈগল (সাদা), ৫। ঈগল, (কালো), ৬। পাতিহাঁস, ৭। এল্‌ক্‌ হরিণ, ৮। র‍্যাকুন, ৯। প্রেইরী নেকড়ে, ১০। কচ্ছপ, ১১। মাটি, ১২। হরিণের ল্যাজ, ১৩। তাঁবু, ১৪। বজ্র।[২]

আমেরিকার হিংস্রতম আদিবাসীদের মধ্যে কও-রা অন্যতম। তবে এরা খুব বুদ্ধিমান ও আকর্ষণীয় মানুষ। এদের বংশধারা, উত্তরাধিকার এবং বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক পুন্‌কাদের মতই। লক্ষণীয় ব্যাপার হল এই যে, এদের মধ্যে দুটো ঈগল গোত্র আর দুটো হরিণ গোত্র আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে এক-একটা আদি গোত্র ভেঙে দুটো করে গোত্র সৃষ্টি হয়েছিল। ঈগল গোত্রটা ভেঙে দু'টুকরো হয়েছিল। একটা অংশের নাম দেওয়া হয়েছিল সাদা ঈগল, আর একটার কালো ঈগল। পরে আমরা দেখব যে কচ্ছপ গোত্রটাও এইভাবে বিভাজিত হয়েছিল। ১৮৫৯ এবং ১৮৬০ সালে আমি মিসৌরী অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে গিয়েছিলাম, কিন্তু তখন ওসাগা আর কুয়াপাদের মধ্যে আমি যেতে পারি নি। এখানে যে আটটা গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই মূল ডাকোটিয়ান ভাষার নানান ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত উপ-ভাষায় কথা বলে থাকে। অনুমান করা হয় যে ওসাগা আর কুয়াপাদের মধ্যেও গোত্র রয়েছে এবং এই অনুমান অত্যন্ত সঠিক। ১৮৬৯ সালে কও-দের লোকসংখ্যা অনেক কমে গিয়ে সাতশ'য় দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ এক-একটা গোত্রে গড়ে মাত্র পঞ্চাশ জন করে লোক ছিল। এইসব গোষ্ঠীর আদি বাসস্থান বৃহৎ সিউক্স নদীর মোহনা থেকে শুরু করে মিসিসিপি পর্যন্ত মিসৌরী ও তার শাখানদীগুলির আশেপাশের অঞ্চল এবং মিসিসিপি নদীর পশ্চিম তীর বরাবর আর্কানসাস পর্যন্ত অঞ্চল।

---

১) ১। মে-জে'রা-জা, ২। মুন-চা, ৩। আহ্‌-অর-হোয়া, ৪। হু-মা, ৫। খা-আ, ৬। লুট্‌-জা, ৭। ওয়া-কা, ৮। মা-কচ্‌।

২) ১। টা-কে-কা-শে-গা, ২। সিন্‌-জা-ইয়ে-গা, ৩। মো-এ-কোয়ে-আহ-হা, ৪। হু-এ-ইয়া, ৫। হান্‌-গো-টিন্‌-গা, ৬। মে-হা-শান্‌-গা, ৭। ও'-পা, ৮। মে-কা, ৯। শো-মা-কু-সা, ১০। ডো-হা-কেল্‌-ইয়া, ১১। মো-এ-কা-নে-কা-শে-গা, ১২। ডা-সিন্‌-জা-হা-গা, ১৩। ইক্‌-হা-শে, ১৪। লো-নে'-কা-শে-গা।

৩। উইনেব্যাগো

এদের অস্তিত্ব যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন এরা উইসকনসিন অঞ্চলে উইনেব্যাগো হ্রদের কাছাকাছি এলাকায় বসবাস করত। এরা মূল ডাকোটিয়ান বংশেরই একটা শাখা। ইরোকোয়াদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এরাও পূর্ব দিকে সেণ্ট লরেন্স উপত্যকার দিকে যাত্রা করেছিল। হুরণ হ্রদ আর সুপিরিয়র হ্রদের মধ্যবর্তী এলাকায় অ্যালগনকিন গোষ্ঠীগুলো এদের বাধা দেয়, ফলে এরা আর এগোতে পারেনি। মিসৌরী অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলোই হচ্ছে এদের নিকটতম আত্মীয়। এদের মধ্যে আটটা গোত্র আছে ঃ ১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। মহিষ, ৪। ঈগল, ৫। এল্‌ক্‌ হরিণ, ৬। হরিণ, ৭। সাপ, ৮। বজ্র।[১]

এদের বংশধারা, উত্তরাধিকার এবং বিবাহের নিয়ম ঠিক পুন্‌কাদের মতই। খুবই আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, এই বর্গের বহু গোষ্ঠীই স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারায় উত্তরাধিকার নির্ণয় করতে শুরু করেছে। কারণ প্রথমে সম্পত্তি সম্বন্ধে এদের ধারণা ছিল একেবারেই কাঁচা অবস্থায়, বা বড়জোর তার থেকে একটু এগিয়ে। সম্পত্তি সম্বন্ধে গ্রীক ও রোমানদের মত কোন কার্যকরী ধারণায় এরা তখনও পেঁছিতে পারেনি। সম্ভবত সাম্প্রতিককালে আমেরিকানদের ও মিশনারিদের প্রভাবেই এই পরিবর্তনটা ঘটেছে এদের মধ্যে। ১৭৮৭ সালে উইনেব্যাগোদের মধ্যে স্ত্রী-ধারায় উত্তরাধিকার নির্ণয়ের প্রথা লক্ষ করেছিলেন কার্ভার। তিনি লিখেছেন, "যে-সব জাতির মধ্যে পদ-মর্যাদা উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তায়, সেখানে বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী। কোন প্রধান মারা গেলে তার ছেলে পরবর্তী প্রধান হয় না, হয় তার ভাগ্নে। মৃত প্রধানের কোন বোন না থাকলে তার অন্য কোন নিকটতম আত্মীয়ার ছেলেই পদটা পায়। আসলে উইনেব্যাগো জাতির কর্ত্রী হচ্ছে একজন নারী। ওদের নিয়ম-কানুনের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল"।[২] ১৮৬৯ সালে উইনেব্যাগোদের মোট জনসংখ্যা ছিল চোদ্দশ, অর্থাৎ প্রতিটা গোত্রে গড়ে দেড়শ জন করে লোক ছিল।

৪। মিসৌরীর উচ্চ অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলি

ক) মান্দান

নিজেদের সমস্ত জ্ঞাতিসম্পর্কিত গোষ্ঠীগুলির থেকে বুদ্ধিমত্তায় ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে মান্দানরা অনেক উন্নত ছিল। সম্ভবত মিনিট্যারীসদের কাছ থেকেই এইসব গুণ অর্জন করেছিল এরা। এদের মধ্যে সাতটা গোত্র আছে ঃ ১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। প্রেইরি মুরগীর ছানা, ৪। ভাল ছুরি, ৫। ঈগল, ৬। চ্যাপ্টা মাথা, ৭। উঁচু গ্রাম।[৩]

---

১) ১। শঙ্ক-চান-গা-ডা, ২। হোনে-চা-ডা, ৩। চা-রা, ৪। ওয়াহক-চা-হে-ডা, ৫। হু-ওয়ান-না, ৬। চা-রা, ৭। ওরা-কোন-না, ৮। ওয়া-কোন-চা-রা।

২) "ট্র্যাভ্‌ল্‌স্‌, পূর্বোল্লিখিত", পৃঃ ১৬৬।

৩) ১। হো-রা-টা-মু-মেক, ২। মা-টো-নো-মেক, ৩। সী-পুশ-কা, ৪। টা-না-ৎসু-কা, ৫। কি-টা-নে-মেক, ৬। ই-স্টা-পা, ৭। মে-টে-আহ-কে।

বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারায় এবং গোত্রের মধ্যে পদ ও সম্পত্তি উত্তরাধিকারমূলক। গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ। একই বর্গের অন্য গোষ্ঠীগুলি যেখানে পুরুষ-ধারায় উত্তরাধিকার নির্ণয় করে, সেখানে মান্দানদের এই স্ত্রী-ধারায় উত্তরাধিকার নির্ণয় একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। আসলে মান্দানদের প্রথাটাই প্রাচীন প্রথা, অন্যরা সাম্প্রতিক কালে এই প্রথাটা ত্যাগ করেছে। মান্দানদের উদাহরণ থেকে দৃঢ় ধারণা হয় যে আদিতে সমস্ত ডাকোটিয়ান গোষ্ঠীই স্ত্রী-ধারায় উত্তরাধিকার নির্ণয় করত। মান্দানদের সম্বন্ধে এই তথ্যটা ১৮৬২ সালে মিসিসিপির উচ্চ অঞ্চলের পুরনো মান্দান গ্রামের জোসেফ কিপ্-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। এই জোসেফ কিপের মা ছিলেন এক মান্দান নারী। উত্তরাধিকারের কথা বলতে গিয়ে সে তার মায়ের গোত্রের নাম উল্লেখ করেছিল এবং সে নিজেও ছিল ঐ গোত্রেরই সদস্য।

খ) মিনিট্যারীস

এই গোষ্ঠীটি এবং উপ্সারোকাস (উপ-সার-ও-কাস) বা ক্রো গোষ্ঠীটি হচ্ছে একটা মূল জনগোষ্ঠীর শাখাবিশেষ। এরা গ্যানোয়ানিয়ান বর্গের এই শাখাটির অংশ কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে, এদের উপ-ভাষা আর মিসৌরী ও ডাকোটা গোষ্ঠীগুলির উপ-ভাষার সংখ্যা সমান সমান বলে, ভাষাতত্ত্বের বিচারে এদেরকে এই বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদের একটা পুরনো ইতিহাস আছে কিন্তু সে ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানা যায় নি। মিনিট্যারীস্রা ঐ অঞ্চলে বাগান-চাষ, কাঠের বাড়ি বানানো এবং একটা বিচিত্র ধর্মীয় ব্যবস্থা চালু করেছিল। মান্দানরা এদের কাছ থেকে এইসব জিনিস শিখেছিল। এমনটাও হতে পারে যে এরা ছিল আসলে ছাঁচপ্রস্তুতকারকদের (Mounders) বংশধর। এদের মধ্যে সাতটা গোত্র আছে ঃ ১। ছুরি, ২। জল, ৩। কুটির, ৪। প্রেইরী অঞ্চলের মুরগিছানা, ৫। পাহাড়ী মানুষ, ৬। অজানা জন্তু, ৭। মাথার ঢাকনা।[১]

উত্তরাধিকার নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারায়, গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ এবং সাকেমের পদ ও সম্পত্তি গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক। বর্তমানে মিনিট্যারীস ও মান্দানরা একই গ্রামে পাশাপাশি বসবাস করে। উত্তর আমেরিকার যে-কোন অঞ্চলের রেড্-ম্যান্দের মধ্যে এদেরকেই দেখতে সবচেয়ে সুন্দর।

গ) উপ্সারোকা বা ক্রো

এদের মধ্যে নিম্নলিখিত গোত্রগুলি দেখা যায় ঃ ১। প্রেইরী অঞ্চলের কুকুর, ২। খারাপ ফিতা, ৩। ভোঁদড়, ৪। মায়াময় কুটির, ৫। হারানো কুটির, ৬। কু-সম্মান, ৭। কসাই,

১। ১। মিট-চে-রো-কা, ২। মিন-নে-পা-টা, ৩। বা-হো-হা-টা, ৪। সীচ-কা-বে-রুহ-পা-কা, ৫। ই-টিশ-শো-কা, ৬। আহ-নাহ-হা-না-মি-টে, ৭। ই-কু-প্য-বে-কা।

৮। সচল কুটির, ৯। ভালুকের-থাবা পর্বত, ১০। ব্ল্যাকফুট কুটির, ১১। মাছ-ধরিয়ে, ১২। কৃষ্ণসারমৃগ (Antelope), ১৩। দাঁড়কাক।[১]

বংশধারা, উত্তরাধিকার এবং গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধকরণের নীতি ঠিক মিনিট্যারীসদের মতই। ক্রো গোষ্ঠীর বেশ কিছু গোত্রের নাম একটু অস্বাভাবিক ধরণের, আর এগুলো যেন ঠিক কোন গোত্রকে বোঝায় না, বরং দলকে বোঝায়। প্রথমটায় আমি এগুলোর ওপর ঠিকমতো আস্থা রাখতে পারিনি। কিন্তু এদের বংশধারা নির্ণয়ের নিয়ম, বিবাহ সংক্রান্ত প্রথা এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ক রীতিগুলো গোত্রের অস্তিত্বকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

আমি যখন ক্রো-দের মধ্যে ছিলাম, তখন আমার দোভাষীর কাজ করতেন রবার্ট মেলড্রাম। এই রবার্ট মেলড্রাম ছিলেন আমেরিকান ফার কোম্পানির একজন প্রতিনিধি। ক্রো-দের সঙ্গে তিনি চল্লিশ বছর বসবাস করেছিলেন এবং তাদের একজন প্রধান হিসেবেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। ওদের ভাষাটা তিনি এতই ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে ঐ ভাষাতেই চিন্তা পর্যন্ত করতে পারতেন। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিশেষ রীতিগুলোর কথা তিনিই আমাকে বলেছিলেন। ধরা যাক একজন লোক উপহার হিসেবে একটা সম্পত্তি পেল। তারপর সেই সম্পত্তি তার দখলে থাকাকালীনই সে মারা গেল। অথচ যে তাকে ঐ সম্পত্তিটা দিয়েছিল, সে তখনও জীবিত। এই অবস্থায় সম্পত্তিটা আবার ঐ দাতার গোত্রের হাতেই ফিরে আসত। কোন স্ত্রী-র দ্বারা নির্মিত বা অর্জিত যে-কোন সম্পত্তি তার মৃত্যুর পর তার সন্তানদের ওপরেই বর্তাতো। আর তার স্বামীর মৃত্যুর পর লোকটির সমস্ত সম্পত্তিই পেত তার স্বগোত্রীয় জ্ঞাতিরা। কেউ যদি নিজের কোন বন্ধুকে কিছু উপহার দিত এবং তারপর মারা যেত, তাহলে বন্ধুটিকে তার জন্য শোকপ্রকাশ করতে হত। যেমন, হয় সে তার বন্ধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় নিজের আঙুলের একটা গাঁট কেটে ফেলত কিংবা মৃত বন্ধুর গোত্রের হাতে উপহার পাওয়া সম্পত্তিটি ফিরিয়ে দিত।[২]

বিবাহ সম্পর্কে ক্রো-দের মধ্যে এমন একটা প্রথা চালু আছে, যে প্রথাটা আরও অন্তত চল্লিশটা ইণ্ডিয়ান গোত্রের মধ্যে আমি লক্ষ করেছি। এখানে প্রথাটার শুধু উল্লেখটুকুই

১। ১। আ-চে-পা-বে-চা, ২। ই-মাচ-কা-বাক, ৩। হো-কা-রুট-চা, ৪। অ্যাশ-বট-চী আহ, ৫। আহ-শিন-না ডে-আহ, ৬। এসে-কেপ-কা বাক, ৭। উ-সা-বট-সী, ৮। আহ-হা-চিক, ৯। শিপ-টেট-জা, ১০। অ্যাশ-কানে-না, ১১। বু আ-ডা-শা, ১২। ও হট-ডু-শা, ১৩। পেট-চালে-রাব-পা-কা।

২। এই ধরণের শোকপ্রকাশ ক্রো-দের মধ্যে খুবই চালু প্রথা। আবার যখন তারা এক মহান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে কোন "আরোগ্য-নিকেতন" চালু করে, তখন এই প্রথাটাই একটা ধর্মীয় উৎসর্গীকরণ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়। আরোগ্য নিকেতনে উৎসর্গ গ্রহণের জন্য একটা ঝুড়ি ঝোলানো থাকে। আমি শুনেছি যে ঐ ঝুড়িতে কখনও কখনও পঞ্চাশটা, এমনকি একশটা পর্যন্ত আঙুলের গাঁট জমা হয়েছে। মিসিসিপির উচ্চ অঞ্চলের ক্রো-দের বসতিতে আমি এমন কিছু পুরুষ ও নারীকে দেখেছি, যাদের হাতের আঙুলের একটা করে গাঁট নেই—ধর্মীয় উৎসবে তারা উৎসর্গ করেছে গাঁটগুলো।

করছি, কারণ পরবর্তী কোন-একটা পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছে আছে। একজন পুরুষ কোন পরিবারের জ্যেষ্ঠা-কন্যাকে বিবাহ করলে, ঐ মেয়েটির ছোট বোনেরাও বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পুরুষটির স্ত্রী হিসেবেই বিবেচিত হয়। পুরুষটি তার এই অধিকার পরিত্যাগও করতে পারে, কিন্তু সে এই অধিকার দাবি করলে তার স্ত্রীর গোত্র সেটা মেনে নেয়। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রথা হিসেবে বহুবিবাহ সাধারণভাবে স্বীকৃত। কিন্তু লোকেরা একাধিক পরিবারের ভরণপোষণে অক্ষম হওয়ার জন্য বহুবিবাহ কখনোই তেমনভাবে চালু হতে পারেনি। মেল্‌ড্রাম-এর স্ত্রীর ঘটনা থেকে প্রথমোক্ত প্রথাটির প্রমাণ পাওয়া যায়। আমি যখন মেয়েটির কথা শুনি, তখন তার বয়স পঁচিশ বছর। ব্ল্যাক্‌ফীটদের ওপর চালানো একটা হামলায় সে ধরা পড়ে এবং মেল্‌ড্রাম তাকে নিজের বন্দিনী করে নেয়। মেয়েটি তখন নেহাতই শিশু। মেয়েটিকে তাদের গোত্রের ও পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করার ব্যাপারে নিজের শাশুড়িকে রাজি করায় মেল্‌ড্রাম। ফলে বন্দিনীটি মেল্‌ড্রামের স্ত্রীর ছোট বোন হিসেবে পরিচিত হয় এবং সে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার অধিকার অর্জন করে মেল্‌ড্রাম। নিজের দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠ করার জন্য এই প্রথাটির সদ্ব্যবহার করে মেল্‌ড্রাম। মানব-জাতির মধ্যে এই প্রথা সুপ্রাচীনকাল থেকেই চালু আছে। প্রাচীন যুগের পুনালুয়া প্রথার থেকেই এর উদ্ভব।

তৃতীয় ঃ উপসাগরীয় গোষ্ঠীগুলি

১) মাস্‌কোকী বা ক্রীক

ছ'টা গোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছিল ক্রীকদের মিত্রসংঘ। এই গোষ্ঠীগুলো হচ্ছে—ক্রীক, হিচেটে, ইয়ুচী, আলাবাম, কুসাটী আর ন্যাচে। প্রথম পাঁচটা গোষ্ঠী একই মূল ভাষার বিভিন্ন উপ-ভাষায় কথা বলত। ফরাসিদের হাতে ন্যাচেরা পরাজিত হওয়ার পর তাদেরকে মিত্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। এরা অন্য ভাষায় কথা বলত।

ক্রীকদের মধ্যে নিম্নলিখিত বাইশটা গোত্র আছে ঃ

১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। ভোঁদড়, ৪। কুমির, ৫। হরিণ, ৩। পাখি, ৭। বাঘ, ৮। বাতাস, ৯। ব্যাঙ, ১০। ছুঁচো, ১১। খ্যাঁকশিয়াল, ১২। র‍্যাকুন, ১৩। মাছ, ১৪। শস্য, ১৫। আলু, ১৬। হিক্যারি বাদাম, ১৭। নুন, ১৮। বনবিড়াল, ১৯। (অর্থ অজ্ঞাত), ২০। (অর্থ অজ্ঞাত), ২১। (অর্থ অজ্ঞাত), ২২। (অর্থ অজ্ঞাত)।[১]

১। ১। ইয়া-হা, ২। নো-কুসে, ৩। কু-মু, ৪। কাল-পুট্‌-লু, ৫। ই-চো, ৬। টুস-ওয়া, ৭। ক্যাট্‌-চু, ৮। হো-টোর-লী, ৯। সো-পাক্‌-টু, ১০। টুক-কো, ১১। চু-লা, ১২। ওয়ট-কো, ১৩। হু-হেলা, ১৪। উ-চে, ১৫। আহ্‌-আহ্‌, ১৬। ও-চে, ১৭। ওক্‌-চান-ওয়া, ১৮। কু-য়া-কু-চে, ১৯। টা-মুল-কী, ২০। আক্‌-টু-ইয়া-চালু-কী, ২১। ইস্‌-ফা-নাল্‌-কে, ২২। ওয়া-হ্‌লাক্‌-কাল্‌-কী।

রেভারেণ্ড এস. এম. লুঘরিজ আমাকে বলেছিলেন যে এই মিত্রসঙ্ঘের অন্যান্য গোষ্ঠী-গুলির মধ্যে নানান গোত্র আছে। রেভারেণ্ড লুঘরিজ মিশনারি হিসেবে বহু বছর ক্রীকদের মধ্যে বসবাস করেছিলেন। উপরোক্ত গোত্রগুলির নাম তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। তিনি আরও বলেছিলেন যে ক্রীকদের মধ্যে বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারায়, সাকেমের পদ এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তায় এবং গোত্রের মন্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ। বর্তমানে ক্রীকরা আংশিকভাবে সভ্য হয়ে উঠেছে, পাল্টে গেছে তাদের জীবনযাত্রা। পুরনো সমাজব্যবস্থার জায়গায় গড়ে উঠেছে এক রাজনৈতিক সম্যজব্যবস্থা, যার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাদের পুরনো গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্ত চিহ্নই মুছে যাবে নিঃশেষে। ১৮৬৯ সালে এদের মোট লোকসংখ্যা ছিল পনের হাজারের মত অর্থাৎ প্রতিটা গোত্রে গড়ে পাঁচশ পঞ্চাশ জন করে লোক ছিল।

২) চোক্‌টা

চোক্‌টাদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠন একটু অদ্ভুত ধরনের। এদের প্রতিটা ভ্রাতৃত্বের নামকরণ করা হয় স্রেফ ভ্রাতৃত্ব হিসেবেই এবং ঠিক সেইভাবেই এগুলো কাজ করে। এর আগে আমরা যে-সব গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করেছি, তাদের অনেকগুলোর মধ্যেও এই ব্যাপারটা আছেই আছে, কিন্তু তা নিয়ে কখনো গভীর অনুসন্ধান চালানো হয়নি। চোক্‌টাদের গোষ্ঠীতে আটটা গোত্র আছে। ইরোকোয়াদের মতই এদের মধ্যেও দুটো ভ্রাতৃত্ব, আর প্রতিটি ভ্রাতৃত্বে চারটি করে গোত্র দেখা যায়।

ক। বিভক্ত মানুষ (প্রথম ভ্রাতৃত্ব)

১। নল-খাগড়া, ২। ল্য ওক্‌লা, ৩। লুল্যাক, ৪। লিনোল্‌কুশা।

খ। প্রিয় মানুষ (দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্ব)

১। প্রিয় মানুষ, ২। ছোট মানুষ, ৩। বড় মানুষ, ৪। বাগ্‌দা-চিংড়ি।[১]

একই ভ্রাতৃত্বের গোত্রগুলির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে প্রথম ভ্রাতৃত্বের নারী-পুরুষরা দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্বের পুরুষ-নারীদের এবং দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্বের নারী-পুরুষরা প্রথম ভ্রাতৃত্বের পুরুষ-নারীদের বিবাহ করতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে ইরোকোয়াদের মত চোক্‌টারদেরও প্রথমে দুটো গোত্র ছিল। পরে প্রতিটা গোত্র থেকে ভেঙে চারটি করে গোত্র সৃষ্টি হয় আর মূল গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। চোক্‌টাদের বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী। সম্পত্তি এবং সাকেমের পদ গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক। ১৮৬৯ সালে এদের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় বারো

১। প্রথম। কুশ্যাপ। ওক্‌লা।

১। কুশ ইক্‌-সা, ২। ল-ওক্‌-লা, ৩। লু-ল্যাক্‌-ইক-মা, ৪। লিন্‌-ওক্‌-লু-শা।

দ্বিতীয়। ওর-টাক্‌-ই-হু-লা-টা।

১। চু-ক্যান্‌-ইক-সা, ২। ইস্‌-কু-লা-নি, ৩। চি-টো, ৪। শাক্‌-চুক্‌-লা।

হাজার, অর্থাৎ প্রতিটি গোত্রে গড়ে দেড় হাজার করে লোক ছিল। উপরোক্ত তথ্যগুলো পেয়েছিলাম প্রয়াত ডক্টর সাইরাস বাইংটন-এর কাছ থেকে। এই ডক্টর বাইংটন ১৮২০ সাল থেকে এই গোষ্ঠীটির মধ্যে মিশনারি হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। চোকটারা তখনও মিসিসিপির পূর্ব তীরে নিজেদের পুরনো এলাকাতেই বসবাস করত। এরা যখন ইণ্ডিয়ানদের এলাকায় চলে যায়, তখন বাইংটনও এদের সঙ্গেই সেখানে যান। পঁয়তাল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মিশনারি হিসেবে কাজ করার পর ১৮৬৮ সাল নাগাদ মারা যান ডক্টর বাইংটন। অনন্য গুণাবলী ও বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী এই মানুষটি এমন এক স্মৃতির সম্পদ রেখে গেছেন, যা নিয়ে গর্ব করতে পারে আমাদের এই মানবসমাজ।

জনৈক চোকটা একবার ডক্টর বাইংটনের কাছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, যাতে করে গোত্রের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তার সম্পত্তি তার স্বগোত্রীয় জ্ঞাতিদের বদলে তার সন্তানেরা পেতে পারে। চোকটাদের রীতি হল—কোন লোকের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়া হবে তার ভাই ও বোনেদের মধ্যে এবং তার বোনেদের সন্তানদের মধ্যে। তবে, সে তার জীবদ্দশায় নিজের সম্পত্তি সন্তানদেরকে দিয়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় গোত্রের সদস্যদের বদলে সম্পত্তি তার সন্তানদের হাতেই থাকে। বহু ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে প্রচুর সংখ্যক গৃহপালিত পশু, ঘরবাড়ি ও জমি আছে। এইসব গোষ্ঠীর লোকেরা এখন গোত্রীয় উত্তরাধিকার এড়ানোর জন্য নিজেদের জীবদ্দশাতেই সন্তানদের হাতে সম্পত্তি তুলে দিয়ে যায়। সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গোত্রীয় উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে সন্তানদের অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। এর ফলে কয়েকটি গোষ্ঠীতে, যেমন চোকটাদের মধ্যে, কয়েক বছর আগে পুরনো প্রথাটি বাতিল করে দিয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পুরোপুরিভাবেই তুলে দেওয়া হয় মৃত ব্যক্তির সন্তানদের হাতে। গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার জায়গায় রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে এবং প্রধানদের নিয়ে গঠিত পুরনো সরকার-ব্যবস্থার জায়গায় একটা নির্বাচিত পরিষদ ও শাসকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার ফলেই এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী বা স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী কিছুই পেত না। তবে, স্ত্রীর সম্পত্তি তার সন্তানদের মধ্যে, আর সন্তান না থাকলে তার বোনেদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত।

৩) চিকাসা

চিকাসাদের মধ্যেও দুটো ভ্রাতৃত্ব। প্রথম ভ্রাতৃত্বটায় ছিল চারটি গোত্র আর দ্বিতীয়টায় আটটা।

ক। চিতাবাঘ ভ্রাতৃত্ব

১। বনবিড়াল, ২। পাখি, ৩। মাছ, ৪। হরিণ।

BanglaBook.org

১। র‍্যাকুন, ২। স্প্যানিশ, ৩। রয়্যাল (বারো-শৃঙ্গী হরিণ), ৪। হাশ্-কো-নি, ৫। কাঠবিড়ালী, ৬। কুমির, ৭। নেকড়ে, ৮। শ্যামাপাখি।[১]

বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী, গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ এবং সম্পত্তি ও সাকেমের পদ গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক। উপরোক্ত তথ্যগুলি রেভারেণ্ড চার্লস সি. কোপ্ল্যাণ্ড এর কাছ থেকে সংগৃহীত। এই আমেরিকান মিশনারিটি চিকাসা গোষ্ঠীর মধ্যেই বসবাস করতেন। ১৮৬৯ সালে এদের লোকসংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের মত, অর্থাৎ প্রতিটা গোত্রে গড়ে চারশ-র মত লোক ছিল। স্পেনিয়দের সঙ্গে আদান-প্রদান শুরু হওয়ার পর সম্ভবত নতুন একটা গোত্র সৃষ্টি হয়েছিল অথবা কোন-একটা আদি গোত্রের নামের বদলে এই নামটা রাখা হয়েছিল। একটা ভ্রাতৃত্বকে স্প্যানিশ নামে অভিহিত করা হত।

৪) চেরোকী

প্রাচীনকালে এই গোষ্ঠীতে ছিল দশটা গোত্র। এগুলোর মধ্যে দুটো গোত্র—ওক্ ফল, আহ্-নে-দ্সু-লা, এবং পাখি, আহ্-নে-দ্সে-স্কোয়া—বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে এখন নিম্নলিখিত গোত্রগুলি রয়েছে ঃ

১। নেকড়ে, ২। লাল রং, ৩। দীর্ঘ তৃণভূমি, ৪। ডেফ (এক ধরণের পাখি), ৫। হলিগাছ, ৬। হরিণ, ৭। নীল, ৮। দীর্ঘ কেশ।[২]

বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী এবং গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ। ১৮৬৯ সালে চেরোকীদের লোকসংখ্যা ছিল চোদ্দ হাজার, অর্থাৎ প্রতিটি গোত্রে গড়ে এক হাজার সাতশ পঞ্চাশ জন করে লোক ছিল। আমেরিকান আদিবাসীদের আর কোন গোষ্ঠীর এক-একটা গোত্রে এত বেশি লোকসংখ্যা দেখা যায় নি। একই উপ-ভাষাভাষী লোকসংখ্যার বিচারে চেরোকী আর ওজিবোয়ারা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বাকি সব গোষ্ঠীকে ছাপিয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে আরো বলা যায় যে উত্তর আমেরিকার কোন অঞ্চলে কখনোই একই উপ-ভাষাভাষী লাখ খানেক ইণ্ডিয়ান ছিল না। একমাত্র আজটেক, টেজকুকান আর তলাসকালানদের মধ্যেই এত লোকসংখ্যা থাকলেও

ক। আই-কোই।

১। কো-ইন-চাশ, ২। হা-টাক-ফু-শি, ৩। নান-নি, ৪। ইস-সি।

খ। ইশ-প্যান-ঈ।

১। শা-উ-ঈ, ২। ইশ-প্যান-ঈ, ৩। মিং-কো, ৪। হাশ্-কো-নি, ৫। টান-নি, ৬। হো-চোন-চাব-বা, ৭। না নো-লা, ৮। চুহ-হুলা।

২। ১। আহ-নে-হুই-ইয়া, ২। আব নে-হু-টেহ, ৩। আহ-নে-গা-টাগা-নিহ, ৪। দ্সু-নি-লি-আ-না, ৫। উ-নি-সদা-সদি, ৬। আহ-নী-কা-উইহ, ৭। আহ-নী-মা-হক-নিহ, ৮। আহ-নু-কা-লো-হাই।

আহ-নী দিয়ে বহুবচন বোঝানো হয়।

থাকতে পারত। আবার এদের সম্বন্ধেও বলা যায় যে, সেই স্পেনিশ বিজয়ের যুগে এদের মধ্যেও যে এত বিপুল লোকসংখ্যা থাকা সম্ভব ছিল, তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণ করা যাবে কেমন করে? প্রচুর সংখ্যক গৃহপালিত পশু এবং চাষবাসের উন্নত পদ্ধতি—এই দুটো কারণেই ক্রীক আর চেরোকীদের লোকসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরা এখন আংশিকভাবে সভ্য হয়ে উঠেছে, প্রাচীনকালের গোত্রের জায়গায় গড়ে তুলেছে একটা নির্বাচনমূলক সাংবিধানিক সরকার। এই সরকারের প্রভাবে গোত্রগুলি দ্রুত ভেঙে পড়ছে।

৫) সেমিনোল্‌স্‌

ক্রীকদের থেকেই এই গোষ্ঠীটি গড়ে উঠেছিল। শোনা যায় যে এরাও গোত্রের ভিত্তিতেই সংগঠিত, কিন্তু সে ব্যাপারে কোন বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা যায় নি।

চতুর্থ : পাওনি গোষ্ঠীসমূহ

পাওনিরা গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত কিনা, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। রেভারেণ্ড স্যামুয়েল অ্যালিস, যিনি একসময় এদের মধ্যে মিশনারি হিসাবে কাজ করেছেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে এদের মধ্যে গোত্র আছে বলে তিনি মনে করেন, যদিও এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালান নি তিনি। তাঁর ধারণা এদের মধ্যে এই ছ'টা গোত্র আছে।

১। ভালুক, ২। বীবর, ৩। ঈগল, ৪। মহিষ, ৫। হরিণ, ৬। পেঁচা।

একবার মিসৌরী অঞ্চলে একদল পাওনির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, কিন্তু তখন কোন দোভাষী যোগাড় করতে পারি নি আমি।

মিনিট্যারীস্‌দের গ্রামের কাছাকাছিই হচ্ছে অ্যারিক্যারীদের গ্রাম। এরাই হচ্ছে পাওনিদের নিকটতম জ্ঞাতি। এদের ব্যাপারেও আমাদের একই সমস্যা—নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় নি। এই গোষ্ঠীগুলি এবং কানাডিয়ান নদীর আশেপাশে বসবাসকারী হিউকো ও অন্য দু' তিনটি ছোটখাটো গোষ্ঠী বরাবরই মিসৌরী নদীর পশ্চিম তীরেই বসবাস করেছে এবং এরা সকলেই একটা স্বতন্ত্র মূল ভাষার কথা বলে থাকে। পাওনিদের মধ্যে যদি গোত্র থেকে থাকে, তাহলে অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও তা আছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

পঞ্চম : অ্যালগনকিন গোষ্ঠীসমূহ

আমেরিকান আদিবাসীদের এই বিরাট অংশটির অস্তিত্ব যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন এদের দখলে রকি পর্বতমালা থেকে হাডসন উপসাগর পর্যন্ত এলাকা, সিস্‌কাচুয়ানের দক্ষিণাংশ, সেখান থেকে পূর্ব দিকে আটলান্টিক পর্যন্ত এলাকা, শুধু মোহনাটুকু বাদে সুপিরিয়র হ্রদের উভয় তীর এবং চ্যামপ্লেন হ্রদের নিম্নাঞ্চলে সেণ্ট লরেন্সের উভয় তীর, দক্ষিণদিকে আটলান্টিকের উপকূল বরাবর নর্থ ক্যারোলিনা পর্যন্ত এবং

উইসকনসিন ও ইলিনয় অঞ্চলে মিসিসিপির পূর্ব তীর বরাবর কেনটাকি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। এই বিরাট এলাকার পূর্ব দিকে ইরোকোয়ারা এবং তাদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত গোষ্ঠীগুলি জোর করে প্রবেশ করেছিল এবং এরাই ছিল এই অঞ্চলে কর্তৃত্ব বিস্তারের ব্যাপারে অ্যালগনকিনদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

ষষ্ঠ : গিট্‌চিগ্যামিয়ান[১] গোষ্ঠীসমূহ

১) ওজিবোয়া

ওজিবোয়ারা একই উপ-ভাষায় কথা বলে এবং এরা গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত। এগুলোর মধ্যে তেইশটা গোত্রের নাম আমরা জানতে পেরেছি। এছাড়া আরও গোত্র আছে কি না, তা জানা যায় নি। ওজিবোয়াদের উপ-ভাষায় 'টোটেম' (যা প্রায়শই 'ডোডেইম' হিসেবে উচ্চারিত হয়) শব্দটা দিয়ে কোন গোত্রের প্রতীক বা চিহ্নকে বোঝানো হয়। যেমন, একটা নেকড়ের মূর্তি ছিল নেকড়ে গোত্রের টোটেম। এইজন্যই গোত্রভিত্তিক সংগঠন বোঝাতে মিস্টার স্কুলক্র্যাফট "টোটেমিয় ব্যবস্থা" কথাটা ব্যবহার করেছেন। ঐ ব্যবস্থার প্রত্যেকটা গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করার মত উপযুক্ত অভিধা লাতিন ও গ্রীক ভাষায় না থাকলে স্কুলক্র্যাফটের অভিধাটিকে গ্রহণ করাই যেত। তবে, কোন কোন ক্ষেত্রে অভিধাটাকে ব্যবহার করা যায়। ওজিবোয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত গোত্রগুলো দেখা যায় :

১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। বীবর, ৪। কচ্ছপ (কাদা-কচ্ছপ), ৬। কচ্ছপ (যে কচ্ছপ কামড়ায়), ৬। কচ্ছপ (ছোট কচ্ছপ), ৭। বলগা-হরিণ, ৬। কাদা-খোঁচা, ৯। সারস, ১০। ঘুঘু বাজ, ১১। পালকহীন ঈগল, ১২। পানকৌড়ি, ১৩। পাতিহাঁস, ১৪। পাতিহাঁস, ১৫। সাপ, ১৬। গন্ধগোকুল, ১৭। বেঁজি, ১৮। বক, ১৯। ষণ্ডমুণ্ড, ২০। পোনামাছ, ২১। মাগুর মাছ, ২২। স্টার্জন মাছ, ২৩। বানমাছ।[২]

বংশধারা নির্ণীত হয় পুরুষ-ধারা অনুযায়ী, সন্তানরা তাদের বাবার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে প্রাচীনকালে স্ত্রী-ধারা অনুযায়ীই বংশধারা নির্ণীত হত এবং মাত্র কিছুদিন আগে তা পুরুষ-ধারায় পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমত, যে দেলাওয়রদেরকে সমস্ত অ্যালগনকিন গোষ্ঠীগুলিই নিজেদের বর্গের

১। গি-টুচি অর্থাৎ বড় এবং গা-মে অর্থাৎ হ্রদ—আদিবাসীরা সুপিরিয়র হ্রদকে এই নামেই ডাকে। এই নামটা এবং অন্যান্য বড় হ্রদের নাম ওজিবোয়াদের কাছ থেকে এসেছে।

২। মাই-ঈন-গান, ২। মা-কোয়া, ৩। আহ-মিক, ৪। মে-নো-কা, ৫। মিক-ও-মোহ, ৬। মে-স্কোয়া-ডা-রে, ৭। আহ-ডিক, ৮। চু-এ-স্কোরে-স্কে-ওয়, ৯। ও-জী-জোক, ১০। কা-কাকে, ১১। ও-মে-গী-জে, ১২। মং, ১৩। আহ-আহ-ওশেহ, ১৪। শে-শেবে, ১৫। কে-না-বিগ, ১৬। ওয়া-ঝুশ, ১৭। ওয়া-বে-ঝাজে, ১৮। মুশ-কা-উ-জে, ১৯। আহ-ওয়াহ-সিম-সা, ২০। না-মা-বিন, ২১। ২২। না-মা, ২৩। কে-নো-ঝে।

অন্যতম প্রাচীনতম গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকার করে এবং যাদেরকে অন্য সকলেই "পিতামহ" বলে ডাকে, সেই দেলাওয়ারদের মধ্যে এখনও স্ত্রী-ধারা অনুযায়ীই বংশধারা নির্ণীত হয়। আরও বেশ কিছু প্রাচীন অ্যালগনকিন গোষ্ঠীর মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত আছে। দ্বিতীয়ত, এখনও এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়, যা থেকে বোঝা যায় যে বর্তমান সময়ের থেকে দুই বা তিন প্রজন্ম আগে প্রধান পদের ব্যাপারে উত্তরাধিকার নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী।[১] তৃতীয়ত, আমেরিকানদের ও মিশনারিদের প্রভাব সাধারণত এর বিরোধিতাই করেছে। প্রথম দিককার যে-সব মিশনারি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধ্যান-ধারণা নিয়ে বড় হয়েছিলেন, তাঁদের চোখে সন্তানদেরকে উত্তরাধিকারহীন করানোর এই বংশধারা নির্ণয়পদ্ধতিটা একান্ত অন্যায্য হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছিল। এমনটাও হতে পারে যে ওজিবোয়ারা সহ আরও কয়েকটি গোষ্ঠীতে তাদের শিক্ষার প্রভাবেই ঐ পরিবর্তনটা ঘটেছিল। এবং শেষত, বেশ কিছু অ্যালগনকিন গোষ্ঠীর মধ্যে এখনও বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী। এ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে যে প্রাচীনকালে গ্যানোয়ানিয়ান বর্গের সব গোষ্ঠীর মধ্যে এই নিয়মটাই চালু ছিল এবং গোত্রের প্রাচীন রূপটাও এই নিয়ম অনুযায়ীই গড়ে উঠেছিল।

গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ এবং সম্পত্তি ও পদ গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার-মূলক। তবে বর্তমানে কেউ মারা গেলে স্বগোত্রীয় লোকজনের বদলে তার সন্তানরাই তার অধিকাংশ সম্পত্তি পেয়ে থাকে। মা-র সম্পত্তি ও জিনিসপত্র পায় সন্তানরা, আর সন্তান না থাকলে ঐ মহিলার আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত বোনেরা। একইভাবে মৃত সাকেমের পদে তার ছেলে বসতেই পারে। কিন্তু মৃত সাকেমের অনেকগুলি ছেলে থাকলে নির্বাচনের ভিত্তিতেই নতুন সাকেম ঠিক করা হয়। গোত্রের লোকেরা সাকেমকে শুধু নির্বাচিতই করেন না, তাকে বরখাস্ত করার অধিকারও তাদের হাতে থাকে। বর্তমানে ওজিবোয়াদের লোকসংখ্যা ষোল হাজারের মত, অর্থাৎ প্রতিটা গোত্রে গড়ে প্রায় সাতশ জন করে লোক আছে।

২) পোটাওয়াট্টামি

এই গোষ্ঠীটার মধ্যে নিম্নলিখিত পনেরটা গোত্র আছে ঃ

১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। বীবর, ৪। এল্‌ক্‌ হরিণ, ৫। পানকৌড়ি,

১। কে-ওয়ে-কোনস নামক জনৈক ওজিবোয়া প্রধান ১৮৪০ সালে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল নব্বই বছর। আমার সংবাদদাতা তাঁকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন যে কেন তিনি নিজের পদ থেকে অবসর নিয়ে পদটা নিজের ছেলের হাতে তুলে দিচ্ছেন না। উত্তরে কে-ওয়ে-কোনস বলেন যে তাঁর ছেলে তাঁর জায়গায় বসতে পারবে না, কারণ বংশপরম্পরাক্রমে ঐ পদের উত্তরাধিকারী হচ্ছে তাঁর ভাগ্নে ই-কোয়া-কা-মিক। এই ভাগ্নেটি তাঁর এক বোনের ছেলে। এই কথাটা থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীনকালে এবং কিছুদিন আগে পর্যন্তও বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী। কে-ওয়ে-কানসের কথা থেকে মনে হয় যে ভাগ্নেটি প্রধান পদটা লাভ করবে কোন জন্মগত অধিকারসূত্রে নয়, বরং সে বংশপরম্পরার মধ্যে আছে বলেই ঐ পদটা তার প্রাপ্য আর তাই তার নির্বাচন একান্তই নিশ্চিত।

৬। ঈগল, ৭। স্টার্জন মাছ, ৮। পোনামাছ, ৯। পালকহীন ঈগল, ১০। বজ্র, ১১। খরগোশ, ১২। কাক, ১৩। খ্যাঁকশিয়াল, ১৪। টার্কি-পাখি, ১৫। কালো বাজ।[১] এদের বংশধারা, উত্তরাধিকার এবং বিবাহসংক্রান্ত নিয়ম ঠিক ওজিবোয়াদের মতই।

৩) ওটাওয়া[২]

ওজিবোয়া, ওটাওয়া আর পোটাওয়াট্যামিরা হচ্ছে একই আদি গোষ্ঠীর বিভিন্ন উপ-শাখা। প্রথম যখন এদের কথা জানা যায়, তখন এরা একটা মিত্রসংঘে আবদ্ধ ছিল। ওটাওয়াদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহেই ছিল, কিন্তু সেগুলোর নাম সংগ্রহ করা যায় নি।

৪) ক্রী

এই গোষ্ঠীটার অস্তিত্ব যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন এরা সুপিরিয়র হ্রদের উত্তর-পশ্চিম তীরে বসবাস করত, আর সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল হাডসন উপসাগর পর্যন্ত এবং পশ্চিম দিক বরাবর উত্তর আমেরিকার রেড রিভার পর্যন্ত। পরবর্তীকালে এরা সিস্‌কাচুয়ানদের এলাকা এবং তার দক্ষিণের অঞ্চলগুলো দখল করে। ডাকোটাদের মতই এদের মধ্যেও গোত্রীয় সংগঠনের কোন অস্তিত্ব নেই, তবে সম্ভবত একসময় ছিল। ভাষাগতভাবে এদের সঙ্গে সবথেকে বেশি সাদৃশ্য রয়েছে ওজিবোয়াদের। এই ওজিবোয়াদের সঙ্গে ক্রীদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও চেহারারও প্রচুর সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

সপ্তম : মিসিসিপি গোষ্ঠীসমূহ

পশ্চিম দিকের অ্যাল্‌গন্‌কিন্‌দের এই নামেই অভিহিত করা হয়। এরা উইস্‌কন্‌সিন ও ইলিনয় অঞ্চলে মিসিসিপির পূর্ব তীরে, দক্ষিণদিকে কেনটাকি পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে ইণ্ডিয়ানা পর্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে।

ক) মিয়ামি

মিয়ামিদের নিকটতম জ্ঞাতি হচ্ছে উই, পিয়ান্‌কেশঅ, পিওরিআ এবং কাস্‌কাস্‌-কিয়ারা। প্রাচীনকালে এদের সকলকে একসঙ্গে 'ইলিনয়' হিসেবে অভিহিত করা হত। ঐ-সব গোষ্ঠীগুলোর লোকসংখ্যা এখন খুবই কমে গেছে এবং একটা স্থায়ী কৃষিভিত্তিক জীবনে এসে পড়ার দরুণ এরা নিজেদের প্রাচীন রীতি-নীতিও ত্যাগ করেছে। ঐ-সব

১। মো-আহ, ২। ম-কো, ৩। মাক, ৪। মিস-শা-ওয়া, ৫। ম্যাক, ৬। ক-নৌ, ৭। ন' মা, ৮। ন' মা-পে-না, ৯। ম'-গে-জে-ওয়া, ১০। চে-কোয়া, ১১। ওয়া-বো-জো, ১২। কা-কাগ-শে, ১৩। ওয়েক-শি, ১৪। পন-না, ১৫। ম'-কে-ইশ-শে-কা কাহ। ১৬। ও-টা-ওয়া।

২। উচ্চারিত হয়—ও-টা-ওয়া হিসেবে।

গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আগে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল কিনা জানা যায় নি, তবে সম্ভবত ছিল। মিয়ামিদের মধ্যে নিম্নলিখিত দশটা গোত্র আছে ঃ

১। নেকড়ে, ২। পানকৌড়ি, ৩। ঈগল, ৪। শিক্রে পাখি, ৫। চিতাবাঘ, ৬। টার্কি, ৭। তুষার, ৮। র‍্যাকুন, ৯। সূর্য, ১০। জল।[১]

পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং লোকসংখ্যা হ্রাসের ফলে গোত্রীয় সংগঠন দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এর ধ্বংস যখন শুরু হয়, তখন বংশধারা নির্ণীত হত পুরুষ-ধারা অনুযায়ী, গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ এবং সাকেমের পদ ও সম্পত্তি গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক ছিল।

খ) শাওনী

এটি একটি বিশিষ্ট এবং সুউন্নত গোষ্ঠী। অ্যালগনকিন বংশের এই অন্যতম সর্বোচ্চস্থানীয় গোষ্ঠীটির মধ্যে এখনও গোত্র আছে। প্রাচীন গোষ্ঠীভিত্তিক ব্যবস্থার জায়গায় এরা অবশ্য একটা পৌর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সংগঠনে আছে একজন প্রথম ও একজন দ্বিতীয় সর্দার প্রধান এবং একটা পরিষদ। এই সবকটাই প্রতি-বছর গণ-ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত তেরোটা গোত্র আছে, নানান সামাজিক ও বংশগত কাজের জন্য এই গোত্রগুলোকে এরা আজও ভেঙে দেয়নি ঃ

১। নেকড়ে, ২। পানকৌড়ি, ৩। ভালুক, ৪। শিকারী পাখি, ৫। চিতাবাঘ, ৬। পেঁচা, ৭। টার্কি, ৮। হরিণ, ৯। র‍্যাকুন, ১০। কচ্ছপ, ১১। সাপ, ১২। ঘোড়া, ১৩। খরগোশ।[২]

বংশধারা, উত্তরাধিকার এবং গোত্রের বাইরে বিবাহ করার নিয়ম ঠিক মিয়ামিদের মতই। ১৮৬৯ সালে শাওনীদের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র সাতশ, অর্থাৎ প্রতিটা গোত্রে গড়ে পঞ্চাশের থেকে কিছু বেশি লোক ছিল। একসময় এদের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় তিন-চার হাজার, অর্থাৎ আমেরিকান ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর গড় লোকসংখ্যার থেকেও বেশি।

বাবার গোত্রে বা মায়ের গোত্রে অথবা অন্য কোন গোত্রের মধ্যে কোন শিশুর নামকরণ করার প্রথা চালু আছে শাওনীদের মধ্যে এবং একই প্রথা চালু আছে মিয়ামি, সৌক্ এবং ফক্স-দের মধ্যেও। এ ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ আছে। এটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। আমরা আগেই দেখেছি যে ইরোকোয়াদের প্রতিটা গোত্রের মধ্যে তাদের সদস্যদের জন্য নিজস্ব বিশেষ বিশেষ নাম আছে, যে নামগুলো ব্যবহার

---

১) মো হোয়া-ওয়া, ২। মন-গোয়া, ৩। কেন-ডা-ওয়া, ৪। আহ-পা-কোসে-ই-আ, ৫। কা-নো-জা-ওয়া, ৬। পি-সা-ওয়া, ৭। আহ-সে-পান-না, ৮। মন-না-টো, ৯। কুল-সোয়া, ১০। (জানা যায়নি)।

২) ১। মোয়া-ওয়া, ২। মা-গোয়া, ৩। ম'-কোয়া, ৪। লই-ওয়া-সী, ৫। ম'-সে-পা-সে, ৬। ম'-আথ-ওয়া, ৭। পা-লা-ওয়া, ৮। প্সাকে-দি, ৯। শা-পা-টা, ১০। না-মা-যা, ১১। মা-না-টো, ১২। পে-সা-ওয়া, ১৩। পা-টেক, ১৪। নো-দি।

করার অধিকার আর কোন গোত্রের নেই।[১] এই প্রথাটা সম্ভবত সব গোষ্ঠীর মধ্যেই চালু ছিল। শাওনীদের ক্ষেত্রে এই নামগুলোই ছিল নির্দিষ্ট গোত্রের অধিকারসমূহ লাভ করার পরিচয়পত্র, নাম দিয়েই বোঝা যেত লোকটি কোন্ গোত্রের সদস্য। কোন গোত্রের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত সাকেমরা যেহেতু সর্বক্ষেত্রে সেই গোত্রেরই সদস্য হত, তাই ধরে নেওয়া যায় যে স্ত্রী-ধারায় বংশধারা নির্ণয়ের ব্যাপারটা এ থেকেই শুরু হয়েছিল —প্রথমত, বাবার জায়গায় ছেলের সাকেম হওয়া নিশ্চিত করার জন্য এবং দ্বিতীয়ত, সন্তানদেরকে তাদের বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভে সমর্থ করার জন্য। নামকরণের সময় কোন ছেলেকে তার বাবার গোত্রের নাম দেওয়া হলে সে তার বাবার গোত্রের এবং বংশপরম্পরার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে এই নামকরণের ব্যাপারটা নির্বাচনাভিত্তিক। এ ব্যাপারটায় বাবার কিছু করার নেই। এই দায়িত্বটা গোত্র তুলে দিয়েছিল কয়েকজনের হাতে, যাদের মধ্যে অধিকাংশই থাকত ধাত্রী। সন্তানের নামকরণ করার অধিকারও ছিল এদেরই হাতে। শাওনীদের গোত্রগুলির মধ্যে একটা বিশেষ বন্দোবস্তের ফলে এরাই নবজাতকদের নামকরণ করত। নির্দিষ্ট পন্থায় নামকরণের পর, নামটা যে গোত্রের অন্তর্গত সেই গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত হত নবজাতকটি।

বংশধারা নির্ণয়ের প্রাচীন রীতির নানান নিদর্শন আজও রয়ে গেছে শাওনীদের মধ্যে। এগুলোর মধ্যে একটার কথা আমি শুনেছিলাম, এখানে সেটা উল্লেখ করছি। লা-হো-ওয়েহ্ ছিলেন নেকড়ে গোত্রের একজন সাকেম। মৃত্যুকালে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে তাঁর নিজের ছেলের বদলে তাঁর এক ভাগ্নে যেন তাঁর পদটা লাভ করে। কিন্তু ঐ ভাগ্নেটি (কস-কোয়া-দি) ছিল মাছ গোত্রের আর তাঁর নিজের ছেলে ছিল খরগোশ গোত্রের সদস্য। ফলে এই দুজনের মধ্যে কেউই তাঁর পদে বসার অধিকারী ছিল না। একমাত্র উপায় ছিল ঐ ভাগ্নেটির নাম পরিবর্তন করে তাকে নেকড়ে গোত্রের সদস্য করে নেওয়া, কারণ নেকড়ে গোত্রে সাকেমের পদ উত্তরাধিকারমূলক ছিল। তাঁর অন্তিম ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানানোর জন্য তাঁর মৃত্যুর পর ভাগ্নেটির নাম রাখা হয় টেপ-আ-টা-গো-দি। এটা নেকড়ে গোত্রের একটা নিজস্ব নাম। এইভাবে নাম পাল্টে তাকে সাকেম পদে নির্বাচিত করা হয়। এ-রকম শিথিলতা গোত্রীয় সংগঠনের ভাঙনকেই সূচিত করে। কিন্তু এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে অদূর অতীতেও শাওনীদের বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী।

৩। সৌক্ এবং ফক্স। এই দুটো গোষ্ঠী মিলিত হয়ে একটা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত গোত্রগুলো দেখা যায়ঃ

১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। হরিণ, ৪। এলক, ৫। বাজপাখি, ৬। ঈগল,

---

১) প্রতিটি গোত্রে নামগুলো গোত্রকেই চিহ্নিত করত। যেমন, সৌক ও ফক্সদের মধ্যে 'দীর্ঘ শৃঙ্গ' নামটা হরিণ গোত্রের নিজস্ব নাম, 'কালো নেকড়ে' নামটা নেকড়ে গোত্রের নিজস্ব। ঈগল গোত্রের কয়েকটা নামের নমুনা এ-রকমঃ কা-পো-না, অর্থাৎ "নীড়মুখী ঈগল", পে-আ-টা-না-কা-হক, অর্থাৎ "বৃক্ষশাখার ওপরে উড্ডীয়মান ঈগল"।

৭। মাছ, ৮। মহিষ, ৯। বজ্র, ১০। হাড়, ১১। খ্যাঁকশিয়াল, ১২। সমুদ্র, ১৩। স্টার্জন মাছ, ১৪। বড় গাছ।[১]

এদের বংশধারা, উত্তরাধিকার এবং গোত্রের বাইরে বিবাহ করা সংক্রান্ত নিয়ম ঠিক মিয়ামিদের মতই। ১৮৬৯ সালে এদের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র সাতশ জন, অর্থাৎ প্রতিটা গোত্রে গড়ে পঞ্চাশ জন করে লোক ছিল। এখনও পর্যন্ত যে কটা গোত্র টিকে আছে, সেগুলোর সংখ্যা থেকেই বোঝা যায়, যে দুশো বছর আগেও আরও প্রচুর সংখ্যক গোত্র ছিল।

৪। মেনোমিনী এবং কিকাপু। এই গোষ্ঠীগুলো পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল নয়। এরা গোত্রের ভিত্তিতেই সংগঠিত, কিন্তু সেইসব গোত্রের নাম আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি। মেনোমিন গোষ্ঠীর জনৈক সদস্য আন্তোইন গুকি ১৮৫৯ সালে আমাকে যা বলেছিলেন, তা থেকে ধরে নেওয়া যায় যে এই গোষ্ঠীটার মধ্যে কিছুদিন আগে পর্যন্তও বংশধারা নির্ণয় করা হত স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী। উত্তরাধিকারের নিয়ম সম্পর্কে আমার প্রশ্নের উত্তরে আন্তোইন বলেছিলেন ঃ "আমি মারা গেলে আমার ভাইরা আর মামারা আমার স্ত্রী আর সন্তানদের হাত থেকে আমার সম্পত্তি কেড়ে নেবে। আমরা তো আশা করি যে আমাদের সম্পত্তি-টম্পত্তি আমাদের সন্তানরাই যেন পায়, কিন্তু তার কোন নিশ্চয়তা নেই। পুরনো নিয়ম অনুযায়ী আমার সম্পত্তি আমার নিকটতম জ্ঞাতিরাই পাবে। জ্ঞাতি বলতে কিন্তু আমার সন্তানরা নয়, পাবে আমার ভাগ্নেরা, বোনেরা আর মামারা।" এ থেকে বোঝা যায় যে গোত্রের মধ্যে সম্পত্তি ছিল উত্তরাধিকারমূলক, তবে তা শুধু স্ত্রী-ধারার জ্ঞাতিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল।

অষ্টম ঃ রকি মাউন্টেন গোষ্ঠীসমূহ

(ক) রক্তমাথা ব্ল্যাকফীট।

এই গোষ্ঠীর মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটা গোত্র আছে ঃ
১। রক্ত, ২। মৎস্যখাদক, ৩। ভোঁদড়, ৪। বিলুপ্ত পশু, ৫। এলক।[২]
বংশধারা নির্ণীত হয় পুরুষ-ধারা অনুযায়ী, কিন্তু গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ অনুমোদিত নয়।

---

১) ১। মো-হোয়া-উইস-মো-আক ২। মা-কুইস মো-জিক, ৩। পা-শা-গা-সা-উইস-মো-আক, ৪। মা-শা-ওয়া-আক, ৫। কা-কা-কুইস-মো-আক, ৬। পা-মিস-মো-আক, ৭। না-মা-সিস-মো-আক, ৮। না-নাম-সাস-মো-আক, ৯। না/না/মা/কিউ/আক, ১০। আহ/কুহ/নে/ন্যাক, ১১। ওয়া/কো/আ/উইস/সো/জিক, ১২। কা/চে/কোনে/আ/উই/সো/আক, ১৩। মা/শে/মা/টাক।

২) ১। কি-নো, ২। মা-মে-ও-ইয়া, ৩। আহ-পে-কি, ৪। আ-নে-পা, ৫। পো-নো-কিক্স।

(খ) পিগান ব্ল্যাকফীট।

এই গোষ্ঠীতে নিম্নলিখিত আটটা গোত্র আছে ঃ

১। রক্ত, ২। ভোঁদড়, ৩। ওয়েব (web) মেদ, ৪। অন্তঃস্থ মেদ, ৫। জাদুকর, ৬। হাসিহীন, ৭। উপবাসী, ৮। অর্ধমৃত মাংস।[১]

বংশধারা নির্ণীত হয় পুরুষ-ধারা অনুযায়ী, গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ। উপরোল্লিখিত নামগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটাই যেন ঠিক গোত্রের উপযুক্ত নয়, বরং এগুলো যেন এক-একটা দলকেই বোঝায়। তবে যেহেতু এই তথ্যগুলো যোগ্য দোভাষীর মাধ্যমে (মিস্টার এবং মিসেস আলেকজান্দার কুলবার্টসন; মিসেস কুল-বার্টসন হচ্ছেন একজন ব্ল্যাকফুট নারী) সরাসরি ব্ল্যাকফীটদের কাছ থেকেই সংগৃহীত, তাই আমি এগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য বলেই মনে করি। এমনটাও হতে পারে যে কখনো কখনো গোত্রের আসল নামটা চাপা পড়ে গেছে তার চালু নামগুলোর আড়ালে।

নবম ঃ আটলান্টিক গোষ্ঠীসমূহ

ক) দেলাওয়ার।

আগেই বলা হয়েছে যে নিজেদের অস্তিত্বের দীর্ঘ সময়কালের বিচারে দেলাওয়াররা হচ্ছে অ্যাল্‌গন্‌কিন্‌ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটা প্রাচীনতম গোষ্ঠী। এদের অস্তিত্ব যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন এরা বসবাস করত দেলাওয়ার উপসাগরের চারপাশে এবং তার উত্তর দিকের কিছু এলাকায়। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি গোত্র আছে ঃ

১। নেকড়ে। টুক-মিট। গোল থাবা।

২। কচ্ছপ। পোক্‌-কু-আন-গো। বুকে হাঁটা।

৩। টার্কি। পুল-লা-কুক। চর্বন করে না।

এই উপ-শাখাগুলো অনেকটা ভ্রাতৃত্বের মত, কারণ এদের প্রতিটার মধ্যে আবার বারোটা করে উপ-গোত্র আছে আর এই উপ-গোত্রগুলোর প্রতিটার মধ্যেই গোত্রের কোন-না-কোন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়।[২] নামগুলো এক-একজন ব্যক্তির এবং সবক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নামগুলো আসলে এক-একজন নারীর। এই ব্যাপারটা বেশ অস্বাভাবিক বলে আমি এটা নিয়ে কানসাসের দেলাওয়ার মহল্লায় যথাসম্ভব পুঙ্খানু-পুঙ্খ পর্যবেক্ষণ চালাই। সেটা ১৮৬০ সালের কথা। এ কাজে আমাকে সাহায্য

---

১) ১। আহ-আহ-পি-টা-পে, ২। আহ্‌-পে-কি-ই, ৩। ইহ্‌-পো-সে-মা, ৪। কা-কা-পো-ইয়া, ৫। মো-টা-টো-সিস, ৬। কা-টি-ইয়া-ইয়ে-মিক্স, ৭। কা-টা-গা-মা-নে, ৮। ই-কো-টো-পিস টাক্সে।

২। নেকড়ে ঃ টুক-সিট।

১। মা-আ-গ্রীট, বড় পা, ২। উঈ-সো-হেট-কে, হলুদ গাছ, ৩। পা-সা-কুন-আ-মন, শস্য চয়ন, ৪। উই-ইয়ার-নিহ-কা-টো, যন্ত্র দাত্রী, ৫। টুশ-ওয়ার-কা-মা, নদীর ওপারে, ৬। ও-লাম-আ-নে

করেন উইলিয়াম অ্যাডমেস্ নামক জনৈক শিক্ষিত দেলাওয়ার। এইসব উপ-শাখার উৎস খুঁজে বার করা সম্ভব হয় নি বটে, তবে আমাদের মনে হয়েছে যে এইসব উপ-শাখার থেকেই গোত্রগুলো সৃষ্টি হয়েছে। গোত্রগুলোর মধ্যে থেকে এদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের স্বাভাবিক উদ্ভবের ব্যাপারটাকেও বোঝা যায়।

দেলাওয়ারদের বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী, আর এ থেকে মনে হয় যে প্রাচীনকালে সমস্ত অ্যালগনকিন্ গোষ্ঠীর মধ্যেই স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয় করা হত। সাকেমের পদ গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক, কিন্তু গোত্রের সদস্যরা সাকেমকে নির্বাচিত করে। তাকে নির্বাচিত করা ও বরখাস্ত করা—দুটো অধিকারই থাকে গোত্রের সদস্যদের হাতে। গোত্রের মধ্যে সম্পত্তিও উত্তরাধিকারমূলক। ঐ তিনটি আদি গোত্রের নারী-পুরুষরা প্রাচীনকালে নিজেদের গোত্রের কাউকে বিবাহ করতে পারত না। কিন্তু বর্তমানে এই নিষেধাজ্ঞা শুধু উপ-গোত্রগুলোর মধ্যেই প্রযোজ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে নেকড়ে গোত্রটা এখন আংশিকভাবে ভ্রাতৃত্ব সংগঠনে পরিণত হয়েছে, সেই গোত্রের একই নামবিশিষ্ট নারী-পুরুষরা পরস্পরকে বিবাহ করতে পারে না, কিন্তু অন্য নামের পুরুষকে তারা বিবাহ করতে পারে। বাবার গোত্রের কোন নাম অনুযায়ী সন্তানদের নামকরণ করাটা দেলাওয়ারদের মধ্যেও চালু আছে। ফলে, শাওনী আর মিয়ামিদের বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা যে বিভ্রান্তির সম্মুখীন হই, সেই বিভ্রান্তি দেখা দেয় এদের ক্ষেত্রেও। আমেরিকান সভ্যতা এবং তাদের সঙ্গে আদান-প্রদানের ফলে ইণ্ডিয়ানদের প্রতিষ্ঠানগুলো একটা ধাক্কা খাচ্ছে আর এই ধাক্কায় ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব জীবনাচরণ পদ্ধতি ভেঙে পড়ছে একটু একটু করে।

পদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দৃষ্টান্তগুলো বংশধারা সম্পর্কে আদিবাসীদের নিয়মকে

সিঁদুর, ৭। পুন-আর-ইউ, আগুনের পাশে দণ্ডায়মান কুকুর, ৮। কুইন-বক-চা, দীর্ঘদেহী, ৯। মুন-হার-টার-নে, খনন কর, ১০। ননু, নদী আনয়ন, ১১। লং-আশ-হার-কার-টো, গাছের গুঁড়ি সাফ করা, ১২। মও-সু, একাকী আনয়ন।

২। কচ্ছপ ঃ পোক-কু-আন-গো।

১। ও-কা-হো-কি, শাসক, ২। টা-কো-অং-ও-টো, উচ্চ তীরভূমি, ৩। সী-হার-অং-ও-টো, পাহাড় থেকে নামানো, ৪। ওলে-হার-কার-মে-কার-টো, নির্বাচক, ৫। মা-হার-ও-লুক-টি, সাহসী, ৬। টল-কি-পা-কুইস-ই, সবুজ পাতা, ৭। টুং-আল-আ-সি, ক্ষুদ্রতম কচ্ছপ, ৮। উই-লাল-আং-সি, ছোট কচ্ছপ, ৯। লী-কুইন-আ-ই, যে কচ্ছপ কামড়ায়, ১০। কুইস-এইস-কীস-টু, হরিণ।

বাকি দুটো উপ-গোত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

৩। টার্কি ঃ পুল-লা-কুক।

১। মো-হার-আ-লা, বড় পাখি, ২। লে-লে-ওয়া-ইউ, পাখির চিৎকার, ৩। মু-কোয়াং-ওয়া-হো-কি, চোখের যন্ত্রণা, ৪। মু-হার-মো-উই-কার-নু, পথ অংকন, ৫। ও-পিং-হো-কি, ওপোসামদের এলাকা, ৬। মাহ-হো উই-কা-কেন, বুড়ো হাড়, ৭। টং ও-না-ও-টো, গাছের গুঁড়িতে ছিদ্র করা, ৮। নুল-আ-মার-লার-মো, জলে বাস করা, ৯। মাহ-স্কেণ্ট-হার-নে, কন্দ খনক, ১০। মাহ-কার্ম-হাক-সে, লাল মুখ, ১১। কু-ওয়া-হো-কে, পাইন বনাঞ্চল, ১২। উ-চাক-হ্যামু, মৃত্তিকা খনক।

সবথেকে ভালোভাবে উন্মোচিত করে। জনৈক দেলাওয়ার মহিলা আমাকে বলেছিলেন যে তিনি এবং তাঁর সন্তানরা নেকড়ে গোত্রের সদস্য আর তাঁর স্বামী হচ্ছেন কচ্ছপ গোত্রের। এই কথা বলে তিনি বলেছিলেন যে কচ্ছপ গোত্রের সর্দার-প্রধান বা সাকেম ক্যাপ্টেন কেচাম (টা-হোয়ে-লা-না) মারা যাওয়ার পর তাঁর এক বোনের ছেলে জন কনার (টা-টা-নে-শা) পরবর্তী সাকেম হয়। এই জন কনার ছিল কচ্ছপ গোত্রের লোক। মৃত সাকেমের এক ছেলে ছিল, কিন্তু সে অন্য গোত্রের সদস্য ছিল বলে বাবার পদে বসতে পারে নি। ইরোকোয়াদের মতই দেলাওয়ারদের মধ্যেও পদের উত্তরাধিকার বর্তাতো এক ভাইয়ের কাছ থেকে আরেক ভাইয়ের ওপর অথবা মামার কাছ থেকে ভাগ্নের ওপর, কারণ এদের বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী।

খ) মান্‌সী।

মান্‌সীরা হচ্ছে দেলাওয়ারদেরই একটা প্রশাখা। এদের মধ্যেও ঐ তিনটি গোত্রই দেখা যায়—নেকড়ে, কচ্ছপ আর টার্কি। বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী, গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ এবং সাকেমের পদ ও সম্পত্তি গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক।

গ) মোহেগান।

কেনেবক নদীর দক্ষিণে বসবাসকারী সমস্ত নিউ ইংল্যান্ড ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর—মোহেগানরাও যার অন্তর্ভুক্ত—পরস্পরের ভাষার মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য ছিল এবং এরা একে অপরের উপ-ভাষা বুঝতেও পারত। মোহেগানরা গোত্রের ভিত্তিতেই সংগঠিত ছিল। এ থেকে অনুমান করা যায় যে পিকোট, ম্যারাগানসেট ও অন্যান্য ছোটখাটো দলগুলোও এভাবেই সংগঠিত ছিল এবং এদের গোত্রগুলোও ছিল মোহেগানদের মতই। মোহেগানদের মধ্যে দেলাওয়ারদের সদৃশ তিনটি ভ্রাতৃত্ব দেখা যায়—নেকড়ে, কচ্ছপ ও টার্কি। এই ভ্রাতৃত্বগুলোর মধ্যে কতকগুলো করে গোত্র আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে দেলাওয়ার ও মান্‌সীদের সঙ্গে এদের বংশগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এ থেকে আরও জানা যায় যে বিভাজনের কোন প্রক্রিয়ায় একটা আদি গোত্র ভেঙে সৃষ্টি হয়েছিল বেশ কয়েকটা গোত্র, যে গোত্রগুলো আবার পুনর্মিলিত হয়েছিল একটা ভ্রাতৃত্বের মধ্যে। গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কিভাবে উদ্ভূত হয় ভ্রাতৃত্ব সংগঠন—তা-ও জানা যায় মোহেগানদের অভিজ্ঞতা থেকে। একটা আদি গোত্রের বিভাজনের প্রমাণকে মোহেগানরা যত চমৎকারভাবে রক্ষা করেছে, তেমনভাবে আর কোন আমেরিকান আদিবাসী গোষ্ঠী তা রক্ষা করেনি বললেই চলে। আমেরিকান আদিবাসীদের অন্য যে-কোন গোষ্ঠীর চেয়ে মোহেগানদের ভ্রাতৃত্বগুলো অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য, কারণ প্রত্যেকটা গোত্রই এই ভ্রাতৃত্বগুলোর অন্তর্ভুক্ত এবং এদের শ্রেণীবিভাগের জন্য ভ্রাতৃত্বের কথা উল্লেখ করা একান্তই প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইরোকোয়াদের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, তার থেকে অনেক কম জানতে পেরেছি এই মোহেগানদের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে। এদের ভ্রাতৃত্বগুলো এ-রকম ঃ

ক। নেকড়ে ভ্রাতৃত্ব। টুক্-সে-টাক্।

১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। কুকুর, ৪। ওপোসাম্।

খ। কচ্ছপ ভ্রাতৃত্ব। টোন্-বা-ও।

১। ছোট কচ্ছপ, ২। কাদা কচ্ছপ, ৩। বড় কচ্ছপ, ৪। হলুদ বানমাছ।

গ। টার্কি ভ্রাতৃত্ব।

১। টার্কি, ২। সারস, ৩। মুরগীছানা।[১]

বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী, গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ এবং সাকেমের পদ গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক—পদটা হয় এক ভাইয়ের কাছ থেকে অন্য ভাইয়ের ওপর অথবা মামার কাছ থেকে ভাগ্নের ওপর বর্তায়। কান্সাসে জনৈক ন্যারাগান্সেট মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে পিকট্ আর ন্যারাগানসেট্দের মধ্যেও বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী।

ঘ) অ্যাবেনাকি।

এই গোষ্ঠীটির নাম 'ওয়া-বে-না-কী', যার অর্থ হল 'উদীয়মান সূর্যের দেশের মানুষ'।[২] কেনেবেক্ নদীর দক্ষিণ তীরের নিউ ইংল্যাণ্ড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক যতটা ঘনিষ্ঠ, তার থেকে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মিক্ম্যাক্দের সঙ্গে। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত চোদ্দটা গোত্র আছে ঃ

১। নেকড়ে, ২। বনবিড়াল (কালো), ৩। ভালুক, ৪। সাপ, ৫। বুটিদার পশু, ৬। বীবর, ৭। বল্গা হরিণ, ৮। স্টার্জন মাছ, ৯। গন্ধগোকুল, ১০। ঘুঘু বাজ, ১১। কাঠবিড়ালী, ১২। বুটিদার ব্যাঙ, ১৩। সারস, ১৪। সজারু।[৩]

বর্তমানে এদের বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী। গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ প্রাচীনকালে নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন এই নিষেধাজ্ঞা প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে। সাকেমের পদ গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক। লক্ষ করা দরকার যে উপরোক্ত গোত্রগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি ওজিবোয়াদের গোত্রগুলোর সদৃশ।

১। ক। টুক্-সে-টাক্

১। নে-হ-জা-ও, ২। মা-কোয়া, ৩। নু-ডে-ইয়া-ও, ৪। ওয়া-পা-কোয়ে।

খ। টোন্-বা-ও

১। গাক-পো-মিউট, ২। ৩। টোন-বা-ও, ৪। উই-স-মা-উন।

গ। টার্কি

১। না-আহ-মা-ও, ২। গা-কো, ৩। .....।

২। আমার "সিস্টেম্স অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি" রচনায় প্রধান প্রধান ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর আদিবাসী নাম এবং সেগুলোর অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

৩। ১। মাল্সি-সাম, ২। পিস-সাহ, ৩। আহ-ওয়েহ-মুস, ৪। শুক, ৫। আহ-লাংক-মু, ৬। টা মা কোয়া, ৭। মা গাহ-লে-লু, ৮। কা-বাহ-সেহ, ৯। মুস-কোয়া-সাহ, ১০। ক'-চে-গা-গংগো, ১১। মেহ-কো আ, ১২। চে-গোয়া-লিস, ১৩। কুস-কু, ১৪। ম'-ড-ওয়েহ-সুস্।

দশম : অ্যাথাপ্যাস্‌কো-অ্যাপাশে গোষ্ঠীসমূহ

হাড্‌সন উপসাগর অঞ্চলের অ্যাথাপ্যাস্‌কানরা এবং নিউ মেক্সিকোর অ্যাপাশেরা হচ্ছে একটা মূল গোষ্ঠীরই দুটো শাখা। এদের মধ্যে গোত্র আছে কিনা, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। ১৮৬১ সালে আমি অ্যাথাপ্যাস্‌কানদের এলাকায় গিয়েছিলাম। তখন খরগোশ আর লাল ছুরি অ্যাথাপ্যাস্‌কানদের কাছ থেকে এই ব্যাপারটা জানার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু উপযুক্ত দো-ভাষীর অভাবে আমার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবু আমার ধারণা গোত্রভিত্তিক ব্যবস্থা থেকে থাকলে অপ্রতুল অনুসন্ধানেও তার কিছু স্বাক্ষর চোখে পড়তোই। প্রয়াত রবার্ট কেনিকট্‌ আমাকে সাহায্য করার জন্য একই প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন আ-চা-ও-টেন-নে বা দাস হ্রদের অ্যাথাপ্যাস্‌কানদের মধ্যে, কিন্তু তিনিও তেমন সফল হতে পারেননি। বিবাহ এবং সাকেম পদের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে কিছু বিশেষ বিধি-বিধানের কথা জানতে পেরেছিলেন তিনি, যেগুলো গোত্রের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। ইউকন্‌ নদী অঞ্চলের কাচিন্‌-রা (লুচক্স) আসলে অ্যাথাপ্যাস্‌কান গোষ্ঠীরই লোক। আমার কাছে লেখা একটি চিঠিতে প্রয়াত জর্জ গিবস লিখেছিলেন : "ম্যাকেঞ্জী নদী অঞ্চলের কোর্ট সিম্পসনের এক ভদ্রলোক আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে লুচক্স বা কাচিন্‌দের মধ্যে সমাজের তিনটি ধাপ বা শ্রেণী আছে—বোঝাই যাচ্ছে তিনি ব্যাপারটাকে টোটেমের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন, যদিও টোটেমের মর্যাদা সম্ভবত অন্যরকম। তারপর তিনি লিখেছিলেন যে কোন পুরুষ তার নিজের শ্রেণীর কাউকে বিবাহ করে না, বিবাহ করে অন্য কোন শ্রেণীর কোন নারীকে। উচ্চতম শ্রেণীর কোন প্রধান নিম্নতর শ্রেণীর কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে, তার জন্য তাকে জাত খোয়াতে হয় না। সন্তানরা তাদের জননীর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর একই শ্রেণীভুক্ত মানুষরা কখনও পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না।"

উত্তর-পূর্ব উপকূল অঞ্চলের কোলুশে-দের সঙ্গে অ্যাথাপ্যাস্‌কানদের কিছুটা ভাষাগত সাদৃশ্য আছে। এই কোলুশেদের মধ্যে গোত্রীয় সংগঠনের অস্তিত্ব আছে। মিঃ গ্যালটিন বলেছেন যে এরা "ঠিক আমাদের এই ইণ্ডিয়ানদের মতই। এরাও গোষ্ঠী বা শ্রেণীতে বিভক্ত। মিঃ হেল্‌-এর মতে, এই বৈশিষ্ট্যটা ইণ্ডিয়ান বা ওরেগনদের মধ্যে দেখা যায় না। এদের গোষ্ঠীগুলোর [গোত্রগুলোর] নাম রাখা হয়েছে পশু-পাখির নামে। যথা—ভালুক, ঈগল, কাক, শুশুক আর নেকড়ে……। উত্তরাধিকার নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী, মামার কাছ থেকে অধিকার বর্তায় ভাগ্নের ওপর। শুধু মুখ্য-প্রধান এই নিয়মের আওতায় পড়েন না। এই মুখ্য-প্রধানই সাধারণত এদের মধ্যে সব-থেকে বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন"।[১]

১। আমেরিকান এথনোলজিক্যাল সোসাইটির অনুবাদ, ২, ভূমিকা, ১০০৫৯।

কোলুশেরা ছাড়াও এই অঞ্চলের আরও কয়েকটা গোষ্ঠীর মধ্যেও গোত্রীয় সংগঠনের অস্তিত্ব আছে। আমার কাছে লেখা একটা চিঠিতে মিঃ গিবস বলেছেন, "পাজেট্‌স্‌ সাউণ্ড এলাকা থেকে চলে আসার আগে উত্তরাঞ্চলের ইণ্ডিয়ানদের তিনটি প্রধান বংশের লোকজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। এরা উত্তর-পশ্চিম উপকূলের বাসিন্দা। ভ্যাঙ্কুবার দ্বীপপুঞ্জের উর্ধ্বাঞ্চল থেকে শুরু করে রুশ সীমানা পর্যন্ত এবং এস্কিমোদের অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এদের এলাকা। ঐ লোকজনদের কাছ থেকে আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে অন্তত ঐ তিনটি বংশের মধ্যে টোটেমীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব আছেই। যে বংশগুলোর কথা আমি বলছি, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুরু করলে তারা যথাক্রমে এই এই বংশ—(ক) টলিংকেট, এদের একটা দলের নাম অনুসারে সাধারণত এদেরকে স্টাইকিনস বলা হয়, (খ) টলাইডাস, (গ) চিমসিয়ানস, যাদেরকে উইস নামে অভিহিত করেছেন গ্যালাটিন। এদের সকলকার মধ্যেই চারটি করে টোটেম বা কুলপ্রতীক আছে—তিমি, নেকড়ে, ঈগল আর কাক। একই টোটেমভুক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, এমনকি ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা বংশের একই টোটেমভুক্ত নারী-পুরুষরাও পরস্পরকে বিবাহ করতে পারে না। লক্ষণীয় ব্যাপার হল এই যে, এইসব জাতিগুলো কিন্তু একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন বংশ হিসেবে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে এদের ভাষাগুলো আসলে পরস্পরের থেকে একেবারেই আলাদা, এগুলোর মধ্যে কোনরকম বোধগম্য সাদৃশ্য নেই। আরও পরবর্তীকালে মিঃ ডাল আলাস্কা সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লেখেন, তাতে তিনি মন্তব্য করেন যে, "টলিংকেটরা চারটি টোটেমে বিভক্ত : দাঁড়কাক (ইয়েহি), নেকড়ে (কানুখ), তিমি আর ঈগল (চেথল) ……। এক টোটেমের সদস্যরা অন্য টোটেমের সদস্যদের সঙ্গে বিবাহ করতে পারে এবং সন্তানরা সাধারণত মায়ের টোটেমের অন্তর্ভুক্ত হয়"।[১]

মিঃ হুবার্ট এইচ ব্যানক্রফট এদের সংগঠন সম্বন্ধে আরও বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে এদের মধ্যে দুটো ভ্রাতৃত্ব আছে এবং প্রতিটা ভ্রাতৃত্বের মধ্যেই আছে বিভিন্ন গোত্র। টলিংকেটদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে "এই জাতিটা দুটো বিভাগ বা উপজাতিতে বিভক্ত। একটা হল নেকড়ে, আর একটা হল দাঁড়কাক। দাঁড়কাক অংশটার মধ্যে আবার নানান উপ-শাখা আছে—ব্যাঙ, হংসী, সালমাছ, পেঁচা আর স্যামন মাছ। নেকড়ে অংশটার মধ্যে আছে ভালুক, ঈগল, ডলফিন, হাঙর আর অ্যালকা……। একই শাখার গোষ্ঠীগুলোর সদস্যরা পরস্পরকে বিবাহ করতেও পারে না। নেকড়ে গোষ্ঠীর তরুণ যোদ্ধাকে তার জীবনসঙ্গিনী খুঁজে নিতে হয় দাঁড়কাক গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে।"[২]

এস্কিমোরা গ্যানোয়ানিয়ান বর্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। গ্যানোয়ানিয়ান বর্গের তুলনায় এই

১। "আলাস্কা অ্যাণ্ড ইটস রিসোর্সেস", পৃঃ ৪১৪।

২। "নেটিভ রেসেস অফ দ্য প্যাসিফিক", ১, ১০৯।

এস্কিমোরা আমেরিকা মহাদেশে বসবাস করতে শুরু করেছে অনেক পরবর্তীকালে। এদের মধ্যে কোন গোত্রও নেই।

দ্বাদশ ঃ স্যালি, সোহাপটিন এবং কুইন গোষ্ঠীসমূহ

কলম্বিয়া উপত্যকা অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে উপরোক্ত গোষ্ঠীগুলোই হচ্ছে মুখ্য গোষ্ঠী। এদের মধ্যে কোন গোত্রীয় সংগঠন নেই। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ হোরেশিও হেল এবং প্রয়াত জর্জ গিবস, যাঁরা উভয়েই এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা এদের মধ্যে গোত্রীয় সংগঠনের কোনরকম চিহ্নই খুঁজে পাননি। এরকমটা মনে করার যথেষ্ট যুক্তিসম্মত কারণ আছে যে এই বৈশিষ্ট্যময় অঞ্চলটাই ছিল গ্যানোয়া-নিয়ান বর্গের আদি বাসস্থান। এইখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাদের দেশান্তর, ছড়িয়ে পড়েছিল তারা মহাদেশের উভয় অংশেই। তাই মনে হয় যে এদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল, তারপর আস্তে আস্তে তা ভাঙতে শুরু করে এবং অবশেষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ত্রয়োদশ ঃ শোশোনী গোষ্ঠীসমূহ

টেক্সাসের কোমানশেরা, ইউট গোষ্ঠীগুলো, বনাক, শোশোনী এবং অন্য কিছু গোষ্ঠী এই শাখার অন্তর্গত। ১৮৫৯ সালে ম্যাথু ওয়াকার নামক জনৈক ওয়ানডোট বর্ণসঙ্কর আমাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি কোমানশেদের মধ্যে একসময় বসবাস করেছিলেন এবং কোমানশেদের মধ্যে এই গোত্রগুলো আছে ঃ

১। নেকড়ে, ২। ভালুক, ৩। এলক, ৪। হরিণ, ৫। ইঁদুর, ৬। কৃষ্ণসারমৃগ।

কোমানশেদের মধ্যে গোত্র থেকে থাকলে ধরে নেওয়া যায় যে এই শাখার অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও গোত্রের অস্তিত্ব আছে।

নিউ মেক্সিকোর উত্তরাংশের উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত আমাদের পর্যালোচনা এখানেই শেষ। ইউরোপিয়ানরা যখন এদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে, তখন উল্লিখিত গোষ্ঠীগুলোর অধিকাংশই ছিল বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থায় এবং বাকিরা ছিল বন্য যুগের উচ্চ অবস্থায়। এদের প্রায় সকলকার মধ্যেই গোত্রীয় সংগঠনের অস্তিত্ব আছে। এ থেকে মনে হয় যে প্রাচীনকালেও এদের সকলকার মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল এবং বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী। এদের ব্যবস্থাটা ছিল পুরোপুরিই সামাজিক, তার প্রাথমিক একক ছিল গোত্র, আর তারপর একে একে ছিল ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠী এবং মিত্রসঙ্ঘ। একীভবন ও পুনঃ-একীভবনের এই চারটি ধারাবাহিক স্তর থেকেই শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় বিকাশের ব্যাপারে এদের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাটার কথা জানতে পারা যায়। আর্য ও সেমিটিকদের প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলো যখন বর্বর অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল, তখন তাদের মধ্যেও এই চারটি ধারাবাহিক স্তরের অস্তিত্ব ছিল। কাজেই ধরে নেওয়া যায় প্রাচীন সমাজে এই

BanglaBook.org

ব্যবস্থাটা প্রায় সর্বত্রই চালু ছিল এবং সম্ভবত একই উৎস থেকে গড়ে উঠেছিল এটা। পুনালুয়া দলগুলোই (পরিবার সংক্রান্ত ধারণার বিকাশের প্রসঙ্গে আলোচনার সময় এই পুনালুয়া দলের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে) জন্ম দিয়েছিল গোত্রের। স্পষ্টত একটাই পুনালুয়া দলের মধ্যে আর্য, সেমিটিক, উরালিয়ান, তুরানিয়ান ও গ্যানোয়ানিয়ান বর্গগুলো গড়ে উঠেছিল নানান গোত্র নিয়ে। এইসব গোত্রের মধ্যে থেকেই সকলের জন্ম হয়েছিল এবং একসময় তারা পরিণত হয়েছিল আলাদা আলাদা বর্গে। ভবিষ্যতের গবেষণায় এইসব তথ্যকে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করলে এই সিদ্ধান্তটাকে মেনে নিতেই হবে বলে মনে করি আমি। ঐ চারটি ধারাবাহিক স্তর মানবসমাজের কাঠামোকে ধরে রেখেছে বন্য যুগের শেষার্দ্ধ থেকে পুরো বর্বর যুগ এবং সভ্যতার প্রথম যুগ পর্যন্ত। এই ধরণের একটা সাংগঠনিক ক্রম কখনোই আকস্মিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। আগে থেকেই বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে থেকে স্বাভাবিক বিকাশের প্রক্রিয়াতেই শুধু এই ধরণের একটা ক্রম গড়ে উঠতে পারে। যুক্তিসম্মতভাবে এবং যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করলে মনে হয় যে, মানবজাতির যে-সব বর্ণের মধ্যে গোত্রভিত্তিক সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল, তাদের সকলকার উদ্ভব হয়েছিল একই উৎস থেকে।

চতুর্দশ : ভিলেজ ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীসমূহ

(ক) মোকি পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ানরা।

মোকি গোষ্ঠীগুলো নিজেদের প্রাচীন যৌথ আবাসগুলোতেই এখনও নির্বিবাদে বসবাস করে থাকে। এ-রকম যৌথ আবাস সাতটা আছে। আরিজোনায় লিট্‌ল কলোরাডোর কাছাকাছি এগুলি অবস্থিত, যে অঞ্চলটা একদা নিউ মেক্সিকোর অংশবিশেষ ছিল। এদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলো আজও সক্রিয়ভাবেই টিকে আছে এবং ইওরোপিয় আবিষ্কারের যুগে জুনি থেকে কাজ্‌কো পর্যন্ত এলাকা জুড়ে ভিলেজ ইণ্ডিয়ানরা যে ধরনের জীবনযাপন করত, সেইভাবেই আজও জীবনযাপন করে চলেছে এই মোকি গোষ্ঠীগুলো। জুনি, অ্যাকোমা, টাওস্‌ এবং নিউ মেক্সিকোর আরও কিছু পুয়েব্লোর যে কাঠামো ১৫৪০—১৫৪২ সালে করোনাডো দেখেছিলেন, আজও তাদের মধ্যে সেই কাঠামোই টিকে আছে। আপাতভাবে এদের মধ্যে যাওয়া সহজ হলেও, এদের জীবন-যাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে বা আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে আমরা প্রকৃতপক্ষে খুব কমই জানতে পেরেছি। এখনও পর্যন্ত এদের ব্যাপারে কোন প্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধান চালানো হয় নি। যেটুকু তথ্য ছাপার আকারে বেরিয়েছে, তা নিতান্তই সাধারণ এবং প্রকাশিত হয়েছে নেহাতই ঘটনাচক্রে। মোকিরা গোত্রের ভিত্তিতেই সংগঠিত। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত নয়টি গোত্র দেখা যায় :

১। হরিণ, ২। বালি, ৩। বৃষ্টি, ৪। ভালুক, ৫। খরগোশ, ৬। প্রেইরির নেকড়ে, ৭। র‍্যাট্‌ল্‌স্নেক, ৮। তামাক গাছ, ৯। শরতৃণ।

BanglaBook.org

ইউ-এস-এ-র অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন ডঃ টেন ব্রয়েক্ মিঃ স্কুল্ক্র্যাফট্কে মোকিদের একটা উপকথা শুনিয়েছিলেন। এই উপকথায় মোকিদের উদ্ভবের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। উপকথাটা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন মোকিদেরই একটা গ্রাম থেকে। এই উপকথায় বলা হয়েছে যে, "তাদের প্রপিতামহী[১] নিজের বাড়ি থেকে নয়টি বংশের মানুষকে নানান রূপে পশ্চিমদিকে নিয়ে এসেছিলেন। প্রথমটা হরিণ বংশ, দ্বিতীয় বালি বংশ, তৃতীয় জল (বৃষ্টি) বংশ, চতুর্থ ভালুক বংশ, পঞ্চম খরগোশ বংশ, ষষ্ঠ প্রেইরি নেকড়ে বংশ, সপ্তম র‍্যাটলস্নেক বংশ, অষ্টম তামাকগাছ বংশ এবং নবমটা হচ্ছে শরতৃণ বংশ। এখন তাদের গ্রামগুলো যেখানে অবস্থিত, সেইখানেই তিনি এদেরকে রোপণ করে মানুষে রূপান্তরিত করেন। এইসব মানুষই গড়ে তোলে আজকের পুয়েব্লোগুলো। এদের সেই বিভিন্ন বংশের মধ্যেকার পার্থক্যটা আজও টিকে আছে। একজন আমাকে বলেছিল যে সে হচ্ছে বালি বংশের লোক, আরেকজন বলেছিল সে হরিণ বংশের ইত্যাদি। মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিতে এরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে এবং বলে যে মৃত্যুর পর তারা তাদের আদি রূপে ফিরে গিয়ে আবার ভালুক, হরিণ ইত্যাদিতে পরিণত হবে……। শাসনব্যবস্থাটা উত্তরাধিকারমূলক হলেও সবসময় সে অধিকার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুত্রের ওপর বর্তায় না। প্রয়োজন বোধ করলে তারা ঐ ব্যক্তির অন্য কোন জ্ঞাতিকে ঐ পদে বসাতে পারে।"[২] বর্বরতার নিম্ন অবস্থা থেকে মধ্য অবস্থায় এদের অগ্রগতিকে অনুসরণ করলে দেখা যায় যে এদের মধ্যে গোত্রভিত্তিক সংগঠন পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে তাদের অবস্থার সঙ্গে গোত্র নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল। সাধারণভাবে ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের বাকি অংশে এবং সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকায় একমাত্র লাগুনাদের ছাড়া আর কারুর ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। এ থেকেই বোঝা যায় যে আমেরিকান জাতিতত্ত্বে এ কাজটা কত অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে—ওদের সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক এককটা আংশিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তার তাৎপর্য বুঝে ওঠা যায়নি। তা সত্ত্বেও পুরনো আমলের স্পেনিয় লেখকদের রচনাপত্রে এর কিছু নিদর্শন দেখা যায় এবং পরবর্তীকালের কয়েকজন লেখকের রচনায় এগুলো সম্বন্ধে কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়। এইসব তথ্যকে একত্রিত করলে আমরা নিঃসন্দেহেই বুঝে নিতে পারি যে প্রাচীনকালে সমস্ত ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যেই গোত্রীয় সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল।

বহু গোত্রের মধ্যে, যেমন মোকিদের গোত্রগুলোর মধ্যেও, এ-রকম উপকথা চালু আছে যে, তাদের আদিপুরুষের সৃষ্টি হয়েছিল কোন জন্তু-জানোয়ার বা জড় পদার্থের নারী ও পুরুষে রূপান্তরের সাহায্যে। ঐ জন্তুটা বা ঐ জড় পদার্থটাই পরে গোত্রের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। যেমন, ওজিবোয়াদের সারস গোত্রটার মধ্যে এ-রকম একটা উপকথা

১। শাওনীরা আগে এক দেবীর উপাসনা করত, যার নাম ছিল গো-গোমে-থা-মা, অর্থাৎ "আমাদের পিতামহী"।

২। "স্কুল্ক্র্যাফট্স হিস্ট্রি এটসেটেরা অফ ইণ্ডিয়ান ট্রাইবস", ৪,৮৬।

চালু আছে যে একজোড়া সারস পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্যবিশিষ্ট একটা জায়গার সন্ধানে উড়ে গিয়েছিল উপসাগর থেকে গ্রে লেক পর্যন্ত এবং মিসিসিপির প্রেইরি অঞ্চল থেকে আতলান্তিক পর্যন্ত। শেষপর্যন্ত তারা নিজেদের বাসভূমি হিসেবে বেছে নেয় সুপিরিয়র হ্রদের নির্গমপথের প্রপাতের কাছাকাছি একটা অঞ্চলকে। এই জায়গাটায় প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। নদীতীরে নেমে এসে সেই দুটি সারস গুটিয়ে নিল নিজেদের ডানাগুলো আর তখনই ঈশ্বর তাদের রূপান্তরিত করলেন পুরুষ আর নারীতে। এরাই ছিল ওজিবোয়াদের সারস গোত্রের আদিমানব ও আদিমানবী। বিভিন্ন গোষ্ঠীর কয়েকটি গোত্রের লোকেরা যে পশুটির নামে নিজেদের চিহ্নিত করে, সেই পশুটিকে কখনও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না। তবে এই প্রথাটা মোটেই সার্বজনীন নয়।

(খ) লাগুনা।

১৮৬০ সালে হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি অফ নিউ মেক্সিকোর সভায় রেভারেণ্ড স্যামুয়েল গম্যান যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা থেকে জানা যায়, লাগুনা পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব আছে এবং এদের বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী। "প্রতিটা শহরে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা বর্গ দেখা যায় এবং প্রতিটা দলের নামকরণ করা হয় কোন পশু, পাখি, লতা, গাছ, গ্রহ অথবা চতুর্ভূতের কোন-একটা ভূতের নাম অনুসারে।

লাগুনার পুয়েব্লোয় এক হাজারেরও বেশি অধিবাসী বাস করে। এখানে মোট সতেরটা গোষ্ঠী আছে। কোনটার নাম ভালুক, কোনটা হরিণ, র‍্যাট্‌ল্‌স্নেক, শস্য, নেকড়ে, আবার কোনটার নাম জল ইত্যাদি। সন্তানরা তাদের মায়ের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং, প্রাচীন প্রথা অনুসারে, একই গোষ্ঠীর নারী-পুরুষদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে সাম্প্রতিককালে এই প্রথাটা আগের থেকে অনেক শিথিল হয়ে পড়েছে।"

"এদের জমিগুলো সার্বজনীন, অর্থাৎ গোটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। তবে কোন জমিতে যে ব্যক্তি চাষ করে, সেই জমির ওপর তার একটু ব্যক্তিগত অধিকার থাকে। এই জমিটা সে তার নিজের সম্প্রদায়ের যে-কোন লোককে বিক্রি করতে পারে। সে মারা গেলে জমিটা তার বিধবা স্ত্রী বা মেয়েরা পায় আর লোকটি অবিবাহিত হলে জমিটা তার বাবার পরিবারের হাতেই থেকে যায়।"[১] স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী অথবা বাবার কাছ থেকে মেয়েরা উত্তরাধিকারসূত্রে জমি-জায়গা পেত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

(গ) আজ্‌টেক, টেজ্‌কুকান এবং ট্‌লাকোপানরা।

এদের এবং মেক্সিকোর অন্যান্য নহট্‌ল্যাক্‌ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেকার গোত্রীয় সংগঠন নিয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে।

১। "অ্যাড্রেস", পৃঃ ১২।

BanglaBook.org

(ঘ) ইয়ুকাতানের মায়া-রা।

মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার গোষ্ঠীগুলোর সম্বন্ধে হেরেরা প্রায়শই "জ্ঞাতিত্ব" কথাটাকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ দাঁড়ায় যে বেশ কিছু লোক, গোত্র ছাড়াও, রক্তসম্বন্ধের ভিত্তিতে সংগঠিত হত। তিনি লিখেছেন, কোন স্বাধীন মানুষকে যে হত্যা করত, সে ঐ নিহত মানুষটির সন্তান ও জ্ঞাতিদেরকে এই হত্যার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকত।"[১] এই কথাটি বলা রয়েছে নিকারাগুয়ার আদিবাসীদের সম্বন্ধে। ইরোকোয়াদের মধ্যেও এই একই প্রথার চলন ছিল আর এই 'জ্ঞাতিত্ব' শব্দটা আসলে 'গোত্র'-এরই সমতুল। সাধারণভাবে ইয়ুকাতানের মায়া ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি আবার বলেছেন যে, কোন ক্ষতির জন্য ক্ষতি-পূরণ দিতে গিয়ে ব্যক্তিটির নিঃস্ব হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকলে তার জ্ঞাতিরা তাকে সাহায্য করত।"[২] এই ব্যাপারটার মধ্যে আরেকটা গোত্রীয় প্রথারই ছায়া দেখা যায়। আজ্‌টেকদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হেরেরা লিখেছেন, "কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে, কোনরকম পক্ষপাত অথবা কোন জ্ঞাতিই তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারত না।"[৩] গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত ফ্লোরিডা ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে তাঁর একটা মন্তব্যও এখানে তুলে দেওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "এরা নিজেদের সন্তানদের অত্যধিক ভালবাসত, সযত্নে লালন-পালন করত তাদেরকে। এক বছর আগে মারা যাওয়া কোন সন্তানের জন্যও তার পিতা-মাতা আর জ্ঞাতিরা বিলাপ করত।"[৪] পুরনো দিনের পর্যবেক্ষকরা ইণ্ডিয়ান সমাজব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছিলেন। বৈশিষ্ট্যটা হল এই যে, এদের বহু সংখ্যক মানুষ জ্ঞাতিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকত এবং সেই কারণে এই দলগুলোকে "জ্ঞাতিত্ব" হিসেবে উল্লেখ করা হত। কিন্তু এই জ্ঞাতিত্বগুলো যে এক-একটা গোত্র গঠন করত এবং এই গোত্রই যে ছিল তাদের সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একক—এটা আবিষ্কার করার মত গভীর সমীক্ষা তাঁরা চালাননি। অথচ এটাই হচ্ছে সম্ভাব্য সত্য।

মায়াদের সম্বন্ধে হেরেরা আরও বলেছেন যে, "নিজেদের বংশপরিচয় মেনে চলতে এরা অভ্যস্ত আর তাই এরা নিজেদের সকলকেই পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে মনে করে এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সাহায্য করে থাকে।...এরা নিজেদের মাকে অথবা শ্যালিকাকে কিংবা বাবার সমনাম বিশিষ্ট কাউকে বিবাহ করে না। এগুলোকে তারা নিয়মবিরুদ্ধ কাজ বলে মনে করে।"[৫] রক্তসম্বন্ধভিত্তিক ব্যবস্থায় একজন ইণ্ডিয়ানের যে বংশপরিচয়, গোত্রকে বাদ দিলে তার কোন তাৎপর্যই থাকে না। কিন্তু এটাকে যদি বাদও দিই, তাহলেও দেখা যায় যে ইণ্ডিয়ানদের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এমন আর কোন

BanglaBook.org

১। "জেনারেল হিস্ট্রি অফ আমেরিকা", লণ্ডন সংস্করণ, ১৭২৬, স্টিভেন্‌স-এর অনুবাদ, ৩, ২৯৯।
২। "ঐ", ৪, ১৭১।
৩। "ঐ", ৩, ২০৩।
৪। "ঐ", ৪, ৩৩।
৫। "জেনারেল হিস্ট্রি অফ আমেরিকা", ৪, ১৭১।

সম্ভাব্য উপায় ছিল না যার দ্বারা বাবা ও তার সন্তানরা গোত্রের মধ্যস্থতা ছাড়া একই 'নাম'-এর অধিকারী হতে পারে। কারণ একমাত্র গোত্রই তার সকল সদস্যকে একটা সাধারণ গোত্রীয় নাম প্রদান করত। বাবা ও সন্তানদের একই গোত্রের মধ্যে আনার জন্য পুরুষ-ধারা অনুযায়ীই বংশধারা নির্ণীত হওয়ার দরকার ছিল। এছাড়াও ঐ বিবৃতি থেকে এ-ও জানা যায় যে মায়াদের সমাজে গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। হেরেরার কথাগুলোকে সত্য বলে ধরে নিলেএই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে মায়াদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল এবং এদের বংশধারা নির্ণীত হত পুরুষ-ধারা অনুযায়ী। টাইলর-এর 'আর্লি হিস্ট্রি অফ ম্যান্‌কাইণ্ড' গ্রন্থটি সুপ্রচুর ও সুচিন্তিত জাতিতাত্ত্বিক তথ্যের একটি ভাণ্ডার বিশেষ। এই মূল্যবান রচনাটিতে তিনি আরেকটি সূত্র থেকে এই একই কথা বলেছেন। টাইলর লিখেছেন, "উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের প্রথার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ানদের প্রথার সাদৃশ্য আছে। এদের উভয়ের মধ্যেই মায়ের দিকের কোন জ্ঞাতির সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু আরও দক্ষিণে মধ্য আমেরিকার এলাকাগুলোতে প্রথাটা ঠিক বিপরীত আর এই বিপরীত প্রথাটার সঙ্গে মিল আছে চীনাদের প্রথার। ইয়ুকাতানের মানুষদের সম্বন্ধে দিয়েগো দ্য লান্দা বলেছেন—এরা কেউ তাদের বাবার দিকের নিজের সমনামবিশিষ্ট কোন নারীকে বিবাহ করে না, কারণ এটাকে তারা অত্যন্ত খারাপ কাজ বলে মনে করে থাকে। কিন্তু তারা তাদের মায়ের দিকের কোন মামাতো বা মাসতুতো বোনকে বিবাহ করতে পারে।"[১]

পঞ্চদশ : দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীসমূহ

দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্রই গোত্রের এবং রক্তসম্বন্ধ নির্ণয়ের গ্যানোয়ানিয়ান ব্যবস্থার বাস্তব উপস্থিতির কথা জানা গেছে, কিন্তু এ বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান চালানো হয় নি। আন্দিজ অঞ্চলের অসংখ্য গোষ্ঠীকে ইন্‌কারা এক ধরণের মিত্রসঙ্ঘের আওতায় সম্মিলিত করেছিল। এইসব গোষ্ঠীর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হেরেরা লিখেছেন, "জাতিগুলো বিভিন্ন বংশ, গোষ্ঠী বা দলে বিভক্ত, যার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ভাষা।"[২] এখানে দল বলতে আসলে গোত্রের কথাই বলা হয়েছে। বিবাহ এবং বংশধারা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মিঃ টাইলর লিখেছেন, "আরও দক্ষিণে, ইস্‌থ্‌মাসের নিম্নাঞ্চলে, মায়ের দিক দিয়েই বংশধারা নির্ণীত হয় এবং মায়ের দিকের জ্ঞাতিদের ক্ষেত্রেই বিবাহ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে।" বানাউ বলেছেন, ব্রিটিশ গায়নার আরাওয়াদের মধ্যে 'জাত নির্ধারিত হয় মায়ের দিক থেকে। সন্তানরা তাদের বাবার পরিবারের মধ্যে বিবাহ করতে পারে, কিন্তু মায়ের পরিবারের কাউকে তারা বিবাহ করতে পারে না।' শেষত, ফাদার মার্টিন ডব্‌রিজ্‌হফার

১। "আর্লি হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইণ্ড", পৃঃ ২৮৭।

২। "জেনারেল হিস্ট্রি অফ আমেরিকা", ৪, ২৩১।

BanglaBook.org

বলেছেন যে গুয়ারানিরা তাদের দূরতম আত্মীয়কেও বিবাহ করে না, এটাকে তারা একটা বিরাট অপরাধ বলে মনে করে থাকে। অ্যাবিপোন্‌দের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কাদার ডব্‌রিজ্‌হফার বলেছেন, "প্রকৃতির নির্দেশ এবং পূর্বপুরুষদের দৃষ্টান্তের ফলে এরা নিজেদের কোন সুদূর আত্মীয়কে বিবাহ করার চিন্তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে থাকে।"[১] আদিবাসীদের সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত এইসব কথাগুলো নিতান্তই অনির্দিষ্ট। কিন্তু ইতোমধ্যে উপস্থাপিত তথ্যসমূহের আলোকে গোত্রের অস্তিত্ব, স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয় এবং গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ-করণের নিয়মের কথা স্পষ্টভাবেই জানা যায় আর তাই ঐ তথ্যগুলো আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়। গায়নার ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলো সম্বন্ধে ব্রেট্‌ লিখেছেন, "এরা বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত এবং এই পরিবারগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে, যেমন সিউইডি, কারুয়াফুডি, ওনিসিডি ইত্যাদি। এদের এই পরিবারগুলো কিন্তু আমাদের পরিবারের মতো নয়। এদের বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী এবং কোন পুরুষ বা নারী একই পদবীবিশিষ্ট কোন নারী বা পুরুষকে বিবাহ করতে পারে না। দেখা যায় যে সিউইডি পরিবারের কোন নারী তার মায়ের পদবীই পায়, কিন্তু তার বাবা অথবা স্বামী কেউই ঐ পরিবারের সদস্য হতে পারে না। তার সন্তানরা এবং তার মেয়েদের সন্তানরা সিউইডি নামেই পরিচিত হয়, কিন্তু তার ছেলেরা ও মেয়েরা একই পদবী-বিশিষ্ট কোন নারী বা পুরুষকে বিবাহ করতে পারে না। তবে ইচ্ছে করলে তারা তাদের বাবার পরিবারের কাউকে বিবাহ করতে পারে। এই রীতিগুলো কঠোরভাবে মেনে চলা হয় এবং কেউ এই নিয়ম ভঙ্গ করলে তা এক পাপকাজ হিসেবেই গণ্য হয়।"[২] বর্তমান লেখকের 'পরিবার'-রচনার মধ্যেও গোত্রের প্রাচীনরূপের ছায়া স্পষ্টভাবেই বিদ্যমান। ওপরে দক্ষিণ আমেরিকার যতগুলো গোষ্ঠীর নাম করা হয়েছে, তাদের মধ্যে একমাত্র আন্দিয়ানরা ছাড়া বাকি সকলেই তাদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার সময় হয় বর্বর অবস্থার নিম্ন দশায় অথবা বন্য অবস্থায় ছিল। পেরুভিয়ান গোষ্ঠীগুলোর আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে গার্সিল্যাসো দ্য লা ভেগা যে অসম্পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন, তা থেকে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে দেখা যায় যে ইন্‌কা ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার অধীনে একত্রিত অনেক পেরুভিয়ান গোষ্ঠীই বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থায় ছিল।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ভিলেজ ইণ্ডিয়ানরা তাদের দেশীয় সংস্কৃতির দৌলতে বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে এবং এমনকি এই মধ্য পর্যায়ের প্রায় শেষভাগে এগিয়ে যেতে পেরেছিল। এদের সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় আমরা স্বভাবতই মনোযোগ দিয়ে থাকি গোত্রগুলোর রূপ পরিবর্তনের ইতিহাসের দিকে। প্রাচীনকালে গোত্রের গঠন

১। "আর্লি হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইণ্ড", পৃঃ ২৮৭।

২। "ইণ্ডিয়ান ট্রাইবস অফ গায়না", পৃঃ ৯৮; লুবক্‌ কর্তৃক "অরিজিন অফ সিভিলাইজেশন" গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৮।

BanglaBook.org

কেমন ছিল, তা আমরা দেখিয়েছি। গ্রীক ও রোমানদের গোত্র নিয়ে আলোচনা করার সময় গোত্রের সর্বশেষ অবস্থার কথাও আমরা বিবৃত করব। কিন্তু গোত্রীয় সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানতে হলে বংশধারা ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে সংঘটিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিবর্তনগুলোকে জানাটাও একান্ত প্রয়োজনীয়। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির, অর্থাৎ গোত্রের, প্রথম দিককার ও পরের দিককার অবস্থা সম্পর্কে আমাদের হাতে প্রচুর তথ্য থাকলেও মাঝামাঝি সময়ের ঐ পরিবর্তনশীল অবস্থাটা সম্পর্কে আমাদের তথ্যের ভাণ্ডারে অনেক ফাঁক-ফোকর রয়ে গেছে। মানব-জাতির যে-কোন গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাধুনিক রূপবিশিষ্ট গোত্রের সন্ধান পাওয়া গেলে ধরে নেওয়া যায় তাদের বহু আগেকার পূর্বপুরুষদের মধ্যেও প্রাচীন রূপবিশিষ্ট গোত্রের অস্তিত্ব ছিলই ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক পর্যালোচনার জন্য দরকার ইতিবাচক প্রমাণ, অনুমানের ভিত্তিতে এ পর্যালোচনা করা যায় না। ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে একদা এইসব প্রমাণের অস্তিত্ব ছিল। এখন আমরা নিশ্চিতভাবেই জেনেছি যে তাদের শাসন-ব্যবস্থাটা ছিল একটা সামাজিক ব্যবস্থা, কোনরকম রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়। অনেক জায়গাতেই আমরা এদের সংগঠনের উচ্চতর স্তরগুলোর, অর্থাৎ গোষ্ঠী ও মিত্রসঙ্ঘের, সন্ধান পেয়েছি। এই ব্যবস্থার প্রাথমিক একক যে গোত্র, তার অস্তিত্বেরও ইতিবাচক প্রমাণ ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে পেয়েছি আমরা। কিন্তু বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থায় থাকা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেকার গোত্র সম্বন্ধে আমরা যত সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছি, তত সুনির্দিষ্ট তথ্য ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের গোত্র সম্বন্ধে আমাদের হাতে আসেনি। স্পেনিয় বিজেতা ও ঔপনিবেশিকদেরই এ ব্যাপারে সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কিন্তু সে সুযোগ তারা কাজে লাগাতে পারে নি। কারণ সভ্য মানুষ তার প্রগতির পথ-পরিক্রমায় যে সমাজব্যবস্থার থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে, সেই সমাজব্যবস্থাকে বুঝতে পারার ক্ষমতা তাদের ছিল না। এদের সমাজ ব্যবস্থার যে প্রাথমিক এককটা সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেই এককটা সম্বন্ধে স্পেনিয়দের কোন ধারণাই ছিল না। আর তাই তাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিত্রিত করার ব্যাপারে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে স্পেনিয়দের লেখা ইতিহাস।

মধ্য আমেরিকা ও পেরুতে প্রাচীন ভাস্কর্যের যে-সব নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, সেগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেয় যে বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়টা ছিল মানুষের অগ্রগতির, বর্দ্ধমান জ্ঞানের এবং ক্রমোন্নত বুদ্ধিমত্তার এক উজ্জ্বল যুগ। এর পর পূর্ব গোলার্ধেও মাথা তুলেছিল এক উজ্জ্বলতর যুগ। উদ্ভাবিত হয়েছিল লোহা বানানোর কৌশল আর এই প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা মানবজাতির একটা অংশকে পৌঁছে দিয়েছিল সভ্যতার আঙিনায়। বর্বর যুগের শেষ ভাগে আবিষ্কার আর উদ্ভাবন এগিয়েছিল অত্যন্ত দ্রুত তালে। এই যুগে মানুষের অগ্রগতির মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি আরও গভীর হয়ে ওঠে বর্বর যুগের মধ্য দশার সমাজকে ভালভাবেজানতে পারলে। আর বর্বর যুগের মধ্য অবস্থার ছবিটাকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে। ধৈর্যসহকারে চেষ্টা করলে আমাদের হারিয়ে-যাওয়া জ্ঞান-

BanglaBook.org

ভাণ্ডারের অনেকটাই আবার উদ্ধার করা যেতে পারে। আমাদের বর্তমান তথ্যরাজির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ইওরোপিয় আবিষ্কারের যুগে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের প্রায় সব গোষ্ঠীর মধ্যেই গোত্রের অস্তিত্ব ছিল। যে দু-একটা ব্যতিক্রমের কথা জানা গেছে, সেগুলো সাধারণ নিয়মটাকে নাকচ করে দেওয়ার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আজ্‌টেক মিত্রসঙ্ঘ

যে স্পেনিয় অভিযাত্রীরা তখন মেক্সিকোর পুয়েব্লোগুলি দখল করেছিল, তারা এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে আজ্‌টেকদের শাসনব্যবস্থাটা হচ্ছে রাজতান্ত্রিক, যার সঙ্গে ইওরোপের বিদ্যমান রাজতন্ত্রগুলোর কোন মূলগত তফাৎ নেই। প্রথম দিককার প্রায় সব স্পেনিয় লেখকরাই মতটি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আজ্‌টেকদের সমাজব্যবস্থার কাঠামো ও নীতি সম্পর্কে তাঁরা এমন একটা অভিধা প্রয়োগ করে দেন, যার সঙ্গে আজ্‌টেকদের প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন মিলই নেই। এর ফলে তাঁদের দ্বারা লিখিত ইতিহাস মূলত ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত এক ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। আজ্‌টেকদের একমাত্র শক্তিশালী আবাসস্থলটাকে স্পেনিয়রা দখল করে নেওয়ার ফলে তাদের শাসন-কাঠামোটা ধ্বংস হয়ে যায়, তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় স্পেনিয় শাসন, আর সেই সঙ্গেই আজ্‌টেকদের আভ্যন্তরীণ সংগঠন ও নীতির বিষয়টা হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে।[১]

আজ্‌টেকরা এবং তাদের মিত্রসঙ্ঘভুক্ত অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো লোহার ব্যবহার জানত না, ফলে কোন লৌহনির্মিত যন্ত্রপাতিও তাদের হাতে ছিল না। তাদের মধ্যে টাকা-কড়ির চলন ছিল না, পণ্যের বিনিময়ের মাধ্যমেই ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। কিন্তু তারা তাদের অঞ্চলে লভ্য ধাতু দিয়ে নানান ধরণের জিনিসপত্র বানাতো, সেচের সাহায্যে চাষবাস করত, তুলো দিয়ে স্থূল ধরণের কাপড় বুনতো, ইঁট ও পাথর দিয়ে যৌথ-আবাস তৈরি করত এবং মাটি দিয়ে চমৎকার চমৎকার সব পাত্র বানাতো। অর্থাৎ, বর্বর যুগের মধ্য অবস্থায় উন্নীত হয়েছিল তারা। তখনও তাদের জমিগুলো ছিল সার্বজনীন সম্পত্তি, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত কয়েকটা পরিবার তখনও পর্যন্ত একটা বড় বাসগৃহেই বসবাস করত। বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে এইসব বাসগৃহে

১। স্পেনিয়দের কার্যকলাপ সম্বন্ধে এবং ইণ্ডিয়ানদের কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্প্যানিশ আমেরিকার ইতিহাসের বক্তব্যকে মোটামুটি বিশ্বাস করা যায়। ইণ্ডিয়ানদের অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র, বাড়িঘর, খাদ্য, বস্ত্র এবং এই ধরণের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও ঐ ইতিহাসের বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়। কিন্তু ইণ্ডিয়ানদের সমাজ, শাসনব্যবস্থা, তাদের সামাজিক সম্পর্ক এবং জীবনাচরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে ঐ ইতিহাসের বক্তব্য একেবারেই অসার, কারণ এগুলো সম্বন্ধে স্পেনিয়রা কিছুই জানা-বোঝার চেষ্টা করেনি। এইসব বিষয় সম্বন্ধে ঐ ইতিহাসের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে নতুনভাবে পর্যালোচনা শুরু করার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে আমাদের। তবে, স্পেনিয়দের দ্বারা লিখিত ইতিহাসে ইণ্ডিয়ানদের সমাজের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ কোন তথ্য থাকলে সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করতেই পারি।

তারা সাম্যবাদী পন্থায় জীবনযাপন করত এবং প্রায় নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে যে প্রতিদিন তারা একবার করেই খাদ্য প্রস্তুত করত এবং সেই খাদ্যটা মধ্যাহ্নভোজনে ব্যবহৃত হত। আলাদা আলাদা ভাবে খেতো তারা। প্রথমে পুরুষরা খেয়ে নিত, তারপর খেতে বসত নারী ও শিশুরা। খাওয়ার জন্য কোন চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা ছিল না বলে তারা নিজেদের সারা দিনের ঐ একমাত্র আহারটা সুসভ্য জাতিগুলোর মত কেতাদুরস্তভাবে খেতে শেখেনি। তাদের সামাজিক অবস্থার এইসব বৈশিষ্ট্য থেকেই তাদের অগ্রগতির আপেক্ষিক অবস্থাটা বোঝা যায়।

সেইসময় সারা পৃথিবীর যেখানে যেখানে প্রাচীন সমাজ বর্বর যুগের এই মধ্য অবস্থায় ছিল, তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় এই আজটেকদের মধ্যে এবং মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও পেরুর ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে। এইসব গোষ্ঠীগুলো সভ্যতার পথে অগ্রগতির এমন একটা বিশেষ স্তরের প্রতিনিধিস্বরূপ, যে স্তরে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক যুগের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক বেশি উন্নত হয়ে উঠেছিল। আর এই প্রতিষ্ঠানগুলোই মানুষের অভিজ্ঞতার গতিপথে আরও উন্নত এক ঐতিহাসিক পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং সভ্যতার আঙিনায় পা রাখার আগে এগুলো আরও বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু হোমারের যুগের গ্রীকরা বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থায় পৌঁছলেও, ভিলেজ ইণ্ডিয়ানরা কখনোই ঐ অবস্থায় পৌঁছতে পারে নি। মেক্সিকো উপত্যকার ইণ্ডিয়ান পুয়েব্লোগুলো ইওরোপিয়ানদের সামনে প্রাচীন সমাজের এক হারিয়ে যাওয়া অবস্থাকে মূর্ত করে তুলেছিল। এই অবস্থাটা এতই লক্ষণীয় ও বিশিষ্ট ছিল যে সেইসময় এটা নিয়ে এক প্রচণ্ড কৌতূহল সৃষ্টি হয়। প্রচুর লেখালিখি হয় এই নিয়ে। বস্তুত, মেক্সিকোর আদিবাসী এবং স্পেনিয় বিজয় নিয়ে যত বইপত্র লেখা হয়েছে, তার দশ ভাগের এক ভাগও লেখা হয়নি একইরকম অগ্রসর অন্য কোন জাতি অথবা সমান গুরুত্বসম্পন্ন অন্য কোন ঘটনা নিয়ে। অথচ, এতসব লেখালিখি সত্ত্বেও, এদের প্রতিষ্ঠান আর জীবনাচরণ পদ্ধতি সম্বন্ধেই সবচেয়ে কম জানা গেছে। ঐ লক্ষণীয় ঘটনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল কল্পনার আঁচ, নেমেছিল রোমান্সের ঢল, আর আজও দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে সেই রোমান্সেরই জয়-জয়কার। এই সবকিছুর ফলে আজটেকদের সামাজিক কাঠামোকে নির্ধারণ করা যায় নি আর তা মানবজাতির ইতিহাসের এক মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়েছে। এর জন্য কাউকে নিন্দা করা উচিত নয়, বরং এটা আমাদের কাছে একান্ত দুঃখময় ঘটনা। এত কষ্টকর অধ্যবসায়ে যা-কিছু লেখা হয়েছে, সেগুলো ভবিষ্যতে কোন সময় আজটেকদের মিত্রসংঘের ইতিহাস পুনর্গঠনের সময় কিছু কাজে লেগে যেতেও পারে। কিছু কিছু ইতিবাচক তথ্য এগুলোর মধ্যে আছে, যেগুলো থেকে অন্যান্য তথ্যও জানা যেতে পারে। তাই কোন সুনির্দিষ্ট মৌলিক অনুসন্ধানের সাহায্যে আজটেক সমাজব্যবস্থার অন্তত মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে পুনরুদ্ধার করাটা এখনও ঠিক অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে না।

প্রথম দিককার ইতিহাসে পাওয়া যায় "মেক্সিকো রাজ্য" কথাটা আর পরের দিককার ইতিহাসে আছে "মেক্সিকো সাম্রাজ্য"। আসলে এটা স্রেফ বানানো কথা। তাদের

BanglaBook.org

প্রতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকার দরুণ তাদের শাসনব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করার একটা আপাত ভিত্তি ছিল। কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণাটাকে আজ আর মেনে নেওয়া যায় না। স্পেনিয়রা যা দেখেছিল, তা ছিল আসলে তিনটি ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর একটা মিত্রসংঘ, যার বাকি দুটো গোষ্ঠী ছড়িয়ে ছিল মহাদেশের সমস্ত অংশে। আর শুধু এই একটামাত্র ব্যাপার ছাড়া স্পেনিয়দের রচনাগুলো আর এক পা-ও এগোতে পারে নি। সরকার পরিচালনা করত প্রধানদের একটা পরিষদ, তাদেরকে সাহায্য করত সামরিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। এটা ছিল দুই শক্তির শাসন—আভ্যন্তরীণ শক্তির প্রতিনিধি ছিল পরিষদ আর সামরিক শক্তির প্রতিনিধি ঐ মুখ্য সেনাপতি। মিত্রসংঘভুক্ত গোষ্ঠীসমূহের প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল মূলগতভাবে গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন। তাই মিত্রসংঘের থেকেও সুনির্দিষ্ট কোন আখ্যা দিতে হলে এগুলোকে চিহ্নিত করা যায় সামরিক গণতন্ত্র হিসেবে।

আজটেক মিত্রসংঘের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তিনটি গোষ্ঠী—আজটেক বা মেক্সিকান গোষ্ঠী, টেজ্‌কুকান গোষ্ঠী আর ট্‌লাকোপান গোষ্ঠী। এ থেকে আমরা সেই ধারাবাহিক সামাজিক ক্রমের শেষ দুটো স্তরের সন্ধান পাচ্ছি—গোষ্ঠী এবং মিত্রসংঘ। প্রথম দুটো স্তর, অর্থাৎ গোত্র এবং ভ্রাতৃত্ব, তাদের মধ্যে ছিল কি না, সে বিষয়ে কোন স্পেনিয় লেখকের রচনাতেই নির্দিষ্ট কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না, তবে তাঁরা অস্পষ্টভাবে এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন যেগুলোকে অনায়াসেই গোত্র এবং ভ্রাতৃত্ব হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। ভ্রাতৃত্ব ব্যাপারটা হয়ত অত্যাবশ্যক নয়, কিন্তু গোত্র একান্তই অপরিহার্য, কেননা এই প্রাথমিক এককটার ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকে গোটা সমাজব্যবস্থাটা। আজটেকদের বিভিন্ন বিষয়গুলো এখন ইতিহাসের এক দুর্ভেদ্য গোলকধাঁধায় পরিণত হয়েছে। সেই গোলকধাঁধার আবর্তে আমি প্রবেশ করছি না। আমি শুধু আজটেকদের সমাজব্যবস্থার এমন কয়েকটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি যেগুলো থেকে এদের সমাজব্যবস্থার প্রকৃত চরিত্রটাকে বোঝা যেতে পারে। এই আলোচনাটা শুরু করার আগে মৈত্রীবদ্ধ গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে তাদের চারপাশের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর সম্পর্কের ব্যাপারটা একটু জেনে নেওয়া ভাল।

উত্তরাঞ্চল থেকে দেশান্তরী হয়ে চলে এসে যে সাতটা গোষ্ঠী মেক্সিকো উপত্যকায় এবং তার আশপাশের এলাকায় বসবাস করতে শুরু করেছিল, আজটেকরা ছিল তাদেরই অন্যতম। স্পেনিয় বিজয়ের যুগে ঐ অঞ্চলে যে গোষ্ঠীগুলো ছিল, তাদের মধ্যেও আজটেকদের নাম পাওয়া যায়। এদের উপকথায় এরা নিজেদের এইসব গোষ্ঠীগুলোকে যৌথভাবে নহট্‌ল্যাক্‌ নামে অভিহিত করে থাকে। অ্যাকস্টা, যিনি ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মেক্সিকোয় গিয়েছিলেন এবং ১৫৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সেভিল্‌ থেকে যাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি আজটেলান্‌ থেকে দেশান্তরী হওয়ার ব্যাপারে এদের মধ্যে প্রচলিত উপকথাগুলোকে একের পর এক বিবৃত করেছেন, উল্লেখ করেছেন গোষ্ঠীগুলোর নাম এবং তারা যে-সব জায়গায় স্থিতু হয়ে বসেছিল সেই জায়গাগুলোর নাম। এইসব গোষ্ঠীর আগমনকে তিনি এ-রকম ক্রম অনুসারে সাজিয়েছেন ঃ

BanglaBook.org

১। সোচিমিল্‌কা (পুষ্পবীজের জাতি), এরা মেক্সিকো উপত্যকার দক্ষিণ ঢালে ক্‌মোচিমিল্‌কো হ্রদের ধারে বসবাস শুরু করেছিল।

২। চাল্‌ক (মোহনার মানুষ), এরা সোচিমিল্‌কাদের থেকে অনেক পরে এসেছিল, এবং বসবাস শুরু করেছিল তাদেরই কাছাকাছি চালকো হ্রদের আশপাশে।

৩। টেপানেকান্‌ (সেতুর মানুষ), এরা উপত্যকার পশ্চিম ঢালে টেজ্‌কুকো হ্রদের পশ্চিমে আজ্‌কোপোজাল্‌কো অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে।

৪। কুলহুয়া (বাঁকাচোরা মানুষ), এরা টেজ্‌কুকো হ্রদের পূর্ব দিকে বসবাস করতে শুরু করে এবং পরবর্তীকালে টেজকুকান নামেই পরিচিত হয়।

৫। টলাটলুইকান (শৈলশ্রেণীর মানুষ), হ্রদের চারপাশের উপত্যকা অঞ্চলটা কেউ-না-কেউ আগেই দখল করে ফেলেছে দেখে এরা শৈলশ্রেণী পেরিয়ে আরও দক্ষিণদিকে এগিয়ে যায় এবং পর্বতের অন্য দিকটায় বসবাস করতে শুরু করে।

৬। ট্‌লাস্‌কালান (রুটির মানুষ), এরা প্রথমদিকে কিছুদিন টেপানেকানদের সঙ্গে বসবাস করেছিল, তারপর উপত্যকা পেরিয়ে পূর্বদিকে ট্‌লাম্‌কালা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

৭। আজটেক, এরা সবথেকে শেষে এসে বর্তমান মেক্সিকো শহরের কাছাকাছি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল।[১] অ্যাকস্টা আরও বলেছেন যে এরা এসেছিল "উত্তর দিকের অনেক দূর দূর দেশ থেকে, যেখানে এখন নিউ মেক্সিকো নামে একটা রাজ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।"[২] হেরেরা[৩] এবং ক্ল্যাভিগেরো-ও[৪] একই উপকথার উল্লেখ করেছেন। লক্ষ করা দরকার যে ট্‌লানেদের নাম এখানে উল্লিখিত হয়নি। খুব সম্ভবত এরা ছিল টেপানেকানদেরই একটা উপ-শাখা এবং এরা ঐ গোষ্ঠীটির আদি বাসভূমিতেই রয়ে গিয়েছিল, বাকিরা চলে গিয়েছিল ট্‌লাস্‌কালানদের ঠিক দক্ষিণের অঞ্চলে। এরা টেপিকা নামে পরিচিত হয়। এই টেপিকাদের মধ্যেও ঐ সাতটা গুহার উপকথা চালু ছিল এবং এরা নহট্‌ল্যাক ভাষারই একটা উপ-ভাষায় কথা বলত।[৫]

এই উপকথাটা থেকে আমরা এমন একটা তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য খুঁজে পাই, যা অন্যভাবে উদ্ভাবন করা যেত না। তথ্যটা হল এই যে, ঐ সাতটা গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল একই সূত্র থেকে। তাদের উপ-ভাষাগুলো এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করে। এই উপকথা থেকে এ-ও জানা যায় যে এরা এসেছিল উত্তরাঞ্চল থেকে। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রথমে এরা সকলে একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল, পরে বিভাজনের

১। "দ্য ন্যাচারাল অ্যান্ড মরাল হিস্ট্রি অফ দ্য ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজ", লণ্ডন সংস্করণ, ৬০৪, গ্রিম্‌স্টোনের অনুবাদ, পৃঃ ৪৯৭-৫০৪।

২। "দ্য ন্যাচারাল অ্যান্ড মরাল হিস্ট্রি অফ দ্য ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজ", পৃঃ ৪৯৯।

৩। "জেনারেল হিস্ট্রি অফ আমেরিকা", লণ্ডন সংস্করণ, ১৭২৫, স্টিভেনস-এর অনুবাদ, ৩, ১৮৮।

৪। "হিস্ট্রি অফ মেক্সিকো", ফিলাডেলফিয়া সংস্করণ, ১৮১৭, কুলেন্‌-এর অনুবাদ, ১, ১১১।

৫। হেরেরা, "হিস্ট্রি অফ আমেরিকা", ৩, ১১০।

স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এদেরকে সাত বা ততোধিক গোষ্ঠীতে পরিণত করেছিল। তাছাড়াও এই ঘটনাই আজটেক মিত্রসংঘের গঠনকে সম্ভবপর করেছিল, কারণ একটা সাধারণ ভাষাই হচ্ছে এই ধরণের সংগঠনের মৌলিক ভিত্তি।

অধিকৃত উপত্যকায় আজটেকরাই সেরা জায়গাটা পেয়েছিল। কয়েকবার জায়গা পাল্টে শেষপর্যন্ত তারা একটা জলার মাঝে একখণ্ড শুষ্ক জমিতে বসবাস করতে শুরু করে। এই অঞ্চলটার চারপাশে কিছু মাঠ আর পুকুর ছিল। ক্ল্যাভিগেরোর মতে, ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে, অর্থাৎ স্পেনিয় বিজয়ের একশ ছিয়ানব্বই বছর আগে, এইখানেই তারা মেক্সিকোর সুবিখ্যাত পুয়েব্লোগুলো (টেনোচ্‌টিট্‌লান) গড়ে তোলে।[১] এদের লোকসংখ্যা ছিল অল্প, অবস্থাও খুব ভাল ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যবশত কুসোচিমিল্‌কো ও চালো হ্রদের নির্গমপথ এবং পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড় থেকে আসা ছোট ছোট নদীগুলো তাদের ঐ বাসভূমির পাশ দিয়েই টেজ্‌কুকো হ্রদে গিয়ে মিশেছিল। ঐ অঞ্চলটার সুযোগ-সুবিধাগুলো উপলব্ধি করার মত বিচক্ষণতা তাদের ছিল। তাই নানান জাঙ্গাল আর বাঁধের সাহায্যে নিজেদের পুয়েব্লোগুলোর চারদিকে তারা বড় বড় কৃত্রিম জলাশয় সৃষ্টি করে। এইসব জলাশয়ের জন্য জল পাওয়া যেত পূর্বোক্ত হ্রদ আর ছোট ছোট নদীগুলো থেকেই। টেজ্‌কুকো হ্রদের জলতল এখনকার চেয়ে তখন অনেক উঁচু ছিল। এর ফলে গোটা কাজটা শেষ হওয়ার পর সারা উপত্যকার সব গোষ্ঠীর মধ্যে এদের অবস্থানটাই সব থেকে সুরক্ষিত হয়ে ওঠে। যে কারিগরী যন্ত্রবিজ্ঞানের (mechanical engineering) সাহায্যে এই কাজটা সম্পন্ন হয়েছিল, তা ছিল আজটেকদের এক বৃহত্তম কীর্তি। এটা ছাড়া তারা আশপাশের গোষ্ঠীগুলোর থেকে উন্নত হয়ে উঠতে পারত বলে মনে হয় না। এরপর তারা স্বাধীন ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এবং কালক্রমে উপত্যকার অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর ওপর তাদের একটা কর্তৃত্বময় প্রভাবও বিস্তৃত হল। এইভাবেই এরা স্থিতু হয়ে বসেছিল এবং আজটেক উপকথা অনুযায়ী এই পুয়েব্লো গঠনের কালটা এতই সাম্প্রতিক যে এটাকে নির্ভরযোগ্য বলে মেনে নেওয়া যায়।

স্পেনিয় বিজয়ের যুগে এই সাতটা গোষ্ঠীর মধ্যে পাঁচটা গোষ্ঠী, যথাক্রমে আজটেক, টেজকুকান, ট্‌লাকোপান, কুসোচিমিল্‌কা এবং চাল্‌কানরা এই উপত্যকায় বসবাস করছিল। উপত্যকা অঞ্চলটা ছিল খুবই ছোট, অনেকটা রোড আইল্যাণ্ডের মত আয়তনবিশিষ্ট। জায়গাটা ছিল নির্গমপথহীন একটা পার্বত্য বা উচ্চাঞ্চলীয় অববাহিকা, যার গড়নটা ডিম্বাকার, উত্তর থেকে দক্ষিণেই বিস্তৃতিটা সবচেয়ে বেশি, পরিসীমা একশ কুড়ি মাইল, আর জলমগ্ন অঞ্চল বাদে মোট এলাকার পরিমাণ ষোলশ বর্গমাইল। আগেই বলা হয়েছে যে উপত্যকাটার চারদিক ঘিরে আছে এক সারি পাহাড়, একটা পাহাড়কে ছাপিয়ে উঠেছে আরেকটা, মাঝখানগুলো খাঁজবিশিষ্ট। এই পাহাড়গুলো উপত্যকার চারিদিকে একটা পাহাড়ী প্রাচীর গড়ে তুলেছে। উল্লিখিত গোষ্ঠীগুলো কমবেশি তিরিশটা পুয়েব্লোয় বাস করত। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল মেক্সিকোর

১। "হিস্ট্রি অফ মেক্সিকো", পূর্বোক্ত, ১, ১৬২।

পুয়োব্লোটা। এই গোষ্ঠীগুলোর কোন বড় অংশ ঐ উপত্যকার বাইরে এবং সন্নিহিত পাহাড়গুলোর ঢালে বসতি স্থাপন করেছিল—এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বরং এমন প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে যে আধুনিক মেক্সিকোর বাকি অঞ্চলগুলোয় তখন এমন বহু গোষ্ঠী বসবাস করত যারা নহট্‌ল্যাক ভাষাভাষী ছিল না এবং যে গোষ্ঠী-গুলোর অধিকাংশই ছিল স্বাধীন। ট্‌লাস্‌কালানরা, এদের উপ-শাখা হিসেবে অনুমিত চোল্‌লান, টেপিকা, হুয়েক্সোট্‌জিন্‌কোরা, টেজ্‌কুকানদের উপ-শাখা হিসেবে অনুমিত মেজ্‌টিট্‌লানরা এবং ট্‌লাট-লুইকানরা—এই অবশিষ্ট নহট্‌ল্যাক গোষ্ঠীগুলো বসবাস করত মেক্সিকো উপত্যকার বাইরে। এদের মধ্যে শুধু ট্‌লাট-লুইকান এবং টেপিকারা বাদে বাকি সবকটাই ছিল স্বাধীন গোষ্ঠী। আরও বেশ কিছু গোষ্ঠী কমবেশি সতেরোটা আঞ্চলিক দলে বিভক্ত ছিল এবং ঠিক ততগুলো মূল ভাষায় কথা বলত। এরাই বসবাস করত মেক্সিকোর অন্যান্য অঞ্চলে। একশ বছর বা তার কিছু আগে যখন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ আমেরিকার গোষ্ঠীগুলোর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়, তখন তাদের বিভাজন ও স্বাধীনতার যে অবস্থা ছিল, মেক্সিকোর এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও প্রায় সেই ধরণের অবস্থাই দেখতে পাই আমরা।

১৪২৬ খ্রিষ্টাব্দের আগে, অর্থাৎ আজটেক মিত্রসংঘ গঠিত হওয়ার আগে, উপত্যকার গোষ্ঠীগুলোর জীবনে ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন কোন ঘটনা ঘটেনি বললেই চলে। এরা তখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। নিজেদের এলাকাটুকুর বাইরে তাদের কোনরকম প্রভাব ছিল না। মোটামুটিভাবে এই সময় থেকেই সংখ্যায় এবং শক্তিতে আজটেকরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে শুরু করে। নিজেদের সমর-নায়ক ইট্‌জ্‌কোয়াট্‌ল্‌-এর নেতৃত্বে তারা টেজ্‌কুকান ও টলাকোপানদের এত-দিনকার আধিপত্যের অবসান ঘটায় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যেকার বিগত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফল হিসেবে গড়ে তোলে একটা মৈত্রী বা মিত্রসংঘ। এটা ছিল ঐ তিনটি গোষ্ঠীর একটা আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষাত্মক মৈত্রী। এই মৈত্রীর মধ্যেই শর্ত ছিল যে অধীনস্থ গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এবং পরবর্তীকালে প্রাপ্ত করকে একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে তারা।[১] অধীনস্থ গ্রামগুলো কর হিসেবে দিত তাদের গ্রামে প্রস্তুত বস্ত্র ও কৃষিজ ফসল। এইসব কর আদায় করা হত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে।

এই মিত্রসংঘের কাঠামোটা কী ছিল, তা আজ আর জানা যায় না। নানা খুঁটিনাটি তথ্যের অভাবে বুঝে ওঠা যায় না যে এটা একটা স্থায়ী সংঘ ছিল নাকি যে-কোন সময়েই এটাকে ভেঙে দেওয়া যেত, অথবা এটা ইরোকোয়াদের মত কোন কোন সুদৃঢ় সংগঠন ছিল কি না, যেখানে সংগঠনের প্রতিটা অংশই একে অপরের সঙ্গে স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে প্রতিটা গোষ্ঠীই

১। ক্লাভিগেরো, "হিস্ট্রি অফ মেক্সিকো", ১, ২২৯; হেরেরা, ৩, ৩১২; প্রেস্‌কট, "কংকোয়েস্ট অফ মেক্সিকো", ১, ১৮।

BanglaBook.org

ছিল স্বাধীন, কিন্তু কোন আক্রমণ বা আত্মরক্ষার ব্যাপারে তিনটি গোষ্ঠী এক হয়ে লড়ত। প্রতিটা গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রধানদের পরিষদ এবং মুখ্য সেনাপতি থাকলেও, আজটেকদের সেনাপতিই তিনটি গোষ্ঠীর মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে কাজ করত। এই সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পেরেছি একটা তথ্যের ভিত্তিতে। তথ্যটা হল—আজটেকদের সেনাপতি নির্বাচন বা তার অনুমোদনের ব্যাপারে টেজ্‌কুকান এবং টলাকোপানরা নিজেদের অভিমত প্রকাশ করার অধিকারী ছিল। আজটেকদের হাতে সর্বাধিনায়কের ভার অর্পিত হওয়া থেকে বোঝা যায় যে গোষ্ঠীগুলো মৈত্রীবদ্ধ হওয়ার সময় যে শর্ত ঠিক করা হয়েছিল, সেইসব শর্ত নির্ধারণের ব্যাপারে সবথেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল আজটেকরাই।

টেজ্‌কুকানদের প্রধান সেনাপতি ছিল নেজাহুয়াল্‌কোজেট্‌ল্‌। তাকে তার পদ থেকে বরখাস্ত বা অধিকারচ্যুত করা হয়েছিল। কিন্তু আজটেকরা তাকে তার পদে পুনরধিষ্ঠিত করে (১৪২৬)। এই ঘটনাটাকেই তাদের মিত্রসংঘ বা মিলিত সংঘের গঠনের সূচনা হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

যে অল্প কয়েকটা তথ্য থেকে এই সংগঠনের চরিত্রটাকে বোঝা যায়, সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে সংক্ষেপে একবার দেখে নেওয়া যাক যে নিজের স্বল্প-স্থায়ী জীবনে আঞ্চলিক আধিপত্য অর্জনের ব্যাপারে এই মিত্রসংঘ ঠিক কী কী করতে পেরেছিল।

১৪২৬ থেকে ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ—এই চুরানব্বই বছর জুড়ে মিত্রসংঘ তাদের আশপাশের গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকেছে। মেক্সিকো উপত্যকা থেকে দক্ষিণদিকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত অঞ্চলে এবং পূর্বদিকে সেই গুয়াতেমালা পর্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা দুর্বল ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধেই এরা সবথেকে বেশি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল। প্রথমে তারা তাদের নিকটতম গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সংখ্যাধিক্য আর কেন্দ্রীভূত কার্যকলাপের জোরে আজটেকদের মিত্রসংঘই জয়ী হয় এবং পরাজিত গোষ্ঠীগুলো এদের করদ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এই অঞ্চলে অসংখ্য ছোট ছোট গ্রাম ছিল। অনেক সময় রোদে-পোড়া ইঁট বা পাথরের তৈরি এক-একটা বিরাট বাসগৃহই এক-একটা গ্রাম হিসেবে বিবেচিত হত। আবার কোথাও কোথাও পাশাপাশি এ-রকম কয়েকটা বাসগৃহ নিয়ে গড়ে উঠত এক-একটা গ্রাম। এই যৌথ-আবাসগুলো আজটেকদের বিজয়-অভিযানে গুরুতর প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছিল। তবে এটা মোটেই কোন অনতিক্রম্য বাধা ছিল না। লুঠপাট, কর চাপানো এবং বলির জন্য বন্দী সংগ্রহ—এইসব ঘোষিত উদ্দেশ্যের জন্য মাঝে-মাঝেই এ-রকম আক্রমণ চালানো হত।[১] উল্লিখিত এলাকার মধ্যেকার কয়েকটা

১। উত্তরাঞ্চলের ইণ্ডিয়ানদের মত আজটেকরাও কখনও বন্দী-বিনিময় করত না বা বন্দীদের মুক্তিও দিত না। উত্তরাঞ্চলের ইণ্ডিয়ানদের কাছে বন্দীর বিধিলিপি ছিল একমাত্র মৃত্যুদণ্ডই, অবশ্য ঐ বন্দীকে কেউ দত্তক হিসেবে গ্রহণ করলে সে রক্ষা পেত। কিন্তু পুরোহিতদের শিক্ষার প্রভাবে আজটেকরা তাদের হতভাগ্য বন্দীদের জন্য অন্য শাস্তি নির্দিষ্ট করেছিল—নিজেদের প্রধান

গোষ্ঠী বাদে বাকি সবকটা প্রধান প্রধান গোষ্ঠী যতদিন না তাদের অধীনস্থ ও করদ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত চলেছে এই আক্রমণ। বর্তমান ভেরা ক্রুজের নিকটবর্তী টোটোনাক্যাকদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলোও তাদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল।

এই গোষ্ঠীগুলোকে আজটেক মিত্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার জন্য কোনরকম চেষ্টাই করা হয় নি, কারণ ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার দরুণ তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব ছিল না। ঐ গোষ্ঠীগুলো তাদের নিজেদের প্রধানদের দ্বারাই পরিচালিত হত এবং নিজের নিজের রীতি-প্রথা পালন করত। কোথাও কোথাও আজটেক মিত্রসংঘের একজন করে কর-সংগ্রাহক এদের মধ্যে বসবাস করত। এইসব বিজয়ের বন্ধ্যা ফলাফল থেকেই তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃত চরিত্রটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কর প্রদানে অনিচ্ছুক গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে শুধু জোর করে কর আদায় করার জন্যই দুর্বল গোষ্ঠীগুলোর উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করেছে সবল গোষ্ঠীগুলো, ফলে কোন জাতি গড়ে ওঠার এতটুকু সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয় নি। এরা যদি গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত হত, তাহলে কোন ব্যক্তি গোত্রের সদস্য না হলে শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারত না, এবং আজটেক, টেজ্‌কুকান বা ট্‌লাকোপানদের গোত্রগুলোর অন্তর্ভুক্ত না হয়ে অন্য কোন গোত্রও অংশগ্রহণ করতে পারত না শাসনব্যবস্থায়। শোনা যায় যে বিজিত লাতিন গোষ্ঠীসমূহের গোত্রগুলোর অন্তর্ভুক্ত জনসমষ্টিকে রোমে নিয়ে গিয়েছিলেন রোমুলাস। আজটেক মিত্রসংঘও এইভাবে বিজিত গেষ্ঠীগুলোকে নিজেদের এলাকায় নিয়ে আসতে পারত। কিন্তু, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করার কথা ধরে নিলেও বলা যায় যে এইরকম ধারণার জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। আবার পরাজিত পক্ষও একই কারণে নিজেদেরকে আজটেকদের সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযোগী করে নিতে বা বিজেতাদেরকে নিজেদের অঙ্গীভূত করে নিতে পারেনি। ফলে চারিদিকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মিত্রসংঘ কোন বাড়তি শক্তি

দেবতার উদ্দেশে বন্দীদেরকে বলি দিত তারা। বন্য এবং বর্বরদের বহু প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী এইভাবে জীবন নেওয়া, দেবতার কাজে বন্দীর জীবনকে এইভাবে ব্যবহার করাটা ছিল আসলে এদের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পুরোহিততন্ত্রের উন্মেষ এবং সে সম্পর্কে উচ্চ ধ্যান-ধারণারই ফল। আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে একটা সুসংগঠিত পুরোহিততন্ত্রের প্রথম উদ্ভব ঘটে বর্বর যুগের মধ্য অবস্থায়। দেবতার মূর্তি এবং নরবলি উদ্ভাবনের সঙ্গেও এই পুরোহিততন্ত্রের আবির্ভাবের নিকট সম্পর্ক ছিল। আসলে এটা ছিল ধর্মীয় মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে মানুষের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার একটা হাতিয়ার। সম্ভবত সর্বত্রই মানবজাতির সমস্ত প্রধান প্রধান গোষ্ঠীর মধ্যে এই একই ঘটনা ঘটেছে। বর্বরতার তিনটি উপ-পর্যায়ে বন্দীদের ব্যাপারে ক্রমান্বয়ে তিনটি প্রথা সামনে এসেছে। প্রথম প্রথাটায় বন্দীদেরকে খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হত, দ্বিতীয়টাতে তাদেরকে দেবতার উদ্দেশে বলি দেওয়া হত, এবং তৃতীয় পর্যায়ে এসে তাদেরকে পরিণত করা হত দাসে। তবে সব সময়ই তারা মনে করত যে বন্দীর জীবন হচ্ছে তার গ্রেপ্তারকারীর সম্পত্তি। এই বিশ্বাসটা মানুষের মনে এতই জাঁকিয়ে বসেছিল যে তা দূর করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল সভ্যতা এবং খ্রিষ্টিয়ান মতবাদের যুগ্ম শক্তির।

অর্জন করতে পারে নি। ঐ-সব গোষ্ঠীগুলোর ওপর নানান বোঝা চাপিয়ে রাখার ফলে তারা পরিণত হয়েছিল মিত্রসঙ্ঘের শত্রুতে এবং সারাক্ষণই তারা চেষ্টা করত বিদ্রোহ করার। তবে মনে হয় যে অধীনস্থ গোষ্ঠীগুলোর সামরিক বাহিনীকে আজটেক মিত্রসঙ্ঘ কখনও কখনও ব্যবহার করত এবং লুঠের মাল তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিত। মিত্রসঙ্ঘ গঠন করার পর আজটেকদের উচিত ছিল বাকি নহট্ল্যাক গোষ্ঠীগুলোকেও ঐ মিত্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। কিন্তু এ-কাজ তারা করতে পারে নি। ক্সোচিমিল্কা এবং চাল্কানরা মিত্রসঙ্ঘের সদস্য ছিল না। তবে, করদ গোষ্ঠী হলেও, একটা ন্যূনতম স্বাধীনতা উপভোগ করত তারা।

আজটেকদের তথাকথিত রাজ্য বা সাম্রাজ্যের বস্তুগত ভিত্তি সম্বন্ধে এর থেকে বেশি আর কিছুই প্রায় জানা যায় না। পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব, পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিভিন্ন বৈরী ও স্বাধীন গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধতো মিত্রসঙ্ঘের। পশ্চিমদিকে ছিল মেচোআকান্রা, উত্তর-পশ্চিম দিকে ওটোমিরা (উপত্যকার কাছাকাছি ওটোমিদের যে ছড়ানো-ছিটোনো দলগুলি ছিল, তারা মিত্রসঙ্ঘকে কর দিত), ওটোমিদের উত্তর দিকে ছিল চিচিমেক্ বা হিংস্র গোষ্ঠীগুলো, উত্তর-পূর্বদিকে মেজাটিটিট্লানরা, পূর্বদিকে ট্লাসকালানরা, দক্ষিণ-পূর্বদিকে চোলুলান আর হুয়েক্সোট্জিন্কোরা, এবং এদের পিছন দিকে ছিল টাবাস্কো, চিআপা আর জ্যাপোটেক গোষ্ঠীগুলো। এইসব দিকে আজটেক মিত্রসঙ্ঘের এলাকা একশ মাইলের বেশি বিস্তৃত হতে পারে নি। আবার এই এলাকাটুকুর মধ্যেও কিছুটা করে জায়গা নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা ছিল যা তাদের চিরস্থায়ী শত্রুদের থেকে মিত্রসংঘকে পৃথক করে রাখত। এইটুকুর ভিত্তিতেই স্পেনিয় লেখকরা ঐ 'মেক্সিকো রাজ্যে'র কথা বানিয়েছিল, পরবর্তীকালে যা 'আজটেক সাম্রাজ্য' হিসেবে অতিরঞ্জিত হয়েছে।

উপত্যকা অঞ্চলের লোকসংখ্যা এবং মেক্সিকোর পুয়েব্লো সম্বন্ধে দু' চার কথা এখানে বলা দরকার। উপত্যকায় যে পাঁচটা নহট্ল্যাক্ গোষ্ঠী বসবাস করত, তাদের লোকসংখ্যা নিশ্চিতভাবে জানার আর কোন উপায় নেই। যে-কোন হিসেবই অনুমান-ভিত্তিক হতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে তাদের কৃষি, জীবনধারণের উপকরণ, প্রতিষ্ঠান, সীমিত এলাকা এবং প্রাপ্ত করের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে এদের লোকসংখ্যা ছিল বড়জোর মোট আড়াই লক্ষ। মানে প্রতি বর্গমাইলে মোটামুটি একশ ষাট জন করে লোক ছিল। অর্থাৎ নিউ ইয়র্কের বর্তমান গড় লোকসংখ্যার থেকে প্রায় দ্বিগুণ এবং রোড আইল্যাণ্ডের গড় লোকসংখ্যার প্রায় সমান। উপত্যকা অঞ্চলে মোটামুটি তিরিশ-চল্লিশটা গ্রাম ছিল। এই কটা গ্রামে এত বিপুল লোকসংখ্যা কিভাবে সম্ভব, তা বোঝা মুস্কিল। এদের লোকসংখ্যা আরও বেশি ছিল বলে যাঁরা দাবি করেন, তাঁদেরকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে সবরকম সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়েও আজকের সভ্য জাতিগুলো ঐ একই আয়তনের এলাকার মধ্যে যতজন অধিবাসীর ভরণ-পোষণ করতে পারে, তার থেকে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের ভরণ-পোষণ কিভাবে করত এমন কতকগুলো বর্বর গোষ্ঠী, যাদের না ছিল কোন গরু-ভেড়ার

পাল, না জানত ক্ষেত-চাষের পদ্ধতি। নেহাতই সাদামাটা একটা কারণে এটা প্রমাণ করা যাবে না। কারণটা হল—ঐ দাবিটা আদৌ সত্য নয়। এদের জনসংখ্যার মধ্যে সম্ভবত তিরিশ হাজারের মত লোক বসবাস করত মেক্সিকোর পুয়েব্লোয়।[১]

যে তথ্যগুলো আমরা পেয়েছি, তার বাইরে গিয়ে ঐ উপত্যকার গোষ্ঠীগুলোর অবস্থা ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা নিতান্তই অর্থহীন হবে। আমেরিকান আদিবাসীদের ইতিহাস থেকে আজটেক রাজতন্ত্রের কথাটা বাদ দেওয়া দরকার, কেননা এটা একটা ভ্রান্ত মতবাদ তো বটেই, উপরন্তু এটা ইণ্ডিয়ানদেরকে ভুলভাবে উপস্থাপিত করে থাকে। কারণ এই ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কখনোই রাজতন্ত্র গড়ে ওঠে নি। গোষ্ঠী-গুলোর একটা মিত্রসংঘই ছিল এদের সরকার। আর সম্ভবত ইরোকোয়াদের মিত্রসংঘের কাঠামো আর ভারসাম্য যেমন ছিল, এদের মিত্রসংঘের কাঠামো আর ভারসাম্য ঠিক তেমনটা ছিল না। এদের এই সংগঠন নিয়ে আলোচনার সময় এদের সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে সমর-নায়ক, সাকেম্ আর প্রধানদের ব্যাপারটা বিবেচনা করলেই আমাদের কাজ চলে যাবে।

মেক্সিকোর পুয়েব্লোটাই ছিল সারা আমেরিকার বৃহত্তম পুয়েব্লো। এদের এলাকাটা বড় স্বপ্নিল—কৃত্রিম হ্রদের মাঝখানে একটুকরো বাসভূমি, জিপ্সামের পলেস্তারা লাগানো বড় যৌথ আবাসগৃহ। জিপ্সামের জেল্লায় বাড়িগুলো উজ্জ্বল আলোয় সাদা ঝক্মকে, হ্রদের বুক চিরে এগিয়ে গেছে বাঁধানো পথ। দূর থেকে স্পেনিয়রা তাকিয়ে ছিল এই

১। স্পেনিয়দের ইতিহাসে মেক্সিকোর লোকসংখ্যার ব্যাপারে যে-সব হিসেব পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ফারাক আছে। তবে বেশ কিছু স্পেনিয় লেখক এক বিস্ময়কর হিসেব দিয়েছেন। এঁরা বলেছেন—মেক্সিকোর লোকসংখ্যা ছিল ষাট হাজার! জুআজো, যিনি ১৫২১ খ্রিষ্টাব্দে মেক্সিকোয় গিয়েছিলেন, তিনি লিখেছেন যে ওখানে ষাট হাজার বাসিন্দা ছিল (প্রেসকট, "কংকোয়েস্ট অফ মেক্সিকো", ২, ১১২, টীকা); কোর্টেস-এর সঙ্গে যে 'অনামী বিজেতা' ছিলেন, তিনিও ষাট হাজার বাসিন্দার কথা লিখেছেন, "Soixante mille habitans" ("এইচ. টার্ন্উ-কম্প্যান্স", ১০, ৯২); কিন্তু গোমোরা এবং মার্টির ষাট হাজার বাড়ির কথা লিখেছেন আর এই হিসেবটাই গ্রহণ করেছেন ক্লাভিগেরো ("হিস্ট্রি অফ মেক্সিকো", ২ ৩৬০). হেরেরা ("হিস্ট্রি অফ আমেরিকা", ২, ৩৫০) এবং প্রেস্কট ("কংকোয়েস্ট অফ মেক্সিকো", ২, ১১২)। সলিস বলেছেন যে ষাট হাজার পরিবার ছিল ("হিস্ট্রি অফ দ্য কনকোয়েস্ট অফ মেক্সিকো, I. C", ১, ৩১৩)। এই হিসেব অনুযায়ী লোকসংখ্যা দাঁড়ায় তিন লক্ষে, যদিও সেই সময় লণ্ডনের লোকসংখ্যা ছিল মোটে দেড় লক্ষ (ব্ল্যাকস, 'লণ্ডন', পৃঃ ৫)। আর শেষমেশ টর্কেমাডা, যাঁর হিসেবটা ক্লাভিগেরো উল্লেখ করেছেন (২, ৩৬০, টীকা), তিনি একেবারে বুক ফুলিয়ে লিখেছেন—এক লাখ বিশ হাজার বাড়ি ছিল ওখানে! নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে ঐ পুয়েব্লোয় বাড়িগুলো ছিল সাধারণত বড় বড় সার্বজনীন বাড়ি বা যৌথ আবাসগৃহ। নিউ মেক্সিকোতেও তখন ঐ ধরণের বাড়ি দেখা যেত। এক-একটা বাড়িতে দশ থেকে পঞ্চাশটা পরিবার, এমনকি কখনও কখনও একশটা করে পরিবারও বাস করতে পারত। অর্থাৎ উপরোক্ত হিসেবগুলোয় বড় মর্মান্তিক ভ্রান্তি রয়ে গেছে। একমাত্র জুআজো আর 'অনামী বিজেতা'ই মোটামুটি মানানসই একটা হিসেব খাড়া করতে পেরেছিলেন, কেননা তাঁদের হিসেবটা সম্ভাব্য লোকসংখ্যার থেকে মাত্র দ্বিগুণ ছিল।

দৃশ্যের দিকে, এক চোখ-ধাঁধানো, মোহ-ছড়ানো ছবি ভেসে উঠেছিল তাদের চোখের মণিতে। ইওরোপিয় সমাজের থেকে পুরো দুটো ঐতিহাসিক যুগ পিছিয়ে থাকা একটা প্রাচীন সমাজের রহস্যাচ্ছন্ন দুয়ার ধীরে ধীরে খুলে গিয়েছিল তাদের সামনে। এই সমাজের সুবিন্যস্ত জীবনাচরণ পদ্ধতি স্পেনিয়দের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল কৌতূহল আর উদ্দীপনা। আর এ-সবের ফলে স্পেনিয়দের পক্ষে কিছু কিছু অতিরঞ্জিত মন্তব্য করে বসাটা প্রায় অপরিহার্যই ছিল।

আজটেকরা কতটা উন্নত হয়ে উঠেছিল, তা দেখানোর জন্য খানিক আগে আমরা কিছু বিবরণ দিয়েছি। এখানে আরও কয়েকটা বিষয় যোগ করা যায়। সাজানো-গোছানো বাগান, অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক পোশাকের ভাণ্ডার, উন্নত পোশাক-পরিচ্ছদ, তুলো থেকে বানানো উন্নততর গুণমানের বস্ত্রাদি, উন্নত যন্ত্রপাতি ও বাসনপত্র এবং নানা ধরণের নতুন নতুন খাদ্য—প্রগতির এইসব লক্ষণ দেখা দিয়েছিল আজটেকদের মধ্যে। ছবির সাহায্যে লিখতে শিখেছিল তারা (Picture writing) যা মূলত ব্যবহার করা হত অধীনস্ত গ্রামগুলোর কাছ থেকে কর হিসেবে কোন্ কোন্ জিনিস নেওয়া হবে তা বোঝানোর জন্য। সময়ের পরিমাপ করার জন্য একটা বর্ষপঞ্জী তৈরি করেছিল তারা এবং জিনিসপত্র বিনিময়ের জন্য গড়ে তুলেছিল খোলা বাজার। আস্তে আস্তে বেড়ে উঠছিল শহুরে জীবনযাত্রা আর তার নানান প্রয়োজন মেটানোর জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়। গড়ে উঠেছিল পুরোহিততন্ত্র, মন্দিরে উপাসনা এবং নরবলি দেওয়ার প্রথা। প্রধান সমর-নায়কের পদটার গুরুত্বও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তাদের অবস্থার এই দিকগুলো এবং অন্যান্য দিকগুলো—যেগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই—থেকে বোঝা যায় যে এগুলোর সঙ্গে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোরও বিকাশ ঘটেছিল। এগুলো হচ্ছে বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থা আর মধ্য অবস্থার মধ্যেকারই কতকগুলো পার্থক্য। ইরোকোয়া আর আজটেকদের অবস্থার তুলনা করলেই এগুলো চোখে পড়ে এবং এই উভয় গোষ্ঠীর আদি প্রতিষ্ঠানগুলো নিঃসন্দেহে একইরকম ছিল।

এই প্রাথমিক আলোচনাটুকুর পর আজটেকদের সমাজব্যবস্থার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও সবথেকে দুরূহ তিনটি প্রশ্নের মুখোমুখি হই আমরা। প্রথমটা হচ্ছে গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রশ্ন, দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্রধানদের পরিষদের অস্তিত্ব ও তার কার্যকলাপ সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং তৃতীয়টা হল সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কের (যে পদে অধিষ্ঠিত ছিল মণ্টেজুমা) অস্তিত্ব তার কার্যকলাপ বিষয়ক প্রশ্ন।

১। গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের অস্তিত্ব

এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার যে পুরনো আমলের স্পেনিয় লেখকরা আজটেকদের মধ্যে কোন গোত্রের সন্ধান পান নি। অবশ্য এদের মধ্যে গোত্র আদৌ থেকে না থাকলে আলাদা কথা। কিন্তু ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের লোকেরা দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে ইরোকোয়াদের মধ্যে কোন গোত্র আবিষ্কার

করতে পারে নি। অনেকদিন আগেই দেখানো হয়েছিল যে এদের মধ্যে বিভিন্ন পশুর নামে বিভিন্ন বংশ আছে, কিন্তু কখনোই ভাবা হয়নি যে এটাই হচ্ছে সমাজব্যবস্থার সেই প্রাথমিক একক যার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে গোষ্ঠী আর মিত্রসংঘ।[১] স্পেন অধিকৃত আমেরিকার গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব লক্ষ করার ব্যাপারে স্পেনিয় পর্যবেক্ষকরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল না। আর এখন গোত্রের অস্তিত্বের কথা জানা গেলে বুঝতে হবে যে ঐ-সব পর্যবেক্ষকরা মোটেই বিষয়টির গভীরে যেতে পারেন নি।

স্পেনিয় লেখকদের রচনাপত্রে এমন বহু পরোক্ষ ও বিক্ষিপ্ত প্রমাণ ছড়িয়ে আছে, যেগুলো গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের অস্তিত্বের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে। এ-রকম কয়েকটা প্রমাণ নিয়েই এখন আমরা আলোচনা করব। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে "জ্ঞাতিত্ব" শব্দটাকে হেরেরা বহুবার ব্যবহার করেছেন। আমরা এ-ও দেখিয়েছি যে এই শব্দটার সাহায্যে তিনি এমন একদল লোকের কথা বলতে চেয়েছেন, যারা পরস্পরের সঙ্গে রক্তসম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। দলগুলোর আয়তন থেকে মনে হয় যে এগুলো আসলে গোত্রই ছিল। বৃহত্তর দলগুলোর কথা বোঝাতে কখনও কখনও "বংশ" কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে। এই দলগুলোর মধ্যে যেন ভ্রাতৃত্বেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মেক্সিকোর পুয়েব্লোটা ভৌগোলিকভাবে চার ভাগে বিভক্ত ছিল, একেকটা ভাগে একেকটা বংশ বসবাস করত। বংশ বলতে বোঝানো হচ্ছে এমন একদল মানুষকে, যাদের নিজেদের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ যতটা ঘনিষ্ঠ, অন্য অন্য ভাগের বাসিন্দাদের সঙ্গে ততটা ঘনিষ্ঠ নয়। সম্ভবত এক-একটা বংশই ছিল আসলে এক-একটা ভ্রাতৃত্ব। ঐ চারটি ভাগের প্রতিটার মধ্যেও আবার নানান ভাগ ছিল। এইসব ভাগে বসবাস করত কোন-না-কোন সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ একদল মানুষ।[২] সম্ভবত এই ছোট ছোট জনগোষ্ঠীগুলোই ছিল এক-একটা গোত্র। এদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ট্লাসকালান গোষ্ঠীর মধ্যেও প্রায় একই ব্যাপার চোখে পড়ে। এদের পুয়েব্লোটাও চার ভাগে বিভক্ত ছিল, একেকটা ভাগে বাস করত একেকটা বংশ। প্রতিটি বংশের নিজস্ব টিউক্ট্লি বা প্রধান সমর-নায়ক থাকত, থাকত নিজস্ব সামরিক উর্দি এবং নিজস্ব নিশান ও কুলপ্রতীক।[৩] একটা ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে এরা একটাই প্রধান-পরিষদের শাসনাধীনে থাকত, যাকে স্পেনিয়রা চিহ্নিত করেছিল ট্লাসকালান শাসকসভা নামে।[৪] চোলুলা-দের মধ্যেও ছ'টা ভাগ ছিল, যেগুলোকে হেরেরা বিভাগ বা তৌজি (ward) হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৫] এদের ক্ষেত্রেও আমরা একই সিদ্ধান্তে

১। "লীগ অফ দ্য ইরোকোয়া", পৃঃ ৭৮।

২। হেরেরা, iii, ১৯৪, ২০৯।

৩। হেরেরা, iii, ২৭৯, ৩০৪; ক্লাভিগেরো, i, ১৪৬।

৪। ক্লাভিগেরো, i, ১৪৭; চারজন সমর-প্রধান তাঁদের পদাধিকার বলেই পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত হতেন। ঐ, ii, ১৩৭।

৫। হেরেরা, ii, ৩১০।

উপনীত হই। আজটেকরা তাদের সামাজিক বিভাজন অনুযায়ী নিজেদের পুয়ো-রোটাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল। তাদের বসবাসের পদ্ধতি অনুসারেই গড়ে উঠেছিল এইসব ভৌগোলিক এলাকাগুলো। অ্যাকস্টা এবং পরবর্তীকালে হেরেরা মেক্সিকোর গড়ে ওঠার সময়ে এইসব 'ভাগগুলো'-র সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন, সেই বিবরণকে এই ব্যাখ্যার আলোকে বিচার করলে আমরা এ ব্যাপারে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেতে পারি। "দেবমূর্তি রাখার জন্য চুণ আর পাথর দিয়ে তৈরি একটি ভজনালয়" নির্মাণের কথা উল্লেখ করার পর হেরেরা লিখছেন ঃ "ভজনালয় তৈরি হওয়ার পর দেবমূর্তিটি পুরোহিতকে আদেশ দিল যে সে যেন প্রধান ব্যক্তিদেরকে হুকুম দেয় তাদের নিজের জ্ঞাতি ও অনুগামীদের নিয়ে চারটি বিভাগ বা ভাগে ভাগ হয়ে যেতে এবং ভজনালয়টাকে ঠিক মাঝে রেখে তার চারদিকে প্রত্যেকে যেন তাদের আপন পছন্দমত বাড়ি তৈরি করে নেয়। এগুলোই হচ্ছে মেক্সিকোর সেই চারটি ভাগ, যেগুলোকে এখন যথাক্রমে বলা হয় সেণ্ট জন, সেণ্ট মেরী দ্য রাউণ্ড, সেণ্ট পল এবং সেণ্ট সেবাস্টিয়ান। ভাগ চারটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর দেবমূর্তিটি নির্দেশ দিল —আমি যে যে দেবতার নাম করব তাদেরকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও আর তাঁদের উপাসনার জন্য প্রতিটি বিভাগে এক-একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে নাও। তাই দেখা যায় প্রতিটা ভাগের মধ্যে বিভিন্ন ছোট ছোট বিভাগ আছে। ঐ দেবমূর্তি উপাসনার জন্য যতগুলো দেবতার নাম করেছিল, ততগুলো ছোট ছোট বিভাগও গড়ে উঠেছিল ···। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল মেক্সিকো, টেনোচ্‌টিট্‌লান···। উপরোক্ত এলাকা-বণ্টন সম্পূর্ণ হওয়ার পর যারা মনে করেছিল যে তারা অন্যায় আচরণের শিকার হয়েছে, তারা নিজের নিজের জ্ঞাতি ও অনুগামীদের নিয়ে অন্য বাসস্থানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল।"[১] এই শেষোক্তরা চলে গিয়েছিল পার্শ্ববর্তী ট্‌লাটেলিউকো অঞ্চলে। হেরেরার বক্তব্যের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে তারা প্রথমে চারটি সাধারণ ভাগে বিভক্ত হয়েছিল, তারপর ভাগগুলোর মধ্যে আবার কিছু ছোট শাখা সৃষ্টি হয়। বিষয়টার যে ফলাফলের কথা হেরেরা বলেছেন, তা এই সূত্র অনুযায়ীই এগোতে বাধ্য। কিন্তু বাস্তবে প্রক্রিয়াটা ছিল ঠিক এর বিপরীত। পরস্পরের সঙ্গে রক্তসম্বন্ধযুক্ত এক-একদল মানুষ এক-একটা এলাকায় বসবাস করত। আর এই ধরণের বিভিন্ন দলগুলোর বসবাসের এলাকা এমনভাবে গড়ে উঠেছিল, যা সব-থেকে ঘনিষ্ঠ দলগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে একটা ভৌগোলিক সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধতে পেরেছিল। যদি ধরে নিই যে ক্ষুদ্রতম ভাগগুলো ছিল এক-একটা গোত্র আর প্রতিটা বড় বড় ভাগে বসবাস করত পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত গোত্রগুলোকে নিয়ে গড়ে ওঠা এক-একটা ভ্রাতৃত্ব—তাহলে ঐ পুয়েরোয় আজটেকদের প্রাথমিক বিভাজনটাকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এই অনুমানটা ছাড়া ব্যাপারটার আর কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। গোত্র, ভ্রাতৃত্ব আর গোষ্ঠীর ভিত্তিতে সংগঠিত একদল মানুষ যখন কোন শহর বা

১। হেরেরা, iii, ১১৪।

নগরে বসতি স্থাপন করত, তখন তাদের সামাজিক সংগঠনের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসেবে তারা এক-একটা গোত্র এবং এক-একটা গোষ্ঠী রূপে আলাদা আলাদা অস্তিত্ব নিয়েই বাস করত। গ্রীক ও রোমান গোষ্ঠীগুলোও তাদের শহরগুলোতে এইভাবেই বসবাস করত। যেমন, গোত্র ও কিউরিয়ার (কিউরিয়া হচ্ছে ভ্রাতৃত্বেরই অনুরূপ সংগঠন) ভিত্তিতে সংগঠিত তিনটি রোমান গোষ্ঠী এক-একটা গোত্র, কিউরিয়া ও গোষ্ঠী অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভাবে বসবাস করত রোমের বুকে। র‍্যাম্‌নেরা বাস করত প্যালাটাইন পাহাড়ে, টিটিদের অধিকাংশই থাকত কুইরিনাল অঞ্চলে, আর লিউসেরেস্‌রা মূলত এস্‌কুইনলাইন অঞ্চলে বসবাস করত। আজটেকরা যদি একটাই গোষ্ঠী হয়ে থাকে আর তাদের মধ্যে গোত্র ও ভ্রাতৃত্ব থেকে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে যতগুলো ভ্রাতৃত্ব ঠিক ততগুলোই আঞ্চলিক ভাগও থাকবে, যেখানে একই ভ্রাতৃত্বের প্রতিটা গোত্র নিজেদের অঞ্চলের মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে বসবাস করে থাকে। স্বামী এবং স্ত্রী যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সদস্য ছিল এবং পুরুষ-ধারা অথবা স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণীত হত বলে তাদের সন্তানরা যেহেতু বাবার কিংবা মায়ের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত, তাই প্রত্যেকটা এলাকায় গোত্রের লোকসংখ্যাই সবথেকে বেশি হত।

এইসব বিভাজনের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল তাদের সামরিক সংগঠন। ঠিক যেমন নেস্টর অ্যাগামেম্‌ননকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ভ্রাতৃত্ব এবং গোষ্ঠী অনুযায়ী সৈন্য-বাহিনীকে বিন্যস্ত করার, তেমনভাবেই আজটেকরাও নিজেদেরকে বিন্যস্ত করেছিল গোত্র ও ভ্রাতৃত্ব অনুযায়ী। ঐ অঞ্চলের স্থানীয় লেখক টেজোজোম্যাক্‌ তাঁর 'মেক্সিকো ক্রনিক্‌ল্‌স্‌' গ্রন্থে (নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটা আমি পেয়েছি আমার বন্ধু ইলিনয়ের হাইল্যাণ্ডের অধিবাসী মিঃ অ্যাড. এফ. ব্যাণ্ডেলিয়র-এর কাছ থেকে; মিঃ ব্যাণ্ডেলিয়র এখন ঐ গ্রন্থটি অনুবাদ করছেন) মিচোআকান-এর ওপর একটা প্রস্তাবিত হামলার কথা জানিয়েছেন। অ্যাক্সইক্যাট্‌ল "মেক্সিকান সেনাপতি ট্‌লাকাএলেক্যাট্‌ল ও ট্‌লাকোট্‌কাল্‌কাট্‌লের সঙ্গে ও অন্যান্য সকলের সঙ্গে কথা বললেন এবং খোঁজ নিলেন যে প্রতিটি বিভাগ তাদের রীতি ও প্রথা উদ্‌যাপিত করে নিজের নিজের সেনাপতির নেতৃত্বে প্রস্তুত হয়েছে কিনা। তারপর তিনি বললেন যে সকলে প্রস্তুত হয়ে থাকলে অভিযান শুরু করা যাক এবং সকলে আবার পুনর্মিলিত হবে মাট্‌লাজিঙ্কো টোলুকা-য়।"[১] এ থেকে বোঝা যায় যে এদের সামরিক সংগঠন গঠিত হয়েছিল এক-একটা গোত্র ও ভ্রাতৃত্ব অনুযায়ী।

আজটেকদের মধ্যে জমি ভোগদখলের যে নিয়ম চালু ছিল, তা থেকেও এদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্বের কথা অনুমান করা যায়। ক্ল্যাভিগেরো বলেছেন, "যে জমিগুলোকে অ্যাল্‌টেপেট্‌লাল্লি (অ্যাল্‌টেপেট্‌ল=পুয়েব্লো) অর্থাৎ শহরের আর গ্রামের জন-গোষ্ঠীগুলোর জমি বলা হত, সেগুলো ভাগ করা হত এইভাবে—একটা শহরে

১। "ক্রনিকা মেক্সিকানা", দ্য ফার্নাণ্ডো দ্য আলভারাডা টেজোজোম্যাক্‌। পরিচ্ছেদ ৫১, পৃঃ ৮৩, কিংসবরো, v, ix।

BanglaBook.org

যতগুলো বিভাগ, জমির ভাগও ঠিক ততগুলো ; প্রতিটা বিভাগের নিজের জমি অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং কেউই কারুর ওপর নির্ভরশীল নয়। এই জমি-গুলোকে কোনভাবেই হস্তান্তরিত করা যেত না।"[১] এই প্রতিটা জনগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা এক-একটা গোত্রেরই ছায়া দেখতে পাই। এক-একটা অঞ্চলে এগুলোর কেন্দ্রীভূত হওয়াটা ছিল আসলে তাদের সমাজব্যবস্থারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ক্ল্যাভিগেরো বলেছেন যে এক-একটা বিভাগে এক-একটা জনগোষ্ঠী বসবাস করত। আসলে এক-একটা জনগোষ্ঠীই এক-একটা বিভাগ গড়ে তুলত এবং সেই বিভাগের জমিটা ঐ জনগোষ্ঠীর সার্বজনীন সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত। প্রতিটা জনগোষ্ঠীকে একসূত্রে বেঁধে রাখত যে জ্ঞাতিত্ববন্ধন, তার কথা অবশ্য ক্ল্যাভিগেরো উল্লেখ করেননি। তবে হেরেরা এই বিষয়টার কথা বলেছেন—"আরও কিছু শাসক ছিল,যাদেরকে বলা হত প্রধান পুরুষ (সাকেম)। এদের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি এক-একটা বংশের (গোত্রের) হাতে থাকত। নিউ স্পেনে লোকজনের বসবাস শুরু হওয়ার পর যখন জমি বণ্টন করা হয়, তখন এ-রকম অনেকগুলো বংশ ছিল। সেইসময় প্রতিটা বংশ নিজের নিজের ভাগের জমি পায় এবং এখনও পর্যন্ত সেই জমিগুলো সেই সেই বংশের হাতেই আছে। এই জমিগুলো নির্দিষ্টভাবে কারুর একলার জমি নয়, সার্বজনীন জমি। কোন জমিই কেউ বিক্রি করতে পারত না, তবে সারাজীবন ধরে ভোগ-দখল করতে পারত এবং নিজের পুত্র-দেরকে ও উত্তরাধিকারীদেরকে সেই জমি দিয়েও যেতে পারত। কোন কুল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে তাদের জমিটা তুলে দেওয়া হত ঐ একই বিভাগের বা বংশের পরিচালক নিকটতম প্রধান পুরুষের (সাকেমের) হাতে, আর কাউকে তা দেওয়া হত না।"[২] এই লক্ষণীয় বক্তব্যটার মধ্যে আজটেকদের প্রতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে বিদ্যমান তত্ত্বগুলোর সঙ্গে তথ্যকে মেলাতে গিয়ে আমাদের লেখকটি যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তিনি এমন এক আজটেক শাসকের কথা বলছেন, যে সামন্ত মালিক হিসেবে জমির স্বত্ব ভোগ করে, যার পদের একটা খেতাবও আছে এবং এই স্বত্ব আর খেতাব সে তার পুত্র ও উত্তরাধিকারীদের হাতে তুলে দিয়ে যায়। তবে একান্ত সত্যনিষ্ঠভাবে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা জানিয়েছেন যে জমি ছিল রক্তসম্বন্ধযুক্ত একদল মানুষের সম্পত্তি, যাদের মধ্যে ঐ শাসক ছিল প্রধান পুরুষস্বরূপ, অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায় যে সে ছিল গোত্রের সাকেম্ এবং জমিগুলো ছিল গোত্রের সার্বজনীন সম্পত্তি। ঐ শাসকটি ছিল আসলে জমির জিম্মাদার—এ কথাটা একেবারেই অর্থহীন। ইণ্ডিয়ান প্রধানরা গোত্রের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল, প্রতিটা গোত্রের কিছুটা করে সার্বজনীন জমি থাকত এবং হেরেরা বলেছেন যে প্রধান মারা গেলে তার পুত্র তার জায়গায় প্রধান হত। এ পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিক কোন স্পেনিয় তালুক আর খেতাবের মতই। আর ভ্রান্ত ধারণাটা সৃষ্টি

১। "হিস্ট্রি অফ মেক্সিকো", ii. ১৪১।

২। "হিস্ট্রি অফ আমেরিকা", iii. ৩১৪, স্পেনিয় ভাষার মূল পাঠ থেকে উপরের উদ্ধৃতিটা ইংরিজিতে অনুবাদ করেছেন মিঃ ব্যাণ্ডেলিয়ের।

BanglaBook.org

হয়েছিল প্রধান পদের প্রকৃতি ও তা ভোগ-দখলের শর্তগুলো সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব থেকেই। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল যে বাবার পরে পদটা তার ছেলে পায়নি, পেয়েছে অন্য কোন লোক। আর তাই লেখা হয়েছে যে, কোন কুলের (alguna case, আরেকটি সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য) সকলে মারা গেলে ওগুলো [জমিগুলো] তুলে দেওয়া হত নিকটতম প্রধান পুরুষের হাতে, অর্থাৎ অন্য আরেকজন লোক সাকেম্ হিসেবে নির্বাচিত হত—কথাটা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায়। স্পেনিয় লেখকদের রচনাপত্রে আমরা ইণ্ডিয়ান প্রধানদের সম্বন্ধে এবং গোষ্ঠীগুলোর জমি ভোগ-দখলের শর্তাদি সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পাই, সেটুকু সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভাষায় কণ্টকিত, অথচ ঐ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কোন অস্তিত্বই ছিল না। স্পেনিয় লেখকদের দ্বারা ব্যবহৃত 'বংশ' শব্দটার মধ্যে আমরা আজটেকদের গোত্রের ইঙ্গিত পাই। 'শাসক' শব্দটা আজটেকদের সাকেম্কেই বোঝায়। আমরা আগে যাদের কথা বলেছি, তাদের মতই এদের মধ্যেও সাকেম্ পদটা ছিল গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক এবং গোত্রের সদস্যদের মধ্যে থেকে তাকে বাছাই করা হত। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ-ধারা চালু থেকে থাকলে পদটা পেত মৃত সাকেমের কোন আপন অথবা জ্ঞাতিসম্পর্কিত পুত্র কিংবা তার কোন পৌত্র, অথবা কোন আপন বা জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাই। কিন্তু বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারা চালু থেকে থাকলে পদটা পেত মৃত সাকেমের কোন আপন বা জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাই কিংবা ভাগ্নে—যেমনটা আমরা অন্যদের ব্যাপারে আগেই বলেছি। সাকেম্কে 'মালিক' বলে মনে করা হত, যেহেতু সে একটা চিরস্থায়ী পদের অধিকারী ছিল এবং যেহেতু গোত্রের হাতে চিরস্থায়ীভাবে কিছু জমি থাকত আর সেই গোত্রের সে ছিল সাকেম্। সাকেমের পদ আর তা ভোগ-দখলের শর্তাদি সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণাটা আমাদের আদিবাসী বিষয়ক ইতিহাসে অসংখ্য ভুলের জন্ম দিয়েছে। হেরেরা কথিত 'বংশ' আর ক্ল্যাভিগেরো কথিত 'জনগোষ্ঠী' শব্দগুলো স্পষ্টত সংগঠনকেই চিহ্নিত করে এবং চিহ্নিত করে একই সংগঠনকে। আমরা ধরেই নিতে পারি যে আসল সত্যটাকে ধরতে না পারলেও এই জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে তাঁরা আজটেকদের সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক এককের, অর্থাৎ গোত্রের, সন্ধান পেয়েছিলেন।

স্পেনিয় লেখকরা ইণ্ডিয়ান প্রধানদেরকে চিহ্নিত করেছেন শাসক নামে এবং জমি-জমা আর লোকজনের ওপর তাদের এমন সব অধিকারের কথা বলেছেন যে অধিকারগুলো এই প্রধানদের হাতে কখনোই ছিল না। কোন ইণ্ডিয়ান প্রধানকে ইওরোপিয় ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী শাসক হিসেবে চিহ্নিত করাটা আসলে একটা ভ্রান্ত ধারণারই ফল। কারণ শাসক শব্দটা সমাজের এমন একটা অবস্থার সঙ্গে যুক্ত, যে অবস্থাটা ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ছিলই না। শাসকরা উত্তরাধিকারসূত্রে একটা বিশেষ পদমর্যাদা ও খেতাব পেয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ আইনের সাহায্যে সমগ্র জনসাধারণের অধিকার খর্ব করা হয় এবং সবটুকু অধিকার পুঞ্জীভূত হয় শাসকদের হাতে। সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের পর থেকে এই পদ আর খেতাবের সঙ্গে এমন কোন দায়িত্বকে যুক্ত করা হয়নি, যে দায়িত্বগুলো

BanglaBook.org

রাজা অথবা রাজত্বের কাছে কোনরকম অধিকার বলে প্রতিভাত হতে পারে। বিপরীত-পক্ষে, ইণ্ডিয়ান প্রধানরা উত্তরাধিকারসূত্রে পদাধিকারী হন না। এলাকার মানুষরা তাদেরকে নির্বাচিত করে এবং উপযুক্ত কারণে তাদেরকে বরখাস্ত করার অধিকারও থাকে ঐ মানুষদের হাতে। প্রধানের পদ পেলে এলাকার মানুষের মঙ্গলের জন্য কতকগুলো কাজ করা বাধ্যতামূলক। গোত্রের সদস্যদের ওপর অথবা তাদের সম্পত্তি বা জমিজমার ওপর তার কোনরকম কর্তৃত্ব থাকে না। এ থেকে বোঝা যায় যে একজন শাসক আর তার খেতাবের সঙ্গে কোন ইণ্ডিয়ান প্রধান আর তার পদের কোন সাদৃশ্যই ছিল না। প্রথমজন একটা রাজনৈতিক সমাজের সদস্য এবং বহুজনের ওপর অল্প কয়েকজনের শাসনের প্রতিভূ। দ্বিতীয়জন একটা গোত্রভিত্তিক সমাজের সদস্য এবং গোত্রের সদস্যদের সার্ব-জনীন স্বার্থই তার পদের ভিত্তি। গোত্র, ভ্রাতৃত্ব কিংবা গোষ্ঠীর মধ্যে অসম সুবিধার কোন স্থান নেই।

আজটেকদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্বের আরও নানান প্রমাণ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি। এছাড়া, ঐ সাংগঠনিক ক্রমের দুটি উচ্চতর স্তর অর্থাৎ গোষ্ঠী ও মিত্রসঙ্ঘের অস্তিত্ব এবং অন্যান্য প্রায় সব গোষ্ঠীর মধ্যেই গোত্রের অস্তিত্ব আজটেকদের মধ্যেও গোত্রের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। পুরনো আমলের স্পেনিয় লেখকরা আর একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান চালালে এ ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারতাম আর তার ফলে আজটেকদের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণাটাই একেবারে পাল্টে যেত।

আজটেকদের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত রীতি-নীতির ব্যাপারে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি, তা বেশ বিভ্রান্তিকর ও পরস্পরবিরোধী। এ ব্যাপারে ঐ লেখকরা বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নি, শুধু বলেছেন যে রক্তসম্বন্ধযুক্ত কিছু লোক একসঙ্গে থাকত আর সন্তানরা তাদের বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত। এই শেষের ব্যাপারটা সত্য হয়ে থাকলে বুঝে নেওয়া যায় যে বংশধারা নির্ণীত হত পুরুষ-ধারা অনুযায়ী আর এ থেকে তাদের সম্পত্তির ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানটাও অনেক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সন্তানদের পক্ষে কোন নিরঙ্কুশ উত্তরাধিকার ভোগ করা সম্ভব ছিল না এবং কোন আজটেকের হাতে এমন এক ছটাক জমিও ছিল না যেটাকে সে নিজের বলে দাবি করতে পারত অথবা সেটা নিজের ইচ্ছেমত কাউকে বিক্রি করতে কিংবা দান করতে পারত।

২। প্রধানদের পরিষদের অস্তিত্ব ও তার কার্যকলাপ

ইণ্ডিয়ান সমাজের নিজস্ব কাঠামোকে বিচার করলে ধরে নেওয়া যায় যে আজটেকদের মধ্যে এই ধরণের একটা পরিষদের অস্তিত্ব ছিল। তত্ত্বগতভাবে দেখলে এই পরিষদ গড়ে উঠতে পারত সেইসব প্রধানদের নিয়ে যাদেরকে চিহ্নিত করা হত সাকেম্ নামে, যারা একদল রক্তসম্বন্ধযুক্ত মানুষের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী পদে অধিষ্ঠিত হত। এখানেও আমরা গোত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাচ্ছি। মানুষের চূড়ান্ত সামাজিক বিভাজনের

BanglaBook.org

পর এক-একটা বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করতে পারত তাদের মুখ্য প্রধানরাই—উত্তরাঞ্চলের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আমরা তাই দেখেছি। আজটেকদের মধ্যে এই প্রধানরা কোথা থেকে সৃষ্টি হল ভাবতে গেলে মেনে নিতেই হয় যে এদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল। আজটেকদের মধ্যে যে একটা পরিষদ ছিল, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই পরিষদে কতজন সদস্য থাকত আর কী কী কাজ সে করত—সে ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানতে পারিনি আমরা। ব্রাসিউর দ্য বুরবর্ণ সাধারণভাবে মন্তব্য করেছেন, "প্রায় প্রত্যেকটা শহর বা গোষ্ঠীই চারটি করে কুল বা অঞ্চলে বিভক্ত, আর কুল বা অঞ্চলগুলোর প্রধানদের নিয়েই গড়ে উঠে মূল পরিষদ।"[১] প্রতিটা অঞ্চল থেকে একজন করে প্রধানকে মূল পরিষদে নেওয়ার কথাই তিনি বলেছেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু অন্যত্র তিনি বলেছেন যে আজটেকদের পরিষদে চারজন প্রধান থাকত। দিয়েগো দরান্, যিনি ১৫৭৯-১৫৮১ সালে তাঁর গ্রন্থটি লিখেছিলেন (অর্থাৎ অ্যাকস্টা ও টেজোজোম্যাক্, দুজনের থেকেই আগে), তিনি বলেছেন, "প্রথমে অবশ্যই জানা দরকার যে মেক্সিকোতে একজন রাজাকে নির্বাচিত করার পর সেই রাজার ভাই বা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে থেকে চারজন শাসককে নির্বাচিত করা হত এবং তাদেরকে শাহজাদা (prince) নামে অভিহিত করা হত। এই চারজনের মধ্যে থেকেই নির্বাচন করা হত পরবর্তী রাজাকে [এই চারটি পদের নাম উল্লেখ করেছেন লেখক—টলাকাচ্কাল্কাট্ল, টলাকাটেকাল্, এজুআউআকাট্ল্ এবং ফিল্যান্কাল্ক্]···। শাহজাদা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর এই চারজন শাসককে রাজ-পরিষদের কার্যভার দেওয়া হয় এবং তাদের মতামত ছাড়া কোন কাজ করা চলে না—অনেকটা আমাদের সর্বোচ্চ পরিষদের সভাপতি ও বিচারকদের মত আর কি।"[২] অ্যাকস্টাও এই পদগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন এবং পদাধিকারীদেরকে "নির্বাচক" নামে অভিহিত করে বলেছেন যে, "এই চারটি পদের অধিকারীরাই ছিল মূল পরিষদের সদস্য এবং এদের পরামর্শ না নিয়ে রাজা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই করতে পারতেন না।"[৩] এই পদগুলোকে চারটি সারি হিসেবে দেখিয়ে হেরেরা লিখেছেন—"এই চার ধরণের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নিয়েই গড়ে উঠত সর্বোচ্চ পরিষদ, এদের পরামর্শ না নিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাজা করতে পারতেন না এবং শুধু এই চার ধরণের ব্যক্তিদের মধ্যে থেকেই পরবর্তী রাজাকে নির্বাচিত করা হত।"[৪] একজন প্রধান সমর-নায়ককে চিহ্নিত করার জন্য এঁরা ব্যবহার করেছেন 'রাজা' শব্দটা এবং প্রধানদের সাকেম পরিচয় দিতে ব্যবহার করেছেন

BanglaBook.org

১। "পোপোল্ ভাহ", ভূমিকা, পৃঃ ১১৭, টীকা ২।

২। "হিস্ট্রি অফ দ্য ইণ্ডিজ অফ নিউ স্পেন অ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডস অফ দ্য মেইন ল্যাণ্ড", মেক্সিকো, ১৮৬৭, জোস এফ. র‍্যামিরেজ কর্তৃক সম্পাদিত, পৃঃ ১০২, মূল পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত। অনুবাদ করেছেন মিঃ ব্যাণ্ডেলিয়ের।

৩। 'দ্য ন্যাচারাল অ্যাণ্ড মরাল হিস্ট্রি অফ দ্য ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজ' লণ্ডন সংস্করণ, ১৬০৪, গ্রিমস্টোনের অনুবাদ, পৃঃ ৪৮৫।

৪। "হিস্ট্রি অফ আমেরিকা", iii, ২২৪।

'শাহজাদা' শব্দটা। এইসব শব্দের সাহায্যে কোন রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি করা যায় না, কারণ তাদের মধ্যে এ-সবের কোন অস্তিত্ব ছিলই না। কিন্তু শব্দগুলোর এই ভ্রান্ত প্রয়োগ আমাদের আদিবাসীদের ইতিহাসকে দুর্বোধ্য ও বিকৃত করে তুলেছে, তাই এগুলোকে বাতিল করা উচিত। টেজোজোম্যাক লিখেছেন যে, হুয়োক্সাট্‌জিঙ্কো-রা যখন ট্‌লাস্‌কালানদের বিরুদ্ধে একটা মৈত্রী গড়ে তোলার প্রস্তাব জানিয়ে মেক্সিকোতে দূত পাঠায়, তখন মণ্টেজুমা সেই দূতদেরকে এইভাবে সম্ভাষণ করেন ঃ "ভ্রাতৃবৃন্দ এবং পুত্রগণ, তোমাদের স্বাগত জানাই। তোমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও। কারণ রাজা হলেও আমি একা তোমাদের প্রস্তাবের উত্তর দিতে পারব না। আমাদের পবিত্র মেক্সিকান শাসকসভার সমস্ত প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করে তবেই আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারব।"[১] উপরোক্ত বিবৃতিগুলো থেকে একটা সর্বোচ্চ পরিষদের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। প্রধান সমর-নায়কের কার্যকলাপকে এই পরিষদই নিয়ন্ত্রণ করত। এটাই হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ থেকে বোঝা যায় যে আজটেকরা নিজেদেরকে কোন দায়িত্বজ্ঞান-হীন স্বেচ্ছাচারীর হাতে ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। তাই তারা তার কার্যকলাপের ওপর প্রধানদের পরিষদের নিয়ন্ত্রণ চালু করেছিল এবং তার পদটাকে মনোনয়নযোগ্য ও বরখাস্তযোগ্য একটি পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এইসব লেখকদের সীমিত ও অসম্পূর্ণ বক্তব্যগুলো যদি বলতে চেয়ে থাকে যে এই পরিষদে মাত্র চারজন সদস্যই ছিল, যেমনটা বলেছেন দুরান্, তাহলে বলতে হয় যে তা সম্ভব ছিল না। এই পরিষদ সমগ্র আজটেক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করত না, বরং এটা ছিল রক্তসম্বন্ধযুক্ত কিছু মানুষের এক-একটা ছোট ছোট দলের প্রতিনিধি, যে দলগুলোর মধ্যে থেকেই তাদের সেনাপতি নির্বাচন করা হত। এটা প্রধানদের পরিষদ সংক্রান্ত তত্ত্ব নয়। এক-এক দল মানুষের প্রতিনিধি ছিল প্রতিটি প্রধান এবং সমস্ত প্রধানরা একযোগে গোটা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। সাধারণ পরিষদ গঠন করার জন্য কখনও কখনও তাদের মধ্যে থেকে কাউকে কাউকে বাছাই করা হত। কিন্তু একটা সাংগঠনিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই সদস্যসংখ্যা স্থির করা হত এবং এই ব্যবস্থার সাহায্যেই তা বরাবর বজায় রাখা হত। শোনা যায় যে টেজ্‌কুকানদের পরিষদে চোদ্দজন সদস্য ছিল[২], আবার ট্‌লাস্‌কালানদের পরিষদে থাকত বহু সংখ্যক সদস্য। ইণ্ডিয়ান সমাজের কাঠামো ও নীতি অনুযায়ী আজটেকদের মধ্যেও এ-রকম একটা পরিষদ থাকা দরকার ছিল, এবং তা ছিল বলেও আশা করা যায়। এই পরিষদের মধ্যেই আজটেকদের ইতিহাসের হারানো উপাদানের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আজটেক সমাজকে ভালভাবে উপলব্ধি করার জন্য এই পরিষদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞান একান্তই আবশ্যিক।

সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন ইতিহাসে এই পরিষদকে দেখানো হয়েছে মণ্টেজুমার একটা উপদেষ্টা-মণ্ডলী হিসেবে, তাঁর নিজের বাছাই-করা কিছু মন্ত্রীর একটা পরিষদ

১। "ক্রনিকা মেক্সিকানা", পরিচ্ছেদ ৯৭, ব্যাণ্ডেলিয়েরের অনুবাদ।

২। ইক্সট্‌লিল্‌জোচিট্‌ল, "Hist. chichimeca", কিংসবরো, "Mex, Antiq.", ix, পৃঃ ২৪৩.

BanglaBook.org

হিসেবে। যেমন, ক্ল্যাভিগেরো লিখেছেন: "এই বিজয়-অভিযানের ইতিহাসে আমরা দেখি যে স্পেনিয়দের নানান ছলনার ব্যাপার নিয়ে মণ্টেজুমা তাঁর পরিষদের সঙ্গে ঘন ঘন আলোচনায় বসেছেন। প্রতিনিধি পরিষদে কতজন করে সদস্য ছিল, তা আমরা জানি না। এ ব্যাপারে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য ঐতিহাসিকরাও আমাদের হাতে তুলে দেন নি।"[১] যে প্রশ্নগুলো নিয়ে সবথেকে আগে অনুসন্ধান চালানো দরকার, এটা তার অন্যতম। পুরনো আমলের লেখকরা এর গঠন ও কার্যকলাপ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ থেকেই তাঁদের কাজের ভাসা-ভাসা চরিত্রটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে, আমরা জানি যে প্রধানদের পরিষদ হচ্ছে এমন একটা প্রতিষ্ঠান যা জন্ম নিয়েছিল গোত্র সৃষ্টি হওয়ার পরই, যা বিভিন্ন নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধি এবং সুপ্রাচীন কাল থেকেই যার একটা নিজস্ব কর্মক্ষেত্র আর মৌলিক শাসনক্ষমতা রয়েছে। টেজ্‌কুকান ও ট্‌লকোপান পরিষদ, ট্‌লাস্‌কালান, চোলুলান ও মিচোআকান পরিষদের কথা আমরা জেনেছি। প্রতিটি পরিষদই গড়ে উঠেছিল প্রধানদের নিয়ে। এই নজির থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে আজটেক প্রধানদেরও একটা পরিষদ ছিল। কিন্তু বলা হচ্ছে যে একই বংশের চারজন সদস্যকে নিয়ে এই পরিষদ গড়ে উঠেছিল। এই রূপে আজটেক প্রধান-দের পরিষদ গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার প্রতিটি গোষ্ঠীরই যে নিজস্ব প্রধান-পরিষদ ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই পরিষদই ছিল গোষ্ঠীর পরিচালক সংস্থা এবং আদিবাসী অধ্যুষিত আমেরিকার সর্বত্রই এর এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে মানবজাতি আজ পর্যন্ত যত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, এই প্রধান-পরিষদই তার মধ্যে প্রাচীনতম। বিভিন্ন মহাদেশে অব্যাহত ধারাবাহিকতায় টিকে থেকেছে এই পরিষদ—বন্য যুগের উচ্চ অবস্থায় শুরু হয়ে, বর্বর যুগের তিনটি উপ-পর্যায় জুড়ে টিকে থেকে, এসে পৌঁছেছে সভ্য যুগের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত। সভ্য যুগে সৃষ্টি হয় গণ-পরিষদ এবং পুরনো পরিষদ পরিণত হয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিচার-বিবেচনা করার পরিষদে। এই প্রধান-পরিষদই জন্ম দিয়েছে দুই সংস্থায় বিভক্ত আধুনিক বিধানমণ্ডলের।

তিনটি গোষ্ঠীর মুখ্য প্রধানদের নিয়ে আজটেকদের কোন সাধারণ পরিষদ (যা ঐ তিনটি গোষ্ঠীর নিজ নিজ পরিষদের থেকে পৃথক) গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয় না। আজটেকদের সংগঠনটা আজটেক গোষ্ঠীর প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণাধীন একটা আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক সংঘ ছিল, নাকি এটা ছিল এমন এক মিত্রসংঘ যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলো একটা সুসমঞ্জস সমগ্রের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল—তা বুঝতে হলে আজটেকদের সাধারণ পরিষদের ব্যাপারটার একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দরকার। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এই সমস্যার সমাধান হবে।

৩। মুখ্য সমর-নায়ক পদের শর্তাবলী ও কার্যকলাপ

যতদূর জানা যায় তাতে আমরা দেখি যে মণ্টেজুমার পদটার নাম ছিল 'টিউক্‌ট্‌লি',

৩। "হিস্ট্রি অফ মেক্সিকো", ১৩২।

BanglaBook.org

অর্থাৎ সমর-নায়ক। প্রধানদের পরিষদেরও সদস্য ছিলেন তিনি, তাই কখনও কখনও তাঁকে 'ট্‌লাটোআনি' নামেও ডাকা হত। ট্‌লাটোআনি মানে হল হল 'বক্তা'। সামরিক সর্বাধিনায়কের পদটাই ছিল আজটেকদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদ। এই পদ ও তার শর্তাবলী ঠিক ইরোকোয়া মিত্রসঙ্ঘের প্রধান সেনাপতির পদ ও তার শর্তাবলীর মতই। কয়েকটা গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় যে কোন বিতর্কের ব্যাপারে বা নিজের মতামত ব্যক্ত করার ব্যাপারে প্রধানদের পরিষদে অগ্রাধিকার পেত সামরিক সর্বাধিনায়ক।[১] এ থেকে মনে হয় যে সামরিক সর্বাধিনায়ক তার পদাধিকার বলেই প্রধানদের পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত হত। কোন স্পেনিয় লেখকই মণ্টেজুমা বা তাঁর উত্তরসূরিদের সম্বন্ধে এই আখ্যাটা ব্যবহার করেন নি। তার বদলে ভুলভাবে তাঁরা ব্যবহার করেছেন রাজা আখ্যাটা। টেজ্‌কুকান ও স্পেনিয় পিতা-মাতার সন্তান ইক্সট্‌লিল্‌ক্সোচিট্‌ল টেজকুকো ও ট্‌লাকোপানদের মুখ্য সমর-নায়কদের শুধু সমর-নায়ক হিসেবেই অভিহিত করেছেন এবং এক-একটা গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার জন্য তিনি এক-একটা অভিধা প্রয়োগ করেছেন। মিত্রসঙ্ঘ গঠিত হওয়ার সময় তিনজন প্রধানের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন এবং ঐ উপলক্ষ্যে তিনটি গোষ্ঠীর প্রধানদের একত্রিত হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর তিনি লিখছেন: "টেজ্‌কুকোর রাজাকে সম্ভাষণ করা হত 'আকুল্‌হুয়া টিউক্‌ট্‌লি' নামে। তাঁর পূর্বপুরুষরা পরিচিত ছিলেন 'চিচিমেকাট্‌ল টিউক্‌ট্‌লি' নামে, তাই এ নামেও তাঁকে সম্ভাষণ করা হত। এটাই ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের প্রতীক। তাঁর পিতৃব্য ইট্‌জ্‌কোয়াট্‌জিন-এর উপাধি ছিল 'কুল্‌হুয়া টিউক্‌ট্‌লি', কারণ তিনি টোল্‌টেক্‌স কুলহুয়াজ্‌ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। টোটোকিহুয়াট্‌জিন অঞ্চলের রাজা আজ্‌কা-পুট্‌জাল্‌কোর উপাধি ছিল 'টেক্‌পানুয়াট্‌ল্‌'। পরবর্তীকালে তাঁদের উত্তরসূরিরাও এই একই উপাধিতে বিভূষিত হত।" মিত্রসঙ্ঘ গঠনের সময় আজটেকদের সমর-নায়ক ছিলেন এখানে উল্লিখিত ইট্‌জ্‌কোয়াট্‌জিন্‌ (ইট্‌জ্‌কোয়াট্‌ল্‌)। যেহেতু উপাধিটা ছিল সমর-নায়কের এবং সেই সময় আরো বহু সমর-নায়ক ছিল, তাই তাঁর নামের সঙ্গে একটা গোষ্ঠীগত আখ্যা যোগ করা হত। ইণ্ডিয়ানদের ভাষায় মণ্টেজুমার পদটার অর্থ হল মুখ্য সমর-নায়ক এবং ইংরিজিতে এর অর্থ হচ্ছে সেনাপতি।

বেশ কয়েকটা নহট্‌ল্যাক গোষ্ঠীর মধ্যে এই পদটা লক্ষ করেছিলেন ক্ল্যাভিগেরো, কিন্তু তিনি কখনোই এই অভিধাটা আজটেকদের সমর-নায়কদের সম্বন্ধে ব্যবহার করেননি। "ট্‌লাস্‌কালা, হুয়েক্সোট্‌জিংকো এবং চোলুলান অভিজাতদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা ছিল টিউক্‌ট্‌লির। এই পদের অধিকারী হওয়ার জন্য দরকার হত অভিজাত বংশে জন্মানো,

---

১। "টিউক্‌ট্‌লি' যুক্ত হত। যেমন—'চিচিমেকা-টিউক্‌ট্‌লি', 'পিল্‌-টিউকট্‌লি' ইত্যাদি। শাসকসভায় উপবেশন ও ভোটদানের ব্যাপারে অগ্রাধিকার পেত এই টিউক্‌ট্‌লিরাই। তাদের পিছনের আসনে বসত একজন করে ভৃত্য। এটা ছিল সর্বোচ্চ সম্মানবিশিষ্ট একটা বিশেষ অধিকারের দ্যোতক।"—ক্ল্যাভিগেরো, ii, ১৩৭। ইরোকোয়াদের মধ্যেও ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে।

২। "হিস্টোরিকা চিচিমেকা", পরিচ্ছেদ ৩২, কিংসবরো: "Mex. Antiq", ix, ১১৯.

বেশ কিছু যুদ্ধে চরম সাহসের প্রমাণ রাখা, একটা নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হওয়া এবং এই ধরণের উচ্চ পদাধিকারীর বিপুল খরচের উপযুক্ত ধনসম্পদ থাকা"।[১] মণ্টেজুমার হাতে পৌর ও সামরিক কার্যকলাপ সহ এক চূড়ান্ত ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হওয়ার পর তার পদটার প্রকৃতি ও ক্ষমতা কী দাঁড়িয়েছিল, সে বিষয়ে আর গুরুত্ব দেওয়া হল না। বস্তুত, বিষয়টা নিয়ে কোনরকম অনুসন্ধানই চালানো হয়নি। সামরিক সর্বাধিনায়ক হওয়ার দরুন জনসাধারণেব আনুকূল্য লাভের এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জনের উপায়গুলো তার হাতেই থাকত। গোষ্ঠী এবং মিত্রসঙ্ঘের কাছে এই পদটা ছিল একটা বিপজ্জনক অথচ প্রয়োজনীয় পদ। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসে, বর্বর যুগের সেই নিম্ন অবস্থা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, একটা বিপজ্জনক পদ হিসেবেই এটা টিকে থেকেছে। সভ্য জাতিগুলোর বর্তমান নিরাপত্তার উৎস হল সংবিধান ও আইন—অবশ্য যদি সংবিধান ও আইন বলে সত্যিই কিছু থেকে থাকে। খুব সম্ভবত ইণ্ডিয়ানদের অগ্রসর গোষ্ঠী-গুলোর মধ্যে এবং মেক্সিকো উপত্যকার গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এমন কিছু রীতি ও প্রথা সৃষ্টি হয়েছিল, যেগুলো এই পদের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করত আর এর কর্তব্য নির্ধারণ করত। এই অনুমানের স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আজটেক প্রধানদের পরিষদ শুধু পৌর বিষয়গুলোতেই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিল না, সেইসঙ্গে সামরিক বিষয়গুলোতেও এই পরিষদই ছিল চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং সমর-নায়কের পদ ও তার কার্যকলাপও এর অন্তর্গত ছিল। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বস্তুগত অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজটেকদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নিঃসন্দেহে জটিলতর হয়ে উঠেছিল, কাজেই এ ব্যাপারে কিছু ধারণা অর্জন করা খুবই দরকার। তাদের সরকারি সংগঠন সংক্রান্ত যথাযথ তথ্যগুলো জানা থাকলে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারতাম।

স্পেনিয় লেখকরা সকলেই মোটামুটি একমত যে মণ্টেজুমার পদটা ছিল মনোনয়নমূলক এবং শুধু একটা বিশেষ পরিবারের মধ্যে থেকেই এই পদের উত্তরসূরিদের মনোনীত করা হত। পদটা এক ভাইয়ের কাছ থেকে অন্য ভাইয়ের ওপর, কিংবা মামার কাছ থেকে ভাগ্নের ওপর বর্তাতো। কিন্তু পদটা কেন কখনোই বাবার কাছ থেকে ছেলের ওপর বর্তাতো না, তার ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেন নি। স্পেনিয়দের কাছে উত্তরা-ধিকারের পদ্ধতিটা বেশ অস্বাভাবিক ছিল, কাজেই প্রধান বিষয়টার ব্যাপারে তাদের ভুল করার সম্ভাবনাও খুব কমই ছিল। তাছাড়াও, বিজেতাদের চোখের সামনেই উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভের দুটো ঘটনা ঘটেছিল। মণ্টেজুমার জায়গায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন কুইট্‌লাহুয়া। এ ক্ষেত্রে পদটা এক ভাইয়ের কাছ থেকে আর এক ভাইয়ের ওপর বর্তেছিল। তবে তাদের জ্ঞাতিত্বের ব্যবস্থাকে না জানার ফলে আমরা জানতে পারিনি যে এরা পরস্পরের আপন ভাই ছিল নাকি জ্ঞাতিভাই ছিল। কুইট্‌লাহুয়ার মৃত্যুর পর তাঁর জায়গায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন গুয়াটেমোজিন। এক্ষেত্রে পদটা

১। "হিস্ট্রি অফ মেক্সিকো", ১, c., ii, ১৩৬।

BanglaBook.org

পিতৃব্যের কাছ থেকে ভাইপোর ওপর বর্তেছিল, কিন্তু আমরা জানি না যে গুয়াটে-মোজিন কুইট্‌লাহুয়ার আপন ভাইপো ছিলেন নাকি জ্ঞাতি-ভাইপো ছিলেন। (তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এইসব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পদটা হয় এক ভাইয়ের কাছ থেকে অন্য ভাইয়ের ওপর, কিংবা মামার কাছ থেকে ভাগ্নের ওপর বর্তেছে।[১] কোন মনোনয়নমূলক পদের জন্য একটা নির্বাচক-মণ্ডলীর দরকার হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে নির্বাচক-মণ্ডলী কারা? এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে দুরান্‌ কথিত চারজন প্রধানকে ('সুপ্রা') নির্বাচক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই চারজনের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে টেজ্‌কুকোদের থেকে একজন এবং ট্‌লাকোপানদের থেকে একজন নির্বাচককে। অর্থাৎ মোট ছ'জন নির্বাচকের কথা বলা হয়েছে। কোন-একটা বিশেষ পরিবারের মধ্যে থেকে মুখ্য সমর-নায়ক বাছাই করার ক্ষমতাটা নাকি এদের হাতেই থাকত। ইণ্ডিয়ানদের একটা মনোনয়নমূলক পদের উপযুক্ত তত্ত্ব এটা নয়, কাজেই এটাকে বাতিল করা যেতে পারে। সাহাগুন্‌ একটা অনেক বড় নির্বাচকমণ্ডলীর কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, রাজা অথবা শাসক মারা গেলে টিউক্‌ট্‌লাটোকে নামে অভিহিত শাসকসভার সমস্ত সদস্যরা, আচ্‌কাকাউহ্‌টি নামে অভিহিত গোষ্ঠীর বয়োবৃদ্ধেরা, ইয়াউটেকিওঅ্যাকে নামে অভিহিত সেনাপতি ও প্রবীণ যোদ্ধারা, যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্য বিশিষ্ট সেনাপতিরা এবং ট্‌লেনামাসাকে অথবা পাপাসাকে নামে অভিহিত পুরোহিতরা জমায়েত হত রাজবাড়িতে। পরবর্তী শাসক কাকে করা হবে তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করত তারা এবং মৃত শাসকের বংশের কোন-একজন অভিজাত ব্যক্তিকে শাসক হিসেবে বাছাই করত। এই শাসককে অবশ্যই হতে হত এক শৌর্যসম্পন্ন মানুষ, যুদ্ধ-বিগ্রহে সুদক্ষ, নির্ভীক ও সাহসী···। কোন-একজন ব্যক্তি সম্বন্ধে একমত হতে পারলেই তারা তাকে শাসক হিসেবে অভিহিত করত। কিন্তু এই নির্বাচন কোন ব্যালটপত্র বা ভোটের সাহায্যে করা হত না। সকলে মিলে আলাপ-আলোচনা করে কোন-একজন সম্বন্ধে একমত হত তারা। শাসক নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর তারা আরও চারজনকে নির্বাচিত করত। এরা ছিল অনেকটা শাসকসভার সদস্যের মতন। এই চারজন সবসময়ই রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকত এবং এদেরকে রাজ্যের সবকিছু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখা হত।"[২] একটা বৃহত্তর নির্বাচক-মণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচনের এই ছকটাও ইণ্ডিয়ানদের প্রতিষ্ঠানগুলোর পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না। তবে এতে শাসনব্যবস্থার মধ্যে ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণের যে কথাটা বলা হয়েছে, তার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহেই ছিল। এই পদটায় থাকার শর্তাদি এবং নির্বাচন-পদ্ধতিকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হলে আগে খুঁজে দেখতে হবে যে তাদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল কি না, বংশধারা স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী নির্ণীত হত নাকি পুরুষ-ধারা অনুযায়ী এবং সেইসঙ্গেই তাদের জ্ঞাতিত্বের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও কিছু জানা দরকার। গ্যানোয়ানিয়ান বর্গের অন্যান্য বহু গোষ্ঠীর মধ্যে যে ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া গেছে, সেই ব্যবস্থাই এদের মধ্যে

১। ক্লাভিগেরো, ১২৬।

২। "হিস্টোরিয়া জেনারেল", ১৮ পরিচ্ছেদ।

BanglaBook.org

থেকে থাকলে (তা থাকা সম্ভবও বটে) লোকেরা তাদের ভাইয়ের ছেলেকে নিজের ছেলে বলত, বোনের ছেলেকে বলত ভাগ্নে, বাবার ভাইকে তারা বাবাই বলত, মায়ের ভাইকে বলত মামা, তাদের বাবার ভাইয়ের সন্তানরা ছিল তাদের ভাই-বোন এবং মায়ের ভাইয়ের সন্তানরা ছিল তাদের মামাতো ভাই-বোন ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের মধ্যে যদি গোত্র থেকে থাকত এবং বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারা অনুসরণ করা হয়ে থাকত, তাহলে একজন মানুষ তার নিজের গোত্রের মধ্যে ভাই, মামা এবং ভাগ্নে পেত, পেত জ্ঞাতি-সম্পর্কিত মাতামহ ও দৌহিত্র। কিন্তু তার কোন নিজের বাবা, নিজের ছেলে অথবা পৌত্র থাকত না। তার নিজের ছেলেরা এবং তার ভাইয়ের ছেলেরা অন্য গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত। আজটেকদের মধ্যে যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিলই, এমন কথা এখনও পর্যন্ত জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু মুখ্য সমর-প্রধানের পদের এই উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা গোত্রের অস্তিত্বের একটা শক্তপোক্ত প্রমাণ হাজির করে, কেননা এই উত্তরাধিকারকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় শুধুমাত্র গোত্রের সাহায্যেই। স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের প্রথাবিশিষ্ট গোত্র থাকলে এই পদটা এক-একটা নির্দিষ্ট গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলকই হয়ে থাকে, তবে তার সদস্যরা তাকে নির্বাচন করে থাকে। সেক্ষেত্রে গোত্রের মধ্যে নির্বাচনের মারফৎ পদটা বর্তায় এক ভাইয়ের কাছ থেকে আর এক ভাইয়ের কাছে অথবা মামার কাছ থেকে ভাগ্নের কাছে, কিন্তু কখনোই বাবার কাছ থেকে ছেলের ওপর তা বর্তায় না এবং আজটেকদের ক্ষেত্রে ঠিক এটাই দেখা গেছে। ইরোকোয়াদের মধ্যেও সাকেম্ এবং মুখ্য সমর-নায়কের পদ এক ভাইয়ের কাছ থেকে অন্য ভাইয়ের কাছে অথবা মামার কাছ থেকে ভাগ্নের কাছে বর্তাতো—কার ওপর বর্তাবে তা নির্ভর করত বাছাইয়ের ওপর। কিন্তু কখনোই বাবার কাছ থেকে ছেলের ওপর এই পদগুলো বর্তাতো না। স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের প্রথাবিশিষ্ট গোত্রই উত্তরাধিকারের এই পদ্ধতির জন্ম দিয়েছিল, অন্য কোন কাঠামোর মধ্যে এ ঘটনা ঘটতে পারে না। শুধু এই তথ্যগুলো থেকেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে আজটেকরা গোত্রের ভিত্তিতেই সংগঠিত ছিল এবং অন্তত এই পদটার ক্ষেত্রে তখনও পর্যন্ত স্ত্রী-ধারা অনুযায়ীই উত্তরাধিকার নির্ণয় করা হত।

কাজেই ব্যাপারটার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায় যে, মণ্টেজুমা যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই পদটা গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক ছিল (মণ্টেজুমার বংশের কুলপ্রতীক বা টোটেম ছিল ঈগল) আর গোত্রের লোকেরা কয়েকজনের মধ্যে থেকে তাকে বাছাই করত। অতঃপর নিজেদের বাছাই করা লোকটির নাম তারা আজটেকদের চারটি বংশ বা বিভাগের কাছে (যেগুলোকে ভ্রাতৃত্ব বলে অনুমান করা যায়) আলাদা আলাদা ভাবে পেশ করত গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যানের জন্য। টেজ্‌কুকান এবং ট্‌লাকোপানদের কাছেও নামগুলো পেশ করা হত, কারণ সর্বাধিনায়ক নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের স্বার্থও সরাসরিভাবে জড়িত ছিল। মনোনীত ব্যক্তিটির যোগ্যতা নিয়ে নিজের নিজের বিভাগের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর, প্রতিটা গোত্র একজন করে লোককে নিযুক্ত করত নিজেদের ঐকমত্য জ্ঞাপন করার জন্য।

BanglaBook.org

এই ছ'জনকে ভুলভাবে নির্বাচক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এমনটা হতে পারে যে আজটেকদের যে চারজন মূল প্রধানকে কয়েকজন লেখক নির্বাচক হিসেবে অভিহিত করেছেন, তারা ছিল আসলে আজটেকদের চারটি বিভাগের চারজন সমর-নায়ক—ঠিক যেমন ট্‌লাস্‌কালানদের চারটি বংশের চারজন সমর-নায়ক ছিল। এরা কাউকে নির্বাচন করত না। এদের কাজ ছিল নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে গোত্রের বাছাই-করা ব্যক্তিটির ব্যাপারে ঐকমত্যে আসার চেষ্টা করা এবং সকলে একমত হলে আলোচনার ফলাফলটা ঘোষণা করে দেওয়া। আজটেকদের মুখ্য সমরপ্রধান পদটা সম্বন্ধে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে একটা অনুমান-ভিত্তিক ব্যাখ্যা হিসেবেই আমরা উপরোক্ত বক্তব্যটা পেশ করেছি। ইণ্ডিয়ানদের প্রথার সঙ্গে এবং ইণ্ডিয়ান প্রধানদের মনোনয়নমূলক পদ সংক্রান্ত তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের এই বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পদের কার্যকাল যেখানে পদাধিকারীর সারা জীবনভোর, সেখানে নির্বাচন করার অধিকারের অপরিহার্য অনুসৃতি হিসেবে থাকে বরখাস্ত করার অধিকারও। অর্থাৎ পদাধিকারী যতক্ষণ ভাল আচার-আচরণ করবে, ততক্ষণই সে তার পদে থাকতে পারবে। সমস্ত আমেরিকান আদিবাসীদের সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নির্বাচন করা ও বরখাস্ত করার এই নীতি দুটো দেখা যায়। এগুলো থেকে যথেষ্ট ভালোভাবেই বোঝা যায় যে প্রকৃত-পক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতাটা থাকে জনসাধারণের হাতেই। বরখাস্ত করার এই ক্ষমতাটা খুব কম সময়ে প্রয়োগ করা হলেও, গোত্রভিত্তিক সংগঠনের ক্ষেত্রে সেটা ছিল একান্তই অপরিহার্য এক অধিকার। মণ্টেজুমাও এই নিয়মের বাইরে ছিলেন না। ঘটনাটা এমন বিচিত্র ছিল যে তাঁকে বরখাস্ত করার জন্য বেশ কিছু সময় লেগেছিল। আসলে বরখাস্ত করার একটা উপযুক্ত কারণ খুঁজে বার করার দরকার ছিল। মণ্টেজুমা যখন ভীতি-প্রদর্শনের সাহায্যে তাঁকে তাঁর বাসস্থান থেকে কোর্টেস-এর শিবিরে নিয়ে যেতে বাধ্য করেন, যেখানে তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়, তখন সেনাপতির অভাবে আজটেকরা একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তাঁর লোকজনদের ওপর এবং তাঁর পদটার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় স্পেনিয়দের অধিকার।[১] স্পেনিয়রা নিজেদের জায়গায় ফিরে যাবে—এই

১। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে স্পেনিয়রা আবিষ্কার করে যে, কোন গোষ্ঠীর নেতাকে বন্দী করে ফেলতে পারলেই ইণ্ডিয়ানদের মনোবল ভেঙে যায় এবং তারা আর যুদ্ধ করতে চায় না। তাই মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে স্পেনিয়রা এই ব্যাপারটাকেই কাজে লাগায়। মুখ্য প্রধানকে ছলে-বলে-কৌশলে ফাঁদে ফেলে, নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখার চক্রান্ত করে তারা। মণ্টেজুমাকে নিজের শিবিরে বন্দী করার সময় স্রেফ এই অভিজ্ঞতাটাকেই কাজে লাগিয়েছিলেন কোর্টেস। আটাহুয়াল্‌পাকে বন্দী করার সময় পিজারো-ও এই একই কাজ করে-ছিলেন। ইণ্ডিয়ানদের প্রথা অনুযায়ী বন্দীকে হত্যা করা হত এবং সে কোন মুখ্য প্রধান হলে তার পদটা গোষ্ঠীর হাতে ফিরে আসত আর সেই পদে তৎক্ষণাৎ অন্য একজনকে মনোনীত করা হত। কিন্তু উপরোক্ত ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে বন্দীরা বেঁচেই ছিল, তারা তাদের পদেরও অধিকারী ছিল, কাজেই ঐ-সব পদে অন্য কাউকে মনোনীত করা হয়নি। অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে পড়ে মানুষ একেবারে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। কোর্টেস-ই আজটেকদেরকে এই অবস্থায় এনে ফেলেছিলেন।

আশায় আজটেকরা কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করে। কিন্তু যখন তারা বুঝলো যে স্পেনিয়রা থেকে যেতেই চাইছে, তখন তারা তাদের সিদ্ধান্তহীন অবস্থাটাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। মণ্টেজুমাকে বরখাস্ত করে তাঁর জায়গায় তাঁর ভাইকে মনোনীত করে তারা। এই ঘটনার ঠিক পরেই তারা স্পেনিয় শিবিরে প্রবল আক্রমণ চালায় এবং শেষপর্যন্ত তাদেরকে নিজেদের পুয়েব্লো থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। মণ্টেজুমাকে বরখাস্ত করার এই ঘটনার সঙ্গে হেরেরার বিবৃতির পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। আজটেকরা আক্রমণ শুরু করার পর কোর্টেস দেখেন যে একজন নতুন সেনাপতি তাদের নেতৃত্ব করছে। প্রকৃত ঘটনা বুঝতে কোর্টেসের দেরি হয় নি। তখন তিনি "ম্যারিনাকে মণ্টেজুমার কাছে পাঠান এটা জানার জন্য যে আজটেকরা ঐ ব্যক্তির হাতেই শাসনভার তুলে দিয়েছে কি না।"[১] ঐ ব্যক্তি বলতে এখানে নতুন সেনাপতির কথাই বলা হয়েছে। মণ্টেজুমা নাকি উত্তর দিয়েছিলেন, "তিনি বেঁচে থাকতে আর কাউকে তারা মেক্সিকোর রাজা হিসেবে মনোনীত করতে পারে না।"[২] তারপর তিনি বাড়ির ছাদে উঠে গিয়ে তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলেন "যে তিনি শুনেছেন তাঁর দেশবাসীরা আর-একজনকে রাজা হিসেবে মনোনীত করেছে, কারণ তাঁকে স্পেনিয়রা বন্দী করেছে এবং তিনি নাকি স্পেনিয়দের পছন্দ করেন"—এই কথার উত্তরে জনৈক আজটেক সৈনিক অশিষ্ট ভঙ্গীতে বলে ঃ "চুপ করো কাপুরুষ বজ্জাত কোথাকার, শুধু কাপড় বোনা আর সুতো কাটাই তো তোমার কাজ। এই কুত্তার দল তোমাকে বন্দী করেছে, তুমি সত্যিই কাপুরুষ।"[৩] অতঃপর তারা তাঁকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে ও পাথর ছোঁড়ে। এইসব আঘাতে এবং গভীর মর্মবেদনায় খানিক পরেই মারা যান তিনি। এই আক্রমণে আজটেকদের সমর-নায়ক ছিলেন মণ্টেজুমার ভাই ও উত্তরসূরি কুইট্‌লাহুয়া।[৪]

এই পদটার কার্যকলাপ সম্বন্ধে স্পেনিয় লেখকদের রচনাপত্র থেকে প্রায় কোন সন্তোষজনক তথ্যই পাওয়া যায় না। আজটেকদের পৌর বিষয়সমূহের ওপর মণ্টেজুমার আদৌ কোন ক্ষমতা ছিল বলে মনে হয় না। যাবতীয় সম্ভাবনা সেইরকম ইঙ্গিতই দেয়। সামরিক কার্যকলাপের ব্যাপারে দেখা যায় যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সম্ভবত পরিষদই নিত। লক্ষ করা দরকার যে মুখ্য সমর-নায়ক পদের সঙ্গে পুরোহিতের কার্যকলাপ এবং বিচারকের কার্যকলাপও যুক্ত ছিল।[৫]

ব্যাসিলিউস্‌-এর সামরিক পদ বিষয়ে আলোচনা করার সময় এদের এই সামরিক পদের স্বাভাবিক বিকাশের মধ্যে এইসব কার্যকলাপের সূচনার ব্যাপারটা নিয়ে আবার আলোচনা করা যাবে। শাসনব্যবস্থায় দুই শক্তির শাসন থাকলেও, পৌর ও সামরিক বিষয়ে এই

১। "হিস্ট্রি অফ মেক্সিকো", iii, ৬৬।
২। ঐ, iii, ৬৭।
৩। ক্ল্যাভিগেরো, ii, ৪০৬।
৪। ঐ, ii, ৪০৪।
৫। হেরেরা, iii, ৩৯৩।

দুই শক্তির মধ্যে কোন সংঘাত বাধলে সম্ভবত পরিষদের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হত। মনে রাখা দরকার যে প্রধানদের পরিষদই ছিল সবথেকে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনের মধ্যে ও প্রধান পদের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের মধ্যে ক্ষমতার একটা শক্তপোক্ত বনিয়াদ গ্রথিত ছিল।

মুখ্য সমর-নায়ক পদের শর্তাবলী এবং তাকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটা পরিষদের উপস্থিতি—এই দুটো জিনিস থেকে বোঝা যায় যে আজটেকদের প্রতিষ্ঠানগুলো মূলগতভাবে গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন ছিল। সমর-নায়ক বাছাইয়ের ব্যাপারে মনোনয়নমূলক নীতি, এবং ধরেই নেওয়া যায় যে সাকেম্ ও প্রধানদের ক্ষেত্রেও এই নীতিই প্রয়োগ করা হত, আর প্রধানদের পরিষদের উপস্থিতি—এই সবকিছুই এদের প্রতিষ্ঠানগুলোর গণতান্ত্রিক চরিত্রের প্রমাণ দেয়। বর্বর যুগের নিম্ন, মধ্য, এমনকি উচ্চ অবস্থাতেও এথেনিয় ধাঁচের একটা বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু কোন জনগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠানগুলো মূলগতভাবে গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন ছিল নাকি মূলগতভাবে রাজতান্ত্রিক ছিল, তা জানা একান্তই জরুরি। রাজতন্ত্রের থেকে গণতন্ত্র যতটা পৃথক, রাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের থেকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানও ঠিক ততটাই পৃথক। তাদের সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একককে নির্ণয় না করে (যদি তারা গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত থেকে থাকে, এবং সম্ভবত তা-ই ছিল) এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে ভালোভাবে না জেনেই স্পেনিয় লেখকরা বুক ফুলিয়ে উদ্ভাবন করে বসলেন যে আজটেদের মধ্যে নিরংকুশ রাজতন্ত্র ছিল আর তার মধ্যে প্রচুর সামন্ততান্ত্রিক লক্ষণও নাকি বিদ্যমান ছিল। এগুলোকে তাঁরা ইতিহাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেও সক্ষম হন। আমেরিকানদের আলসেমির ফলেই এই ভ্রান্ত ধারণাটা সুদীর্ঘকাল টিকে থেকেছে। স্পেনিয়দের চোখের সামনে আজটেকদের যে সংগঠনটা তখন ছিল, সেটা গোষ্ঠীগুলোর একটা মৈত্রী বা মিত্রসংঘ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুস্পষ্ট তথ্যকে একেবারে স্থূলভাবে বিকৃত করেই স্পেনিয় লেখকরা একটা গণতান্ত্রিক সংগঠনের মধ্যে আজটেকদের রাজতন্ত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন।

তত্ত্বগতভাবে বিচার করলে বোঝা যায় যে, প্রধানদের পরিষদের অধিবেশন যখন চলছে না তখন পৌর বিষয়গুলোতে গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এবং পরিষদের কাজের প্রস্তুতির ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আজটেক, টেজকুকান ও টলাকোপানদের একজন সর্বসম্মত প্রধান-সাকেম থাকাই সম্ভব ছিল। আজটেকদের মধ্যে 'জিয়াহুয়াকাটল্' নামে যে পদটা ছিল, তার মধ্যে যেন এই প্রধান-সাকেমেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একে অনেক সময় দ্বিতীয় প্রধানও বলা হত, কারণ সমর-নায়কই ছিল এদের প্রথম প্রধান। কিন্তু এই পদটার ব্যাপারে আমাদের হাতে তথ্য এতই কম যে এ নিয়ে কোন বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়।

ইরোকোয়াদের মধ্যে আমরা দেখেছি যে যোদ্ধারা প্রধানদের পরিষদের সামনে হাজির হয়ে বিভিন্ন সার্বজনীন বিষয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পারত। মেয়েরাও একজনকে মুখপাত্র নির্বাচিত করে তার মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে পারত। শাসনকার্যে

BanglaBook.org

জনসাধারণের অংশগ্রহণের এই ব্যবস্থাটাই পরে গণ-পরিষদের রূপ নেয়। প্রধানদের পরিষদ যখন কোন রাষ্ট্রীয় কাজের প্রস্তাব রাখত এই গণ-পরিষদের কাছে, তখন তা গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকত গণ-পরিষদের। আমি যতদূর জানি তাতে সার্বজনীন কাজের ব্যাপারে ক্ষমতাসম্পন্ন এই ধরণের কোন গণ-পরিষদ ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ছিল না। এদের চারটি বংশ বিশেষ কাজের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য সম্ভবত একসঙ্গে বসত, কিন্তু সার্বজনীন কাজ সংক্রান্ত একটা গণ-পরিষদের থেকে এটা একেবারেই আলাদা। নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলোর গণতান্ত্রিক চরিত্র এবং নিজেদের অগ্রসর অবস্থার দরুণ আজটেকরা এমন একটা যুগের দিকে এগিয়ে চলেছিল, যখন তাদের মধ্যে গণ-পরিষদ সৃষ্টি হওয়া একান্তই সম্ভবপর ছিল।

আমরা আগেই বলেছি যে আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে সরকার সংক্রান্ত ধারণার বিকাশ শুরু হয়েছিল গোত্র থেকে এবং তা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল মিত্রসঙ্ঘে এসে। এদের সংগঠনের চরিত্রটা ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক নয়। সম্পত্তি বিষয়ে তাদের ধারণা যতদূর এগিয়েছিল, তার থেকে বহু দূরে না এগোনো পর্যন্ত গোত্রভিত্তিক সমাজের জায়গায় রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। আদিবাসীদের কোন গোষ্ঠী, অন্তত উত্তর আমেরিকার গোষ্ঠীগুলো, ভূখণ্ড ও সম্পত্তিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সরকারের দ্বিতীয় বিরাট রূপটা সম্বন্ধে কোনরকম ধারণা অর্জন করতে পেরেছিল—এমন কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সরকারের মনোভাব ও জনগণের অবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। সামরিক মেজাজটা যখন জাঁকিয়ে বসল, যেমনটা ঘটেছিল আজটেকদের ক্ষেত্রে, তখন স্বাভাবিকভাবেই গোত্রীয় সংগঠনের মধ্যে জন্ম নিল একটা সামরিক গণতন্ত্র। এই ধরণের সরকার গোত্রগুলোর স্বাধীন মনোবৃত্তিকে বিনষ্ট করে না কিংবা গণতন্ত্রের নীতিগুলোকেও দুর্বল করে দেয় না, বরং এগুলোকে সে সুসমঞ্জসভাবে মানিয়ে নিয়েই চলে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গ্রীক গোত্র

বলা যায় যে ৮৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ হোমারীয় কবিতার জন্মের সময়ই এশিয়াটিক গ্রীকদের মধ্যে সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। ইওরোপিয় গ্রীকদের মধ্যে সভ্যতার সূচনা হয়েছিল এর প্রায় একশ বছর পরে, হেসিয়ডিয় কবিতার জন্মের সময়। এই যুগগুলোর আগে, বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে হেলেনীয় গোষ্ঠীগুলো এগিয়ে চলেছিল বর্বর যুগের অন্তিম পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে এবং তারা প্রস্তুত হয়েছিল সভ্য যুগে প্রবেশ করার জন্য। গ্রীস উপদ্বীপ, ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর এবং সন্নিহিত বিভিন্ন দ্বীপে এরা নিজেদের প্রাচীনতম ঐতিহ্য নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। একই বংশের একটা পুরনো শাখা—যাদের মধ্যে প্রধান ছিল পেলাস্‌গিয়ানরা—এদের আগেই ঐ-সব অঞ্চলের ব্যাপকতম অংশে বসতি স্থাপন করেছিল। এক সময় এরা হয় হেলেনীয় গোষ্ঠীর অঙ্গ হয়ে যায় অথবা ঐ অঞ্চল ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়। হেলেনীয় গোষ্ঠীগুলো এবং তাদের পূর্বপুরুষদের পূর্বতন অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হতে হলে পূর্বতন যুগ থেকে নিয়ে আসা তাদের পূর্বসূরিদের বিভিন্ন শিল্প ও উদ্ভাবনের সাহায্যে, তাদের ভাষার বিকাশের স্তরের সাহায্যে, তাদের বিভিন্ন প্রথা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যেই তা বুঝতে হবে—যেগুলোর বহুলাংশই টিকে ছিল সভ্যতার যুগেও। আমাদের আলোচনা মূলত এই শেষোক্ত বিষয়গুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

পেলাস্‌গিয়ান ও হেলেনিজ উভয়রাই সংগঠিত ছিল গোত্র, ভ্রাতৃত্ব[১] এবং গোষ্ঠীতে। পরে এদের গোষ্ঠীগুলো একাঙ্গীভূত হয়ে একটা জাতি গড়ে তোলে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ সাংগঠনিক ক্রমটা সম্পূর্ণ হয় নি। কি গোষ্ঠী কি জাতি, সর্বত্রই তাদের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে থাকত গোত্র। এই গোত্রই ছিল তাদের সংগঠনের প্রাথমিক একক। এ থেকে গড়ে উঠত একটা গোত্রভিত্তিক সমাজ অথবা একটা জনগোষ্ঠী, যা রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের থেকে পৃথক। সরকারের কার্যসাধনের মাধ্যম ছিল প্রধানদের একটা পরিষদ আর তাকে সহযোগিতা করত একটা জনসমাবেশ বা গণ-পরিষদ এবং একজন ব্যাসিলিয়ুস বা সমর-নায়ক। মানুষ ছিল স্বাধীন আর তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল গণতান্ত্রিক। অগ্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা ও চাহিদা গোত্রকে তার প্রাচীন রূপ থেকে উন্নত করে তোলে সর্বোচ্চ রূপে। উন্নতিশীল সমাজের নানান অপ্রতিরোধ্য চাহিদার

১। ডোরিয়ান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অস্তিত্ব ছিল না।—মুলার-এর "ডোরিয়ান্‌স", টাফ্‌নেল ও ল্য-র অনুবাদ, অক্সফোর্ড সংস্করণ, ২, ২৮।

ফলেই গোত্রের মধ্যে পরিবর্তন ঘটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এইসব পরিবর্তন সত্ত্বেও, এইসব চাহিদা পূরণ করার ব্যাপারে গোত্রের ব্যর্থতা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। মূলত তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রেই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল ঃ প্রথমত, বংশধারা নির্ণয়ের ব্যাপারে স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারার ব্যবহার শুরু হয় ; দ্বিতীয়ত, অনাথা নারী ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনীদের ক্ষেত্রে গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ; এবং তৃতীয়ত, পিতার সম্পত্তির ওপর সন্তানরা নিরঙ্কুশ উত্তরাধিকার অর্জন করে। এইসব পরিবর্তন এবং তার কারণসমূহ নিয়ে অন্যত্র সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে।

সাধারণভাবে হেলেনিজ্‌রা বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত এবং অগ্রগতির একই অবস্থায় থাকা বর্বর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সাধারণভাবে শাসনব্যবস্থার যে রূপ দেখা যায়, সেই রূপই ছিল এদের মধ্যেও। গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের চৌহদ্দীতে যেমন অবস্থা থাকা সম্ভব, তেমন অবস্থাই বিদ্যমান ছিল এদের মধ্যে। তাই এদের মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই পাই না আমরা।

ইতিহাসের আলো যখন প্রথম চোখ ফেরায় গ্রীক সমাজের দিকে—অর্থাৎ প্রথম অলিম্পিক-এর (৭৭৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) সময় থেকে শুরু করে ক্লাইসথেনিস্‌-এর আইন রচনার (৫০৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) সময় পর্যন্ত—তখন গ্রীক সমাজ একটা বিরাট সমস্যা সমাধানের কাজে ব্যস্ত ছিল। সরকারী কাঠামোর একটা মৌলিক পরিবর্তন ছিল এটা, যার সঙ্গে জড়িত ছিল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিপুল পরিবর্তন ঘটানোর কাজও। যে গোত্রীয় সমাজের মধ্যে মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছিল, সেই সমাজ থেকে তারা তখন পৌঁছতে চাইছিল ভূখণ্ড ও সম্পত্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সমাজে—সভ্যতার সূচনার জন্য যা ছিল অত্যাবশক। আরও সঠিক অর্থে বললে, একটা রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল তারা, আর্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যা তখনও পর্যন্ত কোথাও গড়ে ওঠে নি। তারা চাইছিল এই রাষ্ট্রকে একটা এলাকাগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে, তখনকার সময় থেকে আজ পর্যন্ত যে ভিত্তির ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্র। প্রাচীন সমাজের ভিত্তি ছিল কিছু মানুষের একটা সংগঠন এবং ঐ সমাজের শাসনকাজ চলত গোত্র ও গোষ্ঠীর সঙ্গে মানুষদের সম্পর্কের মাধ্যমে। কিন্তু গ্রীক গোষ্ঠীগুলো এই পুরনো ধাঁচের সরকারি কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসছিল এবং একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করেছিল। এই ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য দরকার ছিল একটা সীমারেখাবেষ্টিত 'ডেমে' বা শহর গড়ে তোলা, তার একটা নাম দেওয়া এবং সেখানকার মানুষজনকে একটা রাষ্ট্র হিসেবে সংগঠিত করা। যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি ও বসবাসকারী মানুষজন সহ ঐ শহরটাকেই নতুন ধাঁচের সরকারের প্রাথমিক একক করে তোলা দরকার ছিল। তখন গোত্রের সদস্যরা পরিণত হবে নাগরিকে এবং রাষ্ট্র তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে তার অঞ্চলগত সম্পর্কের মাধ্যমে, গোত্রের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে নয়। তার বসবাস যে শহরে, সেই শহরের নামের তালিকায় তার নাম তালিকাভুক্ত করা হবে,

BanglaBook.org

যা তার নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে। সে ভোট দিতে পারবে এবং তার কাছ থেকে কর নেওয়া হবে। সামরিক কাজের জন্যও ডাকা হবে তাকে। কথাগুলো শুনতে সাদামাটা মনে হলেও এগুলো ঘটতে সময় লেগেছিল বেশ কয়েকশ বছর এবং তার জন্য সরকার সংক্রান্ত বিদ্যমান ধারণাগুলোর একটা সম্পূর্ণ বিপ্লব ঘটাতে হয়েছিল। যে গোত্র এতদিন ছিল সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একক, তা যে এই অগ্রসরমান সমাজের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না—এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীসহ এই গোত্রকে হঠিয়ে দেওয়া এবং তার বদলে বেশ কিছু নাগরিকবিশিষ্ট এক-একটা নির্দিষ্ট এলাকা গড়ে তোলার কাজটা ছিল অতীব দুরূহ। গোত্রের সঙ্গে ব্যক্তির ছিল ব্যক্তিগত সম্পর্ক। এই সম্পর্ককে পরিবর্তিত করার দরকার ছিল শহরের সঙ্গে সম্পর্কে এবং অঞ্চলগত সম্পর্কে। শহরের বিচারকরা কিছুটা যেন গোত্রের প্রধান-দের জায়গাটাই দখল করছিল। স্থাবর সম্পত্তিবিশিষ্ট কোন শহর স্থায়িত্বসম্পন্ন হতে বাধ্য, কাজেই সেখানকার বাসিন্দারাও স্থায়ী বাসিন্দাই হয়ে থাকে। আর গোত্র ছিল এমন কিছু সংখ্যক মানুষের সমষ্টি যারা এক জায়গায় সব সময় স্থায়ীভাবে থাকত না, কিছুটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত এবং ক্রমে ক্রমে গোটা একটা এলাকায় স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার ব্যাপারে অসমর্থ হয়ে উঠেছিল সে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রাথমিক একক হিসেবে শহর যতক্ষণ না গড়ে উঠছিল, বতক্ষণ না এই ধারণাটা গড়ে উঠেছিল এবং বাস্তবে প্রযোজ্য হতে শুরু করেছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত শহরের গুরুত্বকে উপলব্ধি করার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি উজাড় করে দিতে হয়েছিল গ্রীক ও রোমানদের। রাজনৈতিক সম্পদ গড়ার পথ প্রস্তুত করার ব্যাপারে গ্রীক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করে চলেছিল যে নতুন উপাদানটা, তা হল সম্পত্তি। সম্পত্তিই ছিল রাজনৈতিক ব্যবস্থার চালিকাশক্তি এবং বনিয়াদ। আজকের দিনে বসে কাজটাকে যতই সোজা-সরল মনে হোক না কেন, এই ধরনের একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো কিন্তু মোটেই খুব সহজসাধ্য কাজ ছিল না। কারণ গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর ভুতপূর্ব যাবতীয় অভিজ্ঞতাই ছিল গোত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আর এখন সেই গোত্রেরই ক্ষমতাকে নতুন রাজনৈতিক সংস্থা-সমূহের হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল।

নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রথম প্রচেষ্টার সময় থেকে শুরু করে অবশেষে এই ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সময় পর্যন্ত অতিক্রান্ত হয়েছিল বেশ কয়েকশ বছর। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছিল যে রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে তুলতে গোত্র সক্ষম নয়। তখন বিভিন্ন গ্রীক জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানান ধাঁচের আইন-কানুন চালু করা হয়। এগুলো একে অপরের অভিজ্ঞতাকেই কমবেশি অনুসরণ করে এবং প্রতিটা চেষ্টা একই ফলাফলের জন্ম দেয়। এখানে আমরা মূলত এথেনিয়দের অভিজ্ঞতা থেকেই দৃষ্টান্ত দেওয়ার চেষ্টা করব। এদের আইন-কানুনের মধ্যে কয়েকটার কথা উল্লেখ করা যায়—ঐতিহ্যের কর্তৃত্ব সংক্রান্ত থিসিয়ুস-এর আইন, ড্র্যাকো-র আইন (৬২৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ), সোলোন-এর আইন (৫৯৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) এবং ক্লাইসথেনিস-এর আইন (৫০৯ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দ)। শেষ তিনটি আইন ঐতিহাসিক যুগের আওতায় পড়ে। পৌর জীবন ও

BanglaBook.org

প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ, প্রাচীর-বেষ্টিত শহরগুলোতে সম্পদ জমা হওয়া আর এ-সবের ফলে জীবনযাপন পদ্ধতির বিরাট পরিবর্তন—এইসব ঘটনাই গোত্রভিত্তিক সমাজের উচ্ছেদ এবং তার জায়গায় রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছিল। গোত্রভিত্তিক সমাজ থেকে রাজনৈতিক সমাজে উত্তরণের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে গোত্র-গুলোর অন্তিম ইতিহাস। কিন্তু এই উত্তরণ নিয়ে আলোচনা করার আগে গ্রীক গোত্র ও তার কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

এথেনিয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে থেকেই সাধারণভাবে গ্রীক প্রতিষ্ঠানসমূহের চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রাচীন সমাজব্যবস্থার একেবারে শেষ পর্যন্ত গোত্র ও গোষ্ঠীর গঠন সংক্রান্ত যে-কোন অর্থেই কথাটা সত্য। এটা সুবিদিত যে ঐতিহাসিক যুগ শুরু হওয়ার সময় অ্যাটিকার আয়োনিয়ানরা চারটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায় (গেলেওন্টে, হপ্লেট, এগিকোর এবং আর্গেড)। এরা একই উপ-ভাষায় কথা বলত এবং একই ভূখণ্ডে বসবাস করত। এরা একটা জাতি হিসেবে একাঙ্গীভূত হয়েছিল, তবে এই একাঙ্গীভবন আর মিত্রসঙ্ঘ কিন্তু এক নয়। তবে, আরও প্রাচীনকালে এই ধরণের একটা মিত্রসঙ্ঘের অস্তিত্বও সম্ভবত ছিল এদের মধ্যে।[১] অ্যাটিকা অঞ্চলের প্রতিটা গোষ্ঠীর মধ্যেই ছিল তিনটি করে ভ্রাতৃত্ব এবং প্রতিটা ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ছিল তিরিশটা করে গোত্র। অর্থাৎ চারটি গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল মোট বারোটা ভ্রাতৃত্ব আর তিনশ ষাটটা গোত্র। এটা হচ্ছে তাদের কাঠামোর সাধারণ রূপ। গোষ্ঠী এবং ভ্রাতৃত্বের সংখ্যা কখনোই কম-বেশি হত না, তবে প্রতিটা ভ্রাতৃত্বের মধ্যে গোত্রের সংখ্যা কম-বেশি হতেও পারত। একইভাবে, ডোরিয়ানদের মধ্যে ছিল তিনটি গোষ্ঠী (হাইলেইস, পাম্‌ফাইলি ও ডাইমেন), যদিও এদের মধ্যে কয়েকটা জাতিসত্তারও অস্তিত্ব ছিল, যেমন স্পার্টায়, আর্গসে, করিন্থে, এপিডরাসে, ট্রোজেনে, পেলোপনিসাসের ওপারে মেগারায় এবং আরও নানান জায়গায়। কোথাও কোথাও এক বা ততোধিক অ-ডোরিয়ান গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল ডোরিয়ানদের সঙ্গে, যেমন করিন্থে, সিসায়নে, আর্গসে।

যেখানেই গ্রীক গোষ্ঠী ছিল, সেখানেই ছিল গোত্র, জ্ঞাতিত্বের বন্ধন, একই উপভাষার বন্ধন—এইসব ভিত্তির ওপরেই গড়ে উঠত গোষ্ঠী। কিন্তু গোষ্ঠী থাকা মানেই যে ভ্রাতৃত্বও থাকবে, গ্রীকদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক এমন ছিল না। ভ্রাতৃত্ব নামক এই মধ্যবর্তী সংগঠনটার অস্তিত্ব এদের সবকটা গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে থাকলেও, সাময়িকভাবে এর অস্তিত্ব বিলুপ্তও করা যেত। স্পার্টার এক-একটা গোষ্ঠীর মধ্যে 'ওব' নামক কিছু উপ-বিভাগ ছিল। প্রতিটা গোষ্ঠীতে থাকত দশটা করে 'ওব', যা আসলে ভ্রাতৃত্বেরই সমতুল। কিন্তু এই সংগঠনগুলোর কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা খুব নিশ্চিতভাবে কিছু জানি না।[২]

১। এজিনা, এথেন্স, প্রাশিয়া, নাউপ্লিয়া প্রভৃতি জায়গার মিত্রসঙ্ঘের কথা উল্লেখ করেছেন হারমান।—"পলিটিক্যাল অ্যান্টিকুইটিস অফ গ্রীস", অক্সফোর্ড অনুবাদ, পরিচ্ছেদ ১, পৃঃ ১১।

২। "লাইকারগাসের প্রাচীন 'রেট্রা'য় গোষ্ঠী এবং ওবগুলোকে অপরিবর্তিতভাবে বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ও মুলার এবং বোয়েখ্‌ বলেছেন যে প্রতিটা গোষ্ঠীতে দশটা করে

চূড়ান্ত রূপ ও পরিপূর্ণ সজীব অবস্থায় উন্নত এথেনীয় গোত্রগুলোর বিষয়ে এবার আমরা আলোচনা করব। তাদের সামনে তখন মাথা তুলছিল এক জায়মান সভ্যতার উপাদান এবং ধীরে ধীরে তারা নতজানু হচ্ছিলো সেই সভ্যতার সামনে। অবশেষে সেই জায়মান সভ্যতাই ধ্বংস করেছিল তাদের সৃষ্ট এতদিনকার সমাজব্যবস্থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে ঐ বিশিষ্ট সংগঠনটার, অর্থাৎ গোত্রের ইতিহাসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যে গোত্রব্যবস্থা বন্য দশা থেকে মানবসমাজকে ক্রমোন্নত করেছিল এবং বর্বর যুগের পথ পেরিয়ে তাকে পৌঁছে দিয়েছিল সভ্যযুগের দ্বারপ্রান্তে।

এথেনিয়দের সমাজব্যবস্থায় নিম্নলিখিত ক্রম চোখে পড়ে ঃ

প্রথমটা হচ্ছে জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গোত্র (জেনোস) ; দ্বিতীয়টা হল ভ্রাতৃত্ব (ফ্রাত্রা এবং ফ্রাত্রিয়া), যা সম্ভবত কোন-একটা আদি গোত্রের বিভাজনের ফলে উদ্ভূত কিছু গোত্রের ভ্রাতৃত্বের প্রতীক ; তৃতীয়টা হল গোষ্ঠী (ভাইলন, পরবর্তীকালে যাকে ফাইল বলা হত), যা কয়েকটা ভ্রাতৃত্ব নিয়ে গঠিত এবং যার সদস্যরা একই উপ-ভাষায় কথা বলে ; আর চতুর্থটা হচ্ছে একটা জনসমাজ বা জাতি, যা গড়ে উঠত একটা গোত্র-ভিত্তিক সমাজের মধ্যে কয়েকটা গোষ্ঠীর একাঙ্গীভূত হওয়ার দ্বারা। সাধারণত এই একাঙ্গীভূত জাতির লোকেরা একই অঞ্চলে বসবাস করত।

এই একীভূত ও উদীয়মান সংগঠনগুলোর সামাজিক ব্যবস্থা গোত্রের অধীনে থাকা-কালীনই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। টিকে ছিল শুধু পৃথক পৃথক অঞ্চলে বসবাসকারী গোষ্ঠীগুলোর মিত্রসংঘ। প্রাচীন যুগে কোথাও কোথাও গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মিত্রসংঘ গড়ে উঠলেও, এর কোন গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল না। চারটি এথেনিয় গোষ্ঠী একাঙ্গীভূত হওয়ার আগেই সম্ভবত মিত্রসংঘভুক্ত হয়েছিল। অন্যান্য গোষ্ঠীর চাপে পড়ে তারা একটা এলাকায় একত্রিত হওয়ার পরই শুধু তাদের একাঙ্গীভবন ঘটেছিল। এটা যদি এদের ক্ষেত্রে সত্য হয়ে থাকে, তাহলে ডোরিয়ান ও অন্যান্য গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও সত্য। এই ধরণের গোষ্ঠীগুলো যখন একটা জাতিতে একাঙ্গীভূত হত, তখন একটা জাতীয় নাম গ্রহণ করা ছাড়া তা প্রকাশ করার আর কোন উপযুক্ত শব্দ ছিল না। এই একই ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পর রোমানরা নিজেদেরকে বলত 'পপুলাস রোমানাস'। একেবারে লাগসই নাম। তখন তারা ছিল একটা জনসমাজ মাত্র। গোত্র, কিউরিয়া ও গোষ্ঠীর যোগফলে এর বেশি কিছু গড়ে ওঠা সম্ভবও ছিল না। চারটি এথেনিয় গোষ্ঠী মিলে গড়ে তুলেছিল একটা সমাজ বা জনসমাজ, যা উপকথার যুগে 'এথেনীয়' এই নামে সম্পূর্ণ স্বশাসিত হয়ে ওঠে।

মোট ত্রিশটা ওব ছিল। তবে, এই 'রেট্রা'-র ওপর একটু বেশি জোর দেওয়ার থেকে বড় কোন প্রমাণ তাঁরা দিতে পারেন নি, আর এই প্রমাণকেও অন্য বহু সমালোচকই প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রত্যাখ্যান করার যথেষ্ট কারণও তাঁদের ছিল। তাই ওব সম্বন্ধে আমাদের হাতে কোন তথ্যই নেই, যদিও আমরা জানি যে স্পার্টায় এটা ছিল এক প্রাচীন, বৈশিষ্ট্যময় ও মজবুত সংগঠন।"—গ্রোটের "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", মারে-র সংস্করণ, ৩৬২। এই সঙ্গেই দ্রষ্টব্য মুলার-এর "ডোরিয়ান্স", ১, পরিচ্ছেদ ২, পৃঃ ৮০।

BanglaBook.org

প্রথম দিককার গ্রীক জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠী ছিল তাদের সমাজ-ব্যবস্থার একটা স্থায়ী বৈশিষ্ট্য—শুধু কোথাও কোথাও ভ্রাতৃত্বটা অনুপস্থিত ছিল।

গ্রীক গোত্রগুলোর ব্যাপারে মূল তথ্যগুলো মিঃ গ্রোটে এতই সুদক্ষভাবে সংগ্রহ করেছেন যে তাঁর নিজের ভাষায় না বললে তাকে ভালভাবে ফুটিয়ে তোলা যাবে না। যেখানে যেখানে তিনি বিষয়টা নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করেছেন, সেখানে আমরা তাঁর কথাই উদ্ধৃত করব। গ্রীকদের গোষ্ঠীগত বিভাজনের কথা বলার পর তিনি বলেছেন ঃ "কিন্তু ভ্রাতৃত্ব আর গোত্র এ থেকে এক সম্পূর্ণ আলাদা বিভাজন। এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট আদিম দলের মিলনে গড়ে ওঠা এক-একটা দল। এগুলো গোষ্ঠীর থেকে পৃথক এবং গোষ্ঠী না থাকলেও এগুলো থাকতে পারে। এগুলো গড়ে ওঠে পৃথক পৃথকভাবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে, এর জন্য আগে থেকে নিজেদের মধ্যে কোন সমরূপ মনোভাব বা ব্যবস্থা থাকার দরকার হয় না এবং কোন সার্বজনীন রাজনৈতিক লক্ষ্য থাকারও প্রয়োজন হয় না। আইনপ্রণেতা এগুলোকে আগে থেকেই বিদ্যমান অবস্থায় হাতে পান এবং কতকগুলো জাতীয় পরিকল্পনার স্বার্থে এগুলোকে গ্রহণ অথবা পরিবর্তিত করেন। শ্রেণীবিভাজনের সাধারণ তথ্য এবং তার বিন্যাসে ধারাবাহিক অধীনতা (গোত্রের সঙ্গে পরিবারের সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে গোত্রের সম্পর্ক এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক) বিষয়ক সাধারণ তথ্যাবলীকে অবশ্যই পৃথক করে দেখতে হবে এই অধীনতাকে যে সংখ্যাগত সামঞ্জস্য অনুযায়ী সাজানো হয়—তার থেকে। যেমন আমরা অনেক লেখায় পড়ি—একটা গোত্রে ত্রিশটা পরিবার, একটা ভ্রাতৃত্বে ত্রিশটা গোত্র, প্রতিটা গোষ্ঠীতে তিনটি করে ভ্রাতৃত্ব। নিয়মের বন্ধনের সাহায্যে যদি কখনও এ-রকম চমৎকার সংখ্যাগত সমতা অর্জন করা সম্ভবপর হত, তাহলেও আগে থেকেই বিদ্যমান স্বাভাবিক উপাদানগুলোর মধ্যে সক্রিয় করে তোলার সময় এই অনুপাতকে কখনোই স্থায়ীভাবে বজায় রাখা সম্ভবপর হত না। তবে সন্দেহ করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে যে এ-রকম সামঞ্জস্য সত্যিই কখনও ছিল কি না···। প্রতিটা ভ্রাতৃত্বে সমান সংখ্যক গোত্র ছিল এবং প্রতিটা গোত্রে সমান সংখ্যক পরিবার ছিল—এই বক্তব্যটার বিষয়ে আরও বেশি প্রমাণ পেলেও বিশ্বাস করা শক্ত। তবে, এই সংখ্যাগত সমতার সন্দেহযোগ্য বিষয়টা বাদ দিলে বলা যায় যে এথেনীয়দের মধ্যে গোত্র ও ভ্রাতৃত্ব ছিল দুটো অত্যন্ত বাস্তব, প্রাচীন ও দীর্ঘস্থায়ী সংগঠন। এগুলোর সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট ধারণা অর্জন করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোটা কাঠামোটার ভিত্তি ছিল বাসস্থান—গৃহ বা পরিবার। কমবেশি কিছু সংখ্যক গৃহ বা পরিবার নিয়েই গড়ে উঠত এক-একটা গোত্র বা জেনোস। অর্থাৎ এই গোত্রগুলো ছিল এক-একটা বংশ দল অথবা বর্ধিত ও অংশত কৃত্রিম এক-একটা ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন, যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চালু থাকত—১) একই ঈশ্বরের সম্মানে সার্বজনীন ধর্মীয় উৎসব এবং পুরোহিতগিরির নিরঙ্কুশ অধিকার ; এই ঈশ্বরকেই তাদের আদি-পুরুষ বলে মনে করত তারা এবং তাঁর একটা বিশেষ উপাধি থাকত ; ২) একটা সার্বজনীন কবরস্থান[১] ; ৩) সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে পারস্পরিক

১। ডিমোস্থিনিস, "ইউবিলাইডস", ১৩০৭।

অধিকার ; ৪) সাহায্য, প্রতিরক্ষা ও আহতদের পরিচর্যার ব্যাপারে পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব ; ৫) কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে অন্তর্বিবাহ করার পারস্পরিক অধিকার ও বাধ্য-বাধকতা, বিশেষত যেখানে কোন অনাথা মেয়ে বা উত্তরাধিকারিনী থাকত ; ৬) অন্তত কোন কোন ক্ষেত্রে সার্বজনীন সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের নিজেদের একজন করে বিচারক ও কোষাধ্যক্ষ থাকত। এগুলোই ছিল গোত্রের সদস্যদের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব। কয়েকটা গোত্রের একত্রীকরণের মারফৎ গড়ে উঠত যে ভ্রাতৃত্ব, তা ঠিক এতটা ঘনিষ্ঠ বন্ধনযুক্ত হত না। তবে সেখানেও একই ধরণের কিছু পারস্পরিক অধিকার ও দায়-দায়িত্ব থাকত। বিশেষত ভ্রাতৃত্বের কোন সদস্য নিহত হলে নির্দিষ্ট কিছু পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান পালন করা এবং দোষী ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করার ব্যাপারে তাদের পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা থাকত। প্রতিটা ভ্রাতৃত্বকেই চারটি গোষ্ঠীর কোন-না-কোনটার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হত এবং ইউপ্যাট্রিডদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত করা ফাইলো-ব্যাসি-লিয়ুস (গোষ্ঠীপতি) নামে একজন বিচারকের পরিচালনায় বছরের নির্দিষ্ট সময়ে একটা পবিত্র অনুষ্ঠান পালন করত একই গোষ্ঠীর সবকটা ভ্রাতৃত্ব।"[১]

গ্রীক ও ইরোকোয়া গোত্রগুলোর মধ্যেকার সাদৃশ্য খুব সহজেই চোখে পড়ে। এই দুই গোত্রের মধ্যেকার পার্থক্যকেও বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই পার্থক্যের কারণ হল—গ্রীক সমাজের অবস্থা ইরোকোয়াদের থেকে অনেক উন্নত ছিল আর তাদের ধর্মীয় ব্যবস্থাও বিকশিত হয়েছিল অনেক বেশি। গোত্রগুলোর বিভিন্ন কার্যকলাপের যে বিবরণ মিঃ গ্রোটে দিয়েছেন, সেগুলোকে যাচাই করার কোন দরকার নেই, কারণ প্রাচীন লেখকদের বর্ণনা থেকেই এর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক গোত্রগুলোর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহেই ছিল, তবে সেগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করা খুব সহজ নয় এখন। যেমন—৭) শুধু পুরুষ-ধারা অনুসারেই বংশ-ধারা নির্ণয় করা হত ; ৮) একমাত্র উত্তরাধিকারিণীদের ক্ষেত্র বাদে অন্যত্র গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল ; ৯) গোত্রের মধ্যে বহিরাগতদের গ্রহণ করার অধিকার ছিল তাদের ; এবং ১০) গোত্র-প্রধানদের নির্বাচিত ও বরখাস্ত করার অধিকারও তাদের ছিল।

গ্রীক গোত্রগুলোর সদস্যদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়দায়িত্বগুলোকে—সংযোজিত বিষয়সমূহ সহ—এইভাবে সারসংক্ষেপ করা চলে ঃ

১। সার্বজনীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান।

২। সার্বজনীন কবরস্থান।

৩। মৃত সদস্যদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে পারস্পরিক অধিকার।

৪। সাহায্য, প্রতিরক্ষা ও আহতদের পরিচর্যার ব্যাপারে পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা।

৫। অনাথা কন্যা এবং উত্তরাধিকারিণীদের ক্ষেত্রে গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ করার অধিকার।

৬। সার্বজনীন সম্পত্তি, একজন বিচারক আর একজন কোষাধ্যক্ষ রাখার অধিকার।

১। "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", ৩,৫৩, এবং তার পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

BanglaBook.org

৭। পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশ-ধারা নির্ণয়।
৮। কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়া গোত্রের মধ্যে বিবাহ না করার বাধ্যবাধকতা।
৯। গোত্রের মধ্যে বহিরাগতদের গ্রহণ করার অধিকার।
১০। গোত্র-প্রধানদের নির্বাচিত ও বরখাস্ত করার অধিকার।

যে বিষয়গুলোকে পরে যোগ করা হয়েছে, সেগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

৭। পুরুষ-ধারা অনুযায়ী বংশ-ধারা নির্ণয়।

এটাই যে চালু নিয়ম ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের বংশকুলুজি থেকেই এর এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন গ্রীক লেখকের রচনা থেকে গোত্র বা গোত্র-সদস্যদের সম্বন্ধে এমন কোন সংজ্ঞা আমি পাইনি, যা দিয়ে গোত্রীয় সংগঠনের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির অধিকারকে যথাযথভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে। রোমান গোত্র ও গোত্র-সদস্যরা ছিল ঠিক গ্রীক গোত্র ও গোত্র-সদস্যদের মতই। এই রোমান গোত্রের মধ্যে বংশধারা যে পুরুষ-ধারা অনুসারেই নির্ণয় করা হত, তা যথেষ্ট প্রমাণ সহযোগে দেখিয়ে দিয়েছেন সিসেরো, ভ্যারো এবং ফেস্টাস। গোত্রের গঠন অনুযায়ীই ঠিক করা হত যে স্ত্রী-ধারা না পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশ-ধারা নির্ণয় করা হবে। আর সেই নিয়ম অনুযায়ী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত তার প্রতিষ্ঠাতাদের বংশধরদের মাত্র অর্ধাংশ। ব্যাপারটা ঠিক আজকের দিনের পরিবারগুলোর মতই। পরিবারের পুরুষ-সদস্যদের বংশধররাই শুধু পারিবারিক পদবীটার অধিকারী হয় এবং তারা আসলে সঠিক অর্থেই একটা গোত্র গড়ে তোলে। তবে কিনা আজকের পরিবারগুলো খানিকটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে এবং নিকটতম জ্ঞাতিত্বের বন্ধনটুকু ছাড়া তার মধ্যে আর কোনরকম বন্ধন থাকে না। বিবাহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েরা তাদের পদবী হারায় এবং নিজের সন্তান-সন্ততিসহ অন্য একটা পরিবারের সদস্যা হয়ে যায়। গ্রোটে বলেছেন যে অ্যারিস্টটল ছিলেন "চিকিৎসক নিকোম্যাকাস-এর পুত্র, যে নিকোম্যাকাস ছিলেন আস্‌ক্লেপিয়াড গোত্রের সদস্য।"[১] অ্যারিস্টটল নিজেও তাঁর পিতার ঐ গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কি-না, তা নির্ভর করে এই প্রশ্নটির ওপরে যে, তিনি এবং তাঁর পিতা উভয়েই এস্‌কুলা-পায়াস গোত্রের পুরুষ-ধারায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা। লেটিয়াস এটা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে "অ্যারিস্টটল ছিলেন নিকোম্যাকাস এর পুত্র···এবং নিকোম্যাকাসের পিতা ছিলেন নিকোম্যাকাস, তাঁর পিতা ছিলেন ম্যাকাওন এবং তাঁর পিতা ছিলেন এস্‌কুলাপায়াস।"[২] এই পরম্পরার প্রাচীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারটা যদি অলীক কল্পনাও হয়ে থাকে, তাহলেও বংশধারা অনুসন্ধানের এই পদ্ধতি থেকেই কোন ব্যক্তি কোন্ গোত্রের সদস্য—তা বুঝে নেওয়া যায়। ইসাউস্-এর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে

১। "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", ৩, ৬০।
২। ডায়োজেনেস, লেটিয়াস, "Vit. Aristotle", ৫, ১।

হেরম্যান যা বলেছেন, তা-ও এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ—"প্রতিটি শিশুকে তার পিতার ভ্রাতৃত্ব ও বংশের অন্তর্ভুক্ত করা হত।"[১] সন্তানদেরকে পিতার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ একটাই—সন্তানরা তাদের পিতার গোত্রের সদস্য হিসেবে বিবেচিতই হত।

৮। নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র ছাড়া গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ না করার বাধ্যবাধকতা।

বিবাহের পরবর্তী ঘটনাগুলো থেকেই এই বাধ্যবাধকতার ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারে। বিবাহের পরই মেয়েটি তার নিজের গোত্রের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানসমূহ পালন করার অধিকার হারাত এবং তার স্বামীর গোত্রের আচার-অনুষ্ঠানগুলোর ওপর অধিকার অর্জন করত। এই নিয়মটা থেকে স্বভাবতই মনে হয় যে সাধারণত বিবাহ হত নিজ গোত্রের বাইরের কারোর সঙ্গে। ওয়াখ্‌স্‌মাথ লিখেছেন, "কোন কুমারী মেয়ে নিজের পিতার ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, পিতৃকুলের বলিদানের ঘরে তার আর কোন অধিকার থাকে না। তখন সে তার স্বামীর ধর্মীয় কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এর ফলে পবিত্র হয়ে ওঠে তার বৈবাহিক বন্ধন।"[২] বিবাহের পর স্ত্রীর নাম নথিভুক্ত-করণের কথা বিবৃত করেছেন হার্মানি ঃ প্রতিটি সদ্য-পরিণীতা স্ত্রীর নাম—যে নিজেও একজন নাগরিক—ঐ সময় অন্তর্ভুক্ত করা হত তার স্বামীর ভ্রাতৃত্বের মধ্যে।[৩] গ্রীক ও লাতিন, উভয় ধরণের গোত্রের মধ্যেই কতকগুলো বিশেষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান (স্যাক্রা জেণ্টিলিসিয়া) চালু ছিল। রোমানদের মত এদের মধ্যেও মেয়েরা বিয়ের পর তার নিজের গোত্রের যাবতীয় অধিকার হারাত কি না, আমি বলতে পারছি না। এটা তো সম্ভব নয় যে বিয়ের পরই মেয়েদের সঙ্গে তাদের পিতার গোত্রের সব সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যেত এবং বিয়ের পরও মেয়েরা তাদের পিতার গোত্রের একেবারে বাইরের লোক বলে নিজেদেরকে মনে করত না।

গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারটা প্রাচীন যুগে একেবারেই অপরিহার্য ছিল। পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয় চালু হওয়ার পরও এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহেই টিকে ছিল, শুধু সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী ও অনাথা মেয়েদের জন্য একটা বিশেষ বন্দোবস্ত থাকত। একপতিপত্নীক পরিবার পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও অবাধ বিবাহের (রক্তের সম্পর্কযুক্ত কিছু নারী-পুরুষ বাদে) দিকে একটা ঝোঁক দেখা দেওয়া একান্তই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যতদিন পর্যন্ত গোত্রই ছিল সমাজব্যবস্থার বনিয়াদ, ততদিন পর্যন্ত গোত্রের বাইরে বিবাহ করার নিয়ম চালু থাকাটাও ছিল খুবই স্বাভাবিক। উত্তরাধিকারিণীদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত রাখার

১। "পলিটিক্যাল অ্যাণ্টিকুইটিস অফ দ্য গ্রীকস", উলারিখ্‌-এর অনুবাদ, অক্সফোর্ড সংস্করণ ১৮৩৭, ১, ৪৫১।

২। "হিস্টরিক্যাল অ্যাণ্টিকুইটিস অফ দ্য গ্রীকস", পরিচ্ছেদ ৫, পৃঃ ১০০; এছাড়াও দ্রষ্টব্য ডিমোস্থিনিস-এর "ইউবিলাইডস", ২৪।

৩। "পলিটিক্যাল অ্যাণ্টিকুইটিস, ১. সি", পরিচ্ছেদ ৫, পৃঃ ১০০।

BanglaBook.org

ব্যাপারটা এই অনুমানকেই সত্য বলে প্রতিপন্ন করে। এ ব্যাপারে বেকার বলেছেন যে "ছোটখাটো কিছু বিধি-নিষেধ ছাড়া, বিবাহের ব্যাপারে আত্মীয়তা কোন বাধা সৃষ্টি করত না। একই বংশের বা সান্‌র্জিনিয়ার যে-কোন দুজন নারী-পুরুষের মধ্যেই বিবাহ হতে পারত। তবে সাধারণত একই গোত্রের দুজন নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ হত না।"[১]

৯। গোত্রের মধ্যে বহিরাগতদের গ্রহণ করার অধিকার।

এই অধিকারটা পরবর্তী যুগে প্রয়োগ করা হত, অন্তত পরিবারের মধ্যে প্রয়োগ করা হত তো বটেই। তবে এভাবে কাউকে গ্রহণ করার জন্য নানারকম রীতি-প্রথা পালন করতে হত এবং শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই বাইরের লোককে গ্রহণ করা হত।[২] অ্যাটিক্‌ অঞ্চলের গোত্রগুলোর মধ্যে বংশধারার বিশুদ্ধতা বজায় এক পবিত্র কর্তব্য হিসেবেই বিবেচিত হত। ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া বহিরাগতদের গোত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার এই অধিকারটা প্রয়োগ করার নানান সমস্যা ছিল।

১০। গোত্রের প্রধানদের নির্বাচিত ও বরখাস্ত করার অধিকার।

প্রাচীন যুগে গ্রীক গোত্রগুলোর মধ্যে এই অধিকার যে চালু ছিল, তাতে কোন সন্দেহই নেই। সম্ভবত তারা যখন বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তখনই তাদের মধ্যে এই অধিকার দেখা দেয়। প্রতিটি গোত্রের একজন করে বিচারক (আর্কন) থাকত। এই বিচারক বা আর্কনই ছিল গোত্র-প্রধানদের সাধারণ নাম। পদটা নির্বাচনমূলক ছিল (ধরা যাক, হোমারীয় যুগে) নাকি উত্তরাধিকারসূত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ওপর বর্তাতো—সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। শেষোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রাচীনকালে এই পদ হস্তান্তরিত হত না, আর গোত্রের সকল সদস্যের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত অধিকারকে খর্ব করার মত এত বিপুল ও মৌলিক একটা পরিবর্তন ঘটানোর জন্য দরকার ছিল ঐ শেষোক্ত পদ্ধতির বিরুদ্ধে যত যুক্তি, তাকে বাতিল করার মত ইতিবাচক প্রমাণ। কোন পদের ওপর বংশপরম্পরাগত অধিকার থাকলে, সেই পদলাভের সঙ্গেই গোত্রের সদস্যদের ওপর কর্তৃত্ব এবং তাদের প্রতি দায়দায়িত্বও বর্তাতো। অবাধ নির্বাচনমূলক পদ আর উত্তরাধিকারমূলক পদ দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। অবশ্য অন্যায় আচার-আচরণের জন্য পদাধিকারীকে বরখাস্ত করার অধিকারটা উভয় ক্ষেত্রেই থাকত। সোলোন এবং ক্লাইসথেনিস-এর সময় পর্যন্ত এথেনীয় গোত্রগুলোর মধ্যে যে স্বাধীনতার মেজাজ খুঁজে পাওয়া যায়, তা থেকে এটাই মনে হয় যে গোত্রের সদস্যদের স্বাধীনতার প্রশ্নে অত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধিকারকে

১। "চ্যারিক্‌ল্‌স", মেট্‌কাফ-এর লণ্ডন সংস্করণ, ১৮৬৬, পৃঃ ৪৭৭; এতে উদ্ধৃত করা হয়েছে "Isacus de cir. her", ২১৭: "Demosthenes adv. Ebul", ১৩০৪: "Plutarch, Themist", ৩২: "Pausanias", i, ৭, ১: "Achill. Tat", i, ৩।

২। হার্মান, পরিচ্ছেদ ১, পৃঃ ১০০ এবং ১০১।

BanglaBook.org

তারা হাত-ছাড়া করেছিল। এই পদের দায়িত্বকাল সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি আমি। উত্তরাধিকারমূলক পদাধিকার চালু থেকে থাকলে তা প্রাচীন সমাজে অভিজাততন্ত্রের উপাদানের এক উল্লেখযোগ্য বিকাশকেই চিহ্নিত করে, যার অর্থ হল গোত্রের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে খর্ব করা। তাছাড়া এটা গোত্রের অধঃপতনের সূচনারও ইঙ্গিত দেয়। গোত্রের সকল সদস্যই ছিল স্বাধীন ও সমান, ধনী ও দরিদ্রের একই অধিকার ও একই সুযোগ-সুবিধা এবং তারা পরস্পরের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাকে স্বীকার করে নিত। ইরোকোয়াদের মত এথেনিয় গোত্রগুলোর কাঠামোতেও আমরা অনায়াসেই স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের অস্তিত্ব দেখতে পাই। সকলের সমান অধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধার এই প্রাচীন নীতির সঙ্গে গোত্রের মূল পদের ওপর বংশানুক্রমিক অধিকারের ব্যাপারটা একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

অ্যানাক্স (anax), কোইরানো (koirano) এবং ব্যাসিলিয়ুস-এর মত উচ্চতর পদগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার কাছ থেকে পুত্রের ওপর বর্তাতো নাকি এক ব্যাপক জনমণ্ডলী তাদেরকে নির্বাচিত বা অনুমোদিত করার চেষ্টা করত—এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ নিয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করার চেষ্টা করব। প্রথমোক্ত পদ্ধতি চালু থেকে থাকলে তা গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসের ইঙ্গিত দেয় আর শেষোক্ত পদ্ধতি ইঙ্গিত দেয় গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার। সমস্ত অনুমানই বংশপরম্পরাগত অধিকারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, একমাত্র কোথাও কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ পেলে আলাদা কথা। রোমান গোত্র নিয়ে আলোচনা করার সময় এ ব্যাপারে আরও কিছু আলোকপাত করা যাবে। এই পদটার দায়িত্বকাল সম্বন্ধে সযত্নে পুনর্বিবেচনা করলে একান্ত স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি আমূল পাল্টে যেতে পারে।
যথেষ্ট নিশ্চিতভাবেই আমরা ধরে নিতে পারি যে গ্রীক গোত্রগুলোর মধ্যে উল্লিখিত মূল দশটা বিষয়ই চালু ছিল। পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়, সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনীদের ক্ষেত্রে গোত্রের মধ্যে বিবাহ করার রীতি এবং সর্বোচ্চ সামরিক পদটির সম্ভবত উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হওয়া—এই তিনটি বিষয় বাদে বাকি সবকটাই সামান্য অদল-বদল সহ ইরোকোয়াদের গোত্রগুলোর মধ্যেও দেখা যায়। এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে গ্রীক ও ইরোকোয়া গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একই ধরণের গোত্রের অস্তিত্ব ছিল—শুধু একটার মধ্যে গোত্র ছিল উন্নত ধাঁচের আর অন্যটার মধ্যে ছিল প্রাচীন ধাঁচের।

BanglaBook.org

আবার মিঃ গ্রোটের সেই উদ্ধৃতির প্রসঙ্গে ফেরা যাক। গোত্রের প্রাচীন রূপ এবং একপতিপত্নীক পরিবার চালু হওয়ার আগে পরিবারের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে পরিচিত থাকলে তিনি সম্ভবত তাঁর বক্তব্যের কিছু কিছু অংশ পরিবর্তিত করতেন। যেমন তিনি বলেছেন যে গ্রীকদের সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল "বাড়ি, যৌথ-গৃহ অথবা পরিবার।" এই বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের চিন্তায় পরিবারের যে রূপটি কাজ করছিল, তা নিঃসন্দেহেই রোমান পরিবার, যেখানে পরিবারের কর্তাই ছিল

সর্বেসর্বা। আর হোমারীয় যুগে গ্রীক পরিবারগুলোতে পিতার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পরিবারের অন্য কোন প্রাচীনতর রূপ খুঁজতে চাওয়াটাও একইরকমভাবে অসমর্থনীয়। উদ্ভবের নিরিখে গোত্র একপতিপত্নীভিত্তিক পরিবারের থেকে প্রাচীন, জোড়-বাঁধা বিবাহের থেকে প্রাচীন এবং দলগত বিবাহের সমসাময়িক। এগুলোর কোনটাই কিন্তু গোত্রের ভিত্তি ছিল না। গোত্রের গঠনকারী উপাদান হিসেবে কোন ধরণের পরিবারেরই প্রয়োজন হয় নি। বরং প্রাচীনকালে এবং পরবর্তী যুগে প্রতিটি পরিবার অংশত ছিল গোত্রের মধ্যে আর অংশত বাইরে, কেননা সর্বদাই স্বামী ও স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সদস্য হত। ব্যাখ্যাটা একান্তই সহজ ও পূর্ণাঙ্গ। অর্থাৎ, পরিবার তার নিম্নতর রূপ থেকে উচ্চতর রূপে অগ্রসর হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়েই স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হয় গোত্রের মধ্যে থেকে, আর গোত্র হচ্ছে একটা স্থির কাঠামো এবং সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একক। সমগ্র গোত্র একটা ভ্রাতৃত্বের অন্তর্গত, সমগ্র ভ্রাতৃত্ব একটা গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং সমগ্র গোষ্ঠী একটা জাতির অন্তর্গত। কিন্তু একটা পরিবার পুরো-পুরিভাবে কোন গোত্রের অন্তর্গত হতে পারত না, কারণ স্বামী আর স্ত্রী ছিল ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সদস্য।

এখানে উত্থাপিত প্রশ্নটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শুধু মিঃ গ্রোটেই নন, এমনকি নিবার, থির্লওয়াল, মেইন, মম্‌সেন এবং আরও বহু দক্ষ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন অনুসন্ধানকারীরাও এ ব্যাপারে এই একই কথা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলেই বলেছেন যে গ্রীক ও রোমানদের সমাজব্যবস্থায় পিতৃতান্ত্রিক ধাঁচের একপতিপত্নীভিত্তিক পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল সমাজকাঠামো। কিন্তু আসলে কোন ধরণের পরিবারের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে ওঠেনি, কারণ পরিবার পুরোপুরিভাবে কোন-একটা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না। গোত্র ছিল একটা সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যাপার এবং যথেষ্ট স্থায়িত্বও ছিল তার। আর তাই এটাই ছিল সমাজ ব্যবস্থার স্বাভাবিক ভিত্তি। একপতিপত্নীভিত্তিক কোন পরিবার একটা গোত্রের মধ্যে এবং গোটা সমাজের মধ্যেও বিশিষ্ট ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু তাই বলে গোত্র কখনোই তার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিবারকে স্বীকার করত না বা তার ওপর নির্ভরও করত না। আধুনিক পরিবার ও রাজনৈতিক সমাজের ব্যাপারেও একই কথা সত্য। সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পরিবারকে বিশিষ্ট করে তুললেও এবং সাংবিধানিক আইন-কানুন তাকে এক বৈধ সত্ত্বা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও, পরিবার কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রাথমিক একক নয়। যে-সব জেলা নিয়ে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, সেগুলোকে স্বীকৃতি দেয় রাষ্ট্র, জেলাগুলো স্বীকৃতি দেয় তাদের শহরগুলোকে, কিন্তু কোন শহরই তাদের পরিবারগুলোকে গ্রাহ্য করে না। একইভাবে জাতি স্বীকৃতি দিত গোষ্ঠীকে, গোষ্ঠী দিত ভ্রাতৃত্বকে, ভ্রাতৃত্ব দিত গোত্রকে, কিন্তু গোত্র তার পরিবারগুলোকে স্বীকৃতি দিত না। সমাজের কাঠামো নিয়ে আলোচনা করার সময় শুধু তার গঠনগত সম্পর্কগুলোকেই বিবেচনা করা দরকার। গোত্রভিত্তিক সমাজের সঙ্গে গোত্রের যে সম্পর্ক ছিল, আজকের

BanglaBook.org

রাজনৈতিক সমাজের সঙ্গে শহরগুলোর সেই সম্পর্কই চালু রয়েছে। দুটোই হচ্ছে একটা ব্যবস্থার প্রাথমিক একক।

গ্রীক গোত্রগুলো সম্বন্ধে মিঃ গ্রোটে কিছু মূল্যবান কথা বলেছেন, যেগুলোকে আমি ঐ-সব গোত্রের ব্যাখ্যায় কাজে লাগাতে চাই। অবশ্য কোন কোন জায়গায় তিনি বলতে চেয়েছেন যে এই গোত্রগুলো সেই সময়ে চালু পুরাণ বা দেবতাদের একাধিপত্যের সমসাময়িক, যে-সব দেবতাদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি কয়েকটা গোত্রের আদিপুরুষ বলে গোত্রগুলো দাবি করে। আমাদের উপস্থাপিত তথ্যসমূহ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এইসব পুরাকাহিনীর জন্মের বহু আগে থেকেই, মানুষের মনে জুপিটার বা নেপচুন, মার্স বা ভেনাসের চিন্তা উদয় হওয়ার বহু আগে থেকেই গোত্র বিদ্যমান ছিল।

মিঃ গ্রোটে বলছেন ঃ "ক্রম উদীয়মান অবস্থায় অ্যাটিকা অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আদিম ধর্মীয় ও সামাজিক ঐক্যটা এ-রকমই ছিল। সম্ভবত পরবর্তীকালে যে রাজনৈতিক ঐক্যটা দেখা গিয়েছিল, প্রথমে ট্রিটাই ও নউক্র্যারিদের মধ্যে এবং তারপর ট্রিটাই ও ডেমিতে বিভক্ত দশটা ক্লাইস্থেনীয় গোষ্ঠীর মধ্যে—সেটা, আর ঐ ধর্মীয় ও সামাজিক ঐক্যটা এক জিনিস নয়। এই দু ধরনের ঐক্যের মধ্যে প্রথম দেখা দিয়েছিল ধর্মীয় ও পারিবারিক একতার বন্ধন। রাজনৈতিক বন্ধনটা পরবর্তীকালে শুরু হয়ে থাকলেও এই ইতিহাসের বৃহত্তর অংশটা জুড়ে সে ক্রমবর্ধিতভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। প্রথমোক্ত ঐক্যের অপরিহার্য ও মূল বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যক্তিগত সম্পর্ক—আঞ্চলিক সম্পর্ক ছিল গৌণ। শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রধান ব্যাপার হয়ে ওঠে সম্পত্তি ও বাসগৃহ, আর ব্যক্তিগত সম্পর্ক পরিণত হয় এগুলোর সহায়ক বিষয়ে। এইসব ছোটবড় ভ্রাতৃত্ব ও গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি ছিল গ্রীকদের চিন্তাভাবনার সেই একই নীতি ও প্রবণতা—অর্থাৎ, বংশ সংক্রান্ত ধারণার সঙ্গে উপাসনা সংক্রান্ত ধারণার একাঙ্গীভবন অথবা কয়েকটা বিশেষ ধর্মীয় আচার-আচরণের সংযোগের মধ্যে রক্তের সংযোগ খোঁজা, তা সে সংযোগ প্রকৃত বা কল্পিত যা-ই হোক না কেন। যে দেবতা বা বীরের সামনে সমবেত সদস্যরা বলি প্রদান করত, তাদেরকেই তারা তাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ বলে মনে করত। ঐ আদি পূর্বপুরুষের পরবর্তী আরও কিছু পূর্বপুরুষের নামও প্রায়শই উচ্চারিত হয়, যেমনটা দেখা যায় মাইলেসিয়ান হেকাটিউস-এর ক্ষেত্রে। প্রতিটা পরিবারের কিছু নিজস্ব পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে কিছু অন্ত্যেষ্টিমূলক ক্রিয়াকর্ম থাকত। এইসব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করতেন পরিবারের কর্তা, আর এইসব অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্যরা ছাড়া আর কেউ অংশগ্রহণ করতে পারত না···। গোত্র, ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠী নামক বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোও এই একই নীতির সম্প্রসারণের ভিত্তিতেই গড়ে উঠত—যা আসলে পরিবারেরই বর্ধিত রূপ, যাকে একটা ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববন্ধন হিসেবে মনে করা হত, যারা একটা উপযুক্ত নাম বিশিষ্ট সার্বজনীন দেবতা বা বীরের উপাসনা করত আর তাকেই নিজেদের সকলকার পূর্বপুরুষ বলে মনে করত। থিয়োনিয়া এবং অ্যাপাচারিয়ার উৎসবে (প্রথমটা ছিল অ্যাটিকার আর

BanglaBook.org

দ্বিতীয়টা সমস্ত আয়োনিয়ান গোষ্ঠীর সার্বজনীন উৎসব) প্রতিবছর এইসব ভ্রাতৃত্ব আর গোত্রের সদস্যরা উপাসনা, আমোদ-প্রমোদ ও বিশেষ কিছু সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য সমবেত হত। এর সাহায্যে ক্ষুদ্রতর বন্ধনকে ছিন্ন না করেও বৃহত্তর বন্ধনকে দৃঢ়তর করে তোলা হত···। কিন্তু ঐতিহাসিককে চূড়ান্ত তথ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে নানান সূত্র থেকে জ্ঞাত একেবারে প্রাথমিক অবস্থাটাকে, আর আমাদের এই ক্ষেত্রটিতে গোত্রীয় ও ভ্রাতৃত্বকেন্দ্রিক সম্মিলন হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার যার সূচনার যুগে প্রবেশ করার উপায় আমাদের নেই।"[১]

"এথেন্সের এবং গ্রীসের অন্যান্য অঞ্চলের গোত্রগুলোর একটা করে গোত্র-নাম থাকত, যা ছিল তাদের সেই অনুমিত সাধারণ পূর্বপুরুষেরই স্মারক-চিহ্ন[২]···। কিন্তু এথেন্সে, অন্তত ক্লাইসথেনিসের বিপ্লবের পর, গোত্রীয় নামের প্রয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। কোন লোককে তার নিজের নামেই চিহ্নিত করা হত, তারপর বলা হত তার পিতার নাম এবং সবশেষে উচ্চারিত হত তার এলাকার নাম। যেমন—এসচিনেস, অ্যাট্রোমেটাস-এর পুত্র, কথোকিডবাসী···। সম্পত্তি এবং ব্যক্তি—উভয় ক্ষেত্রেই গোত্র ছিল একটা সম্মিলিত সংস্থাবিশেষ। সোলোনের সময়ের আগে পর্যন্ত কেউ উইল করে সম্পত্তি হস্তান্তরিত করতে পারত না। কোন লোক নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত গোত্রের অন্য সদস্যরা। এমনকি সোলোনের পরবর্তীকালেও কোন নিঃসন্তান ব্যক্তি উইল না করে মারা গেলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত গোত্রের সদস্যরাই। কোন অনাথা মেয়েকে গোত্রের যে-কোন পুরুষই বিয়ে করতে চাইতে পারত, তবে অগ্রাধিকার পেত তার নিকটতম জ্ঞাতিরাই। মেয়েটি দরিদ্র হলে এবং তার নিকটতম জ্ঞাতিটি তাকে বিয়ে করতে না চাইলে, সোলোনের আইন অনুসারে ঐ জ্ঞাতিটি বাধ্য হত নিজের মোট সম্পত্তির একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে মেয়েটিকে যৌতুক দিতে এবং অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে···। কোন ব্যক্তি খুন হলে, প্রথমে তার নিকট আত্মীয়দের এবং তারপর তার গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের অন্যান্য সদস্যদের ডাকা হত সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। কিন্তু একই অঞ্চলের অন্যান্য বাসিন্দাদের এই অধিকার ছিল না। এথেনিয়দের প্রাচীনতম আইন-কানুন সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানি, তার ভিত্তি হচ্ছে গোত্র ও ভ্রাতৃত্ব। এই গোত্র ও ভ্রাতৃত্বকে তারা পরিবারের সম্প্রসারিত রূপ বলেই মনে

১। "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", ৩, ৫৫।

২। গ্রীসের বহু অঞ্চলেই আমরা আসক্লেপিয়াড-এর সন্ধান পাই—থেসালিতে আলেউএড্, এজিনায় মিডাইলিডে, পসালাইকিডে, রেপসিয়াডে ও ইউক্লেনিডে, মাইলেটাস-এ ব্রাঙ্কিডে, কস্-এ জেরিডে, অলিম্পিয়ায় ইয়ামিডে ও ক্লাইটিডে, আর্গস-এ আকেস্টরিডে, সাইপ্রাসে কিনিরাডে, মাইটিলিনে পেন্থিলিডে, স্পার্টায় ট্যাল্থিবিডে, আর অ্যাটিকায় কোড্রিডে, ইউমল্পিডে, ফাইটালাইডে, লাইকোমেডে, বুটাডে, ইউনিডে, হেসাইমিডে, ব্রাইটিয়াডে প্রভৃতি। এই প্রত্যেকটারই একজন করে কম-বেশি পরিচিত কাল্পনিক পূর্বপুরুষ ছিল এবং সেই পূর্বপুরুষকেই গোত্রগুলোর আদি পুরুষ এবং প্রথম বীর বলে মনে করা হত। যেমন—কোড্রাস, ইউমল্পাস, বুটেস, ফাইটেলাস, হেসাইথাম ইত্যাদি।"—গ্রোটের "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", ৩, ১২।

করত। উল্লেখ করা দরকার যে, গোত্র ও ভ্রাতৃত্বগত বিভাজনের সঙ্গে সম্পত্তির কোন সম্পর্ক ছিল না—ধনী ও দরিদ্র, উভয়েই একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত। তাছাড়া, বিভিন্ন গোত্রের মর্যাদা মোটেই সমান ছিল না। মূলত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোই এই মর্যাদার মাপকাঠি হিসেবে কাজ করত। প্রতিটা গোত্র উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভার পেত এবং সেগুলোর ওপর থাকত তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। এগুলোর মধ্যে কোন কোন উৎসবকে গোটা শহরের পক্ষে অত্যন্ত পবিত্র উৎসব হিসেবে বিবেচনা করে জাতীয় উৎসবে পরিণত করা হত। এইভাবে দেখা যায় যে, ইলিউসিনিয়ান ডিমিটার রহস্যের পুরোহিত ও তত্ত্বাবধায়ক সরবরাহকারী ইউমল্‌পিডে ও কেরাইকে গোত্রের লোকেরা এবং অ্যাথেন পোলিয়া-র পূজারিনী ও অ্যাক্রোপোলিসের পোসাইডন এরেক্‌থিউস-এর পুরোহিত সরবরাহকারী বুটাডে গোত্রের লোকেরা অন্যান্য গোত্রদের থেকে বেশি শ্রদ্ধা পেত।"[১]

মিঃ গ্রোটে গোত্রকে দেখেছেন পরিবারের একটা সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে এবং গোত্রের আগেই পরিবারের অস্তিত্ব অনুমান করে নিয়েছেন। তিনি পরিবারকে দেখেছেন প্রাথমিক বিষয় হিসেবে আর গোত্র হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের বিষয়। আমরা আগেই যে-সব কারণের কথা উল্লেখ করেছি, সেগুলো অনুযায়ী দেখলে এই দৃষ্টিভঙ্গীকে মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। এই দুটো সংগঠন অগ্রসর হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নীতির ভিত্তিতে এবং এ দুটো কখনোই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। কোন-একজন কল্পিত সাধারণ পূর্বপুরুষের বংশধরদের মাত্র একটা অংশই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত, বাকিরা বাদ চলে যেত। একইভাবে, পরিবারের একটা অংশই শুধু কোন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত, বাকি অংশটা সেই গোত্রের আওতায় পড়ত না। গোত্রের অংশ হয়ে ওঠার জন্য পরিবারকে পরিপূর্ণভাবে গোত্রের মধ্যে প্রবেশ করতে হত। প্রাচীন যুগে এটা আদৌ সম্ভব ছিল না এবং পরবর্তীকালে প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল মাত্র। গোত্রভিত্তিক সমাজকাঠামোয় গোত্রই হচ্ছে প্রাথমিক সংগঠন, গোত্রই হচ্ছে ঐ সমাজব্যবস্থার ভিত্তি এবং প্রাথমিক একক। পরিবারও একটা প্রাথমিক উপাদান আর তা গোত্রের চেয়ে প্রাচীনও বটে। সময়ের বিচারে, গোত্রের আগেই দেখা দিয়েছিল দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার। কিন্তু প্রাচীন সমাজের (এমনকি আধুনিক সমাজেরও) সাংগঠনিক ক্রমের মধ্যে পরিবারের কোন স্থান ছিল না।

ল্যাটিন, গ্রীক ও সংস্কৃতভাষী গোষ্ঠীগুলো যখন একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল, তখনই আর্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল। এদের উপ-ভাষাগুলোতে এই সংগঠনের জন্য একই শব্দের প্রয়োগ থেকেই এটা বোঝা যায় (জেনোস এবং গণ)। নিজেদের বর্বর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এবং আরও প্রাচীন বন্য আদি-পুরুষদের কাছ থেকে তারা গোত্রের উত্তরাধিকার লাভ করেছিল। বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়েই যদি আর্য জনগোষ্ঠী

১। "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", ৩, ৬২, এবং তার পরবর্তী পৃষ্ঠা।

BanglaBook.org

বিভাজিত হয়ে গিয়ে থাকে, যা সম্ভবপরও বটে, তাহলে ঐ বিভাজিত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রাচীন রূপবিশিষ্ট গোত্র থাকাই স্বাভাবিক ছিল। গোত্রের গঠনে যে পরিবর্তন-গুলো ঘটেছিল বলে মনে করা হয়, সেগুলো নিশ্চয়ই ঘটেছিল এই ঘটনার পর, অর্থাৎ গোষ্ঠীগুলোর পরস্পরের থেকে বিভাজনের সময় থেকে শুরু করে সভ্যতার সূচনা পর্যন্ত ঐ দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে। একেবারে সূচনায় নিশ্চয়ই প্রাচীন রূপের গোত্রই ছিল। গ্রীক গোত্রগুলোও আদিতে নিশ্চয়ই প্রাচীন রূপ-বিশিষ্টই ছিল। তাহলে, স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয় চালু হওয়ার মত এত বিরাট একটা পরিবর্তনের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলে আমাদের যুক্তিগুলো একটা পূর্ণাঙ্গ চেহারা নিতে পারে—অবশ্য এই পরিবর্তন আসলে গোত্রের মধ্যে পুরনো ধরনের জ্ঞাতিত্বের জায়গায় নতুন কিছু জ্ঞাতিত্বের জন্ম দিয়েছিল। সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণার উদ্ভব এবং একপতিপত্নীক বিবাহের সূচনা—এই দুটো ব্যাপার থেকেই ঐ পরিবর্তনের যথেষ্ট জোরদার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, তখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল সন্তানদের তাদের পিতার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদেরকে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারে সক্ষম করে তোলা। একপতিপত্নীক বিবাহের ফলে সন্তানদের পিতৃত্ব নিশ্চিতভাবে জানা যেত, যা গোত্র প্রতিষ্ঠার সময় কোনভাবেই জানা সম্ভব ছিল না। আর পিতৃত্ব নিশ্চিত হওয়ার ফলে সন্তানদেরকে তাদের পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করাও আর সম্ভব ছিল না। এই নতুন পরিস্থিতিতে গোত্রগুলোর সামনে দুটো পথই খোলা ছিল—হয় নিজেকে পুনর্গঠিত করা, অথবা ভেঙে যাওয়া। বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ের ইরোকোয়া গোত্র আর বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের গ্রীক গোত্রকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে বোঝা যায় যে এ-দুটো আসলে একই সংগঠন—শুধু একটা হচ্ছে সেই সংগঠনের প্রাচীন রূপ আর অন্যটা হচ্ছে তার চূড়ান্ত রূপ। মানবসমাজের অগ্রগতির নানান জরুরী প্রয়োজনের তাগিদেই এই দুটো রূপের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা দিয়েছিল।

গোত্রের কাঠামোয় এইসব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মেরও কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। সম্পত্তি বরাবরই গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রেই বর্তাতো। প্রথমে তা পেত গোত্রের সদস্যরা। তারপরে গোত্রের বাকি সদস্যদের বাদ দিয়ে শুধু মৃতের জ্ঞাতিরাই তা পেতে থাকল। আর সবশেষে সম্পত্তির ওপর তার নিকটতম জ্ঞাতিদের অধিকারই শুধু স্বীকৃত হল, অর্থাৎ নিকটতম জ্ঞাতি হিসেবে সন্তানরাই হল পিতার সম্পত্তির নিরঙ্কুশ অধিকারী। মৃতের সম্পত্তি কোনমতেই তার গোত্রের বাইরে যাবে না—এই নীতিকে সোলোনের সময় পর্যন্ত অবিচলভাবে মেনে চলা হত। এ থেকেই বোঝা যায় সেই পর্যায়ে গোত্র কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই নিয়মের ফলেই যে-কোন উত্তরাধিকারিনী বাধ্য হত তার নিজের গোত্রের মধ্যেই কারুকে বিবাহ করতে। অর্থাৎ সে অন্য কোন গোত্রের সদস্যকে বিবাহ করলে ঐ সম্পত্তি সেই গোত্রের হাতে চলে যেত—এটাকেই ঠেকানো হয়েছিল ঐ অন্তর্বিবাহের নিয়মের সাহায্যে। কোন ব্যক্তির সন্তানাদি না থাকলে সে উইল বা ইচ্ছাপত্র মারফৎ তার সম্পত্তি যাকে খুশি দিয়ে

BanglaBook.org

যেতে পারবে—সোলোনের এই আইনই সম্পত্তির ওপর গোত্রের একচ্ছত্র অধিকারে প্রথম আঘাত হানে।

গোত্রের সদস্যদের মধ্যে কতটা নিকট সম্পর্ক ছিল বা তাদের মধ্যে আদৌ কোন সম্পর্ক থাকত কি না—এটাও একটা জরুরী প্রশ্ন। মিঃ গ্রোটে বলেছেন, "পোলাক্সের লেখা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি যে এথেন্সে একই গোত্রের সদস্যদের মধ্যে সাধারণভাবে কোন রক্তের সম্বন্ধ ছিল না। কোন তথ্য হাতে না পেলেও আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতাম। গোত্র গড়ে ওঠার সেই অজানা যুগে প্রকৃত আত্মীয়তার ওপরে গোত্র কতটা নির্ভরশীল ছিল, তা জানার কোন উপায় আমাদের নেই—তা সে এথেনিয় গোত্রই হোক বা রোমান গোত্রই হোক (এই দু জায়গার গোত্র মূলত একই ধরণের ছিল)। গোত্রীয় সম্পর্ক নিজেই একটা বন্ধন। এটা পারিবারিক বন্ধনের থেকে আলাদা, কিন্তু গোত্রীয় বন্ধন থাকা মানেই ধরে নিতে হয় যে পারিবারিক বন্ধনের অস্তিত্ব তার আগে থেকেই চালু ছিল। এক কৃত্রিম সাদৃশ্যের সাহায্যে গোত্রীয় বন্ধন এই পারিবারিক বন্ধনকে আরও প্রসারিত করত। গোত্রীয় বন্ধনের ভিত্তি ছিল অংশত ধর্মীয় বিশ্বাস আর অংশত একটা ইতিবাচক মৈত্রী, যাতে করে ভিন্ন রক্তের লোকদেরও একই রক্তের লোক বলে মনে করা যেত। যে-কোন গোত্রের, এমনকি ভ্রাতৃত্বেরও সমস্ত সদস্য বিশ্বাস করত যে তারা সবাই শুধু একজন পিতামহ বা প্রপিতামহ থেকে উদ্ভূত হয় নি, উদ্ভূত হয়েছে একই স্বর্গীয় বা বীরোচিত কোন পূর্বপুরুষের থেকে…। গ্রীকদের মনে এই মৌলিক বিশ্বাসটা একেবারে বদ্ধমূল ছিল। ইতিবাচক মৈত্রীর ফলে এই বিশ্বাসটাই পরিবর্তিত হয়ে গোত্রীয় ও ভ্রাতৃত্বগত ঐক্যের মূল নীতিতে পরিণত হয়…। প্রাচীন রোমান গোত্র প্রসঙ্গে মূল্যবান আলোচনাটিতে নিবুহর সঠিকভাবেই বলেছেন যে, কোন-এক সাধারণ ঐতিহাসিক পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্ট প্রকৃত পরিবার হিসেবে গোত্রগুলোকে ধরা যায় না। আবার এটাও সত্য যে (যদিও তিনি নিজে অন্যরকম ভাবতেন) গোত্রের ধারণার সঙ্গে একজন স্বর্গীয় বা বীরোচিত সাধারণ আদি-পিতার 'বিশ্বাস'-টাও জড়িয়ে ছিল। এদের এই বংশকুলুজিকে আমরা সঙ্গতভাবেই কাল্পনিক বলে মনে করতে পারি, কিন্তু এই বংশকুলুজিকে গোত্রের সদস্যরা পবিত্র বলে মনে করত ও সগৌরবে স্বীকার করত। তাদের মধ্যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যবন্ধন হিসেবেও কাজ করত…। সাধারণ পরিবারগুলোর মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্মে বিভিন্ন বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটতোই, কোন কোন পরিবার আয়তনে বাড়ত, আবার কোন কোন পরিবার ছোট হয়ে যেত বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কিন্তু এইসব পরিবারগুলোর বংশবৃদ্ধি, বিলুপ্তি বা বিভাজনের ফলে যেটুকু পরিবর্তন ঘটতো, সেটুকু ছাড়া গোত্রের আর কোন পরিবর্তন ঘটতো না। ফলে গোত্রের সঙ্গে পরিবারগুলোর সম্পর্কে অবিরাম নানান তারতম্য দেখা দিত এবং গোত্রের যে বংশকুলুজিকে প্রথমদিকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া হত, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ অপ্রচলিত ও বেমানান হয়ে উঠতে লাগল। এই বংশ-কুলুজির কথা আমরা তেমন শুনতেই পাই না, কারণ খুব পবিত্র কোন কাজ ছাড়া এগুলো আর মানুষকে জানানো হত না তবে ছোটখাটো গোত্রগুলোর মধ্যে সার্বজনীন

BanglaBook.org

আচার-অনুষ্ঠান এবং সার্বজনীন অতি-মানবিক পূর্বপুরুষ ও বংশকুলজি টিকে ছিল আর এগুলোকে তারা অনেক বেশি করে মেনেও চলত। এগুলোর মূল কাঠামো আর বনিয়াদ সর্বদা একই হত।"[১]

পোলাক্স, নিবুহর এবং গ্রোটের বিবৃতি কোন কোন দিক থেকে সত্য, তবে পুরোপুরি সত্য নয়। আদি-পিতা বলে যাকে মনে করা হত, গোত্রের বংশধারা তার থেকেও প্রাচীনই হত। কাজেই প্রাচীন কালের গোত্রের কোন জ্ঞাত আদিপুরুষ থাকতে পারত না। তাদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সাহায্যে রক্তের সম্বন্ধকে প্রমাণ করাও যেত না। তথাপি গোত্রের সদস্যরা তাদের একই পূর্বপুরুষে বিশ্বাস করত তো বটেই সে বিশ্বাসটা তাদের দরকারও ছিল। প্রাচীন রূপের গোত্রের মধ্যে জ্ঞাতিত্বের যে ব্যবস্থা চালু ছিল এবং যা গ্রীকদের মধ্যেও চালু হয়েছিল, তা থেকে গোত্রের সদস্যদের পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্কের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। একপতিপত্নীভিত্তিক পরিবার সৃষ্টি হওয়ার পর এই ব্যাপারটা অপ্রচলিত হয়ে পড়ে, যা নিয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করার চেষ্টা করব। গোত্রীয় নাম এমন একটা বংশপরিচয় সৃষ্টি করল, যার পাশে পরিবারের বংশপরিচয়টা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ল। এই গোত্রীয় নামটাই গোত্রের সদস্যদের একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হওয়ার সাক্ষ্য বহন করত। কিন্তু গোত্রের বংশধারা এতই প্রাচীন ছিল যে তার সদস্যদের পক্ষে নিজেদের মধ্যেকার প্রকৃত সম্পর্ক প্রমাণ করা সম্ভব হত না, একমাত্র কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষ মোটামুটি অল্পদিন আগেকার লোক হলে প্রকৃত সম্পর্ক নির্ধারণ করা যেত। লোকদের নামগুলোই ছিল একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হওয়ার নির্দিষ্ট প্রমাণ, অবশ্য গোত্রের পূর্বতন ইতিহাসে কোন বহিরাগতকে গোত্রের মধ্যে গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তাতে ছেদ পড়ত। পোলাক্স এবং নিবুহর দুজনেই গোত্রের সদস্যদের মধ্যে কোন সম্পর্কই ছিল না বলে মনে করেন। এর অর্থ দাঁড়ায় গোত্র ছিল একটা পুরোপুরি কৃত্রিম সংগঠন। তাঁদের এই বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। গোত্রের বহু সদস্যই একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হওয়ার সূত্র ধরে গোত্রের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের প্রমাণ দিতে পারত, আর বাকিদের ক্ষেত্রে গোত্রীয় নামটাই তাদের একই বংশধারার পরিচয় বহন করত। গ্রীক গোত্রে সাধারণত খুব বেশি লোক থাকত না। এক-একটা গোত্রে থাকত ত্রিশটা করে পরিবার। পরিবারের কর্তার স্ত্রীদেরকে হিসেবের মধ্যে না ধরলে, সাধারণ হিসেব অনুযায়ী এক-একটা গোত্রে গড়ে একশ কুড়ি জন করে লোক থাকত।

সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একক হওয়ার দরুণ গোত্র স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক জীবন ও কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এটা ছিল একটা সামাজিক সংস্থা। তার একজন বিচারক ও কোষাধ্যক্ষ থাকত। জমিগুলো ছিল খানিকটা সার্বজনীন ধাঁচের, থাকত একটা সার্বজনীন কবরস্থান এবং সার্বজনীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। এ-সবের পাশাপাশিই থাকত গোত্রের সদস্যদের বিভিন্ন অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব।

১। "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", ৩. ৫৮ এবং তার পরবর্তী পৃষ্ঠা।

গোত্রের মধ্যেই গ্রীকদের ধর্মীয় কার্যকলাপের সূত্রপাত ঘটেছিল, যা ছড়িয়ে পড়েছিল ভ্রাতৃত্বগুলোর মধ্যে এবং অবশেষে যা পরিণত হয়েছিল সবকটা গোষ্ঠীর সার্বজনীন উৎসবে। এম. দ্য কুলাঁগে তাঁর সাম্প্রতিক রচনা "দ্য এনসিয়েণ্ট সিটি"-তে এই বিষয়টি নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার আগে গ্রীক সমাজের অবস্থা কেমন ছিল, তা বোঝার জন্য গ্রীক গোত্রগুলোর গঠনকাঠামো এবং নীতিসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা একান্তই দরকার। কারণ প্রাথমিক এককের চরিত্রই তার পরবর্তী স্তরগুলোর চরিত্রকে নির্ধারণ করে, আর ঐ প্রাথমিক এককই আমাদের হাতে তার পরবর্তী স্তরগুলোকে বিশ্লেষণ করার মাল-মসলা যুগিয়ে দেয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নবম পরিচ্ছেদ

গ্রীক ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠী এবং জাতি

আমরা আগেই দেখেছি যে গ্রীসের সমাজব্যবস্থার সংগঠনে দ্বিতীয় স্তরটা ছিল ভ্রাতৃত্ব। কিছু সার্বজনীন উদ্দেশ্য, বিশেষত ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য নিয়ে কয়েকটা গোত্র মিলে গড়ে তুলত ভ্রাতৃত্ব। জ্ঞাতিত্ববন্ধনই ছিল ভ্রাতৃত্বের স্বাভাবিক বনিয়াদ, কারণ সম্ভবত কোন-একটা আদি গোত্রের বিভাজনের ফলে গড়ে ওঠা কিছু গোত্রকে নিয়েই ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠত। এই পুরনো ইতিহাসের কথাটা ছড়িয়ে থাকত তাদের নানান প্রথার মধ্যে। মিঃ গ্রোটে বলেছেন, "হেকাটেউস ভ্রাতৃত্বের সমকালীন সমস্ত সদস্যই একজন দেবতাকে নিজেদের আদিপুরুষ বলে মনে করে, যে দেবতাটি তাদের ষোড়শ পুরুষ আগের পূর্ব-পুরুষ।" হেকাটেউস ভ্রাতৃত্বের বিভিন্ন গোত্রগুলো একটা আদি গোত্রের বিভাজনের ফলে গড়ে না উঠলে এ কথাটা জোর দিয়ে বলা যেত না। এদের বংশকুলুজি কিছুটা বানানো, তা সত্যি। তবু এদের গোত্রীয় রীতি-নীতির মধ্যেই এই বংশকুলুজির সন্ধান করতে হবে। ডিকেআর্থাস মনে করতেন যে, কিছু কিছু গোত্রের সদস্যরা একে অপরের গোত্র থেকে নিজেদের স্ত্রী সংগ্রহ করত বলেই ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের মধ্যে নানান সার্বজনীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দেখা দিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যাটাকে সঠিক বলেই মনে হয়, কারণ এই ধরণের বিবাহের ফলে বিভিন্ন গোত্রের রক্তের মধ্যে মিশ্রণ ঘটত। কিন্তু আসলে ঘটনাটা ঠিক এর বিপরীত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা আদি গোত্রের মধ্যে বিভাজন ঘটত, আবার তার মধ্যে ঘটত পুনর্বিভাজন, আর তার ফলেই গড়ে উঠত বিভিন্ন গোত্র। অর্থাৎ এই গোত্রগুলো গড়ে উঠত একই বংশধারা থেকে, আর এটাই ছিল একটা ভ্রাতৃত্বের মধ্যে তাদের পুনর্মিলিত হওয়ার স্বাভাবিক ভিত্তি। আসলে ভ্রাতৃত্ব ছিল স্বাভাবিক বিকাশেরই ফসল এবং এটা ছিল একটা গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ গোত্রগুলো ছিল পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রতিম গোত্র এবং সংগঠনের নামটা থেকেই বোঝা যায় যে আসলে এটা ছিল তাদের ভ্রাতৃত্বেরই প্রতীক।

বাইজান্টিয়ামের স্টিকেনাস তাঁর রচনায় ডিকেআর্থাস-এর লেখার একটা অংশ উদ্ধৃত করেছেন। ঐ অংশটিতে ডিকেআর্থাস গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর উদ্ভবের একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই তিনটি সংগঠনের কোনটারই সংজ্ঞা দেওয়ার মত পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য এটা নয়। তবু প্রাচীন গ্রীক সমাজে সংগঠনের এই তিনটি স্তরের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁর বক্তব্যটা অত্যন্ত মূল্যবান। গোত্রের বদলে তিনি প্যাট্রি (patry) শব্দটা ব্যবহার করেছেন। এই প্যাট্রি শব্দটা পিণ্ডার এবং হোমারও কোথাও কোথাও ব্যবহার করেছিলেন।

১। "হিস্ট্রি অফ গ্রীস" ৩, ৫৮।

BanglaBook.org

স্টিকেনাস লিখেছেন ঃ "ডিকেআর্থাস বলেছেন যে গ্রীকদের সামাজিক সংগঠনের তিনটি রূপের অন্যতম ছিল প্যাট্রি। যথাক্রমে এই তিনটি রূপ হচ্ছে প্যাট্রি, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠী। প্যাট্রি তখনই গড়ে উঠেছে যখন পারস্পরিক সম্পর্ক তার প্রাথমিক নিঃসঙ্গ অবস্থা থেকে উন্নীত হয়ে প্রবেশ করেছে দ্বিতীয় স্তরে (সন্তানদের সঙ্গে পিতামাতার এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্ক) এবং তখন সে প্যাট্রির সবথেকে বয়স্ক ও প্রধান সদস্যের নাম অনুযায়ী নিজের নাম ঠিক করেছে, যেমন আইসিডাস, পেলোপিডাস।"
"কিন্তু যখন কয়েকটি প্যাট্রির লোকেরা নিজেদের কন্যাদের সঙ্গে অন্য প্যাট্রির পুরুষদের বিবাহ দিতে শুরু করল, তখন এর নাম হল কাট্রিয়া ও ফ্রাট্রিয়া। কেননা ঐ বিবাহিতা নারীরা তাদের পিতার প্যাট্রির পবিত্র আচার-অনুষ্ঠানে আর অংশগ্রহণ করতে পারত না, তারা তখন নিজের স্বামীর প্যাট্রির সদস্যা হিসাবেই বিবেচিত হত। আগে ছিল ভাই-বোনেদের মধ্যে স্নেহমূলক একতা। এবার দেখা দিল আরেক ধরনের একতা, যার ভিত্তি ছিল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনকারী একটা জনগোষ্ঠী। এটাকেই তারা ফ্রাট্রি (ভ্রাতৃত্ব) নামে অভিহিত করত। তারপর, প্যাট্রি যেমন পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানদের এবং সন্তানদের সঙ্গে পিতামাতার রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে উন্নত হয়ে উঠেছিল, তেমনি ফ্রাট্রিও উন্নত হয়ে ওঠে ভাইদের মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তিতে।"
"তবে গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীসদস্য শব্দগুলো এসেছিল বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও জাতিতে একাঙ্গীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া থেকেই, কারণ একাঙ্গীভবনের প্রতিটি অংশীদারকেই গোষ্ঠী বলা হত।"[১]

লক্ষ করা দরকার যে গোত্রের বাইরে বিবাহকে এখানে একটা প্রথা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং স্ত্রী-রা তাদের স্বামীদের গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত হত, ভ্রাতৃত্বের নয়। ডিকেআর্থাস ছিলেন অ্যারিস্টটল-এর ছাত্র। তাঁর সময়কালে গোত্রগুলো পরিণত হয়েছিল মূলত ব্যক্তিদের বংশপরিচয়ের প্রতীকে, তার যাবতীয় ক্ষমতা তখন চলে গিয়েছিল নতুন রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর হাতে। তিনি বলেছেন, গোত্রের উদ্ভব হয়েছিল একেবারে আদিম যুগে। সেইসঙ্গেই তিনি বলেছেন যে গোত্রের বিবাহসংক্রান্ত কার্য-কলাপের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল ভ্রাতৃত্বের। বিবাহসংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর কথাটা যে ঠিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে ভ্রাতৃত্বের উদ্ভব সম্বন্ধে তাঁর কথাটা একটা অভিমত মাত্র, এটাকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় না। সার্বজনীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং অন্তর্বিবাহ ভ্রাতৃত্বের সংহতিকে সুদৃঢ় করে তুলত। তবে ভ্রাতৃত্বের আরও সন্তোষজনক একটা ভিত্তি রয়ে গিয়েছিল তার অন্তর্ভুক্ত গোত্রগুলোর একই বংশধারা থেকে উদ্ভূত হওয়ার মধ্যে। মনে রাখা দরকার যে গোত্রের ইতিহাস বহু প্রাচীন। বর্বর যুগের তিনটি উপ-পর্যায় পার হয়ে সেই বন্য যুগ পর্যন্ত প্রসারিত তার ইতিহাস। আর্য ও সেমিটিক জনগোষ্ঠীর ইতিহাসের থেকেও প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে গোত্রের। আমেরিকার আদি-

১। ওয়াখ্‌স্‌মাথ-এর "হিস্টরিক্যাল অ্যাণ্টিকুইটিস অফ দ্য গ্রীকস", খণ্ড ১ পরিচ্ছেদ ১, পৃঃ ৪৪৯, মূল লেখাটা পরিশিষ্টে আছে।

বাসীদের মধ্যে এই ভ্রাতৃত্বের উদ্ভব ঘটেছিল বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে আর গ্রীকদের মধ্যে এর অস্তিত্বের কথা বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের আগে পর্যন্ত জানা যায় না।

মিঃ গ্রোটে ভ্রাতৃত্বের কার্যকলাপের কোন নির্দিষ্ট বিবরণ দেন নি (কিছু সাধারণ আলোচনা অবশ্য করেছেন)। একথা সত্য যে ভ্রাতৃত্বগুলো প্রধানত ধর্মীয় চরিত্র-বিশিষ্টই হত। তবে ইরোকোয়াদের মতো গ্রীক ভ্রাতৃত্বগুলোও সম্ভবত মৃতদেহ সমাধিস্থ করার কাজে, সার্বজনীন ক্রীড়ায়, ধর্মীয় উৎসবে, পরিষদের কাজে এবং জনসমাবেশে অংশগ্রহণ করত। কারণ এইসব কাজে প্রধানরা এবং সাধারণ মানুষরা সমবেত হত ভ্রাতৃত্ব অনুসারে, গোত্র অনুসারে নয়। সৈন্যবাহিনীর বিন্যাসের মধ্যেও ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠত। অ্যাগামেম্ননের উদ্দেশে নেস্টরের মুখ দিয়ে যে কথা বলিয়েছেন হোমার, এ প্রসঙ্গে তা এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত।[১] "সৈন্যবাহিনীকে গোষ্ঠী অনুযায়ী এবং ভ্রাতৃত্ব অনুযায়ী ভাগ করুন অ্যাগামেম্ননন, যাতে এক ভ্রাতৃত্ব অন্য ভ্রাতৃত্বকে এবং এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে সাহায্য করতে পারে। যদি আপনি এভাবে আদেশ দেন আর গ্রীকরা যদি তা মেনে নেয়, তাহলে আপনি বুঝে নিতে পারবেন কোন্ কোন্ সেনাপতি ও যোদ্ধা ভীরু আর কারা সাহসী, কারণ সাহসীরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করবে।" সেনাবাহিনীর মধ্যে একই গোত্র থেকে আসা সৈন্যসংখ্যা এতই কম হত যে তারা কোন সেনাবাহিনীর ভিত্তিস্বরূপ হয়ে উঠত পারত না। কিন্তু ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর সম্মিলিত সৈন্যসংখ্যা ফৌজের একটা ভিত্তি হিসেবেই কাজ করত। নেস্টরের পরামর্শ থেকে দুটো জিনিস বোঝা যায়: প্রথমত, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠী অনুযায়ী সৈন্যবাহিনীকে সন্নিবেশিত করার ব্যাপারটা তখন আর চালু ছিল না; এবং দ্বিতীয়ত, প্রাচীনকালে এটাই ছিল সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করার স্বাভাবিক পদ্ধতি আর সেই পুরনো অভিজ্ঞতাটা তখনও পর্যন্ত মানুষ একেবারে ভুলে যায় নি। আমরা আগেই দেখেছি যে বর্বর যুগের মধ্য অবস্থায় থাকা ট্লাস্-কালান ও আজটেকরা তাদের সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলত ভ্রাতৃত্ব অনুযায়ী এবং সেভাবেই তাদেরকে যুদ্ধে পাঠাত। তারা তখন যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায় সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার আর কোন পদ্ধতি সম্ভবত ছিল না। প্রাচীন জার্মান গোষ্ঠীগুলোও একইভাবে নিজেদের সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করত।[২] একটা ব্যাপার এখানে লক্ষণীয় যে, মানবগোষ্ঠীগুলোর সমাজব্যবস্থার তত্ত্ব তাদের কত গভীরে লুকিয়ে থাকে।

হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার দায়িত্ব, পরবর্তীকালে যা হত্যাকারীকে আইনী বিচারসভার সামনে অভিযুক্ত করার কর্তব্যে পরিণত হয়েছিল, তা মূলত ন্যস্ত থাকত নিহত ব্যক্তির গোত্রের ওপর। তবে নিহতের গোটা ভ্রাতৃত্বটাও তার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার দায়িত্ব নিত, ফলে এটা একটা ভ্রাতৃত্বগত দায়িত্বে পরিণত হত।[৩] এস্কাইলাসের

১। "ইলিয়াড", ২, ৩৬২।

২। ট্যাসিটাস, "জার্মানিয়া", পরিচ্ছেদ ৭।

৩। গ্রোটে, "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", ৩, ৫৫। অ্যারিওপ্যাগাস্-এর আদালতে নরহত্যার বিচার হত— ঐ, ৩, ৭৯।

BanglaBook.org

ইউমেনাইড্‌স্‌-এ আমরা দেখি যে, ওরেস্তেস্‌ কর্তৃক নিজের মায়ের নিহত হওয়ার কথা বলার পর, এরিনাইস প্রশ্ন করছে ঃ "তার ভ্রাতৃত্ব সদস্যদের কোন শুদ্ধিকরণ বারি অপেক্ষা করছে ওর জন্য ?"[১] অর্থাৎ, অপরাধী তার দণ্ডের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলে অন্তিম শুদ্ধিকরণের কাজটা ভ্রাতৃত্বই করত, গোত্র নয়। তাছাড়াও, গোত্রের হাত থেকে দায়িত্ব ভ্রাতৃত্বের ওপর ন্যস্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে—কোন ভ্রাতৃত্বের মধ্যেকার সবকটা গোত্র একই বংশধারা থেকে উদ্ভূত হত।

যেহেতু ভ্রাতৃত্ব ছিল গোত্র ও গোষ্ঠীর মধ্যবর্তী সংগঠন এবং যেহেতু তার হাতে কোন প্রশাসনিক কার্যভার দেওয়া হত না, তাই গোত্র ও গোষ্ঠীর তুলনায় ভ্রাতৃত্ব ছিল কম মৌলিক এবং কম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। তবে গোত্র ও গোষ্ঠীর পুনঃ-একীকরণের পথে এটা ছিল একটা সাধারণ, স্বাভাবিক ও সম্ভবত প্রয়োজনীয় স্তর। সেই প্রাচীন যুগের গ্রীকদের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা গেলে হয়ত দেখা যেত যে আমাদের জানা অপ্রতুল তথ্যের ভিত্তিতে আমরা ভ্রাতৃত্বকে যতটা গুরুত্বহীন বলে ভেবে থাকি, আসলে তা মোটেই ততটা গুরুত্বহীন ছিল না। ভ্রাতৃত্বের হাতে যতটুকু ক্ষমতা ছিল বলে আমাদের ধারণা, সম্ভবত তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা ও প্রভাব ছিল তার। এথেনিয়দের সমাজব্যবস্থার বনিয়াদ ছিল যে গোত্র, তার ধ্বংসের পরও ভ্রাতৃত্ব টিকে থেকেছিল এবং নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তার হাতে কিছু কিছু ক্ষমতাও ছিল, যেমন —নাগরিকদের নাম নথিবদ্ধ করা, বিবাহগুলোকে তালিকাভুক্ত করা এবং ভ্রাতৃত্বের কোন সদস্যের হত্যাকারীকে আদালতের সামনে অভিযুক্ত করা।

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে চারটি এথেনিয় গোষ্ঠীর প্রতিটাতে ছিল তিনটি করে ভ্রাতৃত্ব আর প্রতিটি ভ্রাতৃত্বে ছিল ত্রিশটা করে গোত্র। তবে এটা শুধুমাত্র বর্ণনার সুবিধার্থেই বলা হয়ে থাকে। গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের মানুষরা নিজেদেরকে একেবারে সুসমঞ্জসভাবে বিভাজিত ও উপ-বিভাজিত করে না। এগুলো গড়ে ওঠার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি ছিল ঠিক বিপরীত। গোত্রগুলো থেকেই গড়ে উঠত ভ্রাতৃত্ব আর সবশেষে গড়ে উঠত গোষ্ঠী, আর এই সবটা মিলে একটা সমাজ বা জনগোষ্ঠী মাথা তুলে দাঁড়াত। প্রত্যেকটা স্তর ছিল স্বাভাবিক বিকাশেরই ফসল। প্রতিটা এথেনিয় ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ত্রিশটা করে গোত্র ছিল—এই ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক কোন কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রতিটা ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর সংগঠনকে সংখ্যাগতভাবে সমঞ্জস্যপূর্ণ রাখার মত কোন শক্তিশালী উদ্দেশ্যের দরুণ হয়ত এটা সম্ভবপর হয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ, প্রতিটি ভ্রাতৃত্বে যতক্ষণ না ত্রিশটা করে গোত্র সৃষ্টি হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সকলের মতামত অনুসারে গোত্রগুলিকে অবিরাম বিভাজিত করে চলা হত। কোন গোষ্ঠীতে গোত্রের সংখ্যা বেড়ে গেলে জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধযুক্ত গোত্রগুলোকে মিলিয়ে এক করে দেওয়া হত—যতক্ষণ না ভ্রাতৃত্বের গোত্রের সংখ্যা কমে ত্রিশে দাঁড়ায়। যে-সব ভ্রাতৃত্বে ত্রিশের কম গোত্র

১। "ইউমেনাইড্‌স্‌", ৬৫৬।

BanglaBook.org

থাকত, তাদের মধ্যে বাইরের কোন গোত্রকে ঢুকিয়ে নেওয়াটাও সংখ্যাগত সামঞ্জস্য রাখার একটা সম্ভাব্য উপায় হতে পারে।

স্বাভাবিক বিকাশের ফসল হিসেবে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক গোষ্ঠী, ভ্রাতৃত্ব ও গোত্র গড়ে ওঠার পর, প্রতিটা গোষ্ঠীর মধ্যে সমান সংখ্যক ভ্রাতৃত্ব ও গোত্র রাখার ব্যাপারটাকে এইভাবে নিশ্চিত করা গিয়েছিল। প্রতিটা গোষ্ঠীতে তিনটি করে ভ্রাতৃত্ব আর প্রতিটা ভ্রাতৃত্বে ত্রিশটা করে গোত্র—এই সংখ্যাগত ছাঁচটা একবার গড়ে ওঠার পর সেটাকে অনায়াসেই শত শত বছর ধরে টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর হয়েছিল। শুধু কখনও-সখনও হয়ত ভ্রাতৃত্বগুলোর মধ্যে গোত্রের সংখ্যার কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকতে পারে।

গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্রস্থল এবং উৎসভূমি ছিল এই গোত্র আর ভ্রাতৃত্বগুলোই। এইসব সংগঠনের মধ্যে এবং এগুলোর ক্রমবিকাশ ও রূপান্তরের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছিল নানান দেবতা, প্রতীক ও উপাসনা-পদ্ধতি সমন্বিত সেই জমকালো বহু-ঈশ্বরবাদী পৌত্তলিক মতবাদ, যা ধ্রুপদী যুগের মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুগের বিরাট বিরাট সাফল্যগুলোর পিছনে এইসব পুরাকথার বিপুল অবদান ছিল, আর এইসব পুরাকথার প্রেরণাতেই গড়ে উঠেছিল প্রচুর মন্দির ও চমৎকার চমৎকার সব স্থাপত্য, যা দেখে আজও মুগ্ধ হই আমরা। এইসব সামাজিক সংগঠনের মধ্যে থেকে উদ্ভূত কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে জাতীয় আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত করা হত, কারণ অত্যন্ত পবিত্র অনুষ্ঠান বলে মনে করা হত এগুলোকে। এ থেকেই বোঝা যায় যে গোত্র আর ভ্রাতৃত্ব ছিল ধর্মের একটা বড় উৎসস্থল। এই অসাধারণ যুগটি, আর্য জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে নানা দিক থেকেই যে সময়কালটি সবচেয়ে ঘটনাবহুল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার ইতিবৃত্ত প্রায় কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। পড়ে আছে শুধু কিছু উপকথার বংশকুলুজি, উপাখ্যান, পুরাকথা ও কবিতার অংশবিশেষ, যা শেষ হয়েছে হোমার ও হেসিয়ডের কবিতায় এসে। কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠান, শিল্প, উদ্ভাবন, পৌরব্যবস্থা, এককথায় সভ্যতার যে উপাদানগুলো তারা নির্মাণ করেছিল এবং বিকশিত করে তুলেছিল—আগামী নতুন সমাজের জন্য এই উত্তরাধিকারই রেখে গিয়েছিল তারা। রাজনৈতিক সমাজ গড়ে ওঠার ঠিক আগেকার গোত্রভিত্তিক সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিচার করে এবং জ্ঞানের এই বিবিধ উৎসগুলোকে কাজে লাগিয়ে ঐ যুগের ইতিহাসকে আজও পুনর্গঠিত করা যেতে পারে।

BanglaBook.org

প্রতিটি গোত্রের একজন করে বিচারক থাকত, গোত্রের ধর্মীয় পার্বণগুলোতে যে পুরোহিতের ভূমিকা পালন করত। তেমনি প্রতিটা ভ্রাতৃত্বের একজন করে ভ্রাতৃপ্রধান (Phratriarch) থাকত, যে ভ্রাতৃত্বের সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করত এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে পৌরোহিত্য করত। এম, দ্য কুলাঁগে বলেছেন, "ভ্রাতৃত্বের নিজস্ব পরিষদ ও বিচারসভা থাকত এবং তারা বিভিন্ন হুকুমও জারি করতে পারত। ভ্রাতৃত্বের মধ্যে (এবং পরিবারেও) একজন দেবতা, একজন পুরোহিত, একটি বৈধ

বিচারসভা ও একটা প্রশাসন থাকত।"[১] ভ্রাতৃত্বের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো ছিল আসলে তার মধ্যেকার গোত্রগুলোর নানান অনুষ্ঠানেরই সম্প্রসারিত রূপ। গ্রীকদের ধর্মীয় জীবনকে বুঝতে হলে এইসব দিকেই মনোযোগ দেওয়া দরকার।

সাংগঠনিক ক্রমমালায় এর পরের স্তর হচ্ছে গোষ্ঠী, যার মধ্যে থাকত কয়েকটা ভ্রাতৃত্ব আর প্রতিটা ভ্রাতৃত্বে থাকত কয়েকটা করে গোত্র। প্রতিটা ভ্রাতৃত্বের মানুষরা ছিল একই বংশের বংশধর এবং তারা একই উপভাষায় কথা বলত। আগেই বলা হয়েছে যে এথেনিয়দের প্রতিটি গোষ্ঠীতে তিনটি করে ভ্রাতৃত্ব ছিল, ফলে প্রতিটা গোষ্ঠীর কাঠামোও ছিল একইরকম। লাতিন গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে এবং আমেরিকার আদিবাসীদের গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর অনেক বিষয়ে মিল ছিল। প্রতিটা গোষ্ঠীর একটা করে নিজস্ব উপ-ভাষা থাকলে আমেরিকার আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে এদের পরিপূর্ণ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেত। কিছু গ্রীক গোষ্ঠীর একাঙ্গীভবনের ফলে যে জাতি গড়ে উঠেছিল, তারা একটা ছোট এলাকাতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল। ফলে তাদের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য খুব-একটা ঘটতে পারে নি। আর তারপর লিখিত ভাষা ও সাহিত্য গড়ে ওঠার ফলে তাদের ভাষাগত পার্থক্য আরও কমে যায়। আগেকার অভ্যাসের ফলে প্রতিটি গোষ্ঠীই এক-একটা এলাকায় কমবেশি স্থায়ীভাবে বসবাস করত এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কই ছিল তাদের সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। খুব সম্ভবত প্রতিটা গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রধানদের একটা পরিষদ থাকত, যারা নিজ নিজ গোষ্ঠীর যাবতীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিল। সম্মিলিত গোষ্ঠীগুলোর সার্বজনীন বিষয়সমূহ পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল প্রধানদের সাধারণ পরিষদের ওপর। কিন্তু একসময় এই পরিষদের কার্যকলাপ ও ক্ষমতা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে গেল। সেই অবস্থায় কোন নিম্নতর এবং ঐ পরিষদের অধীনস্থ পরিষদগুলি তাদের কার্যকলাপ ও ক্ষমতা বজায় রাখবে—এমনটা আশা করা যায় না, অথচ তাদের সমাজব্যবস্থায় এই ধরণের একটা পরিষদের প্রয়োজনীয়তা ছিলই। সেক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া যায় যে ঐ পরিষদটা গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন গোত্রের প্রধানদের নিয়েই।

কোন গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভ্রাতৃত্বগুলো যখন তাদের ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য সমবেত হত, তখন সেই সম্মিলনটা আসলে এক উচ্চতর সংগঠন, অর্থাৎ গোষ্ঠী হিসেবেই ক্রিয়াশীল হয়ে উঠত। ঐ-সব উৎসবের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করত একজন ফাইলো-ব্যাসিলিয়ুস। এই ফাইলো-ব্যাসিলিয়ুসই ছিল সমগ্র গোষ্ঠীর মুখ্য প্রধান। এই ফাইলো-ব্যাসিলিয়ুসই তাদের সমর-প্রধানের ভূমিকাও পালন করত কিনা—আমি বলতে পারছি না। তার হাতে উৎসব-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার ভার থাকত, যা ছিল ঐ পদের এক সহজাত অধিকার। যে-কোন হত্যার ঘটনায় সে কিছু আইনী ক্ষমতারও অধিকারী ছিল। তবে সেই অধিকারটা শুধুই হত্যাকারীর অপরাধের বিচার করার, নাকি তাকে দন্ড দেওয়ার ক্ষমতাও থাকত তার, তা আমার জানা নেই।

১। "দা এনসিয়েন্ট সিটি", স্মলু-এর অনুবাদ, পৃঃ ১৫৭, বোস্টন, লী অ্যান্ড শিপার্ড।

BanglaBook.org

ব্যাসিলিয়ুস পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পৌরোহিত্য ও আইনগত কার্যকলাপ থেকেই বোঝা যায় যে সেই পৌরাণিক ও মহাকাব্যীয় যুগে এই পদটার কতটা মর্যাদা ছিল। কিন্তু ব্যাসিলিয়ুসের কোনরকম পৌর কাজকর্ম ছিল না, অন্তত আমরা সে ব্যাপারে কোন সন্তোষজনক তথ্য হাতে পাই নি। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ইতিহাসের পাতায় বারবার ব্যাসিলিয়ুসের সমর্থক শব্দ হিসেবে রাজা শব্দটাকে যেভাবে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহেই ভুল। এথেনিয়দের মধ্যে গোষ্ঠীগত-ব্যাসিলিয়ুস থাকত। গ্রীকরা তাদের চার মিলিত গোষ্ঠীর সেনাপতিকে সঙ্গতভাবেই ব্যাসিলিয়ুস নামে অভিহিত করত। এই চারটি গোষ্ঠীর চারজন ব্যাসিলিয়ুসকে রাজা নামে চিহ্নিত করলে একটা অসঙ্গতি দেখা দেয়। অর্থাৎ তাহলে দাঁড়ায়—প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন করে রাজা ছিল, আর মিলিতভাবে চারটি গোষ্ঠীর জন্য ছিল অন্য আরেকজন রাজা! এইরকম প্রচুর কল্পিত রাজার কথা ছড়িয়ে আছে ইতিহাসে। তাছাড়া ঐ সময়ে এথেনিয়দের প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন—এটা জানার পরও ঐ রাজা থাকার কথাটা মেনে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে গ্রীক সমাজকে উপহাস করা। সহজ ও মূল শব্দটা ব্যবহার করাই যে ভাল, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। গ্রীকরা বলত ব্যাসিলিয়ুস, আমাদেরও সেটাই ব্যবহার করা উচিত আর এর কল্পিত সমার্থক হিসেবে রাজা শব্দটার ব্যবহার বন্ধ করা দরকার। গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে রাজতন্ত্র মোটেই মানানসই নয়, কেননা গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন। প্রতিটা গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠী ছিল এক-একটা পূর্ণ-সংগঠিত স্বশাসিত সংস্থা। যেখানে অনেকগুলো গোষ্ঠী একটা জাতি হিসেবে একাঙ্গীভূত হত, সেখানে সেই সম্মিলিত জাতির সরকার গঠিত হত তার মধ্যেকার গোষ্ঠীগুলোকে অনুপ্রাণিত করে তুলতে সক্ষম কিছু নীতির ভিত্তিতেই।

গোটা সংগঠনের চতুর্থ এবং চূড়ান্ত স্তর ছিল একটা জাতি, যা গড়ে উঠত গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই। অনেকগুলো গোষ্ঠী (যেমন এথেনিয় ও স্পার্টানদের গোষ্ঠীগুলো) একাঙ্গীভূত হয়ে একটা জনগোষ্ঠীতে পরিণত হলে সমাজের পরিধিটা বিস্তৃত হত ঠিকই, কিন্তু এই সম্মিলিত ব্যাপারটা আসলে একটি জটিল ধরণের গোষ্ঠী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের এবং ভ্রাতৃত্বের মধ্যে গোত্রের যে স্থান, জাতির মধ্যে গোষ্ঠীরও সেই একই স্থান। গোটা সংগঠনটার কোন নাম ছিল না,[১] সবটা মিলে ছিল স্রেফ একটা সমাজ (Societas)। তার বদলে এক-একটা জনগোষ্ঠী বা জাতির জন্য এক-একটা নাম চালু হয়ে যেত। তাদের বিরুদ্ধে সমবেত হওয়া জাতিগুলোর বিবরণ দিতে গিয়ে এক-একটা জাতিকে এক-একটা নামে চিহ্নিত করেছেন হোমার। যেমন—এথেনিয়ান, এটোলিয়ান, লোক্রিয়ান। কিন্তু অন্যত্র আবার দেখা যায় যে এরা যে যে শহর বা অঞ্চলের অধিবাসী, সেই সেই জায়গার নাম দিয়েই এদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাহলে মোদ্দা ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এ-রকম—লাইকারগাস এবং

১। মহাকাব্যীয় যুগের সরকারকে চিহ্নিত করার জন্য অ্যারিস্টটল, থুকিডিডিস এবং অন্যান্য লেখকরা ব্যাসিলিয়া শব্দটা ব্যবহার করেছেন।

সোলোনের আমলের আগে গ্রীকদের মধ্যে সামাজিক সংগঠনের মোট চারটি স্তর ছিল (গোত্র, ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠী ও জাতি)। প্রাচীন সমাজে প্রায় সর্বত্রই এই চারটি সাংগঠনিক স্তরের অস্তিত্ব ছিল। বন্য যুগে এগুলো আংশিকভাবে বিদ্যমান ছিল। বর্বর যুগের নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ে এগুলো পূর্ণ রূপ নেয় এবং সভ্যতার সূচনা হওয়ার পরও টিকে থাকে। এই সাংগঠনিক ক্রমটা রাজনৈতিক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠার সময় পর্যন্ত মানবজাতির মধ্যে সরকার সংক্রান্ত ধারণার বিকাশের মাত্রাকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে। গ্রীক সমাজব্যবস্থাটা এ-রকমই ছিল। কিছু সংখ্যক লোককে নিয়ে গড়ে ওঠা একটা সমাজ, যাদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক বজায় থাকত গোত্র, ভ্রাতৃত্ব বা গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে। এটা ছিল একটা গোত্রভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা। রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে এই সমাজব্যবস্থার একেবারে মৌলিক পার্থক্য আছে এবং এই দুই ব্যবস্থাকে অনায়াসেই আলাদা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা যায়।

মহাকাব্যীয় যুগে এথেনিয় জাতির মধ্যে সরকারের তিনটি পৃথক পৃথক এবং কোন কোন অর্থে পরস্পর-সহায়ক বিভাগ বা ক্ষমতার অস্তিত্ব ছিল। প্রথমটা হল প্রধানদের পরিষদ, দ্বিতীয়টা হচ্ছে গণ-পরিষদ এবং তৃতীয়টা ব্যাসিলিয়ুস অর্থাৎ সার্বজনীন সমর-নায়ক। প্রয়োজনের খাতিরে বহু সংখ্যক পেটর অর্থাৎ দ্বিতীয় সারির সামরিক পদ সৃষ্টি করতে হয়েছিল এথেনিয়দের। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত ঐ পদ তিনটিই শাসনব্যবস্থার মূল শক্তি। প্রধানদের পরিষদ, গণ-পরিষদ কিংবা ব্যাসিলিয়ুসের কার্যকলাপ ও ক্ষমতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার মত পর্যাপ্ত তথ্য আমার হাতে নেই। আমি শুধু কয়েকটা বিষয়ে কিছু মতামত রাখব। বিষয়গুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গ্রীকবিদ্যা বিশারদরা এ-সব বিষয় নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনা করবেন, আশা রাখি।

১॥ প্রধানদের পরিষদ। গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর প্রধানদের পরিষদ বা গণ-পরিষদের থেকে ব্যাসিলিয়ুসের পদটা অনেক বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সকলের। ফল-স্বরূপ এর গুরুত্বকে অযৌক্তিকভাবে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে আর প্রধানদের পরিষদ ও গণ-পরিষদের গুরুত্বকে কমিয়ে দেখা হয়েছে বা উপেক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে একেবারে প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার যুগ পর্যন্ত প্রতিটি গ্রীক জাতির মধ্যেই প্রধানদের পরিষদ ছিল একটা স্থায়ী সংগঠন। তাদের সমাজব্যবস্থার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে এই সংগঠনের স্থায়িত্বই প্রমাণ করে যে এর কার্যকলাপ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং (অন্তত অনুমান করে নেওয়া যায়) এর ক্ষমতা ছিল চূড়ান্ত ও নিরংকুশ। গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় প্রধানদের পরিষদের প্রাচীন চরিত্র, কার্যকলাপ ও কাজের পরিধি সম্বন্ধে আমাদের হাতে যেটুকু তথ্য আছে, তার ভিত্তিতেই এই অনুমানে উপনীত হই আমরা। মহাকাব্যীয় যুগে এই পরিষদ কিভাবে গড়ে উঠেছিল এবং প্রধান পদের স্থায়িত্বকাল কতদিন ছিল—তা আমাদের স্পষ্ট-ভাবে জানা নেই। তবু একান্ত যুক্তিসম্মতভাবেই আমরা ধরে নিতে পারি যে গোত্রের প্রধানদের নিয়েই এই পরিষদ গড়ে উঠত। জাতির মধ্যে যতগুলো গোত্র থাকত, ততজন প্রধান কিন্তু সাধারণত প্রধানদের পরিষদে থাকত না। অর্থাৎ পরিষদের মধ্যে প্রধানদের

BanglaBook.org

নেওয়ার ব্যাপারে কিছু বাছাইয়ের প্রশ্ন ছিল। কিভাবে এই বাছাইটা করা হত, আমাদের জানা নেই। প্রধান প্রধান গোত্রগুলোর প্রতিনিধিস্বরূপ একটা বিচারকারী সংস্থা হিসেবে এই পরিষদের কার্যকলাপ এবং গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এর স্বাভাবিক বিকাশ—এই দুটো ব্যাপার একে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকার করে তুলেছিল, আর ব্যাসিলিয়ুস পদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং পৌর ও সামরিক কার্যক্রমের জন্য গড়ে তোলা বহু নতুন নতুন পদ সৃষ্টি হওয়ার দরুণ সার্বজনীন কার্যকলাপের ব্যাপারে প্রধানদের পরিষদের ভূমিকার কিছু পরিবর্তন তখন ঘটেই থাকতে পারে এবং তার গুরুত্বও কিছুটা কমে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর আমূল পরিবর্তন না ঘটিয়ে এই পরিষদকে পুরোপুরিভাবে হঠিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই মনে হয় যে, সরকারের উচ্চতম থেকে নিম্নতম প্রতিটি পদাধিকারী ব্যক্তিকেই তাদের সরকারি কাজ-কর্মের জন্য এই পরিষদের কাছে জবাবদিহি করতে হত[১], এবং সেই যুগের গ্রীকরা ছিল স্বাধীন স্বশাসিত জাতি, তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন। প্রধানদের পরিষদের অস্তিত্বের ব্যাপারে এস্কাইলাসের লেখা থেকে একটা দৃষ্টান্ত তুলে আনা যায়। এই দৃষ্টান্তটা থেকে বোঝা যায় যে গ্রীকদের ধ্যানধারণায় সর্বদাই এই পরিষদের অস্তিত্ব থাকত এবং তা সক্রিয় ভূমিকাও নিত। 'দ্য সেভেন এগেনস্ট থিবিস'-এ ইতিওক্লেস্‌কে দেখানো হয়েছে শহরের নেতা হিসেবে, আর তার ভাই পলিনাইসেস হচ্ছে শহরের অবরোধকারী সাতজন প্রধানের অন্যতম। এই আক্রমণ প্রতিহত হয়েছিল। কিন্তু একটা তোরণের সামনে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল দুই ভাই। ঐ ঘটনার পর জনৈক সরকারি ঘোষক বলেছে ঃ "এই ক্যাড্‌মাস্‌ শহরের পরিষদ সদস্যদের অনুশাসন এবং আদেশ ঘোষণা করছি আমি ; সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে"[২] ইত্যাদি। যে পরিষদ যে-কোন মুহূর্তে কোন আদেশ জারি করতে পারে আর জনসাধারণ তা মান্য করে—সে পরিষদ নিঃসন্দেহেই সর্বোচ্চ সরকারি ক্ষমতার অধিকারী। ঘটনাটা মহাকাব্যীয় যুগের হলেও, এস্কাইলাস দেখিয়ে দিয়েছেন যে প্রতিটি গ্রীক জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সরকার-ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই প্রধানদের পরিষদ। প্রাচীন গ্রীক সমাজের ব্যবস্থা-পরিষদই ছিল তাদের পরবর্তী যুগের, অর্থাৎ রাষ্ট্রের, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপক-সভার আদিরূপ।

২ ॥ **গণ-পরিষদ**। মহাকাব্যীয় যুগের একটা গণ-পরিষদ গড়ে উঠেছিল। প্রধানদের পরিষদ কর্তৃক আনীত কোন সার্বজনীন কাজকর্মের পরিকল্পনাকে গ্রহণ করার অথবা বাতিল করার ক্ষমতা এই পরিষদের ছিল। তবু এটা কিন্তু প্রধানদের পরিষদের মত অত প্রাচীন সংস্থা নয়। গোত্র গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গড়ে উঠেছিল প্রধানদের পরিষদ। কিন্তু বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের আগে পর্যন্ত উপরোক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন গণ-পরিষদের অস্তিত্ব ছিল কিনা, সে ব্যাপারে যথেষ্টই

১। ডায়োনিসায়াস, ২, ১২।

২। এস্কাইলাস, "দ্য সেভেন এগেনস্ট থিবিস", ১০০৫।

BanglaBook.org

সন্দেহের অবকাশ আছে। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে থাকার সময় ইরোকোয়ারা নিজেরা একজন মুখপাত্র নির্বাচিত করে তার মারফৎই প্রধানদের পরিষদের সামনে নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যক্ত করত এবং মিত্রসংঘের কার্যকলাপের ওপরেও জনসাধারণের একটা প্রভাব থাকত। কিন্তু কোন সার্বজনীন কাজকর্মের পরিকল্পনাকে গ্রহণ অথবা বাতিল করার ক্ষমতাসম্পন্ন গণ-পরিষদ হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের এমন একটা স্তরের ব্যাপার, যেখানে তখনও পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি ইরোকোয়ারা। হোমারের রচনায় এবং গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলোয় আমরা গণ-পরিষদ সৃষ্টির কথা জানতে পারি। সেই সময়ে এর যা যা বৈশিষ্ট্য ছিল, ঠিক সেই সেই বৈশিষ্ট্যই পরবর্তীকালে এথেনিয়দের লোকসভা ও রোমানদের 'কমিশিয়া কিউরিয়াটা'-র মধ্যেও টিকে ছিল। প্রধানদের পরিষদের দায়িত্ব ছিল সার্বজনীন কাজকর্মের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে সেটাকে গণ-পরিষদের কাছে পাঠানো। গণ-পরিষদ এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ অথবা বাতিল করত এবং তাদের সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। গণ-পরিষদ শুধু এই একটাই কাজ করত। সে কোন পরিকল্পনা রচনা করতে পারত না কিংবা শাসনকাজে হস্তক্ষেপ করতেও পারত না। তা সত্ত্বেও এই পরিষদ ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তাদের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে এর একটা বড় ভূমিকা ছিল। মহাকাব্যীয় যুগে তো বটেই, এমনকি তার আগে সেই পৌরাণিক যুগেও গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গণ-পরিষদ একটা বিশিষ্ট সংস্থা হিসেবেই বিদ্যমান ছিল। প্রধানদের পরিষদ আর গণ-পরিষদকে একত্রে মিলিয়ে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঐ সমস্ত পর্যায় জুড়ে গোত্র-ভিত্তিক সংগঠন ছিল গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন। ধরেই নেওয়া যায় যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্বন্ধেই সাধারণ মানুষরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে মতামত রাখত এবং জনকল্যাণ ও নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য প্রধানদের পরিষদ এই মতামত-গুলোর ওপর গুরুত্বও দিত। উত্থাপিত প্রশ্নটি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা হত। এই আলোচনার পর, প্রাচীনকালে গণ-পরিষদে (যেখানে যে-কোন লোকই মতামত রাখতে পারত[১]) উপস্থিত ব্যক্তিরা হাত তুলে সম্মতি বা অসম্মতি জানাত[২] এবং তার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। সার্বজনীন বিষয়গুলোর সঙ্গে প্রত্যেকেরই স্বার্থ জড়িত থাকত। এগুলোতে অংশগ্রহণ করার ফলে মানুষ ক্রমশই স্বশাসনের কলা-কৌশল আয়ত্ত করেছিল। আর এদের একটা অংশ, যেমন এথেনিয়রা, প্রস্তুত হয়ে উঠছিল পূর্ণ গণতন্ত্রের জন্য। পরবর্তীকালে ক্লাইস্থেনিস এই পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। গণতন্ত্রের নীতিকে উপলব্ধি করতে বা মেনে নিতে অক্ষম অনেক লেখক এই গণ-পরিষদকে প্রায়শই একটা হুজুগে জনতা বলে উপহাস করেছেন। কিন্তু নানান সার্বজনীন প্রশ্ন সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করার যে অধিকার ছিল গণ-পরিষদের, সেটাই হচ্ছে এথেনিয়দের লোকসভার এবং আজকের দিনের বিধানসভার নিম্ন-কক্ষের ভ্রূণরূপ।

১। ইউরিপিদিস, "ওরেস্তেস" ৮৮৪।

২। এস্কাইলাস, "দ্য সাপ্লিঅ্যাণ্টস", ৬০৭।

BanglaBook.org

৩ ॥ **ব্যাসিলিয়ুস**। মহাকাব্যীয় যুগের গ্রীক সমাজে এই পদের অধিকারী একটা বিশিষ্ট চরিত্রে পরিণত হয়েছিল। পৌরাণিক যুগেও পদটা একইরকম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঐতিহাসিকরা ব্যাসিলিয়ুসকে তাদের গোটা ব্যবস্থাটার কেন্দ্রবিন্দু বলে উল্লেখ করেছেন। সরকারকে চিহ্নিত করার জন্য শ্রেষ্ঠ গ্রীক লেখকরা এই পদের নামটা কাজে লাগিয়েছেন। সরকারকে তাঁরা বলেছেন ব্যাসিলিয়া। প্রায় সমস্ত আধুনিক লেখকই ব্যাসিলিয়ুস-এর অর্থ করেছেন 'রাজা' আর ব্যাসিলিয়ার অর্থ করেছেন 'রাজত্ব'। শব্দগুলোকে তাঁরা সমার্থক শব্দ হিসেবে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ব্যাসিলিয়ুস পদের ভূমিকার দিকে আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং ঐ লেখকদের ব্যাখ্যার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে চাই। প্রাচীন এথেন্সের ব্যাসিলিয়া আর আজকের দিনের রাজত্ব বা রাজতন্ত্রের মধ্যে আদৌ কোন মিল নেই। অন্তত এ দুটোকে সমার্থক হিসেবে দেখানোর মত কোন মিল তো নেই-ই। রাজতান্ত্রিক সরকার সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা এ-রকম—একজন রাজা, তাঁর চারপাশে কয়েকজন সুবিধাভোগী ও খেতাবধারী লোক, এরাই সমস্ত জমির মালিক, রাজা নিজের খেয়াল-খুশি গত নানান অনুশাসন ও নির্দেশ জারি করে শাসন চালান, রাজপদের ওপর উত্তরাধিকার দাবি করেন তিনি কারণ শাসিতদের সম্মতি দাবি করার মত জোর তাঁর নেই। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অধিকারের নীতির সাহায্যে এই ধরণের সরকার নিজেকে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয় আর পুরোহিতরা এই অধিকারকে একটা ঈশ্বরপ্রেরিত অধিকার হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে উপযুক্ত উদাহরণ হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের টিউডর রাজারা আর ফ্রান্সের বুর্বোঁ রাজারা। সাংবিধানিক রাজতন্ত্র একটা আধুনিক ব্যাপার এবং গ্রীকদের ব্যাসিলিয়ার থেকে তা মূলগতভাবেই আলাদা। ব্যাসিলিয়া বলতে নিরঙ্কুশ বা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র —কোনটাকেই বোঝায় না। এটা কোন পীড়নমূলক শাসন বা স্বৈরতন্ত্রও ছিল না। তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়ায়—ব্যাসিলিয়া ঠিক কেমন ছিল?

মিঃ গ্রোটে দাবি করেছেন যে, "প্রাচীন গ্রীসের সরকার ছিল মূলত রাজতান্ত্রিক, যার ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ঈশ্বরদত্ত অধিকার।"[১] এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রমাণ দেওয়ার জন্য তিনি বলেছেন, "ইলিয়াডের সেই স্মরণীয় অনুশাসনকে সকলেই সমর্থন করত, বহুজনের শাসন মোটেই শুভ নয়। আমাদের একজন শাসক, একজনই রাজা থাকুন, যাঁর হাতে জিউস তুলে দিয়েছেন রাজদণ্ড, তুলে দিয়েছেন আমাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব।"[২] মিঃ গ্রোটে একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক। কিন্তু এই অভিমতটা তাঁর একান্ত নিজস্ব নয়। গ্রীসের নানান বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়ে বহু ঐতিহাসিকই এ-কথা বলেছেন। একসময় এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে স্বীকৃতও হয়েছে। গ্রীস ও রোমের ব্যাপারে এই দৃষ্টিভঙ্গীর রচয়িতারা আসলে রাজতান্ত্রিক সরকার ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর কথা ভাবতেই অভ্যস্ত ছিলেন, আর সম্ভবত তাঁরা গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর প্রাচীনতম ধাঁচের সরকারের কাছে সানন্দ চিত্তে আবেদন জানিয়েছিলেন

১। "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", ২, ৬৯।

২। "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", ২, ৬৯, এবং "ইলিয়াড", ২, ২০৪।

রাজতান্ত্রিক সরকার গড়ে তোলার জন্য—তাঁদের মতে যা কিনা স্বাভাবিক, আবশ্যিক ও সুপ্রাচীন সরকার-ব্যবস্থা।

একজন আমেরিকান হিসেবে আমার ধারণা হচ্ছে—মিঃ গ্রোটের উক্তির ঠিক বিপরীতটাই হচ্ছে আসল সত্য। অর্থাৎ, প্রাচীন গ্রীসে সরকার ছিল গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন, যার ভিত্তি ছিল গোত্র, ভ্রাতৃত্ব আর গোষ্ঠী। এই সরকার গড়ে উঠেছিল একটা স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে এবং তার নীতি ছিল স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। গোত্রভিত্তিক সংগঠন সম্বন্ধে আমাদের জানা সমস্ত তথ্যই এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। আর আমরা আগেই দেখেছি যে গণতান্ত্রিক নীতিমালাই ছিল এই সংগঠনের মূল বনিয়াদ। এখন প্রশ্ন হল—ব্যাসিলিয়ুস পদটা কি পিতার কাছ থেকে পুত্রের ওপর উত্তরাধিকারসূত্রেই বর্তাতো? তা যদি হয়, তাহলে সেটা ঐ গণতান্ত্রিক নীতির পরাজয়কেই চিহ্নিত করে। আমরা আগেই দেখেছি যে বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে প্রধানের পদটা গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক ছিল। অর্থাৎ ঐ পদটা যখন শূন্য হত, তখন গোত্রের সদস্যদের মধ্যে থেকেই মনোনীত করা হত নতুন প্রধানকে। যেখানে বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুসারে (যেমন ইরোকোয়াদের মধ্যে), সেখানে সাধারণত মৃত প্রধানের কোন আপন ভাইকেই নতুন প্রধান হিসেবে মনোনীত করা হত। আর যেখানে বংশধারা নির্ণীত হত পুরুষ-ধারা অনুসারে (যেমন ওজিবোয়া এবং ওমাহাদের মধ্যে), সেখানে মৃত প্রধানের জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই সাধারণত নতুন প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হত। নির্বাচিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ উঠত না বলে এইটাই নিয়ম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নির্বাচনমূলক নীতিটা তাই বলে উঠে যায়নি। এই নীতিই ছিল স্বশাসনের মর্মবস্তু। ব্যাসিলিয়ুসের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিরঙ্কুশ উত্তরাধিকারের দৌলতে পিতার পদের অধিকারী হত—এমনটা দাবি করার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নেই। এই দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যথোপযুক্ত প্রমাণ দরকার। এটা মোটামুটি স্বীকৃত যে জ্যেষ্ঠ পুত্র অথবা কোন-একজন পুত্রই সাধারণত মৃত পিতার পদের অধিকারী হত। কিন্তু এটুকু দিয়েই সমস্যাটার সমাধান হয়ে যায় না। কারণ প্রথা অনুযায়ী সে ছিল একটা জনমণ্ডলীর মধ্যে থেকে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে ঐ পদের অধিকারী হওয়ার একজন দাবিদার মাত্র। গ্রীক প্রতিষ্ঠান-গুলোর ব্যাপারে মনে হয় যে ব্যাসিলিয়ুসের পদটা তাদের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তাতো না। হয় অবাধ নির্বাচনের সাহায্যে ব্যাসিলিয়ুসকে মনোনীত করা হত অথবা নিজেদের স্বীকৃত সংগঠনগুলোর মাধ্যমে জনসাধারণ এই পদের অধিকারীকে অনুমোদন করত—যেমনটা ঘটত রোমানদের রেক্স বা রাজার ক্ষেত্রে।[১] এই শেষোক্ত

১। মিঃ গ্ল্যাডস্টোন যিনি মহাকাব্যীয় যুগের গ্রীক প্রধানদের রাজা ও রাজপুত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকে সৈনিক হিসেবেও দেখিয়েছেন, তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, "মোটের ওপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার লাভের প্রথা বা নিয়ম চালু থাকলেও তা তেমন যথাযথভাবে নির্দিষ্ট ছিল না।"—"জুভেণ্টাস মাণ্ডি", লিটল অ্যাণ্ড ব্রাউন সংস্করণ, পৃঃ ৪২৮।

পক্ষায় ব্যাসিলিয়ুস পদাধিকারীকে মনোনীত করার দরুণ শাসনব্যবস্থা থেকে যেত জনসাধারণের হাতেই। কারণ নির্বাচন বা অনুমোদন ছাড়া সে ঐ পদের অধিকারী হতে পারত না। তাছাড়া নির্বাচন বা অনুমোদন করার অধিকার থাকার অর্থ হল—তাকে বরখাস্ত করার অধিকারও জনসাধারণের ছিল।

ইলিয়াড থেকে মিঃ গ্রোটে যে দৃষ্টান্তটা তুলে এনেছেন, সেটার সঙ্গে আমাদের আলোচ্য প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই। উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে ইউলিসিসের কথা থেকে। ইউলিসিস তখন অবরুদ্ধ শহরের সামনে দাঁড়িয়ে সৈন্যবাহিনীর পরিচালনা সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। তিনি স্বচ্ছন্দেই এমন কথাও বলতে পারতেন ঃ "সমস্ত গ্রীকরা মিলে এখানে শাসন চালাতে পারে না। এখানে আমাদের একজন কোইরানোস, একজন ব্যাসিলিয়ুস থাকুক, আমাদের পরিচালিত করার জন্য জিউস যাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন রাজদণ্ড আর ঐশ্বরিক ক্ষমতা।" কোইরানো আর ব্যাসিলিয়ুস সমার্থক শব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হত, কারণ দুটোরই অর্থ ছিল সার্বজনীন সেনাপতি। কোন ধরণের সরকার নিয়ে আলোচনা করা বা তাকে সমর্থন করার কোন কারণ ইউলিসিসের ছিল না। কিন্তু একটা অবরুদ্ধ শহরের সামনে দাঁড়িয়ে গোটা সেনাবাহিনীর একজন সেনাপতির প্রতি আনুগত্য জানানোর পক্ষে কথা বলার যথেষ্টই কারণ ছিল তাঁর।

ব্যাসিলিয়াকে চিহ্নিত করা যায় একটা সামরিক গণতন্ত্র হিসেবে, যেখানে মানুষ স্বাধীন এবং সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী (যা হচ্ছে মূল ব্যাপার) হচ্ছে গণতন্ত্রসম্মত। ব্যাসিলিয়ুস ছিল তাদের সেনাপতি। এটাই ছিল তাদের সমাজব্যবস্থার সর্বোচ্চ, সবথেকে প্রভাব-সম্পন্ন এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পদ। সরকারকে চিহ্নিত করার মত উৎকৃষ্টতর কোন শব্দের অভাবে গ্রীক লেখকরা ব্যাসিলিয়া শব্দটাকেই গ্রহণ করেছিলেন। কারণ এই শব্দটার সঙ্গে সেনাপতি সংক্রান্ত ধারণার একটা সম্পর্ক আছে এবং এই সেনাপতি তখন তাদের সরকারের একটা বিশিষ্ট ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। ব্যাসিলিয়ুসের সঙ্গে প্রধানদের পরিষদ আর গণ-পরিষদকে যুক্ত করে নিয়ে সরকারের এই রূপটির কোন নির্দিষ্টতর সংজ্ঞা খুঁজতে হলে একে সামরিক গণতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই অভিধাটা অনেকটাই যথাযথ। অন্যদিকে, রাজত্ব শব্দটার যা অর্থ, তাতে ঐ ব্যবস্থাকে রাজত্ব হিসেবে চিহ্নিত করাটা শব্দের অপপ্রয়োগ মাত্র।

মহাকাব্যীয় যুগে গ্রীক গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন প্রাচীরবেষ্টিত শহরে ঘরবাস করত এবং কৃষিকাজ, নির্মাণকারী শিল্প আর ভেড়া ও গোরু-মোষের পাল পোষার সাহায্যে তারা ক্রমশ সংখ্যায় বেড়ে উঠছিল এবং সম্পদশালী হয়ে উঠছিল। তখন দরকার হচ্ছিল নতুন নতুন পদ এবং কাজকর্মের কিছুটা বিভাজন। তাদের ক্রমবর্ধমান বুদ্ধিমত্তা ও প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়ে উঠেছিল একটা নতুন পৌর-ব্যবস্থা। সবথেকে কাম্য অঞ্চলগুলো দখল করার জন্য অবিরাম সশস্ত্র সংঘর্ষও ঘটেছে এই যুগে। সম্পত্তি বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতসুলভ উপাদানগুলোও বেড়ে উঠেছিল সমাজে। থেসেউসের সময় থেকে শুরু করে সোলোন ও ক্লাইস্থেনিসের সময়কাল পর্যন্ত এথেনিয় সমাজে যত কিছু বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটেছে, তার মূল কারণ ছিল সম্পত্তিই।

BanglaBook.org

এই পর্যায়ে, এবং প্রথম অলিম্পিকের (৭৭৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) কিছুদিন আগে ব্যাসিলিয়ুস পদটা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত, নিজের পদটার প্রকৃতি এবং তৎকালীন পরিস্থিতির দরুণ ব্যাসিলিয়ুসই হয়ে উঠেছিল এথেন্সের বিশিষ্টতম ও সবথেকে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্ব। এথেন্সের পূর্বতন ইতিহাসে কোন-একজন ব্যক্তি কখনোই এত ক্ষমতার অধিকারী হয় নি। এই পদটার সঙ্গে পুরোহিত ও বিচারকের কার্যকলাপ পালনের দায়িত্বও মিশে থাকত, এবং নিজের পদাধিকারবলে সে প্রধানদের পরিষদের সদস্য হিসেবেও মনোনীত হত। পদটা ছিল প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। রণাঙ্গনে সে সেনাবাহিনীর সেনাপতি, শহরে শহর-রক্ষীদের নেতা। ফলে আভ্যন্তরীণ নানান বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করার উপায় ছিল তার হাতের মুঠোয়। তবে কোন পৌর কাজকর্মের ভার তার ওপর ছিল বলে মনে হয় না। অধ্যাপক ম্যাসন বলেছেন, "ঐতিহাসিক যুগের গ্রীক নৃপতিদের ব্যাপারে আমাদের হাতে যেটুকু তথ্য আছে তা মোটেই এতটা যথেষ্ট নয় যার সাহায্যে তাদের কাজকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রটা পাওয়া যেতে পারে।"[১] ব্যাসিলিয়ুসের সামরিক ও পুরোহিত-সুলভ কাজকর্মের ব্যাপারটা বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না, তার বিচারবিভাগীয় কাজকর্মকেও খানিকটা বোঝা যায়, আর পৌর কাজকর্ম বিশেষ কিছু ছিল বলে মনে হয় না। গোত্রভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে এই ধরণের একটা পদের ক্ষমতা অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে ক্রমশ সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। তবে আরও নতুন নতুন ক্ষমতা অর্জন করার একটা প্রবণতা ব্যাসিলিয়ুসের মধ্যে থাকতই, যেগুলো গোটা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। আমরা জানি, প্রধানদের পরিষদ ছিল তাদের সরকার-ব্যবস্থার অন্যতম মূল উপাদান। আমরা ধরে নিতে পারি যে এই পরিষদ তাদের সমাজ-ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক নীতিগুলোর এবং গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করত, আর ব্যাসিলিয়ুস পরিণত হয়েছিল অভিজাততান্ত্রিক নীতিগুলোর প্রতিনিধিতে। ব্যাসিলিয়ুসের হাতে জনসাধারণ যতটা ক্ষমতা অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিল, সেই ক্ষমতার চৌহদ্দীতেই তাকে আটকে রাখার জন্য পরিষদ ও ব্যাসিলিয়ুসের মধ্যে এক অবিরাম সংগ্রাম চলাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া একসময় এথেনিয়রা এই পদটাকে বিলুপ্তও করে দেয়। এ থেকে মনে হয় যে তার ঐ অতিরিক্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রবণতার দরুণ পদটা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল এবং গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর সঙ্গে পদটা ঠিক খাপ খাচ্ছিল না।

একই ধরণের অভিজ্ঞতার ফলে স্পার্টার গোষ্ঠীগুলো ব্যাসিলিয়ুসের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার জন্য বহুদিন আগেই একটা 'এফোরলটি' গঠন করেছিল। হোমারীয় ও পৌরাণিক যুগে পরিষদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা না গেলেও, সর্বদাই এর অস্তিত্ব ছিল। এটাই প্রমাণ করে যে পরিষদের হাতে কিছু প্রকৃত, আবশ্যকীয় ও স্থায়ী ক্ষমতা ছিল। পাশাপাশি ছিল গণ-পরিষদ, এবং এদের প্রতিষ্ঠান-

১। স্মিথ-এর "Dic., Art. Rex", পৃঃ ৯৯১।

BanglaBook.org

গুলোর অদল-বদলের কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে স্থিরীকৃত রীতি-নীতি মেনে চলা এই পরিষদই ছিল তাদের গোত্র, ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠী ও জাতির সর্বোচ্চ পরিচালক, আর ব্যাসিলিয়ুসকে তার সরকারি কাজকর্মের জন্য পরিষদের কাছে জবাবদিহি করতে হত। পরিষদের সদস্যরা ছিল বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি এবং গোত্রগুলো ছিল স্বাধীন। এ থেকেই বোঝা যায় যে পরিষদও ছিল স্বাধীন এবং সে-ই ছিল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

প্রাচীন কালের সরকার সম্বন্ধে থুকিডিডিস কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন। যেমন ঃ "গ্রীকরা যখন শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল আর আগের থেকে বেশি সম্পত্তির অধিকারী হতে লাগল, তখন নানান শহরে বেশ কিছু স্বেচ্ছাচারী শাসক গজিয়ে উঠল—কারণ তাদের রাজস্বের পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তার আগে পর্যন্ত ছিল নির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতাসম্পন্ন উত্তরাধিকারমূলক ব্যাসিলিয়া।"[১] এখানে পদটাকে স্থায়ী অর্থেই উত্তরাধিকারমূলক বলা হয়েছে, কেননা পদটা শূন্য হওয়া মাত্রই তা পূরণ করা হত। তবে সম্ভবত পদটা গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক ছিল। অর্থাৎ গোত্রের সদস্যরা অবাধ নির্বাচনের সাহায্যে তাকে নির্বাচিত করত অথবা পরিষদ তাকে মনোনীত করত এবং গোত্র তা অনুমোদন করত—যেমনটা ঘটত রোমানদের রেক্স-এর ক্ষেত্রে।

মহাকাব্যীয় যুগের ব্যাসিলিয়া ও ব্যাসিলিয়ুস সম্বন্ধে অন্য যে-কোন গ্রীক লেখকের থেকে সন্তোষজনক সংজ্ঞা দিয়েছেন অ্যারিস্টটল। তিনি এই চার ধরণের ব্যাসিলিয়ার কথা উল্লেখ করছেন ঃ প্রথমটা হচ্ছে মহাকাব্যীয় যুগের ব্যাসিলিয়া। এটা ছিল একটা স্বাধীন জনগোষ্ঠীর সরকার, কোন কোন ব্যাপারে তার অধিকার ছিল সীমিত; ব্যাসিলিয়ুসই ছিল তাদের সেনাপতি, বিচারক ও প্রধান পুরোহিত। দ্বিতীয়টা হচ্ছে বর্বর যুগের ব্যাসিলিয়া, যা ছিল উত্তরাধিকারমূলক স্বেচ্ছাচারী সরকার, এবং যাদের একটা আইনও ছিল। তৃতীয় ধরনের ব্যাসিলিয়াকে তারা বলত এসাইমু-নেটিক্, অর্থাৎ নির্বাচনমূলক স্বৈরাচার। আর চতুর্থটা হচ্ছে ল্যাসিডেমোনিয়ান, যা আসলে উত্তরাধিকারমূলক সেনাপতিত্ব।[২] শেষ তিন ধরণের ব্যাসিলিয়া সম্বন্ধে যা-ই বলা হোক না কেন, প্রথম ধরণটার সঙ্গে পরিপূর্ণ রাজত্বের ধারণার বা কোন স্বীকৃত ধরণের রাজতন্ত্রের কোন মিল নেই। অ্যারিস্টটল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাসিলিয়ুসের প্রধান প্রধান কার্যকলাপগুলো উল্লেখ করেছেন। এগুলোর কোনটার মধ্যেই কোন পৌর ক্ষমতার ইঙ্গিত নেই, এবং প্রত্যেকটাই একটা সারা জীবনব্যাপী পদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যা অর্জিত হত নির্বাচনের সাহায্যে। প্রধানদের পরিষদের কাছে তার পরিপূর্ণ অধীনতার সঙ্গেও এটা সাযুজ্যপূর্ণ। এইসব লেখকদের দ্বারা কথিত "সীমিত অধিকার" এবং "নির্দিষ্ট ক্ষমতা"-র ব্যাপারটা থেকে বোঝা যায় যে গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং তার মধ্যে থেকেই সরকারের এই রূপটা গড়ে

১। "থুকিডিডিস", ১।১৩।

২। অ্যারিস্টটল, "পলিটিকস", ৩, পরিচ্ছেদ ১০।

BanglaBook.org

উঠছিল। অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞার মূল বিষয়টা হচ্ছে জনসাধারণের স্বাধীনতা। প্রাচীন সমাজে যার অর্থ ছিল এ-রকম—সরকারের ক্ষমতার ওপর জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ ছিল, ব্যাসিলিয়ুসের পদটা প্রদান করা হত স্বেচ্ছায়, এবং উপযুক্ত কারণ দেখা দিলে তাকে পদচ্যুতও করা যেত। অ্যারিস্টটল বর্ণিত সরকার আসলে এক ধরণের সামরিক গণতন্ত্র। স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকার হিসেবে এই সামরিক গণতন্ত্র গোত্রীয় সংগঠনের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছিল এমন একটা সময়ে যখন সামরিক মনোভাব ছিল তুঙ্গে, যখন সৃষ্টি হয়েছে বিপুল সম্পদ, বেড়ে উঠেছে লোকসংখ্যা, যখন তারা প্রাচীরবেষ্টিত শহরে বসবাসে অভ্যস্ত, এবং যখনও পর্যন্ত মানুষের অভিজ্ঞতা এক প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করতে পারে নি।

গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠত গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীকে ঘিরে, এবং প্রতিটাই ছিল এক-একটা স্বাধীন ও স্বশাসিত সংস্থা। এই একক প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি মানুষেরও স্বাধীন থাকাটাই স্বাভাবিক। এই ধরণের সমাজে উত্তরাধিকারসূত্রে কোন রাজার শাসন চালু থাকা এবং তার কোন জবাবদিহি করার দায় থাকাটা নিতান্তই অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার মূল কারণ হল—গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন রাজা বা রাজতান্ত্রিক সরকারের সম্পর্ক আদৌ মানানসই নয়। প্রাচীন গ্রীক সমাজের কাঠামো ও নীতিগুলোকে বিচার-বিবেচনা করে যে অনুমানে আমরা উপনীত হয়েছি, তাকে খণ্ডন করার জন্য এমন কিছু নিশ্চিত প্রমাণ দরকার (যা পাওয়া একান্ত অসম্ভব বলেই আমার ধারণা), যার সাহায্যে ব্যাসিলিয়ুস পদের নিরংকুশ উত্তরাধিকারমূলক অধিকারের এবং তার পৌর কাজকর্মের প্রমাণ দেওয়া যাবে। প্রজাতন্ত্রের অধীনে একজন আমেরিকান যতটা স্বাধীন, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে অধীনে একজন ইংরেজও ঠিক ততটাই স্বাধীন, এবং তার অধিকার ও স্বাধীনতাকে একইভাবে রক্ষা করা হয়। কিন্তু তার সেই স্বাধীনতা ও তা রক্ষার উৎস হল একগুচ্ছ লিখিত আইন, যা সৃষ্টি হয়েছে সংবিধানের দ্বারা এবং যাকে বলবৎ রাখে আদালত। প্রাচীন গ্রীক সমাজে লিখিত আইনের বদলে ছিল নানান রীতি ও প্রথা, এবং নিজেদের স্বাধীনতা ও তা রক্ষার জন্য মানুষ নির্ভর করত তার সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর। এই-সব প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তির স্বাধীনতার রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—যে-কোন পদের ব্যাপারে নির্বাচনমূলক নীতিই এর প্রমাণ দেয়।

একইভাবে, রোমানদের রেজেস (reges)-রাও ছিল আসলে সামরিক নেতা বা সেনাপতি এবং পুরোহিতের দায়িত্বও পালন করত তারা। এই তথাকথিত রাজতান্ত্রিক সরকারও আসলে ছিল সামরিক গণতন্ত্রেরই পর্যায়ভুক্ত। আগেই বলা হয়েছে যে রেক্সদের মনোনীত করত ব্যবস্থাপক-সভা (senate) এবং কমিশিয়া কিউরিয়াটা তা অনুমোদন করত। সর্বশেষ রেক্সকে পদচ্যুত করা হয়েছিল। তার পদচ্যুতির পর এই পদটা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ রোমের রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর, সেই ব্যবস্থার মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতিগুলোর সঙ্গে এই পদটা একেবারেই মানানসই ছিল না।

গ্রীক গোষ্ঠীর মধ্যেকার রাজত্বের নিকটতম সমরূপ ব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী ব্যবস্থা,

BanglaBook.org

যা সেই প্রাচীন যুগে গ্রীসের বিভিন্ন জায়গায় গজিয়ে উঠেছিল। এগুলো ছিল বলপ্রয়োগের মারফৎ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শাসনব্যবস্থা এবং এগুলোর ক্ষমতা ছিল মধ্যযুগের সামন্ত-রাজাদের মতই। দুটো ব্যবস্থার মধ্যেকার সাদৃশ্যকে সম্পূর্ণ করার জন্য দরকার ছিল কয়েক প্রজন্ম ধরে পিতার কাছ থেকে পুত্রের কাছে পদের হস্তান্তর, যাতে করে বংশানুক্রমিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু গ্রীকদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এবং তাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে এই ধরণের সরকার এতই বেমানান ছিল, যার ফলে এগুলোর কোনটাই গ্রীসের মাটিতে শিকড় গেড়ে বসতে পারে নি। মিঃ গ্রোটে বলেছেন, "কোন উৎসাহী ব্যক্তি যদি স্বীয় ঔদ্ধত্য বা কৌশলের দ্বারা সংবিধান ভঙ্গ করে নিজের খেয়াল-খুশি মাফিক চলা এক স্থায়ী শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইত, তাহলে—সে যত ভাল শাসকই হোক না কেন—জনসাধারণ কখনোই তার প্রতি সহানভূতিশীল হত না। তার রাজদণ্ড প্রথম থেকেই অবৈধ। এমনকি তাকে হত্যা করাও ছিল গৌরবময় কাজ, যেখানে অন্যান্য ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়াটাই ছিল নীতিসম্মত।"[১] গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সঙ্গে রাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সংঘাতে গ্রীকরা যতটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত, অবৈধ রাজদণ্ডের ব্যাপারে ঠিক ততটা ক্ষিপ্ত হত না তারা। এই গভীর গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার জন্ম হয়েছিল গোত্রের মধ্যে থেকেই।

ভূখণ্ড এবং সম্পত্তির ওপর ভিত্তি করে এথেনিয়রা যে নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে, তার সরকার ছিল পুরোপুরি গণতান্ত্রিক ধাঁচের। এটা কোন নতুন তত্ত্ব বা এথেনিয়দের নিজস্ব কোন উদ্ভাবন নয়। এটা এক বহু প্রাচীন ও সুপরিচিত ব্যবস্থা। গোত্রগুলো যত প্রাচীন, এই ব্যবস্থাও ততই প্রাচীন। তাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞানে ও অনুশীলনে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার অস্তিত্ব ছিলই। নতুন ব্যবস্থায় এসে সেটা একটা বিশদতর এবং কিছুটা পরিমাণে উন্নততর সরকারের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করল। যে মেকি উপাদানটি—অর্থাৎ অভিজাততন্ত্রের উপাদানটি—এই ব্যবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে মধ্যবর্তী পর্যায়ে বহু বিবাদ-বিসম্বাদের জন্ম দিয়েছিল, সেটা ব্যাসিলিয়ুস পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং ব্যাসিলিয়ুস পদটা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরেও টিকে ছিল। কিন্তু নতুন ব্যবস্থা তার মূলোচ্ছেদ করে। এথেনিয়রা অন্যান্য গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর থেকে অনেক ভালোভাবে নিজেদের সরকার সংক্রান্ত ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল তার যুক্তিসম্মত পরিণতিতে। তারা যে সমগ্র মানবসমাজের সবথেকে বিশিষ্ট, সবথেকে মননশীল ও সবথেকে গুণসম্পন্ন জাতিতে পরিণত হতে পেরেছিল, তার পিছনে অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করেছে এই ঘটনাটা। মননশীল সৃষ্টির দিক থেকে এরা আজও পর্যন্ত মানবসমাজের বিস্ময়স্বরূপ। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক যুগে যে ধারণাগুলো অংকুরিত হচ্ছিল এবং যে ধারণাগুলো তাদের মস্তিষ্কের প্রতিটি তন্তুতে তন্তুতে ছড়িয়ে পড়ছিল, সেগুলো একটা গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মাটিতে ফুলে-ফলে ভরে

১। "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", ২. ৬১ এবং দ্রষ্টব্য ৬৯।

উঠতে পেরেছিল বলেই তারা এই সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ঐ রাষ্ট্রের জীবনদায়ী প্রেরণার দরুণই তাদের সর্বোচ্চ সামাজিক বিকাশ সম্ভব হয়েছিল।

ক্লাইস্থেনিস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকার মুখ্য কার্যনির্বাহী বিচারকের পদটা তুলে দিয়েছিল। তবে একটা নির্বাচনমূলক ব্যবস্থাপক-সভার মধ্যে প্রধানদের পরিষদকে এবং সাধারণ পরিষদের মধ্যে গণ-পরিষদকে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল। এটা স্পষ্ট যে গোত্র-গুলোর ঐ প্রধানদের পরিষদ, গণ-পরিষদ এবং ব্যাসিলুয়সই ছিল আজকের দিনের রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থার ব্যবস্থাপক-সভা, সাধারণ পরিষদ ও মুখ্য কার্যনির্বাহী বিচারকের (রাজা বা সম্রাট বা রাষ্ট্রপতি) ভ্রূণরূপ। সংগঠিত সমাজব্যবস্থার নানাবিধ সামরিক প্রয়োজনের ফলেই শেষোক্ত পদটা সৃষ্টি হয়েছিল এবং মানবসমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই পদটা বিবর্তিত হয়েছে। সাধারণ সমরপ্রধানের পদ থেকেই এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রথমে ছিল 'মহান যুদ্ধনায়ক,' যেমনটা দেখা যায় ইরোকোয়া মিত্রসংঘের মধ্যে। তারপর এল আরও অগ্রসর গোষ্ঠীগুলোর মিত্রসংঘে একজন সমর-নায়ক, যে পুরোহিতের দায়িত্বও পালন করত, যেমনটা ছিল আজটেক মিত্রসংঘের টিউক্‌ট্‌লির ভূমিকা। তৃতীয় স্তরে দেখা দিল কিছু গোষ্ঠীর একাঙ্গীভবনের মারফৎ গড়ে ওঠা জাতির সেনাপতি, যে পুরোহিত ও বিচারকের ভূমিকাও পালন করত, যেমনটি দেখা গেছে গ্রীসের ব্যাসিলিয়ুসের মধ্যে। আর সবশেষে সামনে এসেছে আধুনিক রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থার প্রধান বিচারপতি। ব্যাসিলিয়ুসের পর এথেন্সে নির্বাচনমূলক বিচারকের পদ সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিচারক আর আধুনিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি—দুটো পদেরই স্থায়িত্বকাল নির্বাচনমূলক। অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে সেই গোত্রের নীতিরই স্বাভাবিক পরিণতির ফসল। সভ্য রাষ্ট্রগুলোর সরকারের মধ্যে শাসনব্যবস্থার এই যে প্রধান তিনটি উপাদান মিশ্রিত হয়ে রয়েছে, সেগুলো সৃষ্টি করা ও বিকশিত করে তোলার জন্য আমরা বর্বরদের অভিজ্ঞতার কাছে ঋণী। মানবসমাজের সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠীর সমস্ত ব্যক্তির মস্তিষ্ক মূলত এক এবং তার ক্ষমতার নির্দিষ্ট সীমাও আছে। তবু সেই সীমার মধ্যেই সমস্ত মানুষ একই পথ ধরে কাজ করছে, করে যাবেও—সামান্য কিছু তারতম্য শুধু চোখে পড়ে বিভিন্ন জায়গায়। বিশ্বের নানান প্রান্তে এবং একেবারে ভিন্ন ভিন্ন যুগে এই কাজের ফলাফল একই অভিজ্ঞতার এক যৌক্তিক শৃংখলে আবদ্ধ। আজকের দিনে এসে মোট কাজের এই বিপুল স্তূপের মধ্যে খোঁজ করলে সেই প্রাথমিক চিন্তাভাবনার কিছু কিছু অংকুর এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলোর সমাধান করার পথ বেয়ে এইসব ছোট ছোট অংকুরই বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছে ফসলের এই বিশাল পাহাড়।

BanglaBook.org

দশম পরিচ্ছেদ

গ্রীসের রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান

গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থা থেকে রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের পথে গ্রীসের জনগোষ্ঠীগুলো একই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছিল। তবে এই উত্তরণের প্রক্রিয়াকে সবথেকে ভালোভাবে বোঝা যায় এথেনিয়দের ইতিহাস থেকে, কারণ এই এথেনিয়দের ইতিহাসই সবথেকে ভালোভাবে রক্ষিত হয়েছে। মূল ঘটনাসমূহের একটা মোটামুটি রূপরেখা সামনে রাখলে আমাদের নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া সম্ভবপর হবে, কারণ নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রপাতের পরবর্তীকালের শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারণার বিকাশকে আমরা খুঁজতে চাইছি না।

এটা স্পষ্ট যে সমাজের নতুন নতুন জটিল প্রয়োজনগুলো পূরণ করার ব্যাপারে গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অক্ষমতার ফলেই গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর কাছ থেকে যাবতীয় পৌর ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নিয়ে সেগুলোকে নতুন ধরনের সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াটা এগিয়েছিল ধীরে ধীরে, বহুদিন ধরে, এবং বেশ কিছু ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গোটা প্রক্রিয়াটা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে বিদ্যমান ত্রুটিপূর্ণ অশুভ ব্যবস্থাগুলোকে প্রতিহত করার উপায় খোঁজা হচ্ছিল। পুরনো ব্যবস্থাটা বিলুপ্ত হচ্ছিল ধীরে ধীরে আর নতুন ব্যবস্থাটাও ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠছিল। একটা সময়ে দুটো ব্যবস্থাই পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল। যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল, সেগুলোর প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যকে বিচার করে দেখলেই আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারব কেন গোত্রীয় সংগঠন সমাজের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল এবং ক্ষমতার মূল উৎসস্বরূপ গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীকে কেন ধ্বংস করতে হয়েছিল আর কী উপায়েই বা করা হয়েছিল সেটা।

মানবপ্রগতির পথ-বরাবর পিছন দিকে তাকালে দেখা যায় যে বেড়া-দিয়ে-ঘেরা গ্রামগুলোই ছিল বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থার গোষ্ঠীগুলোর স্বাভাবিক বাসস্থান। বর্বর যুগের মধ্য অবস্থায় দেখা দিল কেল্লার আকারে তৈরি রোদে-পোড়া ইঁট আর পাথরে গড়া যৌথ আবাসগৃহ। কিন্তু বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থায় মানুষের ইতিহাসে প্রথম সৃষ্টি হল বৃত্তাকার বাঁধ দিয়ে ঘেরা এবং পরে সুবিন্যস্ত পাথরের দেয়ালে ঘেরা শহর। এটা ছিল একটা বৃহৎ অগ্রগতি। বেশ কিছু মানুষের বসবাস করার মত পর্যাপ্ত অঞ্চলকে পাথরের দেয়াল দিয়ে সুরক্ষিত করে, সেখানে নজরদারির জন্য উঁচু বাড়ি, অস্থায়ী পাঁচিল এবং নানারকম তোরণ ও বুরুজের ব্যবস্থা করেছিল তারা, যার উদ্দেশ্য ছিল সকলকে রক্ষা করা এবং সকলের সম্মিলিত শক্তির জোরে বহিঃশত্রুর আক্রমণ

BanglaBook.org

থেকে আত্মরক্ষা করা। এই ধরণের শহর থাকার অর্থই হল সেখানে বেশ উন্নত একটা কৃষি-ব্যবস্থা বর্তমান থাকা, গৃহপালিত গরু-মোষ-ভেড়া পালিত হওয়া, প্রচুর পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হওয়া। এইসব শহরের ঘর-বাড়ি ও জমি ছিল নানা জনের সম্মিলিত সম্পত্তি। এই ধরণের শহর সমাজব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন ঘটিয়েছিল আর তার ফলে শাসন-ব্যবস্থার সামনেও নতুন নতুন প্রয়োজন মাথা তুলে দাঁড়াল। ক্রমশ বিভিন্ন পদমর্যাদা-বিশিষ্ট শাসনকর্তা, বিচারক এবং নানান সামরিক ও পৌর অধিকর্তার পদ সৃষ্টি করার প্রয়োজন অনুভূত হল। সেইসঙ্গেই গড়ে উঠল সামরিক ব্যয় বহনের জন্য কর আদায় করার একটা পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় রাজস্ব আদায়ের কাজে যার খুবই প্রয়োজন ছিল। পৌর জীবনযাত্রা ও তার বিভিন্ন চাহিদা প্রধানদের পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে নিশ্চয়ই দারুণভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল এবং সম্ভবত তার ফলে এই পরিষদের শাসন করার ক্ষমতার ওপর চাপও পড়েছিল অত্যধিক।

আমরা আগেই দেখেছি যে বর্বর যুগের নিম্ন অবস্থায় এক-শক্তির শাসনব্যবস্থা চালু ছিল, অর্থাৎ প্রধানদের পরিষদ। বর্বর যুগের মধ্য অবস্থায় ছিল দুই শক্তির শাসন-ব্যবস্থা, অর্থাৎ প্রধানদের পরিষদ ও সামরিক প্রধান। আর বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থায় গড়ে উঠেছিল তিন শক্তির শাসনব্যবস্থা, অর্থাৎ প্রধানদের পরিষদ, গণ-পরিষদ ও সামরিক প্রধান। কিন্তু সভ্যতার যুগ শুরু হওয়ার পর শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন শক্তিগুলোর বিভাজন আরও বেড়ে গেল। প্রথমে সামরিক ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল ব্যাসিলি-য়ুসের ওপর। সভ্যযুগে এসে সেটা ন্যস্ত হয় সেনানায়ক ও সেনাধ্যক্ষদের ওপর—যদিও এদের ক্ষমতার ওপর অনেক বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। ক্ষমতার বিভাজনের ফলে এথেনিয়দের মধ্যে বিচার-বিভাগীয় ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত হয়। এই ক্ষমতা ন্যস্ত থাকত বিচারক ও ডিকাস্টদের হাতে। শাসন-অধিকর্তাদের (ম্যাজিস্ট্রেট) কার্যভার অর্পণ করা হয় পৌর-অধিকর্তাদের ওপর। একটু একটু করে প্রয়োজন, অভিজ্ঞতা ও অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবং মূল প্রধানদের পরিষদের মোট ক্ষমতাকে নানা ভাগে বিভাজিত করার সাহায্যে এইসব পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। জনসাধারণ তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে ঐ পরিষদের হাতে একদিন এইসব ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল।

নানান বিষয়ের ক্রমবর্ধমান বিস্তার ও জটিলতার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে তাদের এইসব পৌর-বিষয়ক পদ সৃষ্টি হয়েছিল। বর্ধমান দায়িত্বের সামনে পুরনো গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশ ভেঙে পড়েছিল। কর্তৃত্বের জন্য সংঘাত এবং তখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট-ভাবে নির্দিষ্ট নয় এমন কিছু ক্ষমতার অপব্যবহার—এই দুয়ে মিলে সৃষ্টি হচ্ছিল অসংখ্য ধরনের বিশৃঙ্খলা। মধ্যবর্তী যুগে গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর অবস্থা সম্বন্ধে থুকি-ডিডিসের সংক্ষিপ্ত ও চমৎকার বিবরণ[১] এবং একই বিষয়ে অন্যান্য লেখকদের সমমতাব-লম্বী বক্তব্যকে অনুধাবন করলে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে পুরনো ধরণের শাসন-ব্যবস্থার পতন ঘটছিল এবং সমাজের অগ্রগতির জন্য এক নতুন ধরণের শাসন-ব্যবস্থার

১। "থুকিডিডিস", গ্রন্থ ১, ২-১৩।

BanglaBook.org

প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল। সমাজের কল্যাণের ও নিরাপত্তার জন্য দরকার ছিল সরকারের ক্ষমতাগুলোর আরও বেশি বিভাজন, ঐ ক্ষমতাগলোর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং বিভিন্ন পদাধিকারীদের নিজেদের কাজকর্মের জবাবদিহি করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা বজায় রাখা। রীতি ও প্রথার বদলে লিখিত আইন চালু করার প্রয়োজন বোধ হচ্ছিল বিশেষভাবে, যা রচনা করার ভার দেওয়া হয়েছিল সুযোগ্য ব্যক্তিদের ওপর। ঐ যুগে এবং তার পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক যুগে অর্জিত ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে দিয়েই রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের ধারণা গ্রীসের মানুষের মনে ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করছিল। একদা শাসনতন্ত্রের ধাঁচের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা থেকে শুরু হয়েছিল এই প্রক্রিয়া, আর সেদিন থেকে শুরু করে চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছনোর দিন পর্যন্ত অগ্রগতির পথে অতিক্রান্ত হয়েছিল শত শত বছর।

এথেনিয়দের মধ্যে গোত্রীয় সংগঠনকে ধ্বংস করে এক নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রথম প্রচেষ্টা করেছিলেন থেসেউস—এ-রকমই বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, এই ধারণাটার ভিত্তি হচ্ছে উপকথা। তবে ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে এমন কিছু তথ্য খুঁজে পাওয়া গেছে, যেগুলো তাঁর সেই অনুমিত আইনের অন্তত কিছু অংশকে প্রমাণিত করে। থেসেউসকে একটা যুগের অথবা একসারি ঘটনার প্রতিনিধি হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। থুকিডিডিস বলেছেন যে সেক্রপস-এর আমল থেকে শুরু করে থেসেউস-এর আমল পর্যন্ত অ্যাটিকার লোকেরা শহরেই বসবাস করত, তাদের নিজেদের প্রাইট্যানিয়াম এবং বিচারক ছিল। বহিঃ-আক্রমণের কোন বিপদের ভীতি না থাকায় তারা ব্যাসিলিয়ুসের সঙ্গে পরামর্শ করত না, নিজেদের পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজেদের বিষয়গুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালিত করত। কিন্তু থেসেউস যখন ব্যাসিলিয়ুস হলেন, তখন তিনি সকলকে বিভিন্ন শহরের পরিষদ-গৃহ ও শাসকবৃন্দের পদগুলো ভেঙে দিতে রাজি করালেন, রাজি করালেন এথেন্সের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে, একটাই পরিষদগৃহ(boul-euterios), এবং একজনই প্রাইট্যানিয়াম রাখতে যার মধ্যেই একত্রিত হল সকলে।[১] এই বিবরণের মধ্যে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন—অ্যাটিকার লোকেরা বিভিন্ন স্বাধীন গোষ্ঠীতে সংগঠিত ছিল, প্রতিটা গোষ্ঠীর নিজস্ব ভূখণ্ডেই তার সদস্যরা বসবাস করত, প্রতিটা গোষ্ঠীর নিজস্ব পরিষদ-গৃহ ও প্রাইট্যানিয়াম থাকত, এবং প্রত্যেকে স্বশাসিত গোষ্ঠী হলেও পারস্পরিক প্রতিরক্ষার স্বার্থে তারা

১। "থুকিডিডিস" গ্রন্থ ২, পরিচ্ছেদ ১৫। প্লুটার্কও প্রায় একই কথা বলেছেন: "অ্যাটিকার সমস্ত অধিবাসীকে তিনি এথেন্সে জমায়েত করেন এবং তাদেরকে একই শহরে বসবাসকারী একটা জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেন। তার আগে পর্যন্ত এইসব লোকেরা নানান জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করত এবং কোন জরুরী প্রয়োজনে তাদেরকে একত্রিত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল...। প্রতিটা পৃথক পৃথক শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পরিষদ ও আদালত ভেঙে দিয়ে তিনি একটা সার্বজনীন প্রাইট্যানিয়াম ও বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজও পর্যন্ত টিকে আছে। অধীনস্ত বিভিন্ন জায়গাসহ নগরদুর্গ এবং মূল নগরটি অথবা পুরনো ও নতুন শহর—এই সবকিছুই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এথেন্স নামে।"—প্লুটার্ক, "থেসেউস দ্রষ্টব্য", পরিচ্ছেদ ২৪।

সম্ভবত একটা মিত্রসংঘে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল আর নিজেদের সম্মিলিত সেনাবাহিনীকে পরিচালিত করার জন্য একজন ব্যাসিলিয়ুস বা সেনাপতিকে নির্বাচিত করেছিল। এই বিবরণের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত কিছু জনগোষ্ঠীর ছবিই ফুটে উঠেছে, নিজেদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যারা একজন সেনাপতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। কিন্তু এই সেনাপতির ওপর কোনরকম পৌর কাজকর্মের দায়িত্ব দেওয়া হত না। তাদের গোত্রভিত্তিক ব্যবস্থা এ দায়িত্ব হাতে নেয় নি। থেসেউসের আমলে এরা সকলে একটা জনগোষ্ঠী হিসেবে একাঙ্গীভূত হয়, এথেন্স হয় তাদের সরকারি কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু। এর ফলে তারা আগের থেকে উচ্চতর একটা সংগঠনের আওতায় আসে। একই ভূখণ্ডে একটা জাতি হিসেবে কিছু গোষ্ঠীর একাঙ্গীভবনের ব্যাপারটা মিত্রসংঘ গঠনের পরবর্তী যুগের ঘটনা। মিত্রসঙ্ঘের প্রতিটা গোষ্ঠী আলাদা আলাদা অঞ্চলেই বসবাস করত। মিত্রসঙ্ঘের থেকে একাঙ্গীভবন একটা উচ্চতর সাংগঠনিক প্রক্রিয়া। আগে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে মিশ্রণ ঘটত শুধুমাত্র বিবাহের সাহায্যে। এবার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মিশ্রণ ঘটল আঞ্চলিক সীমারেখার গণ্ডী তুলে দেওয়া এবং একই পরিষদ-গৃহ ও প্রাইট্যানিয়াম ব্যবহার করার সাহায্যে। থেসেউস যে কাজগুলো করেছিলেন বলে কথিত আছে, সেই কাজগুলো আসলে তাদের গোত্রভিত্তিক সমাজের উত্তরণকেই, অর্থাৎ নিম্নতর সাংগঠনিক রূপ থেকে এক উচ্চতর সাংগঠনিক রূপে উত্তরণকেই চিহ্নিত করে। এই উত্তরণ কোন এক সময় নিশ্চয়ই ঘটেছিল এবং সম্ভবত উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিই ছিল ঐ উত্তরণের পথরেখা।

কিন্তু আর-একটা কাজও থেসেউস করেছিলেন বলে জানা যায়। এই কাজটার একটা বৈপ্লবিক তাৎপর্য ছিল আর ছিল সরকারের কাঠামোর একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত উপলব্ধি। গোত্র নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে তিনি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন—'ইউপ্যাট্রিডে' বা 'সদ্বংশজাত', 'গিওমোরি' বা 'কৃষক', এবং 'ডেমিআর্জি' বা 'কারিগর'। পৌর প্রশাসন বা পৌরোহিত্য সংক্রান্ত যাবতীয় প্রধান প্রধান পদে প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকেই বসানো হত। এই শ্রেণীবিভাজনটা শুধুমাত্র সমাজ শাসনের কাজে সম্পত্তি ও অভিজাতসুলভ উপাদানের স্বীকৃতিই নয়, সেইসঙ্গেই এই বিভাজনটা ছিল গোত্রের শাসনকারী ক্ষমতার বিরুদ্ধে একটা সরাসরি আন্দোলন। এ কাজের উদ্দেশ্যটা একান্তই স্পষ্ট। উদ্দেশ্যটা হল—বিভিন্ন গোত্রের প্রধানদের, তাদের পরিবারগুলোকে এবং সম্পদশালী লোকেদেরকে একটা আলাদা শ্রেণী হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করা। এদের হাতেই থাকত প্রধান প্রধান পদগুলো আর এইসব পদাধিকারীদের ওপরেই ন্যস্ত থাকত সমাজশাসনের ক্ষমতা। বাকি লোকজনদের দুটো বড় বড় শ্রেণীতে বিভক্ত করাটাও ছিল গোত্রের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। প্রধান প্রধান পদগুলো গোত্রের হাতেই রেখে এবং গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর কাছ থেকে ভোট দেওয়ার ক্ষমতাটা সরিয়ে নিয়ে সেই ক্ষমতাটা শ্রেণীগুলোর হাতে তুলে দিলে একটা বিরাট কাজ হতে পারত। এ কাজটা করা হয় নি, অথচ শ্রেণীগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই পদক্ষেপটা নেওয়ার গুরুত্ব ছিল অসীম। তাছাড়াও, বিভিন্ন

BanglaBook.org

পদে কারা কারা থাকবে, সে ব্যাপারে আগেকার নিয়মকে এই নতুন ব্যবস্থা খুব-একটা পাল্টাতেও পারে নি। নতুন ব্যবস্থায় যাদেরকে ইউপ্যাট্রিডে বলা হত, আগের ব্যবস্থায় সম্ভবত তারাই ছিল বিভিন্ন গোত্রের নানান পদাধিকারী। থেসেউসের এই পরিকল্পনাটা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, কারণ প্রকৃতপক্ষে গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর হাত থেকে কোন ক্ষমতা শ্রেণীগুলোর কাছে হস্তান্তরিত করা হয় নি, এবং একটা ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে গোত্রের তুলনায় ঐ শ্রেণীগুলো ছিল অনেক নিম্নমানের।

থেসেউসের সেই অজানা আমল থেকে শুরু করে সোলোনের আইন প্রণয়নের (৫৯৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) সময় পর্যন্ত যুগটা এথেনিয় ইতিহাসের এক প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। কিন্তু সেই সময় কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা ঘটেছিল, তা আমাদের ঠিকঠাক জানা নেই। প্রথম অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার (৭৭৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) আগেই ব্যাসিলিয়ুস পদটা তুলে দেওয়া হয় এবং তার জায়গায় চালু করা হয় বিচারকের পদ। এই পদটা গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক ছিল। শোনা যায় যে গোত্রের মধ্যেকার কোন-একটা বিশেষ পরিবারই উত্তরাধিকারসূত্রে এই পদটা লাভ করত। প্রথম বারো জন বিচারককে বলা হত মেডন্টিডে। প্রথম বিচারক মেডনের নাম অনুসারেই এই নামটার উদ্ভব হয়েছিল। এই মেডন্ নাকি শেষ ব্যাসিলিয়ুস কোডাস-এর পুত্র ছিলেন। ব্যাসিলিয়ুসের পদ সম্বন্ধে আগে যে প্রশ্নটা তোলা হয়েছিল, সেই একই প্রশ্ন এই বিচারকদের ক্ষেত্রেও (যারা সারা জীবন ঐ পদের অধিকারী থাকত) প্রযোজ্য —পদটা পাওয়ার আগে তাকে একটা জনমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত কিংবা অনুমোদিত হতে হত। এই অনুমানটা সত্য হলে উত্তরাধিকারসূত্রে পদটা পাওয়ার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয় এটা। ৭১১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বিচারক পদের মেয়াদ ধার্য করা হয় দশ বছর। অবাধ নির্বাচনের সাহায্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে মনোনীত করা হত। ঐতিহাসিক যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার নীতিটা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। গোত্রের গঠন-কাঠামো ও নীতি অনুযায়ী এটা ঘটাই স্বাভাবিক ছিল। অবশ্য এটাও সত্য যে সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে ওঠার ফলে গোত্রের মধ্যে অভিজাততান্ত্রিক নীতিগুলোও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং এটাই ছিল সব জায়গার বংশগত অধিকারের মূল বনিয়াদ। এথেনিয়দের মধ্যে প্রচলিত পূর্বতন পদ্ধতির সঙ্গে ঐ শেষোক্ত বিচারকদের ক্ষেত্রে নির্বাচনমূলক নীতির প্রয়োগের তুলনা করে দেখলে বোঝা যায় যে এই নির্বাচনমূলক নীতির একটা গভীর তাৎপর্য ছিল। ৬৮৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে বিচারকদের প্রতি বছর নির্বাচিত করা শুরু হয়, তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে মোট নয়জন করা হয় এবং তাদের দায়িত্বকে শাসনতান্ত্রিক ও বিধানতান্ত্রিক দায়িত্বে পরিণত করা হয়।[১] বিচারক পদের স্থায়িত্বকাল সম্বন্ধে এথেনিয়দের জ্ঞানের

১। "৬৮৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে শুরু করে গণতন্ত্রের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বিচারকের সংখ্যা মোট নয়জনই ছিল। এদের মধ্যে যার নাম অনুসারে নির্দিষ্ট বছরের নামটা নির্ধারিত হত, তাকেই বলা হত "প্রধান বিচারক"; এরপর বিচারক ব্যাসিলিয়ুস (রাজা), সাধারণত তাকে ব্যাসিলিয়ুসই বলা হত; এবং পোলমার্ক। বাকি ছয়জনের সাধারণ নাম ছিল থেস্মোথিটা···। পারিবারিক,

ক্রমান্বয় অগ্রগতির ছাপই ফুটে উঠেছে এইসব ঘটনার মধ্যে। বিচারকই হবে গোত্রের প্রধান—এই ব্যাপারটা এথেনিয়রা তাদের সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিল। ধরেই নেওয়া যায় যে পদটা ছিল গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক এবং তার সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচনসাপেক্ষ। স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয় শুরু হওয়ার পর থেকে মৃত প্রধানের পুত্ররা পিতার বংশধারার অন্তর্ভুক্ত হত এবং কারুর কোন ব্যক্তিগত আপত্তি না থাকলে তাদের মধ্যে থেকেই কোন-একজনকে প্রধান পদে নিযুক্ত করা হত। কিন্তু এবার তারা ঐ পদটাকে নিজেদের সর্বোচ্চ বিচারক পদে রূপান্তরিত করল, গোত্র নির্বিশেষে পদটাকে নির্বাচনমূলক করা হল এবং পদের স্থায়িত্বকাল নির্ধারিত হল প্রথমে দশ বছর, অবশেষে এক বছর। এর আগে পর্যন্ত ঐ পদের অধিকারী তার সারা জীবনের জন্যই ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকত। বর্বর যুগের নিম্ন এবং এমনকি মধ্য পর্যায়েও নির্বাচনের সাহায্যে প্রধানকে মনোনীত করা হত এবং সে তার সারা জীবনের জন্যই পদটার অধিকারী হত। অবশ্য সে ভালো আচরণ না করলে তাকে বরখাস্ত করার অধিকার গোত্রের ছিল। যুক্তিসম্মতভাবেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে গ্রীক গোত্রগুলোর প্রধানদেরও অবাধ নির্বাচনের সাহায্যেই মনোনীত করা হত এবং তার স্থায়িত্বকালও হত এক বছর। এথেনিয় গোষ্ঠীগুলো তাদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পদটার একটা বাৎসরিক মেয়াদ চালু করেছিল এবং ঐ পদের জন্য বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হত। এই-ভাবে তারা নির্বাচনমূলক ও জনমতের প্রতিনিধিত্বকারী পদের একটা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব খাড়া করেছিল এবং সেটাকে তার প্রকৃত বনিয়াদের ওপর স্থাপন করতেও পেরেছিল।

এইসঙ্গেই লক্ষ করা যায় যে সোলোনের আমলে প্রাক্তন বিচারকদের নিয়ে অ্যারিও-পাগাস্ এর আদালত গড়ে তোলা হয়েছিল। এই আদালত অপরাধীদের বিচার করত, মানুষের নৈতিক চরিত্রের ওপর খবরদারি করত। সামরিক, নৌ-বাহিনী সংক্রান্ত এবং প্রশাসনিক ব্যাপার-স্যাপারের কাজ দেখাশোনার জন্য কয়েকটা নতুন পদও সৃষ্টি করা হয়েছিল ঐ সময়ে। তবে ঐ সময়ের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল 'নউক্র্যারি' গঠন। প্রতিটি গোষ্ঠীতে বারোটা করে নউক্র্যারি, অর্থাৎ মোট আটচল্লিশটা নউক্র্যারি গঠন করা হয়েছিল। নউক্র্যারি হচ্ছে কয়েকটা পরিবারকে নিয়ে গড়ে ওঠা এক-একটা ছোট ছোট সীমানা। সামরিক ও নৌ-বাহিনী সংক্রান্ত কাজের জন্য এদের কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা হত এবং সম্ভবত কিছু করও আদায় করা হত। নউক্র্যারিগুলো ছিল ডেমি বা শহরের ভ্রূণরূপ। অঞ্চলগত ভিত্তির ধারণাটা যখন পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন

গোত্রগত এবং ভ্রাতৃত্বগত যাবতীয় বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করত প্রধান বিচারক। অনাথ ও বিধবাদের আইনী রক্ষক ছিল এই প্রধান বিচারকই। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন ও নরহত্যা সংক্রান্ত অভিযোগের মীমাংসা করার দায়িত্ব থাকত বিচারক ব্যাসিলিয়ুসের (বা রাজা-বিচারকের) ওপর। পোলমার্ক (ক্লাইস্থেনিসের আমলের আগে) ছিল সেনাবাহিনীর নেতা এবং নাগরিক ও অ-নাগরিকদের মধ্যেকার বিবাদ মেটানোর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক।"—গ্রোটে, "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", প্রথম পরিচ্ছেদ, ৩, ৭৪।

এই নউক্র্যারিগুলোই শাসনব্যবস্থার দ্বিতীয় ধাঁচটার বনিয়াদে পরিণত হয়। কে এই নিউক্র্যারির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, জানা যায় না। বয়েখ্ বলেছেন, "সোলোনের আমলের আগেও এগুলোর অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল, কেননা তাঁর আইন প্রণয়নের আগেকার আমলেও নউক্র্যারির তত্ত্বাবধায়কদের কথা পাওয়া যায়। অ্যারিস্টটলের মতে—সোলোনই ছিলেন নউক্র্যারির প্রতিষ্ঠাতা। আমরা ধরে নিতে পারি যে সোলোনের রাজনৈতিক সংবিধানই আসলে নউক্র্যারিগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।"[১] বারোটা নউক্র্যারি নিয়ে গড়ে উঠত একটা বৃহত্তর আঞ্চলিক সীমানা, যার নাম ছিল ট্রিটি। এগুলো সবসময় পরস্পরের খুব কাছাকাছি না-ও থাকতে পারত। ট্রিটিগুলো ছিল একটা দেশ (অর্থাৎ কিছু শহরের সম্মিলিত রূপ) গড়ে ওঠার ভ্রূণস্বরূপ।

সরকারি কার্যকলাপের মাধ্যমগুলোর যতই পরিবর্তন হোক না কেন, মানুষ তখনও পর্যন্ত একটা গোত্রভিত্তিক সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের আওতাতেই জীবনযাপন করছিল। গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীগুলো তখনও পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী ছিল আর এগুলোই ছিল ক্ষমতার সর্বজনস্বীকৃত কেন্দ্রবিন্দু। সোলোনের আমলের আগে পর্যন্ত গোত্র ও গোষ্ঠীর সঙ্গে একটা সংযোগ না থাকলে কারুর পক্ষেই তাদের সমাজের সদস্য হওয়া সম্ভব ছিল না। বাকি সকলে ছিল সরকারের চৌহদ্দির বাইরের লোক। সরকারের সেই প্রাচীন ও মর্যাদাব্যঞ্জক উপাদান অর্থাৎ প্রধানদের পরিষদ তখনও টিকে ছিল। তবে এই যুগে এসে সরকারি ক্ষমতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রধানদের পরিষদ, গণ-পরিষদ, অ্যারিওপাগাসের আদালত ও আরও ছয়জন বিচারকের হাতে। প্রধানদের পরিষদ বিভিন্ন সার্বজনীন বিষয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে, গণ-পরিষদের কাছে সেটা পেশ করত। ফলে নীতি রচনার ব্যাপারে প্রধানদের পরিষদের একটা প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকতই। আর্থিক ব্যাপারগুলো এই পরিষদই দেখাশোনা করত এবং শুরু থেকে নিজের শেষ দিন পর্যন্ত এই পরিষদই ছিল সরকারের প্রাণকেন্দ্র। গণ-পরিষদও এই কালে বেশ বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়। তখনও পর্যন্ত এর কাজ ছিল শুধু প্রধানদের পরিষদের পেশ করা পরিকল্পনাকে গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও নানান সার্বজনীন বিষয়ে গণ-পরিষদ বেশ ভালোরকম প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। সরকারের একটা ক্ষমতা হয়ে উঠতে পেরেছিল গণ-পরিষদ, আর এই ঘটনাই এথেনিয়দের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার প্রভূত অগ্রগতির সুনিশ্চিত প্রমাণ দেয়। দুর্ভাগ্যবশত, ঐ প্রথম যুগে প্রধানদের পরিষদ ও গণ-পরিষদের কার্যকলাপ এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় না এবং এগুলোকে কখনও পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যাখ্যাও করা হয় নি।

৬২৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ড্র্যাকো কিছু আইন প্রণয়ন করেন এথেনিয়দের জন্য। অনাবশ্যকরকম কঠোর ছিল এই আইনগুলো। তবে এই আইন রচনার ব্যাপারটাই দেখিয়ে দেয় যে, গ্রীসের ইতিহাসে রীতি ও প্রথার বদলে লিখিত আইন প্রণয়নের দিন এসে

১। "পাবলিক ইকনমি অফ এথেন্স", ল্যাম্ব-এর অনুবাদ, লিট্‌ল অ্যান্ড ব্রাউন সংস্করণ, পৃঃ ৩৫৩।

গিয়েছিল। তখনও পর্যন্ত এথেনিয়রা আইন রচনার কলাকৌশল শিখে উঠতে পারে নি, তাই আইন প্রণয়নকারী সংস্থার কার্যকলাপ সম্বন্ধে আরও বেশি জ্ঞান সঞ্চয় করার দরকার ছিল তাদের। তারা তখন ঠিক সেই স্তরে এসে পৌঁছেছিল, যে স্তরে আইন-প্রণেতাদের আবির্ভাব ঘটে থাকে এবং কারুর-না-কারুর নাম অনুযায়ী এক-একটা আইন চালু হয়। এইভাবেই মানবপ্রগতির বিরাট বিরাট স্তরগুলো একের পর এক এগিয়ে আসে।

সোলোন যখন বিচারক নিযুক্ত হন (৫৯৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ), তখন সমাজে অনিষ্টকর বিষয়গুলো ভীষণভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সম্পত্তি তখন সমাজে বেশ জোরদার হয়ে জেঁকে বসেছে। সম্পত্তির জন্য খেয়োখেয়ির ফলস্বরূপ ঘটে চলেছে নানান বিচিত্র ঘটনা। এথেনিয়দের একটা অংশ ঋণের দরুণ দাসে পরিণত হয়েছে। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে ঋণগ্রহীতার পরিবারের লোকেরা ঋণদাতার ক্রীতদাসে পরিণত হত। অনেকে আবার নিজেদের জমি বন্ধক রাখত এবং পরে তা আর ছাড়াতে পারত না। এইসব নানান ঘটনা সমাজকে ক্রমশ গ্রাস করে ফেলছিল। সোলোনের কয়েকটা বিধান বেশ অভিনব ছিল, কয়েকটা মূল আর্থিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ছিল এগুলোর মধ্যে। এই আইন প্রণয়নের পাশাপাশি, থেসেউসের অনুকরণে সমাজকে নানান শ্রেণীতে বিভক্ত করেন সোলোন। তবে এই বিভাজন থেসেউসের পদ্ধতি অনুযায়ী করা হয়নি, করা হয়েছিল কার কত সম্পত্তি আছে তারই ভিত্তিতে। গোত্রকে সরিয়ে নতুন এক ব্যবস্থা চালু করার জন্য এইসব প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়া দরকার ছিল। রোমান গোষ্ঠীগুলোর বিষয়ে আলোচনা করার সময় আমরা দেখব যে সার্ভিয়াস টিউলিয়াস-এর আমলে তারাও একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই একই পথ অনুসরণ করেছিল। সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী জনসাধারণকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন সোলোন। থেসেউসের পদক্ষেপের থেকে আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে তিনি এই শ্রেণীগুলোর হাতে কিছু কিছু ক্ষমতা তুলে দেন এবং কিছু বাধ্যবাধকতাও চাপিয়ে দেন তাদের ওপর। গোত্র, ভ্রাতৃত্ব আর গোষ্ঠীর পৌর ক্ষমতার কিছুটা অংশ অর্পিত হয় সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলোর ওপর। এইভাবে গোত্রের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে শ্রেণীর হাতে তা তুলে দেওয়ার ফলে গোত্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার পতন শুরু হয়। কিন্তু গোত্রও গঠিত হত বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়ে আর শ্রেণীগুলোও গড়ে উঠত বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়ে। ফলে এই স্তরে এসেও ব্যক্তি এবং পুরোপুরি ব্যক্তিগত সম্পর্কই সরকারের ভিত্তি হিসেবে রয়ে গেল। মূল বিষয়টার কোন পরিবর্তন হল না। প্রধানদের পরিষদের বদলে গড়ে তোলা হয়েছিল চারশ সদস্য-বিশিষ্ট ব্যবস্থাপক-সভা। এটা করতে গিয়েও ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের নেওয়া হয়েছিল চারটি গোষ্ঠী থেকে সমান সমান সংখ্যায়—শ্রেণীগুলো থেকে নয়। তবে লক্ষ করা দরকার যে শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে সম্পত্তির ধারণা সোলোনের ঐ নতুন পদক্ষেপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। রাজনৈতিক সমাজের ধারণায় পৌঁছতে (যার ভিত্তি হল সম্পত্তি এবং ভূখণ্ড) এবং মানুষের আঞ্চলিক সম্পর্কের সাহায্যে তাদেরকে পরিচালিত করার ব্যাপারে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ

BanglaBook.org

হয়। উচ্চ পদগুলো শুধু প্রথম শ্রেণীভুক্ত লোকেরাই পেতে পারত। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা ছিল অশ্বারোহী সৈনিক। তৃতীয় শ্রেণীতে থাকত পদাতিক সৈন্যরা। আর চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা ছিল হালকা-অস্ত্রধারী সৈনিক। এই শেষোক্ত শ্রেণীতেই সবথেকে বেশি সংখ্যক লোক ছিল। এরা কোন পদের অধিকারী হতে পারত না এবং কোনরকম খাজনাও দিত না। তবে এরা গণ-পরিষদের সদস্য হতে পারত, সমস্ত ম্যাজিস্ট্রেট ও আধিকারিকদের নির্বাচনে ভোট দিতে পারত এবং তাদের কাজের জন্য কৈফিয়ৎও চাইতে পারত। ব্যবস্থাপক-সভা যে-সব সার্বজনীন বিষয় তাদের হাতে তুলে দিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, সেগুলোকে গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতাও থাকত তাদের। সোলোনের সংবিধান অনুসারে এদের হাতে কিছু প্রকৃত ও শক্তপোক্ত ক্ষমতা ছিল এবং সার্বজনীন বিষয়গুলোর ওপর একটা স্থায়ী প্রভাবও ছিল এদের। নাগরিকত্ব পাওয়ার দরুণ এবং ঐ গণ-পরিষদের সদস্য হওয়ার ফলে প্রতিটি স্বাধীন মানুষই—কোন গোত্র ও গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও—কিছুটা দূর পর্যন্ত সরকারের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারত। সোলোনের আইনের এটা ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল।

আরও লক্ষ করা দরকার যে জনসাধারণ একটা সৈন্যবাহিনী হিসেবে সংগঠিত হয়েছিল যার তিনটি বিভাগ—অশ্বারোহী বিভাগ, ভারী-অস্ত্রধারী পদাতিক বিভাগ আর হালকা-অস্ত্রধারী পদাতিক বিভাগ। প্রতিটা বিভাগেরই নিজস্ব নানান সারির নেতা থাকত। অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীতে শুধু শেষ তিনটি শ্রেণীর লোকেরাই থাকত। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা মোটেই দেশপ্রেমিক ছিল না, সরকারের প্রধান প্রধান পদগুলো তারা দখল করত অথচ সামরিক কাজকর্মে কোনরকম অংশগ্রহণ করত না। এই অবস্থাটা পাল্টানো একান্তই দরকার ছিল। পাঁচটি শ্রেণীবিশিষ্ট এই একই ধাঁচের একটা কাঠামো আমরা সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলের রোমানদের মধ্যেও দেখতে পাব। তবে সেখানে ঐ পাঁচটা শ্রেণীর লোকদের নিয়েই সেন্যবাহিনী (exercitus) গড়ে উঠত, সৈন্যবাহিনীর প্রতিটা বিভাগের নিজস্ব নেতা ও সাজ-সরঞ্জাম থাকত। সোলোন এবং সার্ভিয়াসের সংবিধানে একটা সামরিক গণতন্ত্রের ধারণাই নতুন সাজে দেখা দিয়েছিল। দু'জায়গাতেই পূর্বতন যুগে যে সামরিক গণতন্ত্র চালু ছিল, তার সঙ্গে এই নতুন সাজের সামরিক গণতন্ত্রটার তত্ত্বগত কোন পার্থক্য ছিল না, পার্থক্য ছিল সংগঠনের ক্ষেত্রে।

সম্পত্তির বিষয়টা নতুন ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল। এর পাশাপাশি পূর্বোল্লিখিত নউক্র্যারিগুলোর মারফৎ ভূখণ্ডের বিষয়টাও আংশিকভাবে নতুন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই নউক্র্যারিগুলোয় সম্ভবত নাগরিকদের নাম ও তাদের সম্পত্তির পরিমাণ তালিকাভুক্ত করা হত। এই তালিকা অনুযায়ীই সামরিক কাজের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করা হত ও খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা হত। ব্যবস্থাপক-সভা, গণ-পরিষদ (তখন যার নাম হয়েছিল এক্লেসিয়া), নয়জন বিচারক এবং অ্যারিও-পাগাসের আদালত—এইগুলো, আর ঐ ব্যবস্থা মিলে এথেনিয়দের সরকার বরাবরের

BanglaBook.org

থেকে অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছিল। এই জটিল সরকার পরিচালনার জন্য অবশ্যই যথেষ্ট উন্নত বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন ছিল। তাদের পূর্ববর্তী ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠানের মত এই সরকারও ছিল গণতান্ত্রিক ধাঁচের। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল ঐ-সব ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠানেরই একটা যৌক্তিক পরিণতি, এবং শুধু এভাবেই ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করা যায়। তবে তিনটি ঘাটতির জন্য এটা একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারে নি। প্রথমত, এই ব্যাপারটা ভূখণ্ডের ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল না। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের সমস্ত উচ্চপদগুলো সকল নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। এবং তৃতীয়ত, বুনিয়াদি সংগঠনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নীতিকে প্রয়োগ করা হত না, তবে নউক্র্যারিগুলোর মধ্যে হয়ত এর একটা প্রাথমিক রূপ চালু ছিল। গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠী তখনও ভালভাবেই টিকে থাকলেও তাদের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল। এই অবস্থাটা আসলে একটা রূপান্তরকালীন অবস্থা। রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে এই অবস্থাটা একটা বৃহৎ পদক্ষেপ। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থার তত্ত্ব গড়ে তোলার জন্য আরও অনেক অভিজ্ঞতার দরকার ছিল। মানবসমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো এইভাবে ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়পদে অগ্রসর হয়েছে নিম্নতর রূপ থেকে উচ্চতর রূপে। মানবমস্তিষ্ক সারাক্ষণ কাজ করে গেছে যুক্তির পথ ধরে—এই পথটা সর্বত্রই সমান ও পূর্বনির্ধারিত।

গোত্রের উচ্ছেদ এবং তার বদলে এক নতুন ধাঁচের সরকার প্রতিষ্ঠা করার পিছনে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ কাজ করেছিল। থেসেউস সম্ভবত এই কারণটা স্বীকার করেছিলেন, সোলোন তো করেইছিলেন। সোলোনের আমলের আগে এবং মহাকাব্যীয় যুগে গ্রীক গোষ্ঠীগুলো একটা অস্থির অবস্থার মধ্যে ছিল, লোকেদের নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে থাকতে হত। অনেকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল। ফলে নিজেদের গোত্রের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্ক ছিল না, আবার অন্য কোন গোত্রের সঙ্গেও কোনরকম সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। প্রতিটা গোষ্ঠীতে এইরকম কোন গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন লোকজন ও তাদের বংশধরদের সংখ্যা বেশ ভালমতন বেড়ে না ওঠা পর্যন্ত ব্যক্তিগত অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা, বাণিজ্য ও যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনে এই ঘটনা বারবারই ঘটেছে। এইসব লোকেরা সরকারের চৌহদ্দীর বাইরেই থাকত, কারণ গোত্র ও গোষ্ঠীর মাধ্যম ছাড়া সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কোন উপায় ছিল না। মিঃ গ্রোটে এই বিষয়টার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সম্ভবত কখনোই দেশের সমস্ত লোক ভ্রাতৃত্ব ও গোত্রগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ক্লাইস্থেনিসের আমলের আগে এবং তার পরেও এই গোত্রহীন লোকেদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছিল।"[১] লাইকারগাসের আমলে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলো এবং এর পূর্ব উপকূলের আয়োনিও শহরগুলো থেকে প্রচুর লোক গ্রীসে চলে এসেছিল। ফলে গোত্রহীন লোকের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল প্রচুর। আবার এদের মধ্যে যারা নিজেদের

১। "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", ৩.৬৫।

পরিবার সমেত চলে এসেছিল, তারা আসলে একটা নতুন গোত্রের বীজ বহন করে এনেছিল নিজেদের সঙ্গে। কিন্তু এই নতুন গোত্রকে কোন গোষ্ঠীর মধ্যে গ্রহণ না করা হলে তারা বরাবর বহিরাগত হিসেবেই রয়ে যেত। সম্ভবত কিছু কিছু নতুন গোত্রকে কোন কোন জায়গায় গোষ্ঠীর মধ্যে নেওয়া হয়েছিল। আর সম্ভবত সেই কারণেই গ্রীসে গোত্রের সংখ্যা এত বেশি। গোত্র ও ভ্রাতৃত্বগুলো ছিল এক-একটা ঘনবদ্ধ সংগঠন। ঐ-সব বহিরাগতকে কোন গোত্রের মধ্যে গ্রহণ করলে সেই গোত্র ও ভ্রাতৃত্ব, দুটোর মধ্যেই ভেজাল মেশার সম্ভাবনা থাকত। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবশ্য কোন-না-কোন গোত্রের মধ্যে গ্রহণ করা হত কিংবা তাদের গোত্রগুলোকে কোন-একটা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হত। কিন্তু দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা এ-রকম কোন সুবিধাই পেত না। নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে থেসেউসের সময়ে এবং বিশেষত সোলোনের আমলে এই গোত্রহীন লোকেদের সংখ্যা (দাসদের কথা বাদ দিয়েই বলছি) খুবই বেড়ে গিয়েছিল। কোন গোত্র বা ভ্রাতৃত্বের মধ্যে না থাকার ফলে, কোন প্রত্যক্ষ ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধাও পেত না তারা, ঐ সুযোগ-সুবিধা ছিল গোত্র আর ভ্রাতৃত্বের সদস্যদের একটা সহজাত, নিজস্ব ব্যাপার। এই গোত্রহীন লোকেদের মধ্যে একটা অসন্তোষ ক্রমেই ধূমায়িত হচ্ছিল যা সমাজের নিরাপত্তার পক্ষে ছিল যথেষ্টই বিপজ্জনক ছিল।

থেসেউস ও সোলোনের আইনে শ্রেণীগুলোর মাধ্যমে এদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যদিও গোত্র আর ভ্রাতৃত্ব তখনও টিকেই ছিল, কিন্তু তার মধ্যে এদেরকে নেওয়া হত না। ফলে ঐ ব্যবস্থাটা কোন পূর্ণাঙ্গ চেহারা নিতে পারে নি। মিঃ গ্রোটে বলেছেন, "সোলোনের আমলের পরবর্তীকালে প্রাচীন গোত্র ও ভ্রাতৃত্বগুলোর রাজনৈতিক অবস্থানটা ঠিক কী ছিল, তা বলা মুশকিল। চারটি গোষ্ঠীই গড়ে উঠেছিল গোত্র ও ভ্রাতৃত্বকে কেন্দ্র করে এবং কোন গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের সদস্য না হয়ে কারুর পক্ষে গোষ্ঠীর সদস্য হওয়া সম্ভব ছিল না। ব্যবস্থাপক-সভায় থাকত ৪০০ জন সদস্য—প্রতি গোষ্ঠী থেকে ১০০ জন করে। অর্থাৎ, কোন গোত্র বা ভ্রাতৃত্বের সদস্য নয় এমন লোকেরা ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য হতে পারত না। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী অ্যারিওপাগাসের ব্যবস্থাপক-সভার নয়জন বিচারক সম্বন্ধেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল। তাহলে বাকি থাকল শুধু গণ-পরিষদ। এইসব গোষ্ঠীর কোনটার সদস্য না হয়েও যে-কোন এথেনিয় ব্যক্তি এই পরিষদের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারত। কোন গোষ্ঠীর সদস্য না হলেও সে নাগরিক হিসেবেই গণ্য হত, কারণ বিচারক ও ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে সে ভোট দিতে পারত, তাদের বার্ষিক জবাবদিহিতে অংশগ্রহণ করতে পারত এবং তার প্রতি কোন অন্যায় করা হলে বিচারকদের কাছে প্রতিবিধানও দাবি করতে পারত। কোন বহিরাগত লোকের ক্ষেত্রে কিন্তু এ-সব কাজ করার জন্য একজন নাগরিককে মধ্যস্থ হিসেবে দাঁড় করানোর দরকার হত। সবটা মেলালে বোঝা যায় যে চারটি গোষ্ঠীর কোনটিরই সদস্য ছিল না যারা, রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে তারা সকলে সোলোনীয় লোকগণনার সেই চতুর্থ ও দরিদ্রতম শ্রেণীটির মতই হীন অবস্থায় ছিল। এ ব্যাপারে তাদের মর্যাদা

BanglaBook.org

ইত্যাদির কোন আলাদা মূল্য ছিল না। আগেই বলা হয়েছে যে সোলোনের আমলের আগেও কোন গোত্র বা ভ্রাতৃত্বহীন এথেনিয়দের সংখ্যাটা নেহাৎ কম ছিল না। এদের সংখ্যা দিন দিন আরও বেড়েই চলেছিল, কারণ গোত্র ও ভ্রাতৃত্বগুলো ছিল ঘনবদ্ধ সংগঠন, বাইরের কাউকে তারা গ্রহণ করত না। অথচ নতুন এই আইনপ্রণেতাটির নীতি ছিল গ্রীসের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পরিশ্রমী মানুষদের এথেন্সে টেনে আনা।"[১] এই একই কারণে রোমান প্লিবিয়ান, অর্থাৎ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত এক শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। এরা কোন গোত্রেরই সদস্য ছিল না, ফলে 'পপুলাস রোমানাস'-এর কাজকর্মে এরা কোনরকম অংশগ্রহণ করতেও পারত না। সমাজের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে গোত্রীয় সংগঠন কেন ব্যর্থ হয়েছিল, তার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায় উপরোল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে। সোলোনের আমলেই গোত্রীয় সংগঠনের শাসনক্ষমতার সীমা পেরিয়ে সমাজ এগিয়ে গিয়েছিল। যে অবস্থার মধ্যে থেকে জন্ম নিয়েছিল গোত্র, তাকে ছাপিয়ে সমাজ তখন বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল। মানুষের অগ্রগতির সেই স্তরে একটা রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি হিসেবে গোত্রগুলো মোটেই যথোপযুক্ত ছিল না।

গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর সদস্যদের একটা এলাকায় একত্রিত রাখাটাও ক্রমে ক্রমে দুরূহ হয়ে উঠছিল। সরকারি সাংগঠনিক ক্রমের অঙ্গ হিসেবে এই একই জায়গায় বসবাস করাটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন যুগে গোত্রগুলোর সার্বজনীন জমি থাকত, ভ্রাতৃত্বগুলোরও ধর্মীয় কার্যকলাপের জন্য কিছু সার্বজনীন জমি থাকত, সম্ভবত গোষ্ঠীগুলোরও অন্য কিছু সার্বজনীন জমির ব্যবস্থা ছিল। কোন অঞ্চলে বা শহরে স্থিতু হয়ে বসার পর তারা নিজেদের বসবাসের জায়গা ঠিক করে নিত গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠী অনুসারে। তাদের সামাজিক কাঠামোর দরুণই এমনটা ঘটত। প্রতিটা গোত্র ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। না, তার সব সদস্যরা অবশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না, কারণ প্রতিটা পরিবারেই দুটো গোত্রের লোক থাকত। একই ভ্রাতৃত্বের বিভিন্ন গোত্রগুলো স্বাভাবিক-ভাবেই পরস্পরের পাশাপাশি বা অন্ততপক্ষে কাছাকাছি অঞ্চলে থাকতে চাইত, আবার একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভ্রাতৃত্বগুলোও চাইত পরস্পরের কাছাকাছি থাকতে। কিন্তু সোলোনের আমলে লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে জমি ও বাড়ির মালিক হয়ে ওঠে। জমি হস্তান্তর করার অধিকারও ছিল তাদের, কিন্তু নিজের গোত্রের বাইরেকার কোন লোকের কাছে বাড়ি হস্তান্তর করা যেত না। ফলে জমির মালিকানা প্রায়শই বদল হত এবং গোত্রের সদস্যরা অন্য এলাকায় নতুন নতুন সম্পত্তির মালিক হত। ফলস্বরূপ কোন গোত্রের সদস্যদের একটা এলাকায় একত্রিত রাখাটা ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠছিল। তাদের সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক এককটা হয়ে উঠছিল অস্থায়ী চরিত্রের। এই প্রবণতাকে ঠেকানো সম্ভব ছিল না, আর এটা তাদের পুরনো ধাঁচের শাসন-ব্যবস্থার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। শহরগুলোতে সৃষ্টি হল স্থাবর সম্পত্তি এবং লোকেরা সেখানে

১। "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", ৩,১৩৩।

স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করল। অর্থাৎ গোত্রের মধ্যে যে স্থায়িত্বের অভাব, সেই স্থায়িত্বের উপাদান নিয়েই সামনে এসে দাঁড়াল শহরগুলো। একেবারে সাদামাটা কাঠামোর বেড়া ডিঙিয়ে সমাজ তখন অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। গোত্রীয় সংগঠন যে সমাজকে পরিচালিত করত, এ সমাজ তার থেকে অনেক আলাদা। সোলোনের আমল থেকে এথেনিয় গোষ্ঠীগুলো অ্যাটিকাতেই বসবাস করছিল। তারা যদি কখনোই কোথাও স্থিতু হয়ে না বসত এবং অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যেত, একমাত্র তাহলেই গোত্রীয় সংগঠন টিকে পারত। প্রাচীরবেষ্টিত শহরে বসবাস শুরু করার পর তাদের সম্পদ ও জনসংখ্যা প্রচুর বেড়ে যায়। গোত্র মুখোমুখি হয় এক অগ্নিপরীক্ষার এবং সে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়—সভ্যতার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলা কোন জনগোষ্ঠীকে পরিচালিত করার ক্ষমতা তার নেই। তা সত্ত্বেও গোত্রকে স্থানচ্যুত করতে আরো বহু সময় লেগেছিল।

রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি করতে হলে যে-সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়, সেগুলোর গুরুত্ব খুব সুষ্ঠুভাবে বোঝা যায় এথেনিয়দের অভিজ্ঞতার দিকে তাকালে। সোলোনের আমলেই এথেন্সে কারুশিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল, সমুদ্রপথে বাণিজ্য একটা জাতীয় ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল, কৃষি ও নির্মাণশিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল এবং শুরু হয়েছিল কাব্য রচনা। বস্তুত দুশো বছর ধরেই তারা একটা সভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু তাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তখনও গোত্র-ভিত্তিকই রয়ে গিয়েছিল। বর্বর যুগের সমগ্র অন্তিম পর্যায়টায় প্রতিষ্ঠানগুলোর যে রূপটা সবথেকে উল্লেখযোগ্য ছিল, সেই রূপটাই তাদের মধ্যে তখন টিকে ছিল। সোলোনের নতুন ব্যবস্থা এথেনিয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে একটা বিপুল গতিবেগ সঞ্চারিত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এথেনিয়দের চিন্তা-ভাবনায় রাষ্ট্রের ধারণা পরিপূর্ণভাবে মূর্ত হয়ে উঠতে প্রায় একশ বছর লেগে গিয়েছিল, দেখা দিয়েছিল নানান গোলযোগ। নউক্র্যারিগুলোর মধ্যে থেকেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রাথমিক একক হিসেবে শহরকে গ্রহণ করার ধারণা চূড়ান্ত রূপ নেয়। কিন্তু এই ধারণাকে পরিপূর্ণ রূপে উপলব্ধি করার জন্য এবং তাকে একটা সাংগঠনিক চেহারা দেওয়ার জন্য দরকার ছিল চরম প্রতিভাশালী, প্রচণ্ড ব্যক্তিগত প্রভাবসম্পন্ন একজন মানুষের। সেই ভূমিকা পালন করেন যে মানুষটি, তাঁর নাম ক্লাইস্থেনিস (৫০৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)। এই ক্লাইস্থেনিসই এথেন্সের প্রথম প্রকৃত আইনপ্রণেতা, শাসন-ব্যবস্থার এই দ্বিতীয় বৃহৎ ধাঁচটার জনক। আজকের সভ্য জাতিগুলো এই ধরণের শাসনব্যবস্থার অধীনেই সংগঠিত হয়েছে।

বিষয়টার একেবারে গভীরে যেতে পেরেছিলেন ক্লাইস্থেনিস। এথেনিয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাকে তিনি এমন এক ভিত্তির ওপরে স্থাপিত করেন, যে ভিত্তির ওপরেই এই ব্যবস্থাটা তাদের মৈত্রীবদ্ধ রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বাধীন অস্তিত্বের শেষ দিন পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল। গোটা শহরের নির্দিষ্ট সীমারেখা ও আলাদা আলাদা নাম থাকত। প্রতিটি নাগরিককে তার শহরের খাতায় নিজের নাম ও সম্পত্তির পরিমাণ নথিভুক্ত করাতে হত। এই নথিভুক্তি-

BanglaBook.org

করণটাই ছিল তার পৌর সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার প্রমাণপত্র এবং ভিত্তি। শহর সৃষ্টি হওয়ার ফলে নউক্র্যারিগুলো ভেঙে গিয়েছিল। শহরের বাসিন্দারা স্থানীয় স্ব-শাসনের ক্ষমতাসম্পন্ন এক-একটা সংগঠিত রাজনৈতিক সংঘে পরিণত হয়েছিল। কাঠামোটা ছিল ঠিক আজকের দিনের আমেরিকার শহরগুলোর মত। এই ব্যাপারটাই হচ্ছে ঐ ব্যবস্থার প্রধান ও সবথেকে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অঞ্চলভিত্তিক সাংগঠনিক ক্রমের প্রথম স্তরে শাসনক্ষমতা অর্পিত হয় জনসাধারণের হাতে। শহরের বাসিন্দারা একজন 'ডিমার্ক'-কে নির্বাচিত করত। সার্বজনীন তালিকাভুক্তির দায়িত্ব থাকত এই ডিমার্কের ওপর। ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকদের নির্বাচিত করা, নাগরিকদের নামের তালিকা সংশোধন করা এবং বিগত বছরে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠেছে তাদের নাম নথিভুক্ত করা—এইসব কাজের জন্য বাসিন্দাদের আহ্বান করার ক্ষমতাও ডিমার্কের থাকত। তারা একজন কোষাধ্যক্ষকে নির্বাচিত করত, খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ আর তা আদায় করার ব্যবস্থা করত এবং রাষ্ট্রীয় কাজে শহর থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থাও করত। ত্রিশজন ডিকাস্ট বা বিচারককেও নির্বাচিত করা হত। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের থেকে কম পরিমাণ জমি-জায়গা ইত্যাদি নিয়ে শহরের মধ্যে যে-সব বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দিত, সেগুলোর বিচার করার ভার থাকত এদের ওপর। স্থানীয় স্ব-শাসনের এইসব ক্ষমতাই হচ্ছে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মর্মবস্তু। এইসব ক্ষমতার পাশাপাশি প্রতিটা শহরের নিজস্ব কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থাকত। শহরের বাসিন্দারা তাদের নিজেদের পুরোহিতকেও নির্বাচিত করত। ছোটখাটো কিছু ব্যাপারকে বাদ দিলে দেখা যায় যে শহরগুলো যখন প্রথম গড়ে ওঠে, তখন স্থানীয় স্ব-শাসনের সবরকম ক্ষমতাই ছিল তাদের হাতে। এমনকি আমেরিকার শহরগুলোর থেকেও বেশি ক্ষমতার অধিকারী ছিল ঐ শহরগুলো। ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও ছিল একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। উপযুক্ত পাত্রেই, অর্থাৎ জনসাধারণের হাতেই ধর্মাচরণের ভারটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তালিকা-ভুক্ত সমস্ত নাগরিকই ছিল স্বাধীন, প্রত্যেকেই সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। শুধু উচ্চতর পদগুলোর ক্ষেত্রে সকলে সমান সুযোগ পেত না। এথেন্সের রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থায় সংগঠনের নতুন এককটার চেহারা এ-রকমই ছিল। এটাকে অনায়াসেই একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের মডেল হিসেবে, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের এক বিস্ময়কর নজির হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। যারা কোন স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই একটা গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে তুলেই সেটা শুরু করতে হয়। এথেনিয়রাও ঠিক তাই-ই করেছিল এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল জনসাধারণের হাতে।

অঞ্চলগত সাংগঠনিক ক্রমের দ্বিতীয় স্তরটা গড়ে উঠত বৃহত্তর ভৌগোলিক অঞ্চলে ঐক্যবদ্ধ দশটা শহরকে নিয়ে। পুরনো গোত্রীয় ব্যবস্থার একটু ছোঁয়া বজায় রাখার জন্য এগুলোকে বলা হত স্থানীয় গোষ্ঠী।[১] অ্যাটিকার এক-একজন বীরের নামে এগুলোর

১। লাতিন শব্দ "ট্রাইবাস" এর অর্থ হল গোষ্ঠী। ট্রাইবাস শব্দটার মূল অর্থ ছিল "তৃতীয় অংশ"। তিনটি গোষ্ঠী নিয়ে গড়ে ওঠা কোন জনগোষ্ঠীর তৃতীয় অংশটাকে বোঝানোর জন্যই এ শব্দটা

BanglaBook.org

নামকরণ করা হত। এগুলো ছিল আজকের দিনের দেশের সমতুল। প্রতিটা বিভাগের শহরগুলো স্বাভাবিকভাবেই পরস্পর-সংলগ্ন হত। এই ব্যাপারটা আজকের দিনের দেশের সঙ্গে ঐ বিভাগগুলোর সাদৃশ্যকে আরও প্রকট করে তোলে। তবে কোথাও কোথাও এই দশটা শহরের মধ্যে দু'একটা অন্যগুলোর থেকে একটু বিচ্ছিন্নভাবেও থাকত। নিকট আত্মীয়দের বিভাগের সঙ্গে নিজেদের শহরটাকে যুক্ত করে দেওয়ার অভিপ্রায়ে আদি রক্তসম্পর্কযুক্ত গোষ্ঠীটির কোন কোন অংশ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেত, আর সম্ভবত তার ফলস্বরূপই ঐ বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব ঘটেছিল। প্রতিটা বিভাগ বা দেশের অধিবাসীরা এক-একটা রাষ্ট্রের চেহারা নিয়েছিল, স্থানীয় স্বশাসনের কিছু ক্ষমতাও থাকত তাদের হাতে। তারা একজন ফাইলার্ককে (phylarch) নির্বাচিত করত। এই ফাইলার্ক তাদের অশ্বারোহী বাহিনীকে পরিচালনা করত। নির্বাচিত করা হত একজন ট্যাক্সিআর্ককে (taxiarch), যে পরিচালনা করত পদাতিক বাহিনীকে। এছাড়া একজন সেনাপতিকেও নির্বাচিত করা হত, যে ঐ দুটো বাহিনীরই নেতৃত্ব দিত। তাছাড়া, প্রতিটা বিভাগকে পাঁচখানা করে রণতরীর ব্যবস্থা করতে হত। ধরে নেওয়া যায় পাঁচখানা রণতরীর পাঁচজন নেতাও থাকত। ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে পাঁচশ জন করেছিলেন ক্লাইস্থেনিস। প্রতিটা বিভাগ থেকে পঞ্চাশ জন করে সদস্য স্থান পেত ব্যবস্থাপক-সভায়। বিভাগের বাসিন্দারাই ঐ সদস্যদের নির্বাচিত করত। এই বিভাগগুলোর আরও কিছু কাজ নিশ্চয়ই ছিল, তবে সেগুলো সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না।

আঞ্চলিক ক্রমের তৃতীয় ও সর্বশেষ স্তরটি হচ্ছে এথেনিয় কমনওয়েলথ বা রাষ্ট্র। দশটা স্থানীয় গোষ্ঠী বা বিভাগ নিয়ে এই রাষ্ট্র গড়ে উঠছিল। এটা ছিল একটা সংগঠিত রাজনৈতিক সংঘ, এথেন্সের সমস্ত মানুষই যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। গোটা রাষ্ট্রটাকে পরিচালনা করত একটা ব্যবস্থাপক-সভা, একটা লোকসভা, অ্যারিওপাগাসের আদালত, আর্কনরা, বিচারকরা এবং নির্বাচিত সামরিক ও নৌ-বাহিনীর নেতৃবৃন্দ।

এইভাবে এথেনিয়রা দ্বিতীয় ধরণের সরকারটা গড়ে তুলছিল ভূখণ্ড ও সম্পত্তির ভিত্তিতে। বেশ কিছু মানুষের একটা সাংগঠনিক ক্রমের বদলে তারা স্থাপন করছিল একটা অঞ্চলগত ক্রম। এই সরকারি ধাঁচটা দাঁড়িয়েছিল স্থায়ী ভূখণ্ড এবং একই অঞ্চলে কমবেশি কেন্দ্রীভূত সম্পত্তির ওপরে। এর নাগরিকরা বসবাস করত শহরগুলোতে। এই নাগরিকদের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ থাকত তাদের আঞ্চলিক সম্পর্ক মারফৎ। রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার জন্য শহরের নাগরিক হওয়াটা ছিল অত্যাবশক। নাগরিকরা তাদের নিজেদের শহরে ভোট দিত খাজনা দিত এবং সামরিক কাজের জন্যও তাদেরকে ডাকা হত। স্থানীয় গোষ্ঠীর বৃহত্তর বিভাগের পক্ষ থেকে, ব্যবস্থাপক-সভার নির্বাচনের

ব্যবহার করা হত। কিন্তু কালক্রমে এথেনিয় স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোর মত লাতিন গোষ্ঠীগুলোও রক্তসম্পর্কের বদলে স্থানীয় বন্ধনেই আবদ্ধ হয়। তখন ঐ ট্রাইবাস শব্দটার সংখ্যাগত অর্থটা মুছে যায় এবং ক্লাইস্থেনিস-এর আমলের ফাইলন-এর মতই একটা স্থানীয় আখ্যায় পরিণত হয়।—মমসেন-এর "হিস্ট্রি অফ রোম", ১, পরিচ্ছেদ ১,৭১।

BanglaBook.org

জন্য এবং সৈন্যবাহিনীর কাজের জন্যও তাদেরকে ডাকা হত। কোন গোত্র বা ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কের মারফৎ তার নাগরিক কর্তব্য আর পরিচালিত হত না। এই ব্যবস্থা দুটোর মধ্যে বৈপরীত্যও ছিল খুব বেশি। এক-একটা রাজনৈতিক সংঘের মধ্যে জনসাধারণের একাঙ্গীভবনের প্রক্রিয়াটা এই স্তরে এসে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছিল। আজকের দিনের সভ্য রাষ্ট্রগুলোর সরকারের মধ্যেও এই অঞ্চলগত ক্রমটা লক্ষ করা যায়। যেমন আমাদের দেশে রয়েছে শহর, প্রদেশ, রাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্র। এই প্রত্যেকটা বিভাগের অধিবাসীরা এক-একটা সংগঠিত রাজনৈতিক সংঘ এবং এদের প্রত্যেকেরই স্থানীয় স্বশাসনের অধিকার রয়েছে। প্রতিটা সংগঠন পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল। একটা নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে কাজ করে প্রতিটি সংগঠন এবং সেই পরিধিতে সে-ই সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। এইরকম একটা ক্রম ফ্রান্সেও চালু আছে—প্রদেশ, মহকুমা, বিভাগ, এবং সাম্রাজ্য, বর্তমানে যাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়। গ্রেট ব্রিটেনে ক্রমটা হল—বিভাগ, জেলা, রাজ্য এবং তিনটি রাজ্য। স্যাক্সন আমলের হাণ্ড্রেড বা উপ-বিভাগগুলো ছিল শহরের সমতুল।[১] তবে তখন শুধু নিজস্ব আদালতটা ছাড়া এই উপ-বিভাগগুলোর স্বশাসনের অন্য সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এই বিভিন্ন অঞ্চলগুলোর বাসিন্দারা এক-একটা রাজনৈতিক সংঘ হিসেবেই সংগঠিত হয়েছিল। তবে সর্বোচ্চ স্তরের নীচের ধাপের সংগঠনগুলোর ক্ষমতা ছিল নিতান্তই সীমিত। রাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অধীনে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতাটা সমস্ত নিম্নতর সংগঠনগুলোকে একেবারে ক্ষইয়ে দিয়েছিল।

ক্লাইস্থেনিসের আইন প্রণয়নের ফলস্বরূপ গোত্র, ভ্রাতৃত্ব আর গোষ্ঠীর ক্ষমতা কমে গিয়েছিল, কারণ ক্ষমতা তাদের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে তুলে দেওয়া হয়েছিল শহর, স্থানীয় গোষ্ঠী আর রাষ্ট্রের হাতে। তারপর থেকে এইগুলোই হয়ে ওঠে যাবতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎসস্থল। তবে এই ঘটনার পর গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীগুলো তৎক্ষণাৎ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। আরও বেশ কয়েকশ বছর এগুলো টিকে ছিল বংশপরিচয় ও বংশধারার ধারক হিসেবে এবং ধর্মীয় জীবনের উৎসভূমি হিসেবে। ব্যক্তিগত বা সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার, বংশধারা নির্ণয় বা কবর দেওয়ার অধিকার বিষয়ক কিছু বক্তৃতায় গোত্র ও ভ্রাতৃত্বকে সক্রিয় সংগঠন হিসেবেই উল্লেখ করেছিলেন ডিমস্থিনিস।[২] ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, কয়েকটা অপরাধের বিচার আর অন্যান্য কিছু সামাজিক কাজকর্মের ব্যাপারে গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে নি নতুন ব্যবস্থা, ফলে গোত্র ও ভ্রাতৃত্ব একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। তবে থেসেউস ও পরবর্তীকালে সোলোন কর্তৃক সৃষ্ট শ্রেণীগুলো ক্লাইস্থেনিসের আমলের পর একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।[৩]

১। "অ্যাংলো-স্যাক্সন ল্য", হেনরি অ্যাডামস এবং অন্যান্য, পৃঃ ২০, ২৩।

২। বিশেষত ইউবুলাইডস এবং মার্কেটাস-এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

৩। হার্মান-এর "পলিটিক্যাল অ্যান্টিকুইটিস অফ গ্রীস", পরিচ্ছেদ ১, পৃঃ ১৮৭।

BanglaBook.org

এথেনিয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সোলেনের নামই করা হয়ে থাকে। কোন কোন লেখক আবার ক্লাইস্থেনিস ও থেসেউসকেও এ ব্যাপারে কিছুটা কৃতিত্ব দিয়ে থাকেন। থেসেউস, সোলোন ও ক্লাইস্থেনিসকে এথেনিয় জনসাধারণের তিনটি বৃহৎ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিচার করলে সত্যের অনেক কাছাকাছি পৌঁছতে পারব আমরা। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এই তিনটি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ এই সবকটা আন্দোলনের আগে থেকেই এথেন্সে গণতন্ত্র চালু ছিল। আন্দোলনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল সরকার-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো—গোত্রীয় সংগঠনের বদলে রাজনৈতিক সংগঠন চালু করা। গোত্রগুলোর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গণতান্ত্রিক নীতিগুলোকে পাল্টানোর উদ্দেশ্য কোন আন্দোলনেরই ছিল না। তারা আসলে তাদের নিজ নিজ সময়ে রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টাকেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিল। এ-কাজের জন্য দরকার ছিল গোত্রীয় সমাজের জায়গায় একটা রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য শহর উদ্ভাবন এবং তার বাসিন্দাদের একটা রাজনৈতিক সংঘ হিসেবে সংগঠিত করাটাই ছিল প্রধান কাজ। কথাটা শুনতে খুব সহজ মনে হতে পারে, কিন্তু এই শহর গড়ার ধারণাটাকে রূপ দেওয়ার জন্য এথেনিয়দের সবটুকু বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ঘটাতে হয়েছিল। ক্লাইস্থেনিসের প্রতিভাই ছিল এর চালিকাশক্তি। এক প্রতিভাবান মানুষ তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন এথেন্সের ইতিহাসে। নতুন রাজনৈতিক সমাজে পূর্ণ গণতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করে তারা। এই পূর্ণ গণতন্ত্র আগে থেকেই তাদের প্রতিটা আবশ্যিক নীতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তবে তাকে আরও বিস্তৃত, আরও পূর্ণাঙ্গ করে তোলার জন্য দরকার ছিল সরকারের ধাঁচটাকে পাল্টানো। আমার মতে মহান ঐতিহাসিক মিঃ গ্রোটে ঠিক এই প্রশ্নে একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের ভুল পথে চালিত করেছেন। সাধারণভাবে গ্রীসের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত গভীর ও প্রাঞ্জল। অথচ তিনি বলেছেন যে গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর প্রথম দিককার সরকার ছিল 'মূলগতভাবে রাজতান্ত্রিক'।[১] তা যদি হত, তাহলে গণতন্ত্রের আমলে এথেনীয় জনগণের যে বিপুল মানসিক অগ্রগতি হয়েছিল, সেই গণতন্ত্রের বাস্তবায়ণের জন্য তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোয় এক আমূল বিপ্লব ঘটানোর দরকার হত। কিন্তু এরকম কোন বিপ্লব ঘটেনি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোন আমূল পরিবর্তনও কখনও ঘটানো হয় নি, কারণ বরাবরই এগুলো 'মূলগতভাবে গণতান্ত্রিক' ছিল। পুরাতন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বলপ্রয়োগের ঘটনা হয়ত ঘটেইছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কখনও নিজেদের স্বাতন্ত্র্যবোধ হারায় নি, স্বাধীনতার ধারণা বা স্বশাসনের অধিকারকে খুইয়ে বসে নি। সমস্ত যুগেই এগুলো ছিল তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পদবিশেষ। এখন আর-একবার ব্যাসিলিয়ুসের কথায় ফেরা যাক। এই পদটার কাজকর্ম এমনই ছিল, যার ফলে এই পদাধিকারী মানুষটি অন্য সবার থেকে বিশিষ্ট হয়ে উঠত। ঐতিহাসিকদের চোখ স্বভাবতই প্রথমে তার ওপরেই পড়েছে এবং তাকেই তাঁরা রাজা বলে চালিয়ে দিয়ে-

১। "প্রাচীন গ্রীসের সরকার ছিল মূলগতভাবে রাজতান্ত্রিক, যার ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত অনুভূতি আর দৈব অধিকার।"—"হিস্ট্রি অফ গ্রীস", ২,৬৯।

BanglaBook.org

ছেন। তবে এ-কথা সত্য যে দৈব অধিকারের জোরে একটা অ-মার্জিত গণতন্ত্রের দ্বারা শাসন চালাত সে। সামরিক গণতন্ত্রের সেনাপতি হিসেবে ব্যাসিলিয়ুসের এই ভূমিকাটা গ্রাহ্য হয়ে ওঠে আর এ-জন্য বিদ্যমান কোন প্রতিষ্ঠানকে লঙ্ঘন করার দরকারও হয়নি তার। এই পদটা চালু হওয়ার ফলে গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর নীতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এই সংগঠনগুলো ছিল গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন এবং প্রয়োজনের খাতিরে এই গণতান্ত্রিক চরিত্রটা গোটা গোত্রভিত্তিক ব্যবস্থাতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জনমত যে সর্বদাই সক্রিয় থাকত, সে ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণ দাখিল করা যেতে পারে। ব্যাসিলিয়ুস পদটা বেশ প্রাচীনকালের ব্যাপার, তখনও সরকারের ক্ষমতার সীমা খুব-একটা সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু গোটা ব্যবস্থাটার কেন্দ্রবিন্দু ছিল প্রধানদের পরিষদ এবং পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় ছিল গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠী। এ-সব থেকেই সেই সময়কার শাসনব্যবস্থার চরিত্রটা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।[১]

ক্লাইস্থেনিস কর্তৃক পুনর্গঠিত সরকার সোলোনের আমলের আগেকার সরকারের থেকে একেবারেই আলাদা। এই রূপান্তরটা একান্ত স্বাভাবিকই শুধু নয়, অবশ্যম্ভাবীও ছিল। কারণ মানুষ নিজেদের ধ্যান-ধারণাকে তার যুক্তিসম্মত পরিণতি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পেরেছিল। রূপান্তরের ফলে শুধু সরকারের ধাঁচটাই পাল্টেছিল, কোন নিয়ম-নীতি বা রীতি-পদ্ধতি পাল্টায় নি। ব্যবস্থাপক-সভার মধ্যেই টিকে ছিল প্রধানদের পরিষদ, লোকসভার মধ্যে বেঁচে ছিল গণ-পরিষদ। সর্বোচ্চ তিনজন বিচারক আগের মতই যথাক্রমে রাষ্ট্র, ধর্ম ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হত। বাকি ছয়জন বিচারক আদালতের নানান বিচারসংক্রান্ত কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করত। বিচার-বিভাগীয় কাজের জন্য প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক ডিকাস্টকে মনোনীত করা হত। নতুন ব্যবস্থায় কোন কার্যনির্বাহী আধিকারিক থাকত না—এটা এই ব্যবস্থার একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। নতুন ব্যবস্থায় ঐ কার্যনিবাহী আধিকারিকের সবথেকে কাছাকাছি পদ ছিল ব্যবস্থাপক-সভার সভাপতির পদ। বৃহত্তাংশের মধ্যে থেকে এক-একদিন এক-একজনকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হত। যে একবার সভাপতি হত তার আর সেই বছরের মধ্যে সভাপতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকত না। একদিনের জন্য সে লোকসভার সভাপতিত্ব করত এবং নগরদুর্গ ও কোষাগারের চাবি সেদিন তার কাছেই থাকত। নতুন সরকারের আমলে লোকসভার হাতেই সবথেকে বেশি ক্ষমতা থাকত এবং এই লোকসভাই

১। সভ্য যুগেও স্পার্টায় ব্যাসিলিয়ুস পদটা ছিল। এটা ছিল এক ধরনের দ্বৈত সৈনাপত্য এবং একটা বিশেষ পরিবারের লোকেরা উত্তরাধিকারসূত্রে পদটার অধিকারী হত। জেরুসিয়া বা পরিষদ, গণ-পরিষদ, পাঁচজন এফোর (ephor) আর দুজন সেনাপতি—এরাই ছিল মিলিতভাবে সরকারি ক্ষমতার প্রতিভূ। এফোরদের প্রতি বছর নির্বাচিত করা হত, এদের ক্ষমতা ছিল ঠিক রোমান গোষ্ঠীপতিদের মতই। অনেক গুণ না থাকলে কেউ স্পার্টার রাজা হতে পারত না। ব্যাসিলিয়ুসই সৈন্যবাহিনীকে পরিচালিত করত এবং মুখ্য পুরোহিত হিসেবে সেই দেবতার কাছে বলি উৎসর্গ করত।

BanglaBook.org

নির্ধারণ করত এথেন্সের ভবিতব্য। পরিপূর্ণ স্বশাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতাসম্পন্ন শহরগুলোই রাষ্ট্রকে স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলা এনে দিয়েছিল। এইরকম একশটা শহর মিলেই সম্মিলিত রাষ্ট্রটির সাধারণ গতিপথ নির্ধারণ করত। প্রাথমিক এককটা যেমন হত, সমগ্র কাঠামোটাও তেমনই হত। আগেই বলা হয়েছে যে এইখান থেকেই মানুষ স্বশাসনের নিয়ম-পদ্ধতি এবং সকলের জন্য সমান আইন, সমান অধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখার কলাকৌশল শিখেছিল। একটা সুদক্ষ সাধারণ প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য এবং প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য সমাজের যাবতীয় ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতাটাও তারা নিজেদের হাতেই রাখত।

নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে এথেন্সের উন্নতি ও প্রভাব অতি দ্রুত বাড়তে থাকে। প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার যে দারুণ বিকাশ সমগ্র মানবসমাজের ঐতিহাসিক জাতিগুলোর মধ্যে এথেন্সকে অত্যুচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তা ছিল আসলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোরই অবদান।

ক্লাইস্থেনিসের আমলে রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর গোত্রীয় সংগঠনকে বর্বর যুগের অবশেষ হিসেবে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাদের পূর্বপুরুষরা বহু শতাব্দী ধরে গোত্রীয় সংগঠনের মধ্যে বসবাস করেছিল। এই সংগঠনের মধ্যে থেকেই তারা অর্জন করেছিল সমগ্র সভ্যতার বীজগুলি, অর্জন করেছিল লিখিত ভাষা। এই সংগঠনই তাদের পৌঁছে দিয়েছিল সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে। প্রাচীন যুগের ইতিহাসের পাতায় গোত্রীয় সংগঠনের কথা চিরদিন উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। মানবজাতির সবথেকে বৈশিষ্ট্যময় ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতার সঙ্গে গোত্রীয় সংগঠন মিশে আছে এক হয়ে। মানবজাতির ইতিহাসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম হিসেবে সর্বদাই চিহ্নিত হবে গোত্রীয় সংগঠন।

এই সংক্ষিপ্ত ও অপ্রতুল পর্যালোচনায় আমরা এথেনিয় ইতিহাসের শুধুমাত্র প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো নিয়েই আলোচনা করলাম। এথেনিয় গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে যা সত্য, অন্যান্য গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রেও তা মোটামুটি সত্য। তবে অন্যদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়ত অত ব্যাপক বা অত উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারেনি। এই সমগ্র আলোচনা থেকে আমাদের একটা মূল প্রতিপাদ্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—মানবজাতির সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই সরকার বিষয়ক ধারণা বিকাশের একটা ধারাবাহিক স্তরের পথ বেয়েই এগিয়েছে।

প্রথম খণ্ড শেষ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org